সাইয়েদ কুতুব শহীদ

কোরআনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

কোরআনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

প্রথম খন্ড ঃ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ
দ্বিতীয় খন্ড ঃ মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

www.pathagar.com

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

www.pathagar.com

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ

সূরা আল ফাতেহা	৭
সূরা আল আনয়াম	৭
সূরা আল আ'রাফ	৪৯
সূরা ইউনুস	৬৭
সূরা হুদ	৭৭
সূরা ইউসুফ	৮৬
সূরা ইবরাহীম	১০৭
সূরা আল হেজর	১১৩
সূরা আন নাহল	১১৬
সূরা বনী ইসরাঈল	১১৮
সূরা আল কাহ্‌ফ	১২৪
সূরা মারইয়াম	১২৮
সূরা ত্বাহা	১৩০
সূরা আল আম্বিয়া	১৩২
সূরা আল মোমেনুন	১৩৫
সূরা আল ফোরকান	১৩৯
সূরা আশ শোয়ারা	১৪৭
সূরা আন নামল	১৪৮
সূরা আল কাছাছ	১৫১
সূরা আল আনকাবুত	১৫৭
সূরা আর রোম	১৫৯
সূরা লোকমান	১৬২
সূরা আস সাজদা	১৬৮
সূরা সাবা	১৭৩
সূরা ফাতের	১৭৭
সূরা ইয়াসিন	১৭৯
সূরা আছ ছাফফাত	১৮২
সূরা ছোয়াদ	১৮৫
সূরা আয্ যুমার	১৮৮
সূরা আল মোমেন	১৯০
সূরা হা-মীম আস সাজদা	১৯৪
সূরা আশ শূ-রা	১৯৭
সূরা আয যোখরুফ	২০১
সূরা আদ দোখান	২০৩
সূরা আল জাছিয়া	২০৫
সূরা আল আহকাফ	২০৭
সূরা ক্বাফ	২১০
সূরা আয যারিয়াত	২১১
সূরা আত তূর	২১৩
সূরা আন নাজম	২১৭
সূরা আল ক্বামার	২২০
সূরা আল ওয়াক্বেয়া	২২১
সূরা আল মুলক'	২২৩
সূরা আল ক্বালাম	২২৮
সূরা হাক্বাহ	২৩৬
সূরা আল মায়ারেজ	২৪০
সূরা নূহ	২৪৬
সূরা আল জ্বিন	২৫৫
সূরা আল মোযযাম্মেল	২৫৬
সূরা আল মোদ্দাসসের	২৬২
সূরা ক্বেয়ামাহ	২৬৭
সূরা আদ দাহর	২৭০
সূরা আল মোরসালাত	২৭৩
সূরা আন-নাবা	২৭৫
সূরা আন নাযেয়াত	২৭৬
সূরা আবাসা	২৭৯
সূরা আত্ তাকওয়ীর	২৮১
সূরা আল এনফেতার	২৮৩
সূরা আল মোতাফফেফীন	২৮৪
সূরা আল এনশেকাক্ব	২৮৬
সূরা আল বুরুজ	২৮৮
সূরা আত্ তারেক	২৯০
সূরা আল আ'লা	২৯১
সূরা আল গাশিয়াহ	২৯২
সূরা আল ফজর	২৯৩
সূরা আল বালাদ	২৯৫
সূরা আশ্ শামস	২৯৫
সূরা আল লায়ল	২৯৬
সূরা আদ দোহা	২৯৮
সূরা আল এনশেরাহ	৩০০
সূরা আত্ তীন	৩০০
সূরা আল আলাক্ব	৩০০
সূরা আল ক্বাদর	৩০৭
সূরা আল আ'দিয়াত	৩০৮
সূরা আল ক্বারিয়াহ	৩০৯
সূরা আত্ তাকাসুর	৩০৯
সূরা আল আসর	৩০৯
সূরা আল হুমাযাহ	৩১০
সূরা আল ফীল	৩১০
সূরা কোরায়শ	৩২০
সূরা আল মাউন	৩২১
সূরা আল কাওসার	৩২২
সূরা আল কাফেরূন	৩২৩
সূরা লাহাব	৩২৬
সূরা আল এখলাস	৩২৮
সূরা আল ফালাক্ব	৩২৮
সূরা আন্ নাস ❐	৩৩০

www.pathagar.com

সূরা আল ফাতেহা

সাত আয়াতবিশিষ্ট এই ছোট সূরাটিকে প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে তেলাওয়াত করেন। যদি এর সাথে কিছু সুন্নত ও নফল পড়া হয় তাহলে এই সংখ্যা অবশ্য আরো বেশী হবে। এই সূরার গুরুত্ব সম্পর্কে সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উবাদা বিন সামেতের বর্ণনা রয়েছে, 'সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত ছাড়া নামায শুদ্ধ নয়।'

এই সূরায় ইসলামী আকিদা ও ধ্যান ধারণার মৌলিক অংশগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামী আকিদার মাধ্যমে লালিত চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রাস্তাসমূহকে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই সূরার তেলাওয়াত প্রতিটি রাকায়াতেই জরুরী এবং এই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এই সূরার তেলাওয়াত ছাড়া নামায কেন শুদ্ধ হয় না।

সূরা আল আনয়াম

এ সূরাটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলো। মক্কী জীবনের সময়কাল ছিলো পূর্ণ তেরো বছর। এ সূরাগুলোতে একটি মাত্র বিষয়কেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন আংগিকে পেশ করা হয়েছে। আল কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো কথা বা বিষয় একাধিকবার পেশ করা হলেও প্রতি বারেই তাকে নতুন এক ভাষা ও ভংগিতে পেশ করা হয়, যার ফলে প্রত্যেক বারই পাঠকের কাছে বিষয়টিকে নতুন মনে হয়।

প্রথম যে বিষয়টির ওপর কোরআনুল কারীমের আলোচনা শুরু হয়েছে তা হচ্ছে এই– 'দ্বীন' এবং এই দ্বীনের জন্যে সব থেকে বড়ো এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে এর 'আকীদা বিশ্বাস'। এটাকেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা যায়। কেননা এ বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দাসত্ব এবং প্রভু ও তার গোলামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়।

এ বিষয়ের আলোচনায় গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ মানুষই– তা সে যে এলাকারই হোক না কেন। আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করায় সে আরবী, কিন্তু মানুষ হিসাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের সাথে তার একটা মানবীয় সম্পর্ক সব সময়েই অবশিষ্ট থাকবে।

আসল বিষয় হচ্ছে 'মানুষ'– যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ সৃষ্টির বুকে তার অস্তিত্বই আসল বিষয় এবং এখান থেকে জীবন শেষে চলে যাওয়ার বিষয়টিও এই মানুষেরই বিষয়। সৃষ্টির সব কিছুই মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যে সম্পর্ক তাও মানুষকেই কেন্দ্র করে। এ এমন একটি বিষয়, যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ গোটা সৃষ্টির মূল ব্যাপার-ই হচ্ছে মানুষ।

আল কোরআনের এই মক্কী সূরাটি সেই মানুষকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা দানই এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরাটির মধ্যে প্রধান জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

মানুষকে কেন্দ্র করেই এসেছে। সে জিজ্ঞাসাটি হচ্ছে– মানুষ কে? কোথেকে এসেছে সে? কেমন করে সে এখানে এলো? কেন এলো? এ জীবন শেষে সে কোথায় যাবে? 'না' থেকে কে তাকে অস্তিত্বে নিয়ে এলো? কে তাকে পুনরায় এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং কোথায় নিয়ে যাবে? যে ধরণীকে সে অনুভব করছে এবং দেখছে তাই বা কী জিনিস? আল কোরআন তাকে এসব প্রশ্নের খোলামেলা ও বাস্তবসম্মত জবাব বলে দিচ্ছে। তার দৃষ্টির অন্তরালে যা কিছু আছে সে অনুভূতি দিয়ে তা বুঝতে পারে; কিন্তু দেখতে পায় না। তাই বা কী জিনিস? এই রহস্যাবৃত সৃষ্টিকে কে অস্তিত্ব দান করলো? কে এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা করছে এবং কেই বা পরিচালনা করছে এসব কিছুকে? আর কিভাবে মানুষের সাথে এ সৃষ্টি জগত ও তার স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ সাধিত হচ্ছে এবং বান্দা তার স্রষ্টার সাথে কিভাবেই বা যোগাযোগ করে চলেছে?

এই সব প্রধান প্রধান বিষয় নিয়েই সত্যিকার অর্থে মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে। আর সর্বকালে সর্বযুগে এগুলোই হচ্ছে প্রধান সেই সব বিষয়, যার ওপর নির্ভর করছে গোটা সৃষ্টি জগত।

তেরোটি বছর ধরে মানুষের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এসব বড়ো বড়ো সমস্যা পর্যালোচনা এবং সমাধান করার কাজেই এ মহাগ্রন্থ নিয়োজিত থেকেছে। এ কারণেই মানুষের জীবনের ছোট বড় সকল সমস্যাই আল কোরআনের বিবেচ্য বিষয়।

তবে কোরআনুল কারীম মানুষের এসব মৌলিক বিষয়াদির সীমা পেরিয়ে ততোদিন পর্যন্ত তার শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি, যতোদিন না এর জন্যে তেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং গোটা মানবমন্ডলীর মাঝে কোরআনে বিরোধীদের সকল বিদ্বেষের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এ পাক কালামের আবেদন সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর দেয়া এ জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবেই মক্কী জীবনের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় যাবতীয় আয়োজন।

এখানে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দানকারী হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সেই ব্যবস্থাকে আল্লাহর যমীনে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময়ে বাতিল ব্যবস্থা দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআনের দাওয়াত এবং ইসলামী আকীদাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এ সময় এ পবিত্র মক্কা নগরীতে মোহাম্মদ (স.) যতোদিন উপস্থিত ছিলেন, ততোদিন তিনি একামতে দ্বীনের বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি এবং মুসলমানদের জন্যে বিস্তারিত কোনো আইন কানুনও তিনি প্রণয়ন করেননি।

আল্লাহর হেকমতের দাবী ছিলো দাওয়াতের প্রথম ও মূল কথাটির দিকেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাই রসূলুল্লাহ (স.) সর্ব প্রথম কালেমায়ে তাইয়্যেবা-লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ– এই কথার দিকেই মানুষদের আহবান জানান এবং মানুষকে এ কথার সাক্ষ্য দান করার জন্যে ডাকতে থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আইনদাতা নেই, ক্ষমতার মালিক বলতে কেউ নেই। সুতরাং তাদের কর্তব্য শুধু তাঁরই নিরংকুশ আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা, অন্য কারো নয়।

www.pathagar.com

বাহ্যিক ও গভীর চিন্তার দৃষ্টিতে আরবদের কাছে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ দাওয়াত গ্রহণ করা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। তারা আরবীভাষী হিসাবে আরবী শব্দ ইলাহ-এর অর্থ ঠিকই বুঝেছিলো যে, এর অর্থ হচ্ছে– 'শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ কর্তৃত্ব'। তারা এটাও বুঝেছিলো উলুহিয়্যাত এবং পবিত্র আল্লাহ্‌র একত্ব শব্দটির অর্থ হচ্ছে– ধর্মজাযক, গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলীয় নেতা ও শাসনকর্তা– যে যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে তুলে দেয়াই হচ্ছে আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এ ক্ষমতা বলতে বুঝায় মানুষের বিবেকবুদ্ধির মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার চেতনা সৃষ্টি করা, তাঁকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে অনুভব করা, জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ ও ঘটনাবলী ফয়সালার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই ক্ষমতাকে চূড়ান্ত মনে করা, সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তাঁরই আইন মানা, তাঁর আইন মতোই বিচার ফয়সালা করা এবং গোটা দেহ ও মনের মধ্যে তাঁরই আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়া। আরবী ভাষাভাষীরা অবশ্যই জানতো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ পৃথিবীর সকল ক্ষমতা– যা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারীরা কুক্ষিগত করে রেখেছিলো এবং নানা ওজুহাতে তারা এসব ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেছিলো, এগুলোর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর এই ক্ষমতায় ভাগ বসানোর অধিকার আল্লাহ তায়ালা কাউকেই দেননি। ইলাহ-এর এই সর্বব্যাপী এসব অর্থের কোনোটিই আরবদের চিন্তা চেতনা বাইরে ছিলো না। তাদের ভাষার অর্থ তারাই ভালোভাবে বুঝবে এটাই স্বাভাবিক। তারা ভালোভাবেই বুঝতো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায় এবং এই কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানানোর উদ্দেশ্যই বা কি। তারা জানতো এই কথা গ্রহণ করলে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে এবং নেতৃবৃন্দরাও জানতো যে, বিভিন্ন জিনিস ও অঞ্চলের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষমতাকে একদিন তাদের থেকে চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেয়া হবে। এই সমস্ত অর্থ বুঝতে পেরেই তারা আদাজল খেয়ে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। এই দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্যে যতো প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারতো তার কোনোটাই তারা বাদ রাখে নাই।

ভেবে দেখতে হবে, এই দাওয়াতের সূচনা এই তাওহীদের কথা দিয়ে কেন শুরু করা হলো, আর কেনই বা আল্লাহ তায়ালা চাইলেন এই দাওয়াতী কাজ শুরু করার সাথে সাথে রসূলের এবং তাঁর সাথীদের এমন কষ্ট হোক।

রসূলুল্লাহ (স.) এই মহান দ্বীন নিয়ে যখন প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন আরব দেশের বেশীর ভাগ উর্বর এবং ধনী এলাকাগুলো আরবদের হাতে ছিলো না। অপেক্ষকৃত ভালো অঞ্চলগুলো ছিলো অনারবদের হাতে।

উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সিরিয়ার পুরো অঞ্চলটিই ছিলো রোম সাম্রাজ্যের কতৃত্বাধীনে। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক আরব আমীর এই অঞ্চলটি শাসন করতো। দক্ষিণে অবস্থিত ইয়ামান ছিলো পারস্যের শাসনাধীন এবং পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলটিকেও চালাতো কিছু সংখ্যক আরব আমীর। আরবদের হাতে

www.pathagar.com

ছিলো মাত্র হেজায, নাজদ এবং অনুর্বর কিছু মরু অঞ্চল, এসব এলাকায় শুধু খেজুরবৃক্ষ এবং বাবলা গাছ উৎপন্ন হতো।

এ সময় মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে কী ছিলো তাও ভেবে দেখা দরকার। কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ কালে হাজরে আসওয়াদটিকে তার নিজ স্থানে রাখার প্রশ্নে তাঁকে 'আল আমীন' বলে ঘোষণা করা ও তাঁর ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্যে কোরায়শের সকল নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছিলো। উপরন্তু তিনি কোরায়শদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। উত্তরাঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী রোমশক্তি ও দক্ষিণের পারস্য শক্তির প্রভাবমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে দ্বিধা বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু আরব কাবিলাগুলোকে একত্রিত করে আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা ও তাদের গুণাবলীকে ওপরে তুলে ধরার যোগ্যতা তিনি নিসন্দেহে রাখতেন এবং একমাত্র তাঁর পক্ষেই সারা আরবের বুকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো।

সেদিন যদি রসূল (স.) আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহবান জানিয়ে সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে চাইতেন, তাহলে নিসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় সকল আরববাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিতো। দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আরব উপদ্বীপের ক্ষমতাধরদের সাথে এই কঠিন সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে সহজেই তিনি আরব বিশ্বের নেতৃপদে বরিত হতে পারতেন।

মোহাম্মদ (স.) যদি আরবদেরকে সংগঠিত করে অপরদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে অবশ্যই তার হাতে সম্মিলিতভাবে সকল ক্ষমতা তুলে দিতো এবং তিনি সবার অবিসংবাদিত নেতা হয়ে যেতেন। তারপর তিনি যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আর কেউ রুখে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতো না এবং এইভাবে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সহজেই সকল জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো।

কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে নির্দেশ দেননি। তাঁকে সর্বপ্রথম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকাশ্য দাওয়াত দান করার জন্যে নির্দেশ দিলেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় যে বাধাবিপত্তি বিপদআপদ ঘাতপ্রতিঘাত আসবে, এই দাওয়াত গ্রহণকারী ছোট দলটিকে তা সহ্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন।

কিন্তু কেন এমন হলো? আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তো কিছুতেই তাঁর রসূল ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে কখনো কষ্ট দিতে চান না। আসলে আল্লাহ তায়ালা জানেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ওইটি নয়। রোমের তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) এবং পারস্যের তাগুতী শক্তিকে আরব তাগূতদের দ্বারা তিনি পরাভূত করতে চাননি। কারণ তাগুতরা সবাই একই প্রকার তাগূত!

পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এজন্যে এ পৃথিবীকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই মুক্ত করতে হবে। আর আল্লাহর এ বিশ্বকে মুক্ত করতে হলে কালেমায়

www.pathagar.com

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র ঝান্ডাকে বুলন্দ করতে হবে সবার আগে সুতরাং, পথ এটা নয় যে, রোমান তাগুত ও পারসিক তাগুতদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আরব তাগুতদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আসল কথা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর পতাকা সমুন্নত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কিছুতেই এক আল্লাহর বান্দা হতে কিংবা থাকতে পারে না। কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ আরবী ভাষাভাষীরা এটিই বুঝে নিয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের জীবনের জন্যে আইন কানুন দেয়ার একচ্ছত্র মালিকও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। কারণ সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে সত্যিকার জাতীয়তা একমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ জাতীয়তার দৃষ্টিতে রোম, পারস্য ও আরবের অধিবাসিরা সবাই সমান, আল্লাহর ঝান্ডা তলে সকল শ্রেণী ও রংয়ের মানুষ এক, আর এটিই হচ্ছে সঠিক পথ।

রসূলুল্লাহ (স.) এই জীবনব্যবস্থা নিয়ে যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরব সমাজ সম্পদ ও ইনসাফ বিতরণের ক্ষেত্রে এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের হাতে দেশের সমুদয় সম্পদ ও ব্যবসা কুক্ষিগত ছিলো, যারা সূদের ব্যবসা করে তারা তাদের ব্যবসা ও সম্পদকে বহু বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলেছিলো এবং সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ছিলো কপর্দকহীন– দু একখানি রুটির কাংগাল। সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে এসব কায়েমী স্বার্থবাদী এসব মিথ্যা আভিজাত্যের ধ্বাজাধারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন এবং জনগণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওইসব সম্পদশালীর হাত থেকে সম্পদের পাহাড় খসিয়ে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্যে মানুষকে ডাক দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও অবশ্য তাঁর হাতে ছিলো।

সেদিন রসূল (স.) যদি সত্য সত্যই মযলুম জনতাকে এইভাবে ডাক দিতেন, তাহলে আরব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো এবং তারা বিজয়ী হয়ে যেতো। এই ভাগের লোকেরা সম্পদ ও সম্ভ্রমের মোকাবেলায় তো স্বাভাবিকভাবে দ্বীন ইসলামের নতুন এই দাওয়াতের সাথেই থাকতো, কিন্তু 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- র দাওয়াত সবাই সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করতে পারতো না এবং বিচ্ছিন্ন এই গোত্রসমূহের কাছে সামগ্রিকভাবে এ দাওয়াত গ্রহণযোগ্যও হতো না।

আবার এমনও বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আচার ব্যবহার এতো সুন্দর ছিলো যে, ওই সমাজের সংখ্যাধিক্য লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর অল্প কিছু সংখ্যক প্রথম দিকে পিছিয়ে থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতো এবং তাঁর নেতৃত্ব সমাজে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এইভাবে তাঁর রব তাঁকে তাওহীদের দাওয়াত দান করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালন করার সাথে সাথে সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁর আধিপত্যও কায়েম হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

কিন্তু মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এর কোনোভাবে কাজ করার জন্যে পাঠাননি।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন ইসলামী দাওয়াত দান করার প্রকৃত পথ এটা নয়। কেননা একমাত্র আকীদা বিশ্বাসের কারণেই সমাজে সামাজিক ইনসাফ প্রসার লাভ করতে পারে, সকল কাজ পরিচালনার বিষয়টি আকীদার কারণেই সর্বশেষে আল্লাহর দিকে মোড় নেয়। একবার আকীদা ঠিক হয়ে গেলে সন্তুষ্টি ও আনুগত্যবোধের সাথে মোহাম্মদ (স)-কেই ফয়সালাদাতা মেনে নেয়া হতো এবং বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করতো যে, তিনি অবশ্যই এমন ফয়সালা দেবেন যাতে আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে যাবেন। আর তখনই মানুষ আনুগত্যপূর্ণ হৃদয় দিয়ে বুঝতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্যের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আকীদার বিভ্রান্তি দূর হয়ে যখন মানুষ সার্বিক বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে আসবে, তখনই তার অন্তরগুলো লোভ লালসার হাতছানি ও হিংসা-বিদ্বেষের কুটিলতা পরিহার করতে সক্ষম হবে। আকীদা ঠিক হয়ে গেলে অন্তরগুলো বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হবে না বা মানুষের আত্মাও সেইভাবে বিষাক্ত হবে না। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র দাওয়াত অস্বীকারকারীদের মন এ কারণেই বরাবর নির্লোভ থেকেছে।

গোটা আরব উপদ্বীপের মানুষের চরিত্র যখন নিম্নতম স্তরে নেমে গিয়েছিলো সেই সময়েই রসূলুল্লাহ (স.) তাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সমাজের সর্বত্র যুলুম নির্যাতন কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো তা যোহায়ের ইবনে আবি সুলামীর নীচের কবিতাংশ থেকে কিছুটা আন্দায করা যায়।

'যে নিজের পানশালা তরবারি দ্বারা রক্ষা করতে পারে না তা ভেংগে দেয়া হয়,
আর যে মানুষের প্রতি যুলুম করে না তার ওপর প্রতিনিয়ত যুলুম করা হয়।'

এই রকমই আর একটি কথা দ্বারা ওপরের কথার সমর্থন পাওয়া যায়,

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো– সে যালেম হোক কিংবা মযলুম হোক।'

সমাজের সর্বত্র সাধারণভাবে মদ ও জুয়ার প্রচলন ছিলো এবং এগুলো দ্বারা আভিজাত্যের প্রদর্শনী করা হতো। এদের চরিত্র সম্পর্কে জাহেলিয়াতের একজন কবি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা তারাফা ইবনুল আবদ-এর নীচের কবিতার সাথে মিল খায়।

'আহ যদি পেতাম আমি তিনটি জিনিস, যা একজন যুবকের কাছে সৌন্দর্যের বস্তু। তোমার ভালোবাসা, যা আমি তখন পাইনি যখন চেয়েছি।

সকল আবেগ সহকারে রংগীন মদিরা হাতে।

রোষ-কষায়িত লোচনে তুমি হেরিছো মোর পানে, সাথে অশ্রুভেজা চোখে দিয়েছো এগিয়ে সুরার পেয়ালাটিরে!'

আরবরা নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতো। একটি হাদীস থেকে তাদের কদর্য জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকখানি আন্দায করা যায়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

(উৎসাহী পাঠকদের যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি বিস্তারিত পাঠ করতে চান তারা অনুগ্রহপূর্বক সূরা আন নেসার তাফসীরে 'জাহেলী যুগের বিয়ে' শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি দেখে নিন।)

আরব সমাজের চরম নৈতিক অধপতনের পেক্ষাপটে মোহাম্মদ (স.) সমাজ সংস্কারের জন্যে সে বিষয়ের দিকে মানুষদের আহবান জানাতে পারতেন, যার দ্বারা মানুষের চারিত্রিক উন্নতি হতে পারতো। সমাজ পরিচ্ছন্ন হওয়ার পথ খোলাসা হতো, মানুষের মধ্যে পারস্পারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেতো এবং সামাজিক মেলামেশার মধ্যে ভারসাম্য পয়দা হতে পারতো।

আর একথা সত্য যে, রসূলুল্লাহ (স.) যখন সে এলাকায় বসবাস করতেন তখন সেখানে এসব সংস্কারমূলক কাজ করতে অবশ্যই সক্ষম হতেন, ঠিক অন্যান্য সংস্কারকরা যেমনটি করে থাকেন। নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় তারা অবশ্যই কিছু সংখ্যক ভালো লোক তৈরী করতে সক্ষম হন, তাদের মধ্য থেকে চারিত্রিক দোষ ও কদর্য ব্যবহার দূরীভূত করে বহু মন্দ ও ক্ষতিকর আচরণ থেকে মানুষকে মুক্তও করতে পারতেন।

এমনও কেউ কেউ বলেছেন, যদি রসূল (স.) এভাবে তাঁর সংস্কার অভিযান চালাতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সফল হতেন এবং বহু লোক শুরুতেই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো, আর এর ফলে এই লোকদের পক্ষে ইসলামী আকীদা গ্রহণ করাও সহজ হতো এবং এইভাবে কাজ করলে প্রথম দিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দান করা থেকে অনেক বেশী কাজ হতো!

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন যে, এটা কোনো সঠিক পথ বা পদ্ধতি নয়। তিনি ভালো করে জানেন যে, সঠিক আকীদার ভীতছাড়া কোনো মযবুত চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। এই আকীদাই নৈতিকতার আসল মানদন্ড এবং এই আকীদাই জীবনের সঠিক মূল্যবোধ স্থাপন করে, আর এইভাবে এ কালেমা সেই ক্ষমতাকে স্থির করে দেয় যার ওপর এসব মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদন্ড দাঁড়িয়ে থাকে। এইভাবেই এই কালেমার ধারক বাহক এবং এর বিরোধীরা নিজ নিজ কাজের ফল ভোগ করে। এই আকীদা স্থির না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বুনিয়াদই নড়বড় থাকে। এমতাবস্থায় কোনো শৃংখলাই টেকে না। কোনো ক্ষমতা স্থায়ী হয় না এবং তার থেকে কোনো প্রতিদান প্রাপ্তিরও আশা করা যায় না।

এমনি করে দীর্ঘদিন ধরে রসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবাদের কঠিন চেষ্টা-সাধনার পর মুসলমানদের আকীদা যখন স্থির হয়ে গেলো, তাদের বিশ্বাস যখন মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেলো তখনই আল্লাহর বান্দারা তাদের রবকে ঠিকমতো চিনতে সক্ষম হলো এবং একমাত্র তাঁর আনুগত্য করার জন্যে তারা সংকল্পবদ্ধ হলো। এই সময়েই মানুষ-মানুষের গোলামী ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভ করলো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র দাওয়াত সঠিকভাবে অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করানো সম্ভব হলো তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরিকল্পিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজটি, তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের দ্বারা সম্ভবপর হলো।

www.pathagar.com

এই সময়ে পৃথিবী রোম ও পারস্যের গোলামী থেকে নাজাত পেলো ঠিকই, কিন্তু সে স্থলে তাদের আরবদের কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো না; বরং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহর আধিপত্য।

এ সময়ে সমাজের মানুষরাও সাধারণভাবে সামষ্টিক যুলুম থেকে মুক্তি পেলো এবং সর্বত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো, যা পৃথিবীর বুকে সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করলো। মানুষ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দেয়া সামাজিক বিচার ব্যবস্থা চালু করলো, যার নাম রাখা হলো ইসলামের ঝান্ডা। আসলে এ নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম এর জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ ঝান্ডার ওপরই লিখিত হলো কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

এই পবিত্র কালেমা দ্বারা মানুষের মন পবিত্র হলো। চরিত্রের উন্নতি সাধিত হলো এবং তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলো। এ মহান কালেমা গ্রহণ করায় মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে এমন আমুল পরিবর্তন এলো যা অন্য কোনোভাবেই আশা সম্ভব ছিলোনা। হয়তো কোনো কোনো জায়গায় এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে। কারণ জাহেলি যামানায় গড়ে ওঠা কিছু লোভ লালসা তখনো নবদীক্ষিত মুসলমানদের কারো কারো মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারতো। এতদসত্তেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রতিদান পাওয়ার আকাংখা এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় সাধারণভাবে এসব কিছুকে দমিত রেখেছিলো।

এ পবিত্র কালেমা সমাজে এমন মানবতাবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো এবং মানুষের মর্যাদাবোধকে এমনভাবে উন্নীত করলো যে, তাদের জীবনের সর্ব বিভাগে আমুল পরিবর্তন আসলো যা ইতিপূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। ইসলামের ছায়াতলে গড়ে ওঠা মানবতাবোধের এতো উৎকর্ষ সাধিত হলো যা ইসলামী আমল ছাড়া ইতিপূর্বে আর কখনো সম্ভব হয়নি।

সদগুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা কেবল ইসলামের এই স্বর্ণযুগেই সম্ভব হয়েছিলো। এই সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা কর্তৃক ইসলামী আইন কানুন যথাযথভাবে কায়েম হয়েছিলো। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমেই তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা-দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন– যা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব ছিলোনা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা লাভের পূর্বেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষা ও পরিচালনায় ইসলামের আকীদা বিশ্বাস মুসলমানদের মন মগযে কায়েম হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকান্ডে অবিচল ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটেছিলো। মক্কী যিন্দেগীর তের বছর সময়ের প্রশিক্ষণ কালে তারা ঈমানের যে স্বাদ পেয়েছিলেন তাতে সেই সময় থেকেই তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন, তারা পৃথিবীর বুকে ইসলামকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু করবেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কারো প্রাধান্য বা কোনো ক্ষমতাকে তারা অন্তরায় হতে দেবেন না। দ্বীনের মর্যাদাকে তারা নিজেরাও ভূলুণ্ঠিত করবেন না। এ ওয়াদা পূরণের পথে কেউ কোনো বাধা সৃষ্টি করতে এলে তারা বলিষ্ঠভাবে তার মোকাবেলা করবেন। তাদের এ ওয়াদা– এ দৃঢ় সংকল্প ছিলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি জান্নাত লাভের জন্যেই। আর এ জন্যে তারা যে কোনো ভয়ংকর যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। যতো পরীক্ষাই এ পথে এসেছে এবং দাওয়াত দান কালে যতো বাধা

www.pathagar.com

বিপত্তিই এসেছে ঈমানী বলে তা তারা অতিক্রম করেছেন।

তাই দেখা যায়, জাহেলি যামানার ন্যায় অন্য সকল যামানায় এবং সকল দেশে ক্ষমতাশীনদের পক্ষ থেকে এই কালেমারই বিরোধিতা করা হয়েছে বেশী। এ কালেমা আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারো শাসন ক্ষমতা মেনে নিতে রাজী হয়নি। দুনিয়ায় যারাই নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, তারা এই কালেমার দাওয়াতকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

তারপর যখন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদের মুখোমুখি করলেন, তখন তারা সবর করলেন এবং সকল কঠিন অবস্থায় তাঁরা দৃঢ়তা অবলম্বন করলেন। এইভাবেই তারা তাদের নফসের চাহিদা মেটানোর তাগিদ থেকে মুক্ত হলেন এবং আল্লাহ তায়ালা জেনে নিলেন যে, তারা দুনিয়ায় কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব; কিংবা কোনো রকম কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা করে না। এমনকি নিজ দেশে বা অন্য কোথাও যদি তাদের সম্মান না থাকে, না থাকে যদি কোনো মর্যাদা তাদের নিজ পরিবেশে বা নিজ বাড়ীতে তাতেও তাদের কোনো দুঃখ নাই।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন তাদের মনের সকল অবস্থা জেনে নিলেন, তখন তিনি তাদেরকে তাঁর মহান সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আমানত দান করলেন এবং তাদের মন মগযে, তাদের ব্যবহার ও চেতনায়, তাদের মাল সম্পদে, তাঁদের ঘরে বাইরে সমাজে রাষ্ট্রে সকল স্থানে এবং সকল সময়ে তাদের এই কালেমা প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হলো। তাদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করা হলো, তখন তাদের হাতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও দেয়া হলো। কারণ তারা জানতেন যে, এসব আইন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনিই তাদেরকে এসব কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এই পবিত্র জীবনব্যবস্থা এতো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না যদি প্রথমে কালেমায়ে তাইয়্যবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঝান্ডাকে ওইভাবে উড্ডীন করা না হতো। বাহ্যিক দিক দিয়ে এ দ্বীনকে কঠিন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মানুষের জন্যে অত্যন্ত সহজ। তাই যদি না হতো, তাহলে ওই সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায় এ মহান জীবন ব্যবস্থাকে কায়েম করা কখনোই সম্ভব হতো না।

এই মোবারক জীবনব্যবস্থা একান্তভাবেই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দাওয়াত সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে। এ দাওয়াত গ্রহণকারী পৃথিবীর সকল মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ মুসলমান জাতিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তাদের সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের জন্যেই ছিলো এই সার্বজনীন আহ্বান।

মক্কার বুকে যে কঠিন অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো তার মোকাবেলায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেতনা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বপ্রথম কাজ। এ পথে বাইর থেকে যতো বাধাই আসুক না কেন, সে সব কিছু সহ্য করে এই কালেমাকে গ্রহণ করা এবং অন্য সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করে এই পথে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা– এই ছিলো এ পথ গ্রহণকারীদের প্রথম দায়িত্ব।

www.pathagar.com

আল কোরআনের প্রথম কাজ ছিলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত কর্মসূচী, আইন কানুন এবং লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে কথা না বলে সর্ব প্রথম মানুষের মনের মধ্যে কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক আর কেউ নাই– এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়া।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতিই হচ্ছে এইভাবে কাজ করা– যার রূপরেখা এখানে পেশ করা হলো। এ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মূলনীতির ওপর টিকে থাকতে পারে। এখানে যতো প্রকার সংগঠন ও আইন সংস্থা হবে তার সব কিছুর মূলে এই মূলনীতিই কাজ করবে। যখন সুউচ্চ, ছায়াদানকারী ঘন পত্র পল্লবিত এক বিশাল বৃক্ষ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা দিয়ে মৃদুমন্দভাবে হাওয়ায় দুলতে থাকে, তখন বুঝতে হবে মাটির অনেক গভীরে তার শেকড় অবশ্যই প্রোথিত রয়েছে, নচেত ওই বৃক্ষ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ঠিক এইভাবে দ্বীন-ইসলামের মহা মহীরুহও যখন চতুর্দিকে শাখা বিস্তার করে তার সুশীতল ছায়াতলে নিগৃহীত ও শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলো, তখন তার মূলে কালেমায়ে তাইয়্যেবার মযবুত শেকড় মানুষের হৃদয়-মনের গভীরে অবশ্যই প্রোথিত করার প্রয়োজন ছিলো। সর্বপ্রথম এই শেকড় গাড়ার কাজটিই তাই আগে করা হয়েছিলো, যার ফলে জীবনের সর্বদিকে এবং ছোট-বড় সকল বিষয়ের ওপর এর প্রভাব যথাযথভাবে পড়তে শুরু করেছিলো, আর এইভাবে আখেরাতের জীবনের জন্যেও এই জীবন ব্যবস্থা কল্যাণকর ভূমিকায় কাজ করতে শুরু করে, শুরু করে দৃশ্যমান অদৃশ্য জগতের সব কিছু এবং বস্তুগত জিনিসের সাথে সাথে বস্তুর ঊর্ধের রহস্যাবৃত জগতের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তথ্যের ব্যাপারেও। কাজেই এই বিশ্বাস দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মূল শেকড় হিসাবে বর্তমানে যেমন কার্যকর আছে– ভবিষ্যতেও থাকবে।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও রহস্যের এ হচ্ছে একটি অনন্য দিক। এই মহান দ্বীনের প্রশস্ত পথ মোমেনকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে সহায়তা করে, তার আকীদার জন্যে সুদৃঢ় ভীত রচনা করে দেয় এবং এর প্রভাব তখন জীবনের সকল শাখা-প্রশাখার ওপর পড়তে থাকে। এই আকীদার মূল ভিত্তি মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে সঠিক, অব্যর্থ ও একমাত্র বৃক্ষের দৃশ্যমান বাহ্যিক সকল শাখা প্রশাখার সাথে তার শেকড়ের যেমন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তেমনি আকীদার সাথে জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্কও ওইভাবে গভীর এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে ওঠে।

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতি যখন মানুষের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তখন জীবনের সকল বিষয়কে পরিচালনার জন্যে যে মহান ইসলামী জীবনব্যবস্থার আগমন হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া অন্য সকল প্রভুত্ব কার্যত এ সময় উৎখাত হয়ে যায়, আর তখনই ছোটো বড়ো সকল জনপদ ঈমানের দাবী পূরণ করতে গিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই আত্মসমর্পণের পরই পর্যায়ক্রমে মানুষ ইসলামের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম ও আইন কানুনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। তখন তার মনের মধ্যে ইসলামের আইন কানুন গ্রহণের ব্যাপারেও আর কোনো আপত্তি থাকে না। এ কারণেই আমরা

www.pathagar.com

দেখতে পাই মদের নেশায় বিভোর হওয়া সত্তেও মদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে তা সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সূদ, জুয়া এবং জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত সকল কুপ্রথাসমূহও। এসব অন্যায় কাজ আল কোরআনের আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিষেধাজ্ঞা জানার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর এখনকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ, তার আইন কানুন, বিধি বিধান, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সকল প্রকার প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করেও এসব সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বড়ো জোর এতোটুকু হয়তো যে, এসব আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতা বন্ধ থাকছে; কিন্তু সমাজের লোক সাধারণভাবে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকছেই।১

ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে ইসলামের আর একটি প্রকৃতিও লক্ষ্য করার মতো। এই জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে মানুষের জীবনকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্যে একমাত্র পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধু দুনিয়ার জীবনের জন্যে নিছক কোনো একটি মতবাদই নয়, বরং মানুষের জীবনের সকল কাজ ও বিষয়কে বাস্তবে পরিচালনা করার জন্যেই এ মতবাদ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর হুকুমেই এ ব্যবস্থা সব কিছুকে পরিচালনা করে। এই পরিচালনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রচলিত পদ্ধতিকে বহাল রেখেছেন, কখনও প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেই কিছু বিধান জারী করেছেন এবং কখনও বা সব কিছু আমূল পরিবর্তন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিধান দিয়েছেন। আসলে গোটা মানবজাতির বাস্তব জীবনের জন্যে যখন যা প্রয়োজন হয়েছে সেই অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা এ বিধান দিয়েছেন।

আল্লাহর এ বিধান এমন কোনো মতবাদ নয় যা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বরং এ হচ্ছে বাস্তব জীবনকে পরিচালনার এক অমোঘ ব্যবস্থা। সুতরাং যে মুসলিম সমাজ কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যেই প্রকাশিত আকীদাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোনো ক্ষমতার দাবীদারকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তাদের দেয়া যাবতীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিকেও অস্বীকার করতে হবে।

এইভাবে এই নবগঠিত সমাজ যখন বাস্তবে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তখনই সে সমাজ জীবন্ত সমাজ বলে পরিচিত হবে। তখন তার প্রয়োজন হবে একটি সমাজ সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার, তার প্রয়োজন হবে নানা প্রকার আইন কানুন, আর এই আইন-কানুন চালু করার জন্যে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার। তবে এসব বিধানের কার্যকরিতা নির্ভর করবে যাদের জন্যে এসব বিধান নাযিল হয়েছে– তাদের এ সকল নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলার ব্যাপারে একনিষ্ঠ আগ্রহের ওপর। একথাও জানা দরকার

১. কেমন করে আল্লাহ তায়ালা মদ নিষিদ্ধ করলেন আর কেমন করে মদ বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিক ব্যর্থ হলো জানার জন্যে দেখুন বিখ্যাত গ্রন্থঃ 'মা যা খাসেরাল আলামু বে-এন্‌হিত্বাতিল মোসলেমীন

www.pathagar.com

যে, মোমেন জনসমষ্টি বা মোমেন সমাজ যদি এই তাওহীদী বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাদের হাতে অবশ্যই একটি রাষ্ট্রক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া চালু হওয়া সম্ভব নয় এবং আইন চালু না হলে সেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। ক্ষমতা বলে শরীয়তের আইন চালু করতে না পারলে ইসলামী ব্যবস্থার উপযোগিতা ও উপকারিতা পাওয়াও সম্ভব নয়।

মক্কার মুসলমানদের হাতে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলো না এবং বাস্তবে তারা এমন অবস্থাতে ছিলো না যে, তারা নিজেরা আল্লাহর বিধান মতো চলতে পারে অথবা অপরকে চালাতে পারে, আর এই কারণেই মক্কী যিন্দেগীর তেরো বছর সময়ের মধ্যে নৈতিক বিধান ছাড়া জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে নিয়ন্ত্রণমূলক বা শাস্তিমূলক কোনো বিধান নাযিল করা হয়নি। এ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের নৈতিকতার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব সূরা ও আয়াত নাযিল হয়েছিলো সেগুলোর প্রভাবে একদল মানুষ সত্যিকার অর্থে সোনার মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলো। এদের আচরণে এবং স্বভাব চরিত্রে সাধারণভাবে মানুষ ছিলো মুগ্ধ-- একমাত্র কিছু স্বার্থপর ও নেতৃত্বলোভী মানব নামের অযোগ্য কিছু হিংস্র লোকই এর বিরোধিতা করছিলো– যাদের আশংকা ছিলো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর গঠিত এই নতুন দলটি অচিরেই তাদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেবে। এ জন্যে তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই নতুন বিপ্লবকে ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। এরপর মুসলমানদের হাতে যখন মদীনার নগর কেন্দ্রিক রাষ্ট্রটি এসে গেলো এবং তারা সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পেলো, এ সময় ধীরে ধীরে তাদের ওপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম নাযিল হতে শুরু হলো এবং এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইন কানুন চালু করা সম্ভব হলো এবং সুন্দরভাবে মানুষের যাবতীয় সমস্যারও সমাধান হতে লাগলো।

মক্কী যিন্দেগীর ওই স্তরে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের আইন কানুন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোনো বিধান নাযিল করতে চাননি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সে সংক্রান্ত ব্যবস্থা পাঠানো ইসলামের নিয়মের খেলাপ। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেখানে আইন কানুনের প্রয়োজন হবে যেহেতু মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে তখন তা প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে। আগেই সে বিধান নাযিল করার অর্থ হতো অনাগত সমস্যাগুলোর আন্দায অনুমান করে সমাধান দেয়া। এই অনুমান করা ইসলামী ব্যবস্থার মেযাজের খেলাফ বরং যখন সমস্যা এসেছে তখনই সমস্যার গুরুত্ব ও গভীরতা বুঝে সেইভাবে তার সমাধান পেশ করা হয়েছে।

আজকের দিনে যারা জীবনের সমস্ত কাজ কারবারকে ইসলামের আইন অনুযায়ী চালাতে চায়, তারা পৃথিবীর কোনো দেশেই এর নযির খুঁজে পায় না, দেখতে পায় না কোথাও এর বাস্তব রূপরেখা ও দৃষ্টান্ত। এমন কোনো দেশ তাদের নযরে পড়ে না যেখানে একমাত্র ইসলামের আইন কানুন দিয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

যদিও বহু দেশে নামধারী মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে এবং ইচ্ছা করলেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুন চালু করতে পারে। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ কি করে ইসলামী শাসনব্যবস্থার মেযাজ ও সুফল বুঝতে পারবে এবং কি করেই বা তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে কার্যকর করবে!

আজকের মুসলমানদের দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তাদের কেউ কেউ আধুনিক জগতের বিভিন্ন চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় সাধন করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার করতে চায়, মনে করে মানবরচিত আইন কানুন বুঝি বেশী দেশ ও জাতির জন্যে উপযোগী। তারা মনে করে মানবরচিত আইনের মাধ্যমেই জীবন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে চিন্তা করে তারা নিজের অন্তরের কাছেই পরাজয় বরণ করে, পরাজয় বরণ করে সমাজের কাছেও। তারা ভবিষ্যতের অবাস্তব কল্পনায় সময় ক্ষেপণ করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা চান যে, তাদের অন্তরে আগে ঈমানের বাতি জ্বলে উঠুক এবং তাদের বিবেকের কাছে আল্লাহর ক্ষমতার ধারনাটুকু জেগে উঠুক, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও সামনে তাদের মাথা নত করতে হবে না এবং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন দ্বারা তাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে না। এইভাবে মানুষ যখন নিজেদের আকীদা বিশ্বাসকে মযবুতির সাথে অন্তরে পোষণ করতে পারবে এবং সমাজের বুকেও এই বিশ্বাসীরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে ইসলামের আইন কানুন চালু করা সম্ভব হবে। মানুষদের সকল সমস্যার সমাধানও তখন তারা এই আইন দ্বারাই করতে সক্ষম হবে।

ইসলামের দাওয়াত দানকারীদের মনে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যখন কোনো জনপদে তারা মানুষদের ইসলামী ব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্যে আহবান জানাবে, তখন তারা যেন সর্ব প্রথম জনগণের মনে ঈমান-আকীদার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করে। এ জন্যে তাওহীদের দিকে সরাসরি আহবান জানানোই হবে মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। যদি ওই সব ব্যক্তি নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করে তাহলে এটাই তাদের করতে হবে। কারণ জন্মগতভাবে মুসলমান হলেও তারা জেনে বুঝে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মেনে নেয়নি। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম কালেমা লা-ইলাহ ইল্লালাহ্‌র দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সঠিক চেতনা জাগাতে হবে, তাদের জানাতে হবে যে, বিচার ফয়সালা ও শাসন-কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা– আর কেউ নয়।

ইসলামের দিকে মানুষকে যখনই আহবান জানানো হবে, তখনই আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও তাঁর নিরংকুশ মালিকানা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ঠিক সেইভাবে ধারণা ও চেতনা জন্মাতে হবে– যেমন করে ইসলামের সূচনালগ্নে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। মক্কী জীবনের দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআন এই মূল্যবান কাজটিই করেছিলো।

কোনো ব্যক্তি যখন এই চেতনা সহকারে দ্বীন ইসলাম কবুল করবে, তখন সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করেছে, তাদের সামগ্রিক জীবনকে তারা যেহেতু এই তাওহীদের ভিত্তির ওপরই স্থাপন করেছিলো এবং তারা একথা মেনে নিয়েছিলো যে, তাদের জীবনকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পরিচালনা করবেন।

যখন মুসলমানরা পৃথিবীর কোথায়ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, তখন তাদেরকে প্রথমে এই বুনিয়াদের ওপরেই দাঁড়াতে হবে। এটিই হচ্ছে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কাছে মনে হবে যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামনে পেশ করে দেয়া আর ইসলামী বিধান চালু করা বুঝি একই কথা– যদিও এ লোকগুলো মনের দিক দিয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান। আসলে এরা খুব গভীরভাবে দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও আল্লাহর সুদৃঢ় জীবনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করেনি। মহাজ্ঞানী ও চির বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা এ মহান দ্বীনের ইমারত কেন যে স্থাপন করলেন তা তারা ভালোভাবে বুঝতেও চেষ্টা করেনি। মানুষের স্বভাব চরিত্র ও তার জীবনের জন্যে কি প্রয়োজন তাও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। ওরা ভাবে যে, শুধু দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিলেই দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

মানুষ মেযাজের দিক দিয়ে ব্যস্ততাপ্রিয়। এই জন্যেই তারা মনে করে যে, এতে সহজভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এদের মনের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও এরা হচ্ছে ওই সব কল্পনা বিলাসী মানুষের মতো, যারা মনে করে যে, রসূল (স.) আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যেই বুঝি মানুষদের ডাক দিয়েছিলেন। অথবা তিনি সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করার বা কিছুটা নৈতিক জীবন যাপন করার জন্যেই মানুষদের সংগঠিত করেছিলেন এবং এইভাবেই এ পথে চলাকে তিনি মানুষের জন্যে সহজ করে দিয়েছিলেন। আজ আমাদের অবশ্যই প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে হবে। মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং সর্বান্তকরণে ও নিশর্তভাবে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার কথা ঘোষণা করা। অন্য সকল ক্ষমতার দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান কবুল করা যথার্থ বলে গন্য হবে। আর এই মানবরচিত সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না করলে নিজেকে অন্য সকল ক্ষমতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা কখনোই সম্ভবই নয়।

মানুষের মনে ইসলামের প্রতি আগ্রহ তো তখনই পয়দা হবে, যখন মানুষ একান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে নেবে। এভাবেই সে সম্পূর্ণভাবে অন্যদের ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারবে। এর জন্যে প্রথমেই তার মনে ইসলামের সকল ব্যবস্থার কার্যকারীতা বসিয়ে দিতে হবে এবং এর সব কিছু জেনে বুঝে সে ইসলাম কবুল করবে।

আল্লাহর ব্যবস্থা নিসন্দেহে সর্বোত্তম। যেহেতু এ ব্যবস্থা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন, সুতরাং ভালো না হয়ে এর কোনো উপায় নেই। চাকরের তৈরি করা বিধান কিছুতেই মনিবের তৈরি করা বিধানের মতো হতে পারে না– এটা যে কোনো মানুষই

www.pathagar.com

বুঝবে। তবু এইভাবে কথা বলা ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবিধান মেনে নেয়ার জন্যে সর্বসাধারণকে আহবান জানানো এবং অন্য সবার নিয়ম বিধানকে অস্বীকার করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া, চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ নাই, অথবা তা পেশ করার কোনো প্রয়োজনও নাই। এইভাবে দাওয়াত পাওয়ার পর যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সে-ই সঠিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলো এই আকীদা গড়ে তোলার ব্যাপারে যেভাবে কাজ করেছে সে আলোকে আমরা দেখতে পাই, মানুষের এই আকীদাকে আল কোরআন কোনো মতবাদ হিসাবে পেশ করেনি– পেশ করেনি প্রচলিত কোনো ধর্মীয় তত্ত্ব হিসাবে। কোনো তর্কশাস্ত্র বা বিতর্কের বিষয়ও মূলত এটা নয়। কোনো বাজে তর্ক-বিতর্কও এটা নয়, বরং এটা হচ্ছে মহান কোরআন মানুষের মধ্যে নিহিত মানবতাবোধকেই তা সম্বোধন করে। তার অস্তিত্ব ও আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদির দিকে তাকাতে তাকে আহবান জানায়। তার বিবেককে জাগিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে সকল প্রকার জড়তা পরিহার করে সে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে এবং তার মধ্যে মরচে ধরা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বিবেক যেন আবার গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে নিজ কর্তব্য সম্পাদনের ডাকে সাড়া দেয়। তার বিবেকের মূল উৎস সুপ্ত জ্ঞান ভান্ডারের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তার সামনে অবারিত করে দেয় সৃষ্টি রহস্যের মাধুর্যকে। স্বতস্ফূর্তভাবেই সে এবার সত্যের ডাকে সাড়া দেয়।

আলোচ্য সূরাটি এই মহান জীবনব্যবস্থার এক পূর্ণাংগ ও অনন্য দৃষ্টান্ত, এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে আলোচনা করবো।

ঈমানের সাধারণ ও বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরে কোরআনুল করীম অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই আলোচনা পেশ করেছে, যাতে করে জাহেলী যুগের বিবেক ও বুঝ-শক্তির ওপর যে জগদ্দল পাথর এতোদিন চেপেছিলো তা অপসারিত হতে পারে। এইভাবে বিবেক জেগে উঠলে, চর্ম-চোখে যা দেখা যায় না তা কোনো না কোনো সময়ে তাদের মানস চোখে মূর্ত হয়ে উঠবেই। তাই দেখা যায় ঈমান-আকীদা গ্রহণের এই দাওয়াত সবসময়ই যিন্দা দিল মানুষের কাছে, সকল দুঃখ-দৈন্য, বাধা বিঘ্ন ও সর্বপ্রকার অন্তরায়ের মোকাবেলায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলো। জাহেলিয়াতের হিংস্র ধ্বজাধারীরা মুসলমানদের শুধু মৌখিক বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা চরম নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক আক্রমণও করেছে। পরবর্তীকালে নানা কূটতর্কের অবতারণাও করা হয়েছে, যার মোকাবেলায় কোরআনুল কারীম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং ওইসব ভ্রান্ত যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছে। একইভাবে ধর্মতঃ আর একটি শাস্ত্র তৈরি করে তার মাধ্যমেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে অথচ ইসলামে আকীদার তত্ত্ব পেশ করার সাথে তার বাস্তব কর্ম প্রণালীও পেশ করেছে এবং মানুষকে তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে রাখার পরিবর্তে তাকে জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলাম মুসলিম জামায়াতের মন মগযের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে বিশ্বাসের ভীত রচনা করেছে, তার ফলে তাদের মধ্যে এক অনমনীয় ঈমানী মনোবল সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলেই তারা একটি সুশৃংখল সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এই বাস্তব কর্মপন্থার ঢাল দ্বারা তারা জাহেলিয়াতের অলীক ও অন্ধ আবেগ প্রবণতাকে প্রতিহত করেছে। এমনকি পরবর্তিকালে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও জাহেলিয়াতের যে সব রসম রেওয়াজ রয়ে গিয়েছিলো ইসলাম সেগুলোরও মোকাবেলা করেছে। মানুষের মন মগয থেকে তার স্বভাব চরিত্র থেকে সে সব কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে– যা সুদীর্ঘকাল থেকে তাদের মধ্যে শেকড় গেড়েছিলো। এইভাবে সমাজে ইসলামী আকীদার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে এবং মানুষ সুস্পষ্টভাবে জেনে নিয়েছে যে, ইসলামী আকীদা কোনো কল্প কুসুম স্বপ্ন নয় অথবা হাওয়ার ওপর নির্মিত কোনো বেওকুফের প্রাসাদও নয়। এ আকীদা হচ্ছে বাস্তব জীবনকে সুন্দর করার এক মৌলিক বিশ্বাস, যার শেকড় রয়েছে মাটির সুদূর গভীরে এবং তার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। সুতরাং এই আকীদা যতো মযবুত হবে, ততোই তার প্রভাবে জীবন আরও সুন্দর, আরও গোছালো, আরও সমৃদ্ধিশালী এবং আরও মধুর হবে!

আজ ইসলামী দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিদের এই দ্বীনের প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতে ও বুঝতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং ওপরে বর্ণিত সকল প্রকার কর্মপ্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা তাদের থাকতে হবে, যাতে করে তারা বুঝতে পারে, মক্কী জীবনে মুসলমানদের মধ্যে যে আকীদা গড়ে উঠেছিলো পরবর্তী কালে কোনো সময়েই সে বিশ্বাসের ভীত চুল পরিমাণ নড়বড়ে হওয়াও চলবে না। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এ বিশ্বাস শুধু মনের মধ্যে পুষে রাখলেই চলবে না, বরং এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এক সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন, এমন জীবন যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে এবং যা সংবেদনশীল ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও দরদী এক দল সোনার মানুষ গড়ে তুলবে, যারা পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে তুলবে একটি সত্যিকারে সোনালী সমাজ। এরাই হবে বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুশৃংখল জামায়াত।

আকীদার এই ভিত্তি গড়ার সময় শুধু তাত্ত্বিকভাবে মানুষকে কিছু শিক্ষা দিলেই চলবে না। বরং এই আকীদার ভিত্তিতে তাদের বাস্তব জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন থেকেই বুঝা যাবে যে, তাদের অন্তরের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাস কতোটুকু দানা বেঁধে উঠেছে। জাহেলী যামানায় তাদের যে স্বভাব-প্রকৃতি ছিলো এবং যে ভাবে তারা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো সে জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানবতার বিকাশ ঘটবে, তাদের মধ্যে এমন সব সদগুণাবলী সৃষ্টি হবে, যা হবে গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে কল্যাণকর।

www.pathagar.com

কিন্তু পর্যায়ক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে মারাত্মক যে ভুলটি সংক্রামিত হয়েছে তা হচ্ছে তাওহীদের এ তত্ত্বটি জমাট পাথরের মতো তাদের মনে স্থবির হয়ে রয়ে গেছে। এ বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ হিসাবে বাস্তব জীবনে যে পরিবর্তন আসা দরকার ছিলো তা আসেনি। এর ফলে মুসলমান সমাজ নানা প্রকার সমস্যায় ভুগছে, আর এটা অবশ্যই একটি বড় বিপদ।

প্রথম দিকে তাওহীদের আকীদা সম্পর্কে যে কথাগুলো নাযিল করা হয়েছিলো শুধু সেই কথাগুলো শেখানোর জন্যেই যে দীর্ঘ তেরোটি বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। আসলে আল্লাহ তায়ালা যে কথাগুলো শেখাতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের সকল সমস্যার যে সমাধান দিতে চেয়েছিলেন সে সব বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশাবলী তো তিনি চাইলে একই সাথে এবং একই সময়ে নাযিল করে দিতে পারতেন, যা হয়তো মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই দীর্ঘ সময় ধরে পড়তে পারতেন এবং এভাবে তারা ইসলামী চিন্তাধারাকেও ভালোভাবে রপ্ত করতে পারতেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা চাননি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন ভিন্ন আর একটি জিনিস। তিনি সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রথমত একটি দল গড়তে চেয়েছেন, চেয়েছেন একটি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করতে এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আকীদার সুদৃঢ় ভীত রচনা করতে। রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে আকিদার এমন ইমারত গড়ে তুলতে চেয়েছেন যে ইমারত তাদের জীবনে সকল বিপদ আপদের সামনে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। কেননা বিশ্বের বুকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি সংঘবদ্ধ দল, যারা হবে একটি শরীরের অংগ প্রত্যংগের মতো এবং সেই সব অংগ প্রত্যংগের কোনো একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে অপর অংগগুলোও ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠবে, আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একত্রে এক দিনে গড়ে তোলা যায় না। মানুষের মধ্যে ঈমান যখন পরিপক্বতা লাভ করে, তখন জামায়াতী জীবনে অবশ্যই তার কার্যকর প্রভাব পড়ে এবং তখনই সে জামায়াত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এর জন্যে যেমন প্রয়োজন দলীয় জীবনে সংহতি, তেমনি প্রয়োজন তাদের আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা। এর প্রতিটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারলে অবশ্যই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

আল কোরআনের মক্কী সূরাগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। দ্বীন ইসলামের এই প্রকৃতিকে ভালো করে আমাদের জানতে হবে এবং এর উদ্দেশ্যকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে। আর সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা মানবরূপী শয়তানদের ফেরেবে পড়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। কারণ ওই সব মতবাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে দিবানিশি নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করে চলেছে এবং আমাদের মন মগযকে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের জালে আবদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের আকীদা নষ্ট করে দিয়ে তাদের গোটা অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের সেই জীবন

www.pathagar.com

লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা, যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার মধ্যে যে সব ত্রুটি আছে তাও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং এই ত্রুটির কারণে যে বিপদ আসতে পারে তা বুঝে সে ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে আমাদের আকীদাকে যদি আমরা আবার জীবন্ত রূপ দিতে পারি, এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি একটি সুসংঘবদ্ধ দল, তাহলেই সকল বাতিল মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের লক্ষ্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো।

ইসলামী আকীদার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, যখন কারো অন্তরের মধ্যে এ আকীদা স্থান করে নেয়, যায়, তখন তার কাজে, কথায়, ব্যবহারে তার বহিপ্রকাশ অবশ্যই ঘটবে অর্থাৎ তার সব কিছুতেই এই আকীদা জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। সুতরাং আজ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করবে, তাদের জীবনের সর্ব বিষয়ে এসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে হবে, ফুটে উঠতে হবে তার সাংগঠনিক তৎপরতায়, সমগ্র সাধনায় এবং সেই সব আন্দোলনধর্মী তৎপরতায় যা বলিষ্ঠভাবে তাকে যে কোনো সংগ্রামে প্রস্তুত করবে। এই কর্মসূচী তার চতুর্দিকের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাকে তৈরী করবে। এ সবকিছুই মুসলিম সমাজের মধ্যে আজ বিষফোঁড়ার মতো বিরাজ করছে। এসব জাহেলী রীতি নীতি মানুষের অন্তর ও বুদ্ধিকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যে, তারা এর সুদূর প্রসারী গভীর খাদের দিকে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা এগিয়ে যায় এবং এইভাবেই তারা একসময় নানা বিভ্রান্তির মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে।

ইসলামী চিন্তাধারা মানুষের মন মগযে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেতনা জাগিয়ে দেয়। তাদের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে, মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এ পূর্ণাংগ ধারণা বিশ্বাসের সাথে আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার কর্ম। ইসলামী বিশ্বাসের দাবী হচ্ছে, মানুষ যেন এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলে, এ মানবতাকে জীবন্ত সংগঠন মাধ্যমে এবং বাস্তব আন্দোলনমুখী তৎপরতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। এইভাবেই এ আকীদা তার বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সঠিক অবদান রাখতে সাহস ও শক্তি যোগায়।

এর সাথে উন্নত চিন্তাধারা বাতিল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। কারণ একবার এ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাতিলের অগ্রাভিযানকে এগিয়ে নেয়া যা রুখবার জন্যেই আল কোরআনের অবতারণা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি কোরআনকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি যাতে করে তুমি মানুষকে পড়ে শোনাও থেমে থেমে এবং আমিও এ মহান কেতাবকে ধীরে ধীরে নাযিল করেছি।'

এতে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা চান পৃথক পৃথক করে প্রতিটি শব্দ এমনভাবে যেন পড়া হয়, যাতে করে শ্রোতার তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। আবার তিনি এও চান

www.pathagar.com

যেন প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া হয়, যাতে করে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে ওই কথাগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। একমাত্র এভাবেই যে মত ও পথের সন্ধান আয়াতগুলোতে এসেছে তা মানুষ বুঝতে পারবে এবং সেই অনুসারে তারা কাজ করতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা চান, এই দ্বীনের ধারক ও বাহকরা যেন জানতে পারে যে, এই জীবনব্যবস্থা দানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং এর মধ্যে যে পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই দেয়া এবং তা মানুষের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ জন্যে মানুষকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহপ্রদত্ত এ জীবনব্যবস্থা যেমন মানুষের জীবনকে সুন্দর করতে এসেছে, এসেছে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে, তেমনি এসেছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান নানা প্রকার ভুল চিন্তাধারা থেকে তাকে মুক্ত করতে। আসলে ইসলাম মানুষকে এক নতুন চিন্তাধারা দিয়েছে, যার আলোকে সে এক নতুন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ ব্যবস্থা তার চিন্তাধারার মধ্যে এক অভিনব বিপ্লব এনেছে, যার ফলে সে এক বিশেষ চিন্তার অধিকারী হয়েছে, যা দুনিয়াকেন্দ্রিক মানুষের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নতুন এ চিন্তাধারা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, জীবন সঞ্চারী এবং বাস্তবমুখী। কাজেই তার চিন্তাধারা এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনধারা এগুলো কখনই পরস্পর ভিন্নমুখী নয়। বরং এসব কিছু এক রশিতে এমনভাবে গাঁথা যে, একটি বাদ দিলে আর একটির কোনো মূল্য থাকে না। এ ব্যবস্থা যে শুধু প্রথম যুগের মুসলিম সমাজের জন্যেই রচিত হয়েছিলো তা নয়, বরং এ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে সকল যুগের সকল মানুষের জন্যে এবং যে কোনো মানবগোষ্ঠীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে এর থেকে ভালো আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না।

ইসলামের কাজ মোটেই এটা ছিলো না যে, কিছু লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে দিয়ে থেমে যাবে, বরং ইসলাম মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে পরিবর্তিত চিন্তার সাথে বাস্তব জীবনের কাজের মিল দেখিয়ে দিতে চেয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যা প্রয়োজন তা যে একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারার মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে এবং এ চিন্তাধারা যে মানব রচিত যে কোনো চিন্তাধারা থেকে অধিক বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ তাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের পরিকল্পনা যে কী তা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং আল্লাহমুখী জীবন যে কী তাও আমরা ভালোভাবে বুঝি না। তবে যে পদ্ধতিতে তিনি আমাদের চিন্তা ও কাজ করতে বলেছেন তা অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু আমরা যখন আশা করবো যে, ইসলাম আমাদেরকে নতুন নতুন মতবাদ মেনে চলার স্বাধীনতা দিক তখন আমরা মূলত এর মাধ্যমে আল্লাহর জীবনব্যবস্থার শৃংখলা থেকে বেরিয়ে আসার পর্যায়েই চলে যাবো। এটা অবশ্যই আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতি বহির্ভূত চিন্তা। এর অর্থ দাঁড়াবে ইসলামকে মানব রচিত মতবাদসমূহের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়াবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে চলার

www.pathagar.com

মতো নয়, এর কার্যক্রম তাবিজ তুমার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বাস্তব জীবন ব্যবস্থা একমাত্র মানুষরাই দিতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা করা অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ এবং এ হচ্ছে এক বিপজ্জনক কাজ যার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে আমরা সকলেই ইসলামের দাওয়াতদানকারী। আমাদের কাছে রয়েছে বিশেষ এক চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করে আমরা সকলেই পৃথিবীতে প্রচলিত মানবনির্মিত সকল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হবো। এসব বাতিল চিন্তাধারা আমাদের মন মগযের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি দৈনন্দিন জীবনধারার প্রতিটি বিষয়ের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় যখন সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান জাহেলী চিন্তাধারার আলোকে আমরা হীনমন্যতার মনোভাব নিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে, মানবমন্ডলীর কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌছে দেয়ার দায়িত্ব থেকে আমরা এমনিই সরে দাঁড়াই এবং আমরা নিজেরাই আমাদের দেশ থেকে এবং আমাদের মন মগয থেকে সেই বাতিল মতবাদকে উৎখাত করার সুযোগ হারাই, যা আজ সর্বত্র তার বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে।

এই দিক দিয়ে যখন বর্তমান অবস্থার দিকে আমরা তাকাই, তখন আমাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয় এবং এর ক্ষতি যে কত ধ্বংসাত্মক তা চিন্তা করে শেষ করা যায় না।

চিন্তা ও কাজের পদ্ধতি ইসলাম যা দিয়েছে তার মূল্য একজন মুসলমানের কাছে কোনো অংশে কম মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তুলনামূলক অধ্যয়নের চিন্তায় যখন ইসলামী ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য মতবাদ অধ্যয়ন করতে চাই, তখন প্রকারান্তরে ধরেই নেই যে, বাস্তব জগতের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ইসলামী ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আসলে মনের এই কুচিন্তাকে কিছুতেই আমরা একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারি না। এমতাবস্থায়, বাস্তবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে না থাকলে আমাদের মন থেকে এটা কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয় যে, 'সকল কাজে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয়া বর্তমান জগতে কিছুতেই উপকারী হতে পারে না।' ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী ইসলামী ব্যবস্থা ও বাতিল ব্যবস্থাকে পাশাপাশি রেখে পড়াশুনা করা। তারা মনে-প্রাণে ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বিধায় এটা তাদের করতেই হবে। বার বার আমি একথার ওপর জোর দিতে চাই যে, ইসলামের মূল বিশ্বাসকে বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন যথাশীঘ্র ইসলামী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। কারণ এর মাধ্যমেই ইসলামী আকীদার প্রতি আস্থাবান হওয়ার প্রমাণ পেশ করা যায়।

আমি পুনরায় বলছি, একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই মানুষের জন্যে তার প্রকৃতি সংগত। এই জীবন পদ্ধতি মানুষের সকল সমস্যা সমাধানে সব থেকে বেশী

www.pathagar.com

কার্যকর এবং মানুষের চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার সাথে তার মন মগযে এর সুশীতল পরশ বুলানোর ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইসলামী আন্দোলনে বাস্তবে যোগদান করার পূর্বেই এ মহান 'দ্বীন'-এর আকীদা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করা খুবই জরুরী। কারণ এই প্রশান্তিই তাকে ধাপে ধাপে কঠিন থেকে কঠিনতর দায়িত্ব পালনে সাহস ও উৎসাহ জোগাবে এবং দ্বীনের তত্ত্বকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবে।

ইসলামী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইভাবেই তার মন যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তখনই এক দুরন্ত মনের শক্তি পাওয়া যাবে এবং তখনই ইসলামী আইন কানুন চালু করার দিকে তার পা বাড়ানো সহজ হবে। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর্মীর ধমনীতে খুবই চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, যার কারণে তারা ইসলামী ব্যবস্থাকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে দেখার জন্যে প্রচন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ তাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমরা আহবান জানাচ্ছো, তার বিস্তারিত রূপরেখা কী? এ ব্যবস্থা চালু করার জন্যে তোমাদের কাছে কী কী যুক্তি আছে? কী আইন কানুন আছে? আসলে এরা মনের মাঝে নিজেদের আকীদা মযবুত করার পূর্বেই সেই আইনগুলো জানতে চায়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মক্কার জীবনে ঈমানের এই স্তরে এসেও তারা আল্লাহ তায়ালার বিধান মানার জন্যে যোগ্য হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, এই স্তরে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঈমানকে মযবুত করে নিক এবং তাদের মেযাজের সংগে যখন ঈমান খাপ খেয়ে যাবে, তখনই তাদের জীবনের জন্যে উপযোগী বিভিন্ন আইন কানুন নাযিল করা হবে। কেননা, এই সব আইন কানুনের মধ্যে যে কঠোরতা আছে তখন তাদের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব হবে।

ইসলামী দাওয়াত দানকারীদের কর্তব্য হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় কোনো জিনিসের দিকে তারা তাকাবেনা বিভিন্ন কাজ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মনীতি পরিত্যাগ করতে পেরেছে, তারা বাস্তবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাদের কর্তব্য হবে সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নের মোকাবেলায় এই দ্বীনের বিধিবিধানের মাধ্যমে তাদের আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করা। এই কার্যক্রমই হচ্ছে মুসলমানের শক্তির মূল কথা এবং তা গোটা মুসলিম সমাজেরও শক্তির উৎস।

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি জিনিসই হচ্ছে বাস্তব অবস্থার উপযোগী এবং কখনো এ ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করা হয়নি। সত্য এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। এই দুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। সত্যবিরোধী কোনো নিয়মকেই ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যেমন অবিচল হতে হবে, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুনকে চূড়ান্ত ও সুন্দরতম ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়াই ঈমানের পরিচায়ক। একইভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া ও দৃঢ়ভাবে তাতে টিকে থাকাও জরুরী।

www.pathagar.com

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এটিই আমার শেষ কথা। এখানে অবশ্য আমি এই কথাটিও বলতে চাই যে, মক্কী যুগে অবতীর্ণ কোরআনুল কারীমের সূরা ও আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বা ও অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস এবং তিনিই যে সকল ক্ষমতার মালিক একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এসে গেছে। অবশ্যই আমি হৃদয় মন দিয়ে একথাটি বুঝতে পেরেছি এবং আমি সর্বান্তকরণে মনে করি যে, যারা ইসলামী দাওয়াতের ধারক ও বাহক তাদের বুঝতে হবে যে, এ পথের রূপরেখা কি, তাদের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এটিই সব থেকে সুন্দর পথ এবং এ বিশ্বাসের ওপর তাদের অবিচল হয়ে যেতে হবে। তাদের জানতে হবে যে তাদের কাছে যা আছে তাই ভালো এবং তারাই সবার ওপরে সবদিক দিয়ে মর্যাদাবান। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এ কোরআন সেই পথেই পরিচালনা করে, যা সব থেকে মযবুত এবং সব থেকে স্থায়ী।'

এবার আমরা দেখবো সূরাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আর কী আলোচনা এসেছে।

আসলে এ হচ্ছে একটি বিস্ময়কর সূরা। এ সূরাটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যা আল কোরআনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সেই জীবন পদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরেছে। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করারও চেষ্টা হয়েছে। কোরআনের সেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যকে এই সূরাটি সংরক্ষণ করেছে, যার বাহ্যিক রূপ প্রতিটি সূরার মধ্যেই বলতে গেলে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং কোনো ভাবে কারো নযর থেকেই এ বৈশিষ্ট্যটি কখনো বাদ পড়ে না। প্রত্যেক সূরারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আর প্রত্যেক সূরার মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক এবং এমন কিছু বিষয় আছে যাকে কেন্দ্র করেই সে সূরার অবতারণা করা হয়েছে। তার মধ্যে আলোচনার বিষয়টিকে উপস্থাপনের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, রয়েছে এমন কিছু প্রভাবসৃষ্টিকারী ও জীবন্ত চিত্র এবং এমন কিছু ছায়া এমন কিছু পরিবেশ যার জন্যে প্রত্যেকটি সূরাই সমগুরুত্ব সম্পন্ন। এতদসত্তেও কিছু বিষয় এতে বারবার আলোচিত হয় এবং বারবার সেগুলোর উল্লেখ দ্বারা সে বিষয়টিকে মানুষের মন মগযে স্থায়ীভাবে অংকিত করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে যখন বারবার তুলে ধরা হয় তখন দেখা যায় সব কিছু মিলে আসলে তা একটিই মাত্র বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে আল-কোরআনের অবতারণা, আর তা হচ্ছে মানুষ ও তার জীবন।

এরপরও সূরাটি নিজ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একটি মৌলিক বিষয় এখানে তুলে ধরেছে। কোরআনের প্রকৃতিই হচ্ছে নযুলের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেক পরিবেশের মধ্যে যখনই তা নাযিল হয়েছে আপন সুষমায় তা সমৃদ্ধ এক চমৎকার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ সৌন্দর্য মানুষের কোমল অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে এবং মানুষকেও তা সুন্দর বানিয়েছে। পরিবেশ, পরিবেশের ঘটনাবলী ও মানুষের মন মগযকে সুন্দর করে তুলেছে।

www.pathagar.com

হাঁ, এইই হচ্ছে আসল সত্য। এ মহাসত্যকে আমি আমার অন্তর এবং আমার অনুভূতির মাঝে গভীরভাবে অনুভব করেছি। আমি সূরাটির প্রাসংগিক বিষয়, দৃশ্যসমূহ ও সকল ঘটনা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে সেই অনুসারেই আমার আচরণ নির্ধারণ করি। আমি মনে করি পবিত্র এ কালামে আমি যে আনন্দ পাই তা যে কোনো দিলওয়ালা লোকেরাই পাওয়ার কথা। এর রং, রস ও মাধুর্য যে কোনো সজীব প্রাণকেই নাড়া দেয়।

এ সব কিছু এক সাথে মিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের সত্যতা ও সার্বজনীনতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর এ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ সকল জীব জন্তুর মধ্যে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। তার বিবেকের মধ্যে তারই অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে, গোটা দৃশ্য জগতের জানা অজানা রহস্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যেই ফুটে রয়েছে, জীব জন্তু ও মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতিতেও তা পরিকল্পিত হচ্ছে। যে বিশাল প্রকৃতি রয়েছে তার প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি ছড়িয়ে রয়েছে, এ সব ঘটনাবলী তো প্রতি নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে এবং এখানে নিশিদিন তাঁর করুণারাশিও ঝরে পড়ছে অথবা সংঘটিত কোনো বিপর্যয় সেসব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এইভাবেই মানুষের জীবন ও তার স্থায়িত্ব, তার বাস্তব অবস্থা ও আশা আকাংখা, বিশ্বপালকের কুদরত ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সব কিছু মিলে প্রতিনিয়ত তাকে তার প্রভুত্ব ও প্রতিপালন ক্ষমতা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। সবশেষে কেয়ামতের দিন কিভাবে গোটা মানবমন্ডলী তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হবে আল কোরআন তাও তুলে ধরছে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতো কিছু আলোচনা হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে মানুষের আকীদা বিশ্বাস। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর যে ক্ষমতা বিরাজ করছে সূরাটি সে বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আলো ও অন্ধকার উভয়ের অস্তিত্ব, এই মহা সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান চাঁদ, সূর্য ও তারকারাজি, রয়েছে এর মধ্যে সুউচ্চে স্থাপিত বাগ বাগিচা এবং নিম্ন ভূমিতে বিরাজিত সজি বাগান, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া ও পৃথিবীর দিকে দিকে তার প্রবাহিত হওয়া, কোনো কোনো এলাকায় এই পানির মজুদ হয়ে থাকা এবং কোনো এলাকা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আল্লাহর নেয়ামত। স্থল ও পানি ভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার সব কিছুর আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা, অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর রহস্য উদঘাটন মুর্দা থেকে যিন্দার আগমন এবং যিন্দা থেকে মৃত জিনিসের বের হয়ে আসা, মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে বীজ লুকিয়ে থাকা সবই আল্লাহর নেয়ামত। অন্ধকারাচ্ছন্ন মাতৃজঠরে শুক্রবীজের অবস্থান করা এবং দলে দলে মানুষ, জ্বিন, পক্ষীকুল, জীবজন্তু, প্রথম ও শেষের সব মৃত ও জীবিত এবং রাত ও দিন সদা সর্বদা মানুষের হেফাযত করা সবই মহান আল্লাহর মহান দান।

মানুষের মধ্য থেকে একদল মানুষ আজ প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এবং এসব কিছু তাদের অনুভূতি রাজ্যে সৃষ্টি করেছে প্রচন্ড এক আন্দোলন। এর

www.pathagar.com

গূঢ় রহস্য বুঝার জন্যে তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ নিয়োগ করে চলেছে। তারপর যে সব প্রাণ মাতানো নতুন জিনিস তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেইগুলো হাসিল করার জন্যে তাদের মনের মধ্যে তীব্র আকাংখা ও ব্যাকুলতা পয়দা করা হচ্ছে। এরপর যখন এই সব প্রিয় জিনিস তাদের দুয়ারে হাযির হয় তখন তাদের হৃদয়পটে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানো হচ্ছে, তাদের মনে হয় সম্ভবত ধরনের জিনিসের সংস্পর্শে তারা বুঝি এই প্রথম এলো। অন্য মানুষরা ইতিপূর্বে এর সন্ধান কখনও নাকি পায়নি।

তাদের মনের এ অবস্থাকে, তাদের আচরণকে এবং তাদের সার্বিক অবস্থাকে একটি শ্রোতস্বিনী নদীর সাথে তুলনা করা যায় এর উত্তাল তরংগের আঘাতে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে। এক তরংগ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন আর এক তরংগ। একটির পর আর একটি তরংগ আসছে, আর তা আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়ির ওপরে।

এইভাবে উপর্যুপরি আসা এই অশান্ত ঢেউ মনের ওপর অভূতপূর্ব এক উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে যুগপৎ ভয় ও তীব্র আবেগ রয়েছে। এর সাথে শীঘ্রই আমরা ইনশাআল্লাহ আরও কিছু বিষয় বর্ণনা করবো, যার সাথে এই প্রসংগের গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। ভীতিজনক হলেও সেগুলোতে আরও সৌন্দর্যের বহু নিদর্শন রয়েছে, রয়েছে প্রাণোচ্ছলকারী কিছু সজীবতা এবং রয়েছে ছবির মতো ফুটে ওঠা কিছু ঘটনা, এগুলো আমাদের যে কোনো কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে উৎসাহ যোগাবে।

আমরা এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা কিছুতেই এ সূরার মধ্যে বর্ণিত আসল কথাগুলোকে কারো অন্তরের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারবো না। তবে আমরা সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনা যেমন আছে, তেমনিকরেই উপস্থাপন করতে পারি মাত্র, আমরা শুধু এতোটুকু করতে পারি যে, এ মহান কোরআন থেকে যারা দূরে সরে গেছে, তাদের কাছে এ সকল প্রকার যুক্তি তুলে ধরতে পারি, যাতে করে আল্লাহর এ কোরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারে এবং সে অনুযায়ী তারা জীবন গড়তে পারে।

আল কোরআনের পরিবেশে জীবন গড়ার অর্থ শুধু কোরআন চর্চা, কোরআন পাঠ এবং অপরকে কোরআন শেখানোই নয়। কোরআনের পরিবেশে বাস করার দ্বারা আমরা শুধু এই কাজটুকু করার কথাই বুঝাতে চাইনি। আমরা চেয়েছি মানুষের জীবন ও জীবনের প্রতিটি বিষয় আল কোরআনের শিক্ষা অনুসারে গড়ে উঠুক। আমরা চেয়েছি, যে পরিবেশে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো, আজ যদি অনুরূপ পরিবেশ বিরাজ করে, তাহলে সেই পরিবেশকে যেনো আল কোরআন সেই ভাবেই ঢেলে সাজাতে পারে যেমন করে অতীতে সাজিয়েছিলো। যেন সেইভাবে মানুষের অন্তর, কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে যেমন করে অতীতে তা সম্পন্ন করেছিলো। সেই সামাজিক সংহতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজো প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেমনটি করে আল কোরআনের আলোকে অতীতে মানুষ করতে সক্ষম হয়েছিলো। আল কোরআনের আলোকে মানুষ সেইভাবে আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে পারে যেমন করে অতীতে মোকাবেলা করেছিলো। আমরা চাই আল কোরআন আর একবার রুখে দাঁড়াক, রুখে দাঁড়াক আধুনিক জাহেলিয়াতের সকল চিন্তাধারার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে, এর সর্বপ্রকার প্রচারনার বিরুদ্ধে। সর্বপ্রকার চাপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ওই চাপের বিরুদ্ধে কোরআন যুদ্ধ ঘোষণা করুক। কোরআন চায় রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলার পর মানুষরা তার পথেই চলবে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণাংগভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা, সংগ্রাম ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের পর তার পথ ধরেই চলবে এবং অন্যদেরকেও এই পথে আসার জন্যে আহবান জানাবে। এইই হচ্ছে আল কোরআনের সেই পরিবেশ, যেখানে মানুষের পক্ষে সুখে-শান্তিতে বাস করা সম্ভব। এ ধরনের পরিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে মানুষ আল কোরআনের স্বাদ অনুভব করবে। এটিই হচ্ছে সেই পরিবেশ, যার মধ্যে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো এবং এই অবস্থার মধ্যেই ইসলাম কাজ করেছে। আজকে যারা এই ধরনের পরিবেশে বাস করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনুল কারীম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যতোই তারা কোরআন চর্চা করুক, কোরআন পড়ুক এবং অপরকে কোরআনের জ্ঞান দান করুক না কেন তাতে কোনো কল্যাণ হবেনা।

এ ব্যাপারে যারা আগ্রহী হবে তাদের ও কোরআনের মাঝে প্রকৃত যোগসূত্র ততোদিন পর্যন্ত কায়েম হবে না– যতোদিন ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তারা বাস্তবে এই চেষ্টাকে কার্যকর না করবে। এইভাবে যখন এ মহান কেতাবকে তারা ব্যবহার করবে, তখনই তারা কেতাবের স্বাদ পাবে এবং তারা সেই বাঞ্ছিত ফল পাবে যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

এ সূরাটি যে মৌলিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়। আলোচনা করেছে মনিব প্রতিপালকের সাথে বান্দাদের সম্পর্কের নিরূপণ করার বিষয়টি। কে তিনি? এ সৃষ্টির উৎস কি? এ সৃষ্টির ঊর্ধে কোন অজানা রহস্য রয়েছে? এই বান্দারাই বা কারা? কে তাদের অস্তিত্ব দান করলেন? কোন সেই মহান স্রষ্টা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কে তাদের প্রতিনিয়ত খাবার দিচ্ছেন? কে তাদের দেখাশুনা করছেন? কে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করছেন? কে তাদের অন্তর ও চোখগুলো পরিচালনা করছেন? কে তাদের জন্যে রাত ও দিনকে আবর্তিত করছেন? কোন উদ্দেশ্যে তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন? আর কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাদের এখানে যিন্দা রাখবেন এবং কবে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এগুলোর আলোচনা এসেছে এখানে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি মল্লিকার বিভিন্ন ফুলগুলোকে, কে সাজিয়ে রেখেছেন? এই যে মুষলধারার বৃষ্টি, এই যে প্রাণ মাতানো ফুলকুঁড়ি, এই যে পরতে পরতে সাজানো খাদ্য শস্য, এই যে অন্ধকারের চাদর ভেদকারী তারকারাজির রশ্মি, এই যে স্নিগ্ধ প্রভাতের শুভাগমন, দীর্ঘ রজনী এবং সন্তরণশীল নৌযানগুলো– এ সব কিছু কার পরিচালনায় চলছে? কার অদৃশ্য হাত ক্রিয়াশীল রয়েছে এ সবের পেছনে? রয়েছে এ সবের পেছনে কোন সে মহা রহস্য? এই যে জাতিসমূহ, এই যে যুগের পর যুগ ধরে মানুষের আনা-গোনা, ধ্বংস ও পুনর্গঠন– কে আছে এ সব কিছুর পেছনে! কে এগুলো ধ্বংস করছেন, আবার কে এগুলো পুনরায় গড়ছেন? একদিন কেনই বা তিনি সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবেন তা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

মানুষকে এ সব কিছুর পরিচালনার দায়িত্ব দান করা এবং সে সঠিকভাবে তা পরিচালনা করছে কিনা, তার পরীক্ষা নেয়ার পেছনেই বা কোন রহস্য রয়েছে? পরিশেষে ধ্বংস করে দেয়ার পর কী হবে তার শেষ পরিণতি? কেমন হবে তার হিসাব-নিকাশ?

এ সব প্রশ্নের সাথে দিগন্তব্যাপী আরো যতো প্রকার প্রশ্ন হতে পারে সেসব কিছুকে সূরাটি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠকের অন্তরে তুলে ধরেছে, তুলে ধরেছে অত্যন্ত গভীরভাবে। এ সব প্রশ্ন মক্কার সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে গভীরভাবে জড়িত, যার প্রেক্ষাপটে আল কোরআন এ আলোচনা করেছে। পেছনের পাতাগুলোতে কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। সেখানে আমরা আল কোরআনের প্রদত্ত রূপরেখা অনুসারে কিছু বক্তব্য রাখতে প্রয়াস পেয়েছি। এখানে কখনও আমি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিনি বা নিজেদের মনগড়া কোনো আকীদা পেশ করিনি। মন মগযকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলতে পারে এমন কোন দার্শনিক তর্কের অবতারণাও করিনি। সদা সর্বদা আমাদের লক্ষ্য থেকেছে মানুষকে তার প্রকৃত মালিকের সাথে পরিচিত করে দেয়া, যাতে করে এই পরিচিতি মানুষকে তার মনিবের গোলামীতে আবদ্ধ করতে পারে, তাদের বিবেক ও আত্মাকে রাব্বুল আলামীনের সামনে নত করে দিতে পারবে।

সূরাটির মধ্যে আলোচনার গতি পুরাপুরিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হয়েছে। একথাটি অকাট্য সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রেযেকদাতা, তিনিই মালিক মনিব, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম, তিনিই যাবতীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই চোখের অন্তরালে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে সে সব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তিনি সকল হৃদয় ও দৃষ্টিকে তেমনি করে পরিবর্তন করেন যেমনি করে তিনি আবর্তিত করেন দিন ও রাত্রিকে। বান্দার জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিচালক যে তিনিই তা এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায়। কেউ নেই যে কোনো বিধান অথবা ফয়সালা দিতে পারে, আর কেউ নেই এমন যে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারে। এই সব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার নামই হচ্ছে উলুহীয়্যাত বা 'সার্বভৌমত্ব'। এই হচ্ছে শব্দটির আসল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কেউ নেই যে গোটা মানবমন্ডলীর জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে, এমন নেই কেউ যে যিন্দা করতে পারে বা মারতে পারে, ক্ষতি বা উপকার সাধন করতে পারে। কিছু দিতে পারে বা বন্ধ করতে পারে, না ইচ্ছামতো দুনিয়া ও আখেরাতে নিজে কোনো কিছুর মালিক হতে পারে, না অপরকে মালিক বানাতে পারে। সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনায় যে সব দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উল্লেখ হয়েছে, রোজ হাশরের যে চমৎকার বর্ণনা আছে তাতে একাধারে পাঠকের মন চমৎকৃত হয়, তার প্রাণ ভয় ও ভীতিতেও ভরে উঠে। এ জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী দৃশ্য মনকে ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে দেয় আর পাঠকের মাথাকে আনুগত্যের অনুভূতিতে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং তার মনকে সকল সংকট ও সকল আশা আকাংখার দুয়ার থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

সব থেকে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এ সূরার মধ্যে বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও মালিকানার বিষয়টি। এ আলোচনা যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর, তেমনি ব্যাপক এবং তেমনি সুদূর প্রসারী।

তৎকালীন মুসলিম জামায়াতের জীবনে যেসব সমস্যা ছিলো সেগুলোর এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে যার আলোকে যে কোনো সময়ের সমস্যাসংকুল মানুষরাই তাদের সঠিক পথটি নিরূপণ করতে পারবে, আর তা হচ্ছে জাহেলী যামানায় মানুষের মনগড়া প্রথা অনুসারে কোনো খাদ্য বা যবাই করা পশুকে হালাল বা হারাম করা অথবা কোনো কিছুকে পরিহার করা এবং সেগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে যেগুলো ক্ষতিকর নয় সেই সব জন্তু মানত করার বিষয়, আরো আছে পশু যবাই, সন্তানাদি ও ফল-মূল সম্পর্কিত কথাবার্তা মানত সংক্রান্ত কথাগুলোকে সূরাটির একেবারে শেষের দিকে রাখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং, খাও সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কি হলো তোমাদের, কেন তোমরা খাচ্ছো না সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে! যে সব জিনিসকে তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে তো তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়েই দিয়েছেন। ..... আর শয়তানের গোষ্ঠী তো সদা সর্বদা তাদের সংগী সাথীদের প্ররোচিত করেই চলেছে যেন তারা তোমাদের সাথে নানা প্রকার কূটতর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, তাদের কথামতো যদি তোমরা চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরাও মোশরেক (শেরকের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত) হয়ে যাবে।..... তিনি নিশ্চয় অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১১৮-১২১ এবং ১৩৬-১৪০)

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা দেখলে মনে হবে, তারাও এখন প্রাচীন জাহেলিয়াতের মতো আচারণ করে চলেছে। এ ছাড়াও অন্য যে বড়ো সমস্যাটি সর্বত্র বিরাজ করছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সমস্যা। এ নিয়ে গোটা সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনা এসেছে আসলে এই বিষয়টিই মক্কী সূরাগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে যেখানে সংগঠন ও আইন কানুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও এ বিষয়ের ওপর সঠিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

মুসলমানদের জামায়াতটি সূরাটির বর্ণনা ও প্রভাবপূর্ণ কথাগুলোকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার জন্যে আগ্রহ সহকারে এগিয়ে এসেছে, সাথে সাথে তারা জাহেলিয়াতের প্রচলিত নিয়মনীতি ও রীতিপ্রথা বর্জন করেছে তাদের একথাটি জানানো হয়েছে যে, কিভাবে তারা ইসলামী আইন মেনে চলবে এবং ইসলামী আকীদাকে কিভাবে মনের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে পোষণ করবে। সে আকীদার মূল কথা হচ্ছে. প্রভুত্ব ও দাসত্ব সম্পর্কিত কথাটি। এই বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার ওপর নির্ভর করবে লোকটি ঈমানের ওপর টিকে আছে, না কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে, না জাহেলিয়াতের কুহেলিকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এখনো

www.pathagar.com

হাবুডুবু খাচ্ছে। এই মুসলিম জনপদের কাছে আমরা সেই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যা এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এরপর এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা আসছে যাতে করে এই দ্বীনের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মায় এবং দ্বীনের এ অর্থটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আর সে বিষয়টি হলো, জীবনের ছোটো খাটো অংশের ব্যাপারেও সরাসরি আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সোপর্দ করা। এটা না করা হলে শুধু ওই ছোট জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর শাসন ক্ষমতাকে অমান্য করাই বুঝাবে– তা নয়, বরং সম্পূর্ণ দ্বীন থেকে তার খারিজ হয়ে যাওয়াই বুঝাবে।

এ কথার ওপর মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে– জীবনে সকল বিষয়– বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ, ছোটো বা বড়ো, সর্ব বিষয়ে দ্বীনের নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে– গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে নিজেদেরকে মূল মালিকের সাথে, যেহেতু সারা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরই নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে এই উম্মতের দায়িত্ব, যেমন করে সারা বিশ্বের ওপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা অনিরুদ্ধভাবে কার্যকর রয়েছে।

সূরার মধ্যে, পশু, ফসল ও মানত সম্পর্কে জাহেলী যুগের রীতি নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে সরাসরিভাবে– যাতে করে এসব রীতি নীতির প্রতি আল্লাহর প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায় এবং এগুলোকে চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। সর্বোপরি হালাল হারাম বিধান দেয়ার ব্যাপারেও বান্দার যে কোনো এখতিয়ার খাটানোর অধিকার নাই এটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদের জানিয়ে দেয়া যে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে সরল সঠিক ও মযবুত পথ। এ পথ যে পরিহার করবে সে দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এর পূর্বের আয়াতগুলোতে ধর্মীয় প্রতীকসমূহ সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তার পরিপূরক হিসাবে নীচে আরও কিছু বর্ণনা আসছে,

'আর তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সুউচ্চে অবস্থিত বাগ-বাগিচা গড়ে তুলেছেন আরও গড়ে তুলেছেন এমন বাগিচা যা মাটিতে অনুচ্চ ..... তিনি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা ভয় করে চলতে পারো। (আয়া ১৪১-১৫৩)

এমনি করে আমরা দেখছি জীব জানোয়ারের গোশতের হারাম বা হালাল হওয়া এবং পশু ও ফলমূল মানত করার ছোট-খাটো বিষয়েও ফয়সালা দেয়া হয়েছে। সন্তানাদি উৎসর্গ করার বিষয়ে পরিষ্কার বিধান দেয়া হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে তারা জাহেলী যামানার অনুসরণে ভুল পথে চলছিলো। আল্লাহ তায়ালা ও শয়তানের পথে চলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে কিসে আল্লাহর রহমত আসে এবং কি কারণে মহান আল্লাহর অসন্তোষ নাযিল হয়। আরো বলা হয়েছে– আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দিতে হবে, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর দেখানো মযবুত ও সোজা পথে চলতে হবে। আরো আলোচনা এসেছে

www.pathagar.com

আল্লাহর অসীম করুণা ভরা পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে মানুষের মনে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার মানসিকতার ওপর।

একই এলাকায় সমুন্নত স্থানে বাগিচা এবং নিম্নভূমির বাগিচার মধ্যে সৃষ্টি ও যিন্দা করার যে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা এসেছে– বর্ণনা এসেছে খেজুর ও বিভিন্ন রংয়ের ফসলের, যায়তুন ফলের এবং ডালিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাদৃশ্যবিহীন বিভিন্ন ফলের। আরও দেখতে পাই এ সূরাতে যেমন সাক্ষ্য দান করার মতো কিছু জিনিস রয়েছে তেমনি রয়েছে সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কিছু বিষয় বস্তুও। আরও রয়েছে মোশরেকদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা।

এইভাবে গোটা সূরাটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানান দৃশ্যের বর্ণনা, কিন্তু এর সাথেই দেখা যায় কোনো রকম উদারহণ পেশ না করেই সরাসরি আকীদার বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা। এ সকল বর্ণনার মধ্যে রয়েছে দ্বীন ইসলামের প্রতি মানুষকে এগিয়ে দেয়ার প্রেরণামূলক কথাবার্তা।

আলোচ্য সূরাটিতে আইনকানুন এবং শাসনক্ষমতা কার হতে হবে সেই বিষয়েও কিছু ইংগিত রয়েছে। এ হচ্ছে সেই প্রসংগ, যার সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে, এ সূরাটির বর্ণনা ও আলোচ্য বিষয়ের প্রভাবে বহু লোক দলে দলে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে এ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এখানে এসেছে। আসলে, আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের বিষয়টিই সারা সূরা জুড়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে রয়েছে, সুতরাং বুঝা গেলো যে, দ্বীনের মূল কথাও এইটিই এবং ছোটো-বড়ো সকল জনপদে এবং জীবনের সকল বিষয়ে তারই আইন চালু করাই এর লক্ষ্য।

এখন আমরা সূরাটির মধ্যে আলোচিত বিষয় ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পূর্বে সংক্ষেপে আরো কিছু কথা রাখতে চাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আসমা বিনতে ইয়াযেদ জাবির, আনাস ইবনে মালেক এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েতগুলো পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং গোটা সূরাটি এক সাথেই নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এসব রেওয়ায়াতে সূরাটি নাযিল হওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা বলা হয়নি অথবা বর্ণনাধারার মধ্যেও এমন কোনো ইংগিত নাই যাতে করে মক্কী যুগের কোন সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে। তবে এটা বুঝা যায় যে, এটি সূরায় আল হাজর-এর পর নাযিল হয়েছে এবং সম্ভবত এটির ক্রমিক নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন। কিন্তু এটাও সত্য যে, সূরায় আল বাকারার অবতীর্ণ কাল সম্পর্কে যেভাবে বলা সম্ভব হয়েছে ওইভাবে অন্যান্য সূরা নাযিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় ঠিকমতো বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে কোনো সূরার বর্ণনাক্রম অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা শুরু হওয়ার সময়টিই বলতে পেরেছি, সম্পূর্ণ সূরা সম্পূর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারিনি। এমনও অনেক সময়ে দেখা গেছে লেখার সময়ে

www.pathagar.com

প্রথম দিকে অবতীর্ণ কোনো কোনো অংশকে পরবর্তীতে অবতীর্ণ অন্য কোনো অংশের পরে রাখা হয়েছে, কারণ এটিই ছিলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং অর্থের দিক দিয়ে তাকে বেশী উপযোগী মনে করা হয়েছে। এইভাবে পূর্বে বা পরে নাযিল হওয়ার যে তথ্য আমরা এখানে পেশ করছি তাতে ক্রমধারার বর্ণনার অধিক অন্য কোনো পার্থক্য এ সূরাগুলোর মধ্যে নাই, যেহেতু মক্কী এ সব সূরার লক্ষ্য একই, আর তা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত দান এবং মোশরেকদের সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হওয়া, এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার এক হীন প্রয়াস। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটির প্রধান ভূমিকা ছিলো যে হারে বিরোধীরা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো তিনিও ততো জোর দিয়ে ইসলামী আকীদার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই প্রসংগে ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা থেকে একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, গোটা সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ। মাত্র দুটি আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে, আর সে দুটি হচ্ছে,

'তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি যখন ..... করার জন্যে ছেড়ে দাও।' (আয়াত ৯১)

এই আয়াতটি দু'জন ইহুদী মালেক ইবনে সয়েফ এবং কা'ব ইবনে আশরাফ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিলো। আল্লাহর আর একটি বাণী হচ্ছে–

'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা .....পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১৪১)

এই আয়াতটি সাবেত ইবনে কায়েস শামস আল আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, অবশ্য ইবনে যোরায়েয এবং মাওয়ারদী বলেন, আয়াতটি মোয়ায ইবনে জাবাল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আয়াতটির ব্যাপারে প্রথম রেওয়ায়াত এসেছে সম্ভবত এই জন্যে যে, এর মধ্যে মূসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ কিতাব হচ্ছে মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও নূর অর্থাৎ এটি হচ্ছে পথপ্রদর্শক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের আলো। এ আয়াতটিতে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা এ কিতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছো যা তোমরা প্রকাশ্যভাবে দেখাচ্ছো।' যদি মোজাহেদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রেওয়াতগুলোর দিকে খেয়াল করা হতো, তাহলে ওরা বুঝতে পারতো, 'আল্লাহ তায়ালা কিছুই নাযিল করেননি'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার মোশরেকরা। কেননা আয়াতটি পড়া হয়েছে এইভাবে,

'বলো, কে নাযিল করেছে সেই কিতাবটি যা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও নূর হিসাবে মূসা নিয়ে এসেছে? তারা এ কিতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছে এবং এর কিছু অংশ তারা প্রকাশ করছে আর অনেকাংশকে গোপন রাখছে।' সুতরাং এ কেরাতে বুঝা যায় যে, আয়াতটি দ্বারা ইহুদীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিজেদের সম্বোধন করা হয়নি। এই কারণেই মনে করা হয় আয়াতটি সম্ভবত মক্কায় অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আয়াতটির প্রসংগ চিন্তা করলে আয়াতটিকে মাদানী মনে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ এ আয়াতটিকে আলাদা রাখলে পূর্বের আয়াতটির অর্থ ও শব্দগুলো মনে হয় বাদ পড়ে যায়। রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে তিনি ওপরে অবস্থিত বাগ বাগিচা ও পশুর মধ্য থেকে আরোহণের বস্তু এবং বিছানো জিনিস (শাকসব্জি) বানিয়েছেন। (আয়াতটির মূল শব্দগুলো দ্রষ্টব্য।) তারপর প্রসংগ এগিয়ে চলেছে 'আনয়াম'সম্পকিত কথাটিকে পূর্ণাংগ করার দিকে। 'আনয়াম'(অর্থাৎ গৃহপালিত পশু) কথাটিকে 'ফলমূল'-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কিছু মিলে আসলে বিষয় একটিই দাড়ায় যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অপরদিকে যারা এই সূরাটিকে মাদানী মনে করেছেন তারা এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন,

'খাও এর ফল থেকে যখন এ বৃক্ষ ফল দিতে শুরু করে এবং যে দিন এর ফল পাড়া হবে সেদিন এর হক আদায় করো।'

'হক' দ্বারা তারা বুঝেছেন 'যাকাত'। আর যাকাত মাদানী যিন্দেগীতে ফরয হয়েছিলো এবং তার পরিমাণও ওই সময় নির্ধারিত হয়েছিলো। এই কারণে সূরাটি অবশ্যই মদীনার জীবনে নাযিল হয়েছিলো বলে বুঝা যায়। কিন্তু 'হক' শব্দ দ্বারা একমাত্র এ অর্থটিই এ আয়াতে বুঝতে হবে এটা জরুরী নয়, যেহেতু হাদীসে এর তাফসীর করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটিতে যাকাত নয়; বরং সদকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফল পাড়ার সময় যারা সেখানে হাযির হবে বা ওই পথ দিয়ে যাবে অথবা আত্মীয়-স্বজন যারা আশেপাশে থাকবে, তাদেরকে ওই ফসল বা ফল থেকে খেতে দিতে হবে। এরপর যাকাতের সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ফল বা ফসলের এক-দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দিতে হবে। সুতরাং, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে আয়াতটি মক্কী যেহেতু কোনো পরিমাণের কথা এখানে বলা হয়নি।

সা'লাবী বলেন, ছয়টি আয়াত ব্যতীত সূরায়ে আনআমের বাকি সব অংশই মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছয়টি আয়াতের মধ্যে 'তারা আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে পারেনি'– থেকে তিনটি আয়াত এবং 'তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন– তা আমি পড়ে শোনাই'– থেকে তিনটি আয়াত।

প্রথম আয়াতগুলোকে আমরা মক্কী বলেছি, অথচ এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতগুলোকে যতোটা মক্কী মনে হয় প্রথম আয়াতটিকে ততোটা মনে হয় না।

দ্বিতীয় আয়াতগুলো সম্পর্কে যতোটা জানা যায়, কোনো সাহাবা বা তাবেঈ একে মাদানী বলেননি এবং এগুলোর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও এমন কিছু নাই যার কারণে এগুলোকে মাদানী বলা যায়। আয়াতগুলোতে পশু যবাই, মানত ও হালাল হারাম সংক্রান্ত জাহেলী যুগে প্রচলিত কিছু চিন্তাধারা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা এ আয়াতগুলোকেও মক্কী বলেই বুঝেছি।

দু'জন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সম্পাদিত কোরআনের কপিগুলোতে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোকে মাদানী বলা হয়েছে, ২০, ২৩, ৯১, ৯২, ১১৪, ১৪১,

www.pathagar.com

১৫১, ১৫২, ১৫৩। আবার ৯১, ৯২, ১৪১ এবং ১৫১-১৫৩ আয়াতগুলোকেও মাদানী বলা হয়েছে। আর ২০, ২৩, ১১৪ আয়াতগুলোর কারণে ধারণা করা হয় যে, সূরাটি হয়তো মক্কী। তবে আহ্‌লে কিতাবদের কথা আসাতে আবার মাদানী বলেও মনে হয়। কিন্তু এটাও সত্য, অনেক মক্কী সূরা এবং আয়াতের আহলে কিতাবদের কথা পাওয়া যায়।

এ সব কিছুকে সামনে রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, গোটা সূরাটি একই রাতে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আসমা বিন্‌তে ইয়াযীদ, আর একটি রেওয়ায়েতে শুধু আসমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একই সময়ে সূরায়ে আনয়াম নবী (স.)-এর ওপর নাযিল হয়, আর সে সময় আমি তার উঁটের লাগাম ধরে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম এবং তখন আমার মনে হচ্ছিলো ওহীর চাপে উটের হাড়গুলো ভেংগে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসটি তাবারানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সূরায় আনআম মক্কা শরীফে এক রাতে একই সময়ে সম্পূর্ণ নাযিল হয়। এ সময়ে এই শহরের চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা জোরে জোরে তাসবীহ পড়ছিলেন।

ওপরের হাদীস দুটি ওই হাদীস থেকে বেশী জোরদার- যার দ্বারা এ সূরার কোনো কোনো আয়াতকে মদানী বলা হয়। এর কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ওই সব জিনিস হালাল হওয়া সম্পর্কে কথা রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে দেয়া হয়েছে।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, সূরাটির বর্ণনাধারাতে গ্রহণ ও বর্জনের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাতে অন্তরের মধ্যে এক প্রেরণা সৃষ্টি হয়, অথবা মনে হয় এ যেন এক স্রোতস্বিনী ছোট্ট নদী, যার গতি পথে কোন বাধা নাই। সূরাটিতে আয়াতগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ মনে হয় যে, প্রতিটি আয়াতের কথাগুলো অপর আয়াতের কথা দ্বারা আরও মযবুতভাবে প্রমাণিত হয়।

সূরাটির আলোচ্য মূল বিষয়বস্তু ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সূচনাতে কিছু ইংগিত দিলাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত আরও কিছু কথা বলা জরুরী বোধ করছি।

আবূ বকর ইবনে মারদুওয়ায় আনাস ইবনে মালেকের বরাত দিয়ে একটি হাদীস পেশ করেছেন। এতে রসূল (স.) বলেছেন, সূরায় আনয়াম নাযিল হওয়ার সময় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত প্লাবিত করে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর তাসবীহ গাইতে গাইতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে নেমে এলেন, তখন তাদের তাসবীহর গুরণে পৃথিবী মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো। রসূল (স.)-ও এ সময়ে বারবার পড়ছিলেন, সোবহানাল্লাহিল আযীম, সোবহানাল্লাহিল আযীম।

ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে এই আগমনের বার্তা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সূরাটির প্রতিটি আয়াতে। এ মহান দৃশ্য, প্রাণ মাতানো এ ঘটনা এবং আশ্চর্য এ অবস্থাটি এতোই সুন্দর- যার সাথে কোন কিছুর তুলনা করা মুশকিল। যেমন আমরা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

বলেছি যে, প্রাণ উজ্জীবনকারী এ অবস্থা ও এ দৃশ্যকে একমাত্র তুলনা করা যায় এক স্রোতস্বিনী নদীর সাথে যা বয়ে যায় দিবা-নিশি, আর তা ভক্তের হৃদয়কে সুরময় এক জগতে নিয়ে যায়। এ নদীতে জোয়ারের সময় প্রচন্ড ঢেউ সৃষ্টি হয়, যা উপর্যুপরিভাবে অবিরাম গতিতে বালিয়াড়ির ওপরে আছড়ে পড়তে থাকে। এক ঢেউ শেষ হতে না হতে আবার আর এক ঢেউ উঠে আসে। এইভাবে এক ঢেউয়ের পানি অপর ঢেউ-এর সাথে মিলিত হতে হতে অপর ঢেউটি বিলীন হয়ে যায়।

মূল যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির আলোচনার ধারা এগিয়ে চলছে তা এমন শক্তিশালী যে যতো কথা বা পার্শ্ব বিষয় এর মধ্যে এসেছে তার সবগুলোই এই মূল ধারার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এ জন্যে কোনো বিষয়কে মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার এখানে সুযোগ নেই। এটা হচ্ছে এমন এক ঢেউ যা এসে কিনারায় আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই উঠে আসে আর এক ঢেউ এবং আগের ঢেউ পরের ঢেউয়ের সাথে মিশে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এইভাবে সকল ঢেউ মিলে একে অপরকে পূর্ণাংরূপ দান করে চলেছে। এই জন্যেই আমরা সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা না করে এর সকল অংশকে এক সাগরের বিভিন্ন ঢেউয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করে বুঝতে চেয়েছি।

সুরাটি শুরু হয়েছে সেই মোশরেকদেরকে সম্বোধন করার মাধ্যমে, যারা আল্লাহর সাথে আরও অনেককে প্রভুত্ব কর্তৃত্বের মালিক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। এজন্যে ওদেরকে সম্বোধন করে সর্ব প্রথম আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র আধিপত্য ও সকল ক্ষমতার নিরংকুশ মালিকানা যে একমাত্র তাঁরই সে বিষয়ে ওদের বিবেককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্যে প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, এমন কি তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যে একই নিয়মের সুর ধ্বনিত হচ্ছে তাও তাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে তাদেরকে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তিনটি আয়াতের মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে– যা আকাশ, বাতাস, পৃথিবীতে ও নভোমন্ডলের সবকিছুর সাথে জড়িত। এসব জিনিসের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনটি প্রধান জিনিসের ওপর আলোচনা করা হয়েছে যা এই মহাসৃষ্টির সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে।

'সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব মহান আল্লাহর, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্তেও কাফেররা তাদের মালিকের সাথে অন্য জিনিসকে সমান বানাতে চায়। তিনিই তো তোমাদের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমাদের জীবন কালের সময়টিকে.....। '(আয়াত ১-৩)

ওপরের তিনটি আয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের তাঁর গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা জানাচ্ছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতটিতে গোটা সৃষ্টির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এর পর তৃতীয় আয়াতটিতে দেখানো হয়েছে যে, মহান আকাশ ও পৃথিবীর সবখানে আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। এই আয়াত তিনটির মধ্যে কী চমৎকার, কী সুন্দর, কী সামগ্রিক এবং কী ব্যাপক কথা প্রকাশ করা হয়েছে তা ভেবে দেখার মতো।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে গোটা সৃষ্টিজগত, সেই সৃষ্টিজগতের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচার তাগিদে মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা তদ্বীর করে চলেছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তারা রুজি রোজগারের চেষ্টায় রত– যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সম্রাট, যার হাতে সকল প্রভুত্ব কর্তৃত্ব নিবদ্ধ। যার হাতে রয়েছে গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু এবং যাবতীয় রুজি রোজগারের চাবিকাঠি। সেই মহান সত্ত্বার সামনেই মোশরেকদের শেরক স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেই ব্যক্তির কোনে মর্যাদা নাই, যে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, তার নিজের কাছেও তার কোনো সম্মান নাই এবং বিবেকের কাছেও সে এর কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না।

এখানে অস্বীকারকারীদের জন্যে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর চরম শাস্তি ও তাদের ভীষণ কদর্য অবস্থার কথা জানানো হয়েছে। বান্দার এ ধরণের ভূমিকার কারণে তার প্রতি সব দিক থেকে শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার নেমে আসে। এক সময় সে নিজেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, কিন্তু মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা ও মহিমা সমুজ্জ্বল হয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। তার এই কুফরী মনোভাব সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সত্যের সামনে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশগ্রাস্ত হতে বাধ্য করে এবং তার কাছে ও এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে কোনো যুক্তি বা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে তার অবস্থানকে মযবুত বানাতে পারেনি, বরং নিছক তার খোশ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সে সত্যের বিরোধী হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের রব প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের পক্ষে যে কোনো নিদর্শন এসেছে, তাকে তারা অস্বীকার করেছে, সত্য সমাগত হওয়ার পরেও তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং সত্যের সাথে যে ঠাট্টা মস্কারি তারা করেছে তার ফল ভোগ করার খবর শীঘ্রই আসছে ..... পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখো, সত্যদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে অতীতে। (৪-১১) আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন।

এখানে প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মূল তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেই তৃতীয় বিবৃতিটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যা হৃদয়ের মধ্যে এক প্রচন্ড তুফান সৃষ্টি করে, অন্তর-মনকে আলোকিত করে তোলে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুর ওপর আল্লাহ পাকের মালিকানার তীব্র অনুভূতি তাকে বিমোহিত করে তোলে। সে যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় মহান রেযেকদাতাকে, গভীরভাবে সে অনুভব করে যে একমাত্র তিনিই তাকে তার সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেন। একমাত্র তিনিই হচ্ছেন তার দরদী অভিভাবক। তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, একমাত্র তাঁর কাছেই বান্দা আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং শুধু তাঁর কাছেই নিজেকে সে সঁপে দিয়ে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। তাই সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বান্দার একমাত্র কর্তব্য। নাফরমানদেরকে পরকালে অবশ্যই তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন। তিনিই ভালো মন্দ সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই বিজ্ঞানময়– তিনিই খবর রাখনেওয়ালা।

www.pathagar.com

রসূল (স.) দাওয়াতের সূচনা করার পর থেকে মোশরেকদের যে বিরোধিতা ও হঠকারিতা চলে আসছিলো তা এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, আত্মীয়তা ও প্রতিবেশির যে নৈকট্য ছিলো তাও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রসূল (স.) একাধারে তাদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্যে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন। জানাচ্ছিলেন যে, তিনি শেরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ঐকান্তিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা দ্বারা আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) ঘোষণাও তিনি করে চলেছিলেন। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো কার? বলে দাও, এগুলো আল্লাহ্‌র ..... তোমরা যে সব শেরক করে চলেছ এগুলো থেকে আমি সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত।' (আয়াত ১২-১৯)

এরপর শুরু হচ্ছে ওই মোশরেকদের হঠকারিতার চতুর্থ পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে তারা এই নতুন কিতাব সম্পর্কে আহলে কিতাবদের মন্তব্য তুলে ধরে এ কিতাবটিকে মিথ্যা বলে দাবী করছিলো। এই জন্যেই তাদের এই শেরককে সব থেকে বড় অন্ধকার বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, রোজ হাশরে সেই ভয়ংকর সমাবেশে মোশরেকদেরকে হাযির করা হবে এবং তাদেরকে তাদের সেই কল্পিত দেবতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতো। তখন তারা শেরক করেছিলো বলে অস্বীকার করবে এবং তখন তারা বুঝতে পারবে তাদের মিথ্যা বলার পরিণতি কতো কঠিন। সেদিন তাদেরকে ঈমান আনার কথা বলাও হবে না এবং তারা ঈমান আনতেও পারবে না। তাদের অন্তরের ওপর পর্দা পড়ে থাকবে। কারণ দুনিয়াতে তারা কোরআন সম্পর্কে বলছে যে, এতো প্রাচীন কালের কাহিনী মাত্র, আর তুমি তাদের সম্পর্কে বেদনাহত হৃদয়ে বলেছো, হায়! এই কথা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। তারা নিজেরা তো ঈমান আনবেই না, অপরকেও তারা ঈমান আনতে এবং হেদায়াতের পথে চলতে নিষেধ করছে। এরই ফল স্বরূপ তাদেরকে দোযখের আগুনের কিনারায় হাযির করা হবে। তাদের এই অবস্থাটি কতো ভয়াবহ হবে তা একবার চিন্তা করে দেখুন। তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়ার জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হতো তাহলে অবশ্যই আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে আমাদের রবের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত না করে আমরা মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম! আসলে দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে যদি ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে একই ভাবে পুনরুত্থান ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে আবারও তারা অস্বীকার করতো। তারপর একইভাবে পুনরায় তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হতো এবং তাদের ওই অবস্থাটিরই পুনরাবৃত্তিই হতো। এইভাবে তাদের হঠকারিতার ফলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কালে তাদেরকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তার বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। শেষ হচ্ছে এ বর্ণনাও যে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় হবে সম্পূর্ণ বেমজাদার ; এরশাদ হচ্ছে,

'যাদেরকে, আমি এই কেতাবটি দিয়েছে তারা অবশ্যই এ কেতাবকে সেইভাবে চেনে যেমন করে তাদের ছেলেদেরকে তারা চেনে .....আর, দুনিয়ার এই জীবন

www.pathagar.com

খেল-তামাশা ছাড়া তো আর কিছুই নয় এবং অবশ্যই আখেরাতের উত্তম ঘর তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ ভয় করে চলে। তোমরা কি বুঝছো না?' (২০-৩২ পর্যন্ত ও তরজমা দেখুন)।

এরপর আসছে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তরংগের বর্ণনা। এই তরংগের মধ্যে রসূল (স.)-এর কর্ম প্রণালীর দিকে বিশেষ নযর দেয়া হয়েছে। এ সময়ে কাফেরদের অত্যাচার চরম রূপ নেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাঁকে ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রমাণের জন্যে যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো তার কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুঃখ ভরা মনের ভারকে লাঘব করার জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলোর অবতারণা করা হয়েছে। এসব আয়াতে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নিয়ম অমোঘ এবং অপরিবর্তনীয়। তাদের অস্বীকৃতির কারণে রসূলুল্লাহ (স.) যদি সবর করতে না পারেন, তাহলে মানুষের চেষ্টার মতো তিনিও অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করুন! আল্লাহ তায়ালা চাইলে মানুষদের হেদায়াতের পথে একত্রিত করে দেবেন। এর জন্যে তো সৃষ্টির বুকে তাঁরই ইচ্ছার প্রধান্য ও বিজয় প্রয়োজন। কারণ একমাত্র তিনিই কোনো পরিবর্তন আনার জন্যে হুকুম বা ফায়সালা দান করতে পারেন। একবার তাঁর ইচ্ছা বা মর্জি হয়ে গেলে সব বিরোধিতা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তারা হয়তো হিসাব করবে যে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই তাদেরকে মৃত্যু ও আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, আর মরণের পর হেদায়াতের পথ গ্রহণ করায় কোনো কাজও হবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি জানি যে কথাগুলো ওরা বলে চলেছে .....এরপর তাদেরকে (আল্লাহর কাছে) ফিরিয়ে নেয়া হবে। (আয়াত ৩৩ -৩৬)

এইভাবেই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলো এগিয়ে চলেছে মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো। প্রাণে দোলা দেয়ার মতো বাক্যগুলো একটির পর আর একটি এগিয়ে আসছে। এইভাবে সূরাটির বক্তব্য আমাদের মনে বারবার দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এসব কথা আমাদের মনকে আন্দোলিত করছে, যার ফলে অনেক সময় বহু কঠিন ঝুঁকি নিতেও আমাদের মন প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বড়ো থেকে বড়ো দুর্ঘটনাও সহ্য করাও আমাদের কাছে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সুরাটির প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন আরবের যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি অবতরণকালে শ্রোতাদের মাঝে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে তার সব কিছু স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের দিকে ইংগিত দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদ্ধতিতে তার মৌলিক বিষয়টিগুলোকে তুলে ধরেছে। সেখানে ইসলামী দাওয়াতের কঠিন দুঃসময়ের প্রতিটি মুহূর্তগুলো দেখানো হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিষয় এবং প্রতিটি দৃশ্যই ছিলো এমন চরম অবস্থার বহিপ্রকাশ যা মনকে শক্তি যোগায়, অনুভূতিকে সযত্নে জাগিয়ে তোলে। সূরার বিষয়বস্তু, দৃশ্যসমূহ ও ঘটনাগুলো যখন সামনে আসে, তখন অবশ্যই প্রাণ উদ্দীপিত হয়।

www.pathagar.com

এবারে আমরা সূরার মধ্যে যেসব যুক্তিপূর্ণ কথা রয়েছে সেগুলোকে একটির পর একটি পেশ করছি, এগুলো আল কোরআনের চমৎকার বর্ণনাভংগির সাক্ষ্য বহন করছে, আর তা হচ্ছে ঈমানী শক্তির হৃদয়স্পর্শী গুণ যা মানুষের মনে এমনভাবে দাগ কাটে যার কোনো তুলনা নেই।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের পক্ষে তাদের মনীবকে জানা ও তাঁর আনুগত্য করা– এইগুলো হচ্ছে সুরাটির মূল বক্তব্য বিষয়। সুতরাং এই সব বিষয় সূরাটির বিভিন্ন স্থানে কিভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আসুন তা দেখা যাক।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দান করা এবং যারা এ কথার বিরোধী তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা এ কাজ যারা করতে পারবে– তাদের অন্তরে পুরোপুরি ঈমান প্রবেশ করেছে বলে মনে করতে হবে। এই বলিষ্ঠ ঈমানের দ্বারাই মোমেনরা বিরোধীদের মোকাবেলা করে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তারা এর দাওয়াত দেয়। আল্লাহর বাণী;

'বলো, আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে আমার অলী বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবো? .... বলো, একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আর আমি সম্পর্ক-মুক্ত ওই সব জিনিস থেকে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করো।' (আয়াত ১৪-১৯)

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই সূরার মধ্যে বেশ কয়েক স্থানে আল্লাহর ধমক রয়েছে। ওই সব ধমক থেকে বান্দাদের ওপর সার্বিকভাবে আল্লাহর ক্ষমতার কথা প্রকাশ পেয়েছে, তাদের সামনে বিশ্বপ্রকৃতি উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অজ্ঞানতার যে অন্ধকার তাদের মনে পুঞ্জীভূত ছিলো তা দূরীভূত হয়ে যায়। তারা তাদের প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রুজু হয় এবং তাদের অন্তরও আল্লাহমুখী হয়ে যায়, তাতে যতো বিপদ আসুক না কেন এবং মিথ্যাবাদীরা যতোই তাদের বিরোধিতা করুক না কেন, তাতে তাদের কোনোই পরওয়া থাকে না। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর হঠাৎ করে আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা কেয়ামতই যদি সংঘটিত হয়ে যায়, সে অবস্থায় তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবে কি? বলো, জওয়াব দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো?..... বলো, তোমরা কি চিন্তা করেছো.....?' (আয়াত ৪০-৪৭)

সূরাটির তৃতীয় দৃশ্য হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা। তিনি গায়বের খবর ও গোপন সকল তথ্য সম্পর্কে জানেন। সকল মানুষের সকল অবস্থা একমাত্র তিনিই ওয়াকেফহাল। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সব কিছু করার অধিকার রাখেন এবং জলস্থলের সব কিছুর ওপর তাঁরই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত। রাত-দিন, জীবন মৃত্যু সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়বের চাবিকাঠি, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ..... শোনো, হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনিই...।' *(আয়াত ৫৯-৬২)*

সূরাটির চতুর্থ দৃশ্য হচ্ছে প্রকৃতির বিষয়াবলী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং এ জিনিসগুলো আল্লাহর দিকে মানুষকে পথ দেখায়। তাদের সামনে তা স্পষ্ট করে সঠিক পথের দিশা তুলে ধরে এবং সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কথা তাদের জানিয়ে দেয়। এসব নিদর্শন সৃষ্টির গোপন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে যেন আহ্বান জানায়,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, আপনি কি মূর্তিগুলোকে মাবুদ বানিয়েছেন? ..... যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (আয়াত ৭৪-৮২)

সূরাটির পঞ্চম ভূমিকা হচ্ছে, দুনিয়ার বুকে পৃথক পৃথকভাবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রকার রহস্য ভরা জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা যা মানুষের হৃদয়ে প্রচন্ড কম্পন জাগায়। প্রকৃত পক্ষে এসব দৃশ্যের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রভাত বেলার মৃদু সমীরণ ও গোধূলি বেলার স্নিগ্ধতা সৃষ্টিকর্তার স্নেহের পরশ বয়ে আনে, সুদূর নীল আকাশে তারকারাজির লুকোচুরি খেলা এবং লুকিয়ে থাকা গোপন রহস্য, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ এবং সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিসিঞ্চিত ফসলের সমারোহ, গাছ-গাছালি ও পাকা পাকা ফলের দৃশ্য– এসব কিছুই লা শরীক আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেয়। সাথে সাথে, আল্লাহর ক্ষমতায় যারা অন্য কাউকে শরীক বানাতে চায়, বানাতে চায় তার পুত্র পরিজন, তাদের দাবীর অসারতা প্রকাশ করে দেয় বুদ্ধি ও বিবেক ধিক্কারের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকারী দানা ও আঠিযুক্ত ফসল ও ফলমূলের..... কোনো চোখ তাঁকে দেখতে পায় না, অবশ্য তিনি চোখগুলোকে দেখেন।' (আয়াত ৯৫-১০৩)

সূরাটির সর্বশেষে বলা হয়েছে, এখানে পরিবেশিত এসব দৃশ্যের ছবি বিদগ্ধ হৃদয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা ও নম্রতা জাগার, আর সব কিছু থেকে মুক্ত করে তার মনকে লা-শরীক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং এভাবেই সে নিজেকে নামাযের মধ্যে সঁপে দেয়। সে বলে, 'আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই তোমার জন্যে হে আমার মালিক'। এ সময়ে তার হৃদয়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মে, সে জানে একমাত্র তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক। এরপর তার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ও তৎসংশ্লিষ্ট পরীক্ষা এবং আখেরাতে হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদানপ্রাপ্তির বিষয়গুলো সব কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পেশ করা হবে। এই ভাবে সূরাটির উপসংহারে নিবেদিত চিত্তের

www.pathagar.com

একাগ্রতা ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতার এক প্রশান্ত ছবি ভেসে ওঠে। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে রসূল) বলো, অবশ্যই আমার রব তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন সরল সঠিক ও মযবুত পথ, সে পথ হচ্ছে পরম নিষ্ঠাবান ইবরাহীমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা, আর কিছুতেই সে মোশরেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না ..... নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তি-দানকারী, আবার তিনিই মাফ করনেওয়ালা– মেহেরবান। (আয়াত ১৬১-১৬৫)

উপরে আমরা যে ছয়টি উদাহরনের দিকে ইংগিত করেছি এগুলো সবই সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রসংগের চমৎকার এবং অত্যাশ্চর্য কিছু দৃশ্য, যার প্রতিটি উপস্থাপনা, প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি সঞ্জীবনী কথা মনকে আকৃষ্ট করে।

এইভাবেই শেষ হচ্ছে সেই সব প্রাণবন্ত কথাগুলো, যা আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটির মধ্যে বলতে চেয়েছিলেন। আলোচনায় আমরা ওয়াদা করেছিলাম যে, 'আল-কোরআনের বর্ণনাভংগি সর্বত্র 'গোছালো ভাব' রয়েছে– এর দ্বারা আমরা কি বুঝেছি সে বিষয়ে কয়েকটি কথা পেশ করা,

এ পর্যায়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার পর আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই, যাতে করে কোরআন থেকেই একথাগুলোকে বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়া যায়। তিনটি বিষয় আমরা এখানে আনতে চাই যা সূরাটির আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল,

সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাধারা রয়েছে, কিন্তু তাঁর সবগুলোরই লক্ষ্য হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যকে জোরালো ভাবে পেশ করা। তাই প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সূরায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে ব্যক্ত কথাগুলোকে যে কোনো শ্রোতার কাছে মনে হবে ওই কথাগুলো যেন তাকেই সম্বোধন করে উচ্চারিত হচ্ছে। যেন পর্দার আড়াল থেকে কেউ তাকেই অনুপ্রাণিত করছে।

আয়াতগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মনে হয় যেন কেয়ামত ও হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার দৃশ্যগুলো পাঠকের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি যদি সেই সময়ের অবস্থা দেখতে পেতে যখন দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, তখন তারা বলতে থাকবে, হায় আফসোস, আমাদেরকে যদি আর একবার ফেরত পাঠানো হতো.....।'

'আর যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে.....তোমরা দুনিয়ার বুকে করে এসেছো।' (আয়াত ২৭)

'আর যদি তুমি যালেমদের মৃত্যুর বিভীষিকার দৃশ্যটা দেখতে পেতে .....।' (আয়াত ৯৩)

'আর সেই দিনের কথা একবার ভেবে দেখো যখন মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তারপর মোশরেকদেরকে বলবেন, কোথায় তোমাদের সেই

www.pathagar.com

শরীকরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতে। এই পরীক্ষার জবাবে তখন তারা বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব, না, আমরা কিছুতেই মোশরেক ছিলাম না। দেখো, তারা কেমন করে নিজেদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা কথা বলবে.....।'

আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার কথা অস্বীকার করার কারণে তিনি কতো কঠিনভাবে ধমক দিচ্ছেন তাও লক্ষ্য করার মতো। তার শাস্তির সামনে তাদেরকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে, তাদের কাছে মনে হবে, তারা পরস্পরকে কিছুটা সাহায্য করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ... যদি আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর এসে যায় তখন কি আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে, বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো .....।'

'বলো, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের শোনার শক্তি ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরের ওপর যদি সীল মেরে দিয়ে তোমাদের বুঝার ক্ষমতাও শেষ করে দেন, সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে আছে এমন যে এসব ক্ষমতা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে .....?'

হেদায়াত পাওয়ার পর আবার গোমরাহীতে ফিরে যাওয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যার সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো শ্রোতা অবশ্যই ক্রোধে নিজেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে, যদিও এসব দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে কাউকে সরাসরি হুকুম দেয়া হয়নি, অথবা তাদের কাউকে সেখানে থামতে ইশারাও করা হয় নাই। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবো .....এসো আমাদের কাছে।' (আয়াত ৭১)

এমনি করে সূরাটির বর্ণনাধারার মধ্যে সুন্দর করে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সে সব দৃশ্যের সামনে যখন কেউ দাঁড়ায়, তখন তার সামনে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের ভান্ডারের বর্ণনা এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি তখন জান্নাতের রং-বেরং-এর ফলের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে, 'আর তিনিই বর্ষণ করেছেন আকাশ থেকে (বৃষ্টির) পানি..... সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান আনে। (আয়াত ৯৯)

এইভাবে সূরাটির সকল দৃশ্য ও বক্তব্য পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠেছে। বিরোধীরাও তাদের কাজের মাধ্যমে এগুলোর প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করেছে।

সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কেয়ামতের দৃশ্যগুলোকে এমন কঠিনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মোশরেক ও মিথ্যা দাবীকারীদের ওপর ওই কঠিন শাস্তিগুলো যে অবশ্যই আসবে তার মধ্যে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না। ইতিপূর্বে এর কিছু উদাহরণও পেশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে– 'আর তুমি যদি দেখতে:'

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি উদাহরণের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসকে মযবুত বানানোর জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং শরীয়তের আইনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে এ দু'টি বিষয় আসলে একই।

সূরাটির শুরুতে আকীদা সম্পর্কে কথা বলার সময়ে এ বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'বলো, সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে এর থেকে বড় জিনিস আর কি হতে পারে? বলো, আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। আর আমার কাছে একথাগুলো এই জন্যে নাযিল হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ বাণী পৌঁছুবে, তাদের সবাইকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দিতে পারি। আল্লাহর সাথে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক হওয়ার ব্যাপারে আরও কেউ ক্ষমতাধর আছে বলে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো? বলে দাও, না, আমি এমন কাউকে দেখছি না। বলো, একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ..... ।' (আয়াত ১৯)

সূরাটির মধ্যে হালাল হারামের বিধানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করার পর অন্য আর একটি প্রমাণ পেশ করা হলো, আর আহ্বান জানানো হলো এই বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্যের প্রতি, যাতে করে মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে এর ধারা ফিরিয়ে দেয়া যায় এবং কোরআনুল করীমের সাধারণ ব্যাখ্যার সাথে তা পুরো সামঞ্জস্যশীল হয়,১

'বলো, নিয়ে এসো তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে, যারা এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলো হারাম করেছেন।..... আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে..... তুমি তাদের সাথে মিলে তাদের ওই খামখেয়ালীপনার অনুসরণ করো না।'

এসব বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তৃতীয় যে চমক লাগানো কথাটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, এর প্রাসংগিক যে ব্যাখ্যা এসেছে তা আয়াতের মূল বক্তব্য বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। আর এই বক্তব্যগুলোর বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে এ কথাটিই দৃষ্টান্ত হিসাবে ফুটে উঠেছে যে, একটি মাত্র সত্যকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আয়াতে পেশ করা হয়েছে।

কাফেরদের সম্পর্কে সূরার শুরুতে এভাবে বর্ণনা এসেছে যে, তারা অন্যদের আল্লাহর সমান বানাতে চায়। এখানেও বর্ণনাটি সেইভাবেই এসেছে। তারপর, সুরাটির শেষের দিকেও এসেছে এই রকমই আর এক ব্যাখ্যা– তা এসেছে সেই সব লোকের জন্যে যারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করে এবং এইভাবে আইন তৈরীর কাজে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাতে চায়। নিম্ন-বর্ণিত আয়াতটিতে এই কথাটিই বলা হয়েছে,

'আল্লাহরই সমস্ত কৃতিত্ব ও প্রশংসা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন.... এরপরও যারা কুফরী করে তারা অন্য কাউকে তার সমান বানাতে চায়।'.....

১. দেখুনঃ আত্তাসবীরুল ফান্নিউ ফিল কুরআন– আত্তানাসুক্–অধ্যায়

www.pathagar.com

প্রথম আয়াতে দেখা গেছে যে, তারা তাদের রবের সাথে অন্য কিছুকে সমান বানায়, যেহেতু তারা আল্লাহর ক্ষমতায় ওদেরকে শরীক মনে করে। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের রবের সমকক্ষ অন্য কাউকে বানানোর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, এমনি আরও অনেককে তারা তাঁর সাথে শরীক করে। এই শেরকের ধরন হচ্ছে, আইন কানুন তৈরী করার ব্যাপারে তাদের শাসকদের পুরোপুরি অধিকার আছে বলে তারা মনে করে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। আর এইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন কানুন রচনার গুরুত্বও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন,

'অতপর যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করতে চাইবেন ইসলামী জীবনব্যবস্থা বুঝার ও গ্রহণের জন্যে তার বুককে তিনি খুলে দেবেন, আর যাকে তিনি গোমরাহ করতে চাইবেন তার বুককে তিনি এমনভাবে সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ করে দেবেন যে, ইসলামকে বুঝা ও মানা তার কাছে আকাশে চড়ার মতো কঠিন হয়ে যাবে।'.....

এরপর আসছে গৃহপালিত পশু ও ফসলাদির বর্ণনা। শেষের দিকে আরও আসছে হালাল হারাম সম্পর্কিত আরো কিছু কথা– যার ইংগিত সূরাটির সূচনাতেই দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এই হচ্ছে আমার সরল সঠিক মযবুত পথ; অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো; আর বিভিন্ন পথের দিকে যেয়ো না, তাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। .....

ওপরে বর্ণিত সকল কথার আলোকে এ সূরাটির মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে মানুষের 'আকীদা' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ও অন্যান্য বিশ্বাসগত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে মনে প্রাণে তা গ্রহণ করা। আসলে দৃঢ়তার সাথে এ পথে জীবনভর টিকে থাকার অর্থই হচ্ছে সেরাতুল মোসতাকীমের ওপর চলা। আর এই পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর নামই হচ্ছে সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে আসা। এটিই হচ্ছে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ওপরে দিয়েছি।

এখানে আমরা এ সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করতে চাই। সর্বশেষে কথা হচ্ছে, এই সূরায় একটি পাঠ শেষে আর একটি পাঠ শুরু করার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা হয়নি যেমন মাদানী সূরার বর্ণনাতে সাধারণত দেখা যায়। এইভাবে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে সূরার মধ্যে উত্থাপিত বিষয়াবলীর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে এমনভাবে পেশ করা যাতে পাঠকের মনে তা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যেও প্রাসংগিক কথাগুলোকে পর্যায়ক্রমে পেশ ধরার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যথাযথভাবে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

সূরা আল আ'রাফ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক সূরায়ে আনয়াম-এর মতোই। তাই অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই এর আলোচ্য বিষয়ও মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত আকীদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কিন্তু এ সত্বেও এই একই বিষয়ের ওপর দুটি সূরার মধ্যে আলোচন্য কতো বৈচিত্র্যময় তা লক্ষণীয়। আসলে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি সব সময়ই অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনার দাবী রাখে।

আল কোরআনের প্রত্যেকটি সূরাই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজের কিছু এমন বিশেষত্ব যা অপর সূরা থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। প্রত্যেক সূরারই রয়েছে নিজের পৃথক বর্ণনাভংগি। এই একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দিক দিয়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সামনে রেখে দু'টি সূরায়ই আলোচনা করা হয়েছে, কেননা এই বিষয়টি অতি বড়ো, অতি মহান।

এসত্তেও প্রত্যেকটি সূরার নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগি রয়েছে, রয়েছে আকর্ষণীয় পৃথক পৃথক বর্ণনাভংগি ও পদ্ধতি। ক্ষেত্র ভেদে এ বিষয়টির ওপর বহু ধরণের আলোচনা হতে পারে। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যেই বিভিন্ন সূরাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

আল কোরআনের মর্যাদা বুঝতে হলে আমাদের একবার সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের মর্যাদার দিকে তাকাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে কি ধরনের আদর্শ করে বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাও দেখতে হবে । বিশ্ব-চরাচরে যতো আদম সন্তানকে আমরা দেখছি সবাই তো মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ ও গঠন প্রণালীতে ও কর্মকান্ডে পরিদৃশ্যমান হয়ে রয়েছে মানবীয় সকল আকার-আকৃতি। এসত্তেও এদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রূপের মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। একজনের সাথে অন্য জনের কিছু বৈচিত্র্যময় সাদৃশ্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের বৈসাদৃশ্য, যা মানুষ নামের পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাদের একত্রিত করতে সক্ষম নয়।

এভাবেই আমি মহাগ্রন্থ এই পবিত্র কালামের সূরাগুলোকে গণনার মধ্যে নিয়ে এসেছি এইভাবেই আমি তাকে অনুভব করেছি এবং আল কোরআনের ছায়াতলে বসে দীর্ঘকাল থেকে আমি এইভাবে বাস্তব জীবনে আল্লাহর এই পবিত্র গ্রন্থকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছি। দীর্ঘ দিন ধরে এই পাক কালামকে আমি ভালোবেসেছি এবং এর প্রত্যেকটি কথা ও নির্দেশকে প্রকৃতি সংগত ও আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তেই একটি প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে পেয়েছি।

আমি আল কোরআনের মধ্যে বহু প্রকার মানুষের নমুনা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি বিভিন্ন প্রকারের মানুষকে, যারা কোরআনের ছায়াতলে এসে নিজেদের চেষ্টা বলে আল্লাহর অনুগ্রহে নিজেদের যোগ্যতা ও মান সম্ভ্রমকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

এই সকল মানুষ যারা ভালো হওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা পরস্পরকে একজনকে আরেকজনের বন্ধু হিসাবে পেয়েছে, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছেন সত্যপ্রিয় এবং একে অপরের সঠিক বন্ধু। প্রত্যেকেই হচ্ছেন সত্যিকারের আল্লাহ প্রেমিক, তাদের অন্তর তাঁর মোহব্বতে ভরা। এ মানব-প্রেমিক বন্ধুদেরকে আমি দেখতে পেয়েছি সচ্ছল, তাদেরকে আমি বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর ও পরোপকারী বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।

এই সৎচিন্তাশীল, সৎকর্মশীল ও দানশীল ব্যক্তিদেরকে আমি মানুষের ভালোবাসার পাত্র হিসাবে পেয়েছি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন প্রবাহ এগিয়ে চলেছে এবং তাদের জীবনে মানুষের অজান্তেই ওই সৎ ব্যক্তিদের প্রভাব তারা গ্রহণ করেছে। সকল সংকটাবর্তে তারা নিজেদের জন্যে সমাজে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়। সব নিদর্শন ও দৃশ্যাবলী, যেসব চিন্তা উদ্রেককারী তত্ত্ব ও তথ্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা আমার প্রাণকে উজ্জীবিত করেছে ও অন্তরের গভীরে তা বিপুল পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে। সৃষ্টির সব কিছুকে আমার নযরে যেন আরো সুষমামন্ডিত করে তুলেছে।

সূরায়ে আন্‌য়ামের আলোচ্য বিষয় যেমন ছিলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস তেমনই সূরায়ে আরাফের মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুও ওই একটাই। কিন্তু দেখা যায় সূরায়ে আনয়ামে শুধু আকীদা সম্পর্কেই বর্ণনা এসেছে, কিন্তু সূরা আ'রাফে আলোচনা শুধু আকীদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আকীদার বিষয়বস্তু ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে আরো বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়ের আরব জাহেলিয়াতের চেহারা প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, সকল যুগের সকল জাহেলিয়াতই প্রকৃতির দিক দিয়ে এক প্রকার। এই অর্থে অতীতে আরবদের মধ্যে যেমন হঠকারিতা ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে হীনতা প্রদর্শন করা হতো, আধুনিক বিশ্বেও এই একই প্রকার সংকীর্ণমনা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিয়ত সত্যের বিরোধিতাই শুধু নয়, বরং সত্যের বাতিকে চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে কাজ যাচ্ছে। যে বিষয়ে কখনও সংক্ষেপে এবং কখনও বিস্তারিতভাবে আমরা ইতিপূর্বের সূরাগুলোতে আলোচনা করেছি।

আমরা সূরায়ে আ'রাফে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আলোচনাই মুখ্যতর দেখেছি। দেখেছি এই সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে এবং তা আলোচিত হয়েছে গোটা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসকে সামনে রেখে। পৃথিবীর এ জীবন নিশ্চিন্ত এবং স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্র নয়; বরং এ হচ্ছে চলমান এক ভ্রমণক্ষেত্র মাত্র। সত্যিকার অর্থে এর যাত্রা শুরু হবে জান্নাতে পৌঁছানোর পর। এই দুনিয়ার জীবনের শেষ যেখানে– সেখান থেকেই এর শুরু হবে। বস্তুত সে যাত্রার কোনো শেষ নেই, মহাকাল ধরে চলবে সেখানে এ অনন্ত জীবন। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঈমানের প্রতিফল পাওয়া যাবে। বরং বলা যায় মহা-সমারোহে ঈমানের উৎসব বসবে সেখানে, যার কোনো শেষ হবে না। এ সৌভাগ্যের মেলার পরিচালক হবেন আদম (আ.) থেকে

www.pathagar.com

নিয়ে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী রসূলের কাফেলা। এ মহান জামায়াতের সবার মধ্যে বিরাজ করেছে এই একই আকীদা। ইতিহাসের সর্বত্র মূর্ত হয়ে রয়েছে সেই একই কাফেলা এবং যুগ যুগ ধরে এই আকীদার ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিই এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে কেমন করে বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠিকে এই নবীরা সম্বোধন করেছেন, আর তারা কিভাবেই বা তার জবাব দিয়েছেন! কি ভাবে এইসব জনগোষ্ঠী নবীদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে থেকেছে। এভাবে নবী রসূলদের কষ্ট দিয়ে কি জঘন্য অপরাধ না তারা করেছে! যারা আল্লাহর দ্বীনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগেছিলো তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে ! ইতিহাসের এই বর্ণনাধারা এবং সত্যের সাথে সদ্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহারের এ ইতিহাস অনেক দীর্ঘ; কিন্তু পর্যায়ক্রমে এ সুদীর্ঘ যাত্রাপথের বাধা অতিক্রম করে এ সূরাটিতে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এসেছে। বংশের পর বংশ ধরে এবং যুগের পর যুগ ধরে এ সূরার আবেদন মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে এই বিশ্বাস গ্রহণ করার কথাই বলে এসেছে। এরপর সূরাটির বর্ণনাভংগি আরো বলছে, দাওয়াতে দ্বীন নিয়ে যারা মানুষের কাছে গেছে, তাদের সাথে মানুষ কি ব্যবহার করেছে! 'দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তিরা কিভাবে সত্য-বিরোধীদের রক্ত চক্ষু এড়িয়ে তাদের পাতানো ফাঁদ পার হয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজটি অবিরাম চালিয়ে গেছে। এরপর ইহকাল এবং পরকালে এইসব সত্যবিরোধী ও সত্যাশ্রয়ী লোকদের কি কি পরিণতি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণও সূরাটির মধ্যে পাওয়া যায়।

উভয় দলের এ সফর অনেক অনেক লম্বা; কিন্তু সূরাটি তার মন মাতানো গতিময় ছন্দের সাথে ক্রমে ক্রমে এক একটি ধাপ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে চিহ্নিত পথে বিশ্বব্যাপৃত সত্যের চিহ্নগুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করে। আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা প্রকাশকারী এসব চিহ্ন এতো স্পষ্ট যে, যে কেউ খেয়াল করলে এগুলো থেকে সহজেই শিক্ষা নিতে পারে। এসব চিহ্ন সদা-বিরাজমান। এগুলো কোনো ছোট খাটো বা তুচ্ছ চিহ্ন নয়, বরং সাধারণ দৃষ্টিতেই এগুলো ধরা পড়ে। সামগ্রিকভাবে উত্থান, পতন, এই নিয়মেই মানুষের জীবন এগিয়ে চলেছে। অবশেষে তাকে তার সেই বেহেশতেরই দিকে যেতে হবে, যেখান থেকে সে একদিন এই মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো।

মূলগতভাবে মানুষ এক বিশেষ স্থান থেকে তার জীবনযাত্রা শুরু করেছে। বাবা আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী মা হাওয়া (আ.)– এই দুইজন মানুষ থেকেই মানুষের এই মহা পরিবারের যাত্রা শুরু হয়েছে। একই সময়ে এদের সাথে এবং এদেরকে ও এদের সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতিপ্রাপ্ত শয়তানও তার যাত্রা শুরু করেছে। অপরদিকে বাবা আদম ও মা হাওয়াও আল্লাহর সাথে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হলো। এই স্বাধীনতা দেয়া হলো যে, তারা চাইলে আল্লাহ তায়ালারই হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, অথবা শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়লে তার দিকেও তারা

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়তে পারবে। আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমাদের জাতশত্রু, সে তোমাদেরকে ক্ষতি ও বিপথগামী করার জন্যে সর্বপ্রকার সুযোগ ব্যবহার করবে, অতএব তার থেকে সাবধান থেকো। এসব সতর্কবাণী সত্তেও তার দেয়া লোভ ও লোভনীয় বস্তুর আকর্ষণ থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যেই ছিলো আল্লাহর এ ব্যবস্থাপনা। আর এই পরীক্ষার প্রয়োজনেই তাদের আদি পিতামাতা এবং তাঁদের বংশধরদেরকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার মধ্যে এটাও ছিলো যে, ডান ও বাম দিক থেকে শয়তান এসে তাকে ভুলপথে নেয়ার চেষ্টা করবে। যার প্ররোচনায় দুঃখ কষ্টের স্থান এ দুনিয়াতে তাদের আসা, তার ও তার উপস্থাপিত লোভনীয় জিনিস থেকে সতর্ক করার জন্যে নবী-রসূলরা আসবেন, তখন শয়তানও সুন্দর করে তার সামনে উপস্থিত লাভ ও লোভের জিনিসকে তুলে ধরবে। এ অবস্থায় তখন সে কোন্‌টা গ্রহণ করবে?

পবিত্র ও মহান আল্লাহর কাছ থেকে পৃথিবীর দিকে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখানে সে চতুর্মূখী অবস্থার সম্মুখিন, অন্যায় কাজও করছে, ভালো কাজও করছে। গড়ছে কখনও, ভাংছে কখনও। প্রতিযোগিতা ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আবার মারামারি কাটাকাটিতেও লিপ্ত হয়ে পড়ছে। একটু ভালো থাকা ও খাওয়া পরার জন্যে সকলেই নিরন্তন চেষ্টা সাধনা করে চলছে। পৃথিবীর এই দীর্ঘ সফর কালে যা কিছু সে উপার্জন করেছে তাই সাথে করে নিয়ে যাবে। যা কিছু কামাই করেছে এ জীবন পরিক্রমায়, ফুল ও কাঁটা, দামী ও সস্তা, বড়ো ও তুচ্ছ জিনিস, ভালো ও মন্দ, কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর সব কিছুই সে তার সাথে নিয়ে যাবে। যা কিছু আজকে সে আনবে তারই সে মালিক হবে– তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, তার যাত্রা সেই দিকে যেখান থেকে সে রওয়ানা হয়েছিলো এবং সেখানেই একদিন সে পৌছে যাবে। সূরাটি অধ্যয়ন কালে এই কথাগুলোই আমরা বার বার জানতে পারছি! এখানে এই সূরার বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারাটা পৃথিবী ভর্তি হয়ে আছে নানা প্রকার জিনিসে ও মানুষে। আগে কোথায় ছিলো এসব বস্তু ? বিশেষ করে এই মানুষগুলো কোথায় ছিলো! এসব মানুষই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে, তাদের একদিন যাত্রা বিরতি ঘটবে। অবশেষে তাদের রওয়ানা হওয়ার সেই প্রথম স্থানে যখন তারা পৌছে যাবে, তখন প্রত্যেকের আমল তার দাঁড়িপাল্লার সামনে রাখা হবে, তখন সে ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে। কেউ কাউকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না! প্রত্যেকের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা হবে এবং যার প্রতিদান সেই পেয়ে যাবে।

সূরাটির মধ্যে আর এক শ্রেণীর মানুষের সংবাদ দেয়া হয়েছে– এরা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু কাছাকাছি পৌছুতেই, জান্নাতের দরজা এদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে– এরা আসলে পৃথিবীর বুকেও ছিলো এমনি। এদের সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু ও অভিভাবক বলে গ্রহণ করছিলো, অথচ তারা মনে করছিলো যে, তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

এখানে প্রতিনিয়ত সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে সংগ্রাম চালু রয়েছে, এ সংগ্রাম অব্যাহত আছে হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে, এ সংগ্রাম নবী-রসূলের দল এবং সম্মানিত মোমেন দলের সাথে অহংকারীর দল ও সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞানকারীদের সংগ্রাম। এ দ্বন্দ্ব একবার হয়েই শেষ হয়ে যায় না, বরং বরাবর এ সংঘাত সংঘর্ষ চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। এসব যুদ্ধের ফলাফলও একই রকমের। এসব সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ঈমানের পাতা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর কুশ্রী কদাকার হয়ে ওঠে মিথ্যার পাতা। এ বিষয়টিকে আলোচ্য প্রসংগ তুলে ধরেছে যেন এর থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং অন্যায়কারী ও অহংকারী না-ফরমানের দল সতর্ক হতে পারে। পবিত্র এসব স্মৃতি সূরার মধ্যে এক বিশেষ ধারায় পেশ করা হয়েছে। তারপর একটি স্তর পার হওয়ার পর দেখা যায় নতুন আর এক সংঘর্ষ এগিয়ে আসে। সেখানেও অবশেষে সত্যেরই বিজয় হয়। সমগ্র সূরা জুড়ে এইভাবেই চলতে থাকে এসব বিবরণধারা।

মানবজীবনের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনী একটি নির্দিষ্ট ধারায় এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে মানব ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আল্লাহ যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ফুটে উঠেছে। তারপর এও দেখানো হয়েছে যে, কেমন করে সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই হচ্ছে এ সূরার মধ্যে বর্ণিত আর একটি দিক যা সূরায়ে আন্‌য়ামে বর্ণিত হয়নি। যদিও দেখা যায় মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত দল এবং মিথ্যা ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টারত দলের চেহারা তুলে ধরা এবং কেয়ামত ও সৃষ্টিকুলের গতি-প্রকৃতির বর্ণনা করার ব্যাপারে দুটি সূরা একই প্রকারের ভূমিকা পালন করেছে। দুটি সূরার বর্ণনাভংগি এতোটা ভিন্ন যে, পাশাপাশি পাঠ করলে এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুটি সূরার কথাগুলোকে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করলেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়ের সাথে সংগতি রেখেই তার ব্যাখ্যা আসে। প্রসংগক্রমে এখানে বলা দরকার যে, সূরায়ে আনয়ামে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে দফায় দফায়, যেমন করে একটি ঢেউ শেষ হতে না হতে আর একটি ঢেউ বালিয়াড়ির ওপরে আছড়ে পড়ে। আর এ সময়ে দৃশ্যপটে যে ছবিগুলো ভেসে ওঠে তা থাকে কম্পমান, সমুজ্জ্বল এবং হৃদয় আকর্ষণকারী। কিন্তু আ'রাফের বর্ণনা এইভাবে আবেগ সৃষ্টি করার পরিবর্তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। ঘটনাগুলো পেশ করে সহজভাবে তাকে বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার আহব্বান জানায়। এ যেন বিশাল এক কাফেলার সুদীর্ঘ সফরের শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা, যদিও তা প্রতি মনযিলে নব নব রূপে সামনে এসে হাযির হয় এবং সফরের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বৈচিত্র নিত্য নতুন আকারে আসতেই থাকে। তবে মানবজাতিকে যে সব পথে চললে এবং যে সব কাজ করলে শাস্তির ভয় দেখানো

www.pathagar.com

হয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক না হলে তাদের ভাগ্যে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে যা তাদেরকে ওলট-পালট করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেয়। অহংকারী ও না-ফরমান যাত্রীদের কপালে এমন ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। সূরা দুটির মধ্যে বড়ো ও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হচ্ছে– সূরা দুটির উভয়ই মক্কায় অবতীর্ণ।

সম্ভবত এ পর্যায়ে সূরাটির বাস্তব কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে নিলে সূরাটির মধ্যে আলোচিত আকিদার বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে, আর এ মহান আকিদা মানুষের ইতিহাসের স্রোতধারায় কি পরিবর্তন এনেছে তাও হৃদয়ংগম করা সহজ হবে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, মানবজাতির ইতিহাসে এই আকিদার কাহিনীটি কি কি পরিবর্তন সাধন করেছে, প্রধানত সূরাটি সে কথা পেশ করেনি এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মানুষকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে সে বিষয়েও তেমন কোনো কিছু জানায়নি। শুধু জানিয়েছে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত কিছু ঘটনাবলী, তাও অনেকটা কেসসা বর্ণনার পদ্ধতিতে। জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষের কথা এই সূরা দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে। এরপর সূরাটির বিভিন্ন দৃশ্য ও গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত দৃশ্য ও পদক্ষেপের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ওই সব মানুষের কাছে যারা সরাসরি আল কোরআনের আহ্বান পাচ্ছিলো। কোরআনুল করীম তাদের সামনে অতীতের ওইসব কাহিনীই তুলে ধরছে– যার বর্ণনা মনের গভীর রেখাপাত করে। তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছে যে, তারা যে মত ও পথের ওপর রয়েছে তা পরিত্যাগ না করলে তাদের সাথে রসূল ও তাঁর সংগী-সাথীদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এ সংঘর্ষ শেষে তাদের ওপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসবে। জানানো হচ্ছে যে, এ শাস্তির মধ্যে অবশ্যই তাদেরকে একদিন পড়তে হবে যাদেরকে আল কোরআন সত্যের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে এবং যারা এ আহ্বানকে জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের সত্যবিরোধিতার কারণে মানবজীবন শেষে সীমাহীন পরকালীন জীবনে এ শাস্তি তাদের ওপর নেমে আসবে। তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ঘটনার মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে কোনো মিথ্যাকে দূরীভূত করা। সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ার কাজের জন্যেই ইসলামের এই আন্দোলন। শুধু দর্শন ও চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটানোর জন্যেই ইসলামের আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি, অথবা কোনো ঘটনা বর্ণনা করা কিংবা শুধু শুধু গল্প বলার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়নি বা কোনো সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেও তা বলা হয়নি!

অতীতের না-ফরমান জাতিসমূহের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব গযব নেমে এসেছিলো আল কোরআনে তার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো সদ্বিৎসুদের উপদেশ দান এবং হঠকারী জাহেল ও ক্ষমতাগর্বী ইসলাম দুশমনদের সতর্ক করা। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আল কোরআনের এসব ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে। ঘটনার

www.pathagar.com

আলোকে আন্দোলনের সূচনা-বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন কথা বলা হয়েছে তেমনি কথা বলা হয়েছে পরিসমাপ্তি বা পরিণতিকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের এসব পাতা জুড়ে রয়েছে নূহ-জাতি, হূদ জাতি, সালেহ জাতি, লূত জাতি ও শোয়ায়ব জাতির কেসসাসমূহ। এসব জাতির মধ্যে মূসা (আ.)-এর জাতির ঘটনাটি এসেছে সবচেয়ে বিষদভাবে।

শুরুতেই আমরা এমন কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই যেগুলোকে কেন্দ্র করে মহা গ্রন্থ আল কোরআন নাযিল হয়েছে। দেখুন কেমন করে সূরাটি শুরু হচ্ছে,

'আলিফ লা-ম মী-ম সোয়াদ। এ হচ্ছে একটি কেতাব যা তোমার কাছে নাযিল করা হলো, অতএব এর প্রচারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা যেন না থাকে। .....আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না। আসলে তোমরা খুব কমই তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।' (আয়াত ১-৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমেই সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-কে এবং তাঁর সেই সাথীদেরকে যারা অন্যদের বিরুদ্ধে এই কোরআনের সাহায্যেই জেহাদ করে চলেছেন। এরপর এখানে মহাকাল ধরে মানুষের সফরের বর্ণনা এসেছে, এসেছে সুনির্দিষ্ট এই সফর শেষে তার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। সৃষ্টির বুকে বিরাজমান দৃশ্য এবং কেয়ামতের দিনে যে অবস্থা হবে তাও তাকে জানানো হয়েছে। এসব কিছুর সম্বোধন কখনও কখনও নবী (স.)-কে পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। সূরাটির এই ছোট্ট শুরুর আয়াতটিতে যেমনটি দেখা গেছে রসূলুল্লাহ (স.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহর ঘোষণা। 'এ হচ্ছে একটি কিতাব– যা তোমার কাছে নাযেল করা হলো, সুতরাং এর প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে।'

এ ছোট্ট আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি অবস্থার ছবি এঁকেছেন যা আজকের সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা খুবই মুশকিল। তবে সে ঠিকই বুঝতে পারবে, যে অনুরূপ কোনো জাহেলী সমাজে বসবাস করছে এবং সে ওই জাহেলী সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারবে যে, কতো বড়ো কঠিন ও ভয়ানক কথা সে উচ্চারণ করছে এবং যে কঠিন কাজ তার সামনে রয়েছে তা কি।

তার লক্ষ্য হচ্ছে, ওদের মধ্যে এক মহান বিশ্বাসের ইমারত গড়ে তোলা। তাদের জন্যে জীবনের নতুন মূল্যবোধ ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের সমাজ সভ্যতার আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন জীবনের সূচনা করা, সাথে সাথে তাদের অন্তরে বিরাজমান জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট ভাবধারাকে সমূলে ঝেঁটিয়ে বের করে দেয়া, তাদের জীবনে জাহেলিয়াতের যে মূল্যবোধ বাসা বেঁধে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে মুছে ফেলা। তাদের অংগ প্রত্যংগ ও ধমনী থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূর করে দিয়ে সর্বত্র ইসলামের ভাবধারা চালু করাই ছিলো মূলত সকল নবী রসূলের লক্ষ্য। তৎকালীন সমাজ যেহেতু এক বিশেষ ভাব ধারায় গড়ে উঠেছিলো তাই প্রথম প্রথম

www.pathagar.com

তাদের কাছে নতুন এ জীবনধারা কঠিন মনে হচ্ছিলো। বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা নিয়মনীতি পরিত্যাগ করা তাদের কাছে খুবই কঠিন লাগছিলো। অপরদিকে নবী রসূলদের আনীত ব্যবস্থা সমাজের আংশিক সংস্কার সাধন করেই তৃপ্ত ছিলো না। তাদের কাজ ছিলো মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করে সর্বকালে নবী রসূলরা সামগ্রিক বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছেন এবং জীবনের সর্বত্র আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্যে তারা আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবখানে চেয়েছেন তারা আল্লাহর বিধান চালু করতে, যেন সাধারণ মানুষ ইনসাফ পায় এবং দুর্বলরা সবলের দ্বারা শোষিত না হয়। মানব রচিত আইন কানুন যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে তাই সবার স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তাঁর বান্দাদের সেসব স্বার্থপর শ্রেণীর হাতে নিষ্পেষিত হতে দিতে পারেন না, আর এই কারণেই নবী রসূলরা আল্লাহর বিধান চালু করার উদ্দেশ্যে আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। এ ব্যাপারে কারো অনীহা, অসহযোগিতা, বিরোধিতা বা আক্রমণাত্মক ভূমিকার কোনো পরওয়াই তাঁরা করেননি। এমনকি বাস্তব যুদ্ধ করতেও তাঁরা পিছপা হননি।

যেহেতু প্রতি যুগেই আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে, মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে এ আকীদা বিশ্বাসের ধারক বাহকদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে– এজন্যে সত্যের পতাকাবাহী নবী ও তাঁর সংগীসাথীরা, সংখ্যা ও সরঞ্জামে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর এই সাক্ষাত সমরের শেষ পরিণতিতে চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে সর্বকালে সত্যের পতাকাবাহীদেরই। আল্লাহর রহমতে তারাই হয়েছেন বিজয়ী। এই সকল তথ্যের ধারা বিবরণী পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠেছে আলোচ্য সূরার মধ্যে। দেখুন, কী চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে অতীতের ঘটনাপঞ্জীকে–

'কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ..... ওরাই হচ্ছে তারা, যারা আমার আয়াতগুলোর সাথে যুলুম করার কারণে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' (আয়াত ৪-৯)

এই ভূমিকার পর মূল কাহিনী শুরু হচ্ছে–

এতে বলা হয়েছে পৃথিবীর বুকে মানবজাতির বসবাস কেমন করে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয়েছিলো এইভাবে যে, মানবজাতির বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন সকল দ্রব্য-সামগ্রী, উপায়-উপকরণ, প্রয়োজনীয় খাদ্য খাবার। পৃথিবীর গোটা পরিবেশ ও আবহাওয়াকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। মানব-প্রকৃতির মধ্যে দান করেছেন সেই সব জ্ঞান ও উপাদান, যার দ্বারা সে বুঝে নিতে পারে পৃথিবীর সব কিছু থেকে কোন্‌টাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কি কি খাদ্য সে গ্রহণ করবে

www.pathagar.com

এবং কিভাবেই বা তা উৎপাদন করবে– এসব জ্ঞান আল্লাহ তায়ালাই তাকে দিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে তাকে আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থও দিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন–

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছি এবং তোমাদের জন্যে সেখানে জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন উপায় বানিয়ে দিয়েছি, তোমরা খুব কমই শোকর করো।'

একথাগুলো মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ 'প্রথম সৃষ্টির বিষয়'টি বর্ণনার পূর্বে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপই পেশ করা হয়েছে। আর মানুষের জীবনযাত্রার সূচনা যে বিন্দু থেকে সুপরিকল্পিতভাবে শুরু হলো, বর্তমান এই সূরার মধ্যে সেই প্রসংগেই মূলত বর্ণনাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির ঘটনাকেই পেশ করা হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তাকে সঠিক পথে চলার জন্যে উপদেশ দান করা।

তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দান করেছি, ... । এখানেই তোমরা বেঁচে থাকবে, মৃত্যুও বরণ করবে এখানে, আর এর থেকেই তোমাদেরকে (রোজ হাশরে) বের করা হবে।' (আয়াত ১১-২৫)

এখানে মানবজাতির পথপরিক্রমার বিবরণের মধ্যে যে সব দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে এ দীর্ঘ যাত্রার চমৎকারিত্ব এবং সর্বপ্রকার বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। আর এ বর্ণনাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তাকে বরাবরই এক মহা সংঘর্ষের মোকাবেলা করেই জীবন সাগর পাড়ি দিতে হবে ... জীবনের দীর্ঘ এ সফরের কোনো পর্যায়েই এ সংঘর্ষ স্তিমিত হবে না। সকল আদম সন্তানকেই শয়তানের সাথে বরাবর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে।

এই আলোচনা প্রসংগে মানুষের শান্তির যে পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিবারে গযব নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, পরকালে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং যথাযথভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে সেই মরদূদ জেদী শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে।

এরপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছে। এই জেদী ও অহংকারী শয়তান কিভাবে মানবমন্ডলীর আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বিভ্রান্ত করেছিলো তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আর বর্ণনার মধ্যে দেখা যায় মানবজাতির আদি পিতামাতার সাথে শয়তান কেমনভাবে মুখোমুখি হয়েছে। আর এ মোকাবেলার ফলেই মানুষ সৃষ্টির প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলো। তাই আদমসন্তানকে ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাদেরকে অবশেষে সেখানেই ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তারা এসেছে। 'হে আদম সন্তানেরা, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে এমন পোশাক পাঠিয়েছি, যা..... (আয়াত ২৬-২৭, ৩৫-৩৬)

www.pathagar.com

আমাদেরকে অবশ্যই একটু খেয়াল করে ওই ঘটনার দিকে তাকাতে হবে যখন আমাদের পিতা মাতা নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর বিবস্ত্র হয়ে গেলেন এবং তারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে লতা-পাতা ব্যবহার করতে লাগলেন। তারপর তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে নেমে এলো ভয়ানক এক তিরস্কারবাণী। স্মরণ করানো হলো তাদেরকে পোশাক রূপী আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে, যা তাঁদের লজ্জাস্থান ঢাকার সাথে সাথে সৌন্দর্যবর্ধক হিসাবেও দেয়া হয়েছিলো। আরো খেয়াল করতে হবে শয়তানের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার হুঁশিয়ারীর কথা, যা তৎকালীন মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদেরও লজ্জা ঢাকার পোশাক ও সৌন্দর্যের জিনিসগুলো মরদূদ শয়তান তেমনি করে খুলে দিয়ে তাদেরকে লজ্জা ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে– যেমন করে তাদের বাপ মায়ের সাথে তারা করেছিলো। এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে। আমাদের দেখা দরকার যে, আদম-হাওয়ার এই ঘটনাটিকে তৎকালীন জাহেল আরবের মোশরেক সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা প্রাচীন কালের আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম নীতি অন্ধভাবে মানতে গিয়ে উলংগ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতো। হজ্জের সময় তারা বেশ কিছু খাদ্য খাবার ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক নিজেদের জন্যে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিলো এবং তারা বিশ্বাসও করতো যে, এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত ব্যবস্থা। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানবসৃষ্টির সূচনালগ্নে বিবস্ত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে যে লজ্জা ও অপ্রস্তুত হওয়ার অনুভূতি জেগেছিলো এবং মানবতার স্বাভাবিক দাবী হিসাবে তাদের মধ্যে নিজেদেরকে আবৃত করার যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিলো, তাকে সামনে রেখে জাহেল আরব সমাজ তথা গোটা মানবমন্ডলীকে জানানো হচ্ছে, লজ্জাস্থান ঢাকা ও সৌন্দর্যের জন্যে পোশাক ব্যবহার মানুষের প্রকৃতির ধর্ম। কাজেই প্রকৃতির এ স্বাভাবিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করাটাই জাহেলিয়াত তথা মূর্খতা নয়? এবং উলংগতা ও শরীর খোলা রাখার অর্থই কি লজ্জাহীনতা এবং আল্লাহভীতির অভাব নয়? আর এই ঘটনাটি আল কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে চিন্তা করার জন্যে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, আল কোরআনের মধ্যে যতো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এবং যতো ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই ঘটনার আলোকে মানুষ যেন বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষা নিতে পারে। যতোবারই এ ঘটনার উল্লেখ এসেছে ততোবারই নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ এসেছে।

এই বিষয় সম্পর্কে সূরায়ে আনয়ামের ৭ম রুকুর তাফসীরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে খুবই গুরুত্বের সাথে যে মূলনীতিটি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে, কোরআনুল করীমে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যার বাস্তব প্রয়োগ নাই। নিছক জ্ঞান গরিমার ঘর অথবা তথ্যের ভান্ডার হয়ে থাকাই আল কোরআনের কাজ প্রকৃতি নয়।

www.pathagar.com

মানবজাতির কাফেলা তার যাত্রাপথে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আদম (আ.) ও তার স্ত্রী তাদের দুইজনের প্রথম ভুল কাজ করার যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। আবার এখন পেছনের ঘটনাগুলো সামনে টেনে আনলে শেষ বিচারের দিনের ছবির দৃশ্য দ্রুতগতিতে সামনে ভেসে ওঠে। মহা এ সফর শেষে আগত শেষ বিচারের যে ভয়ংকর দৃশ্যের সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হবে তার কঠিন ছবি আমাদেরকে বিচলিত করে। পবিত্র কোরআনে বিধৃত এ বর্ণনা একাধারে দুনিয়ার জীবনের এ পরীক্ষা গৃহের খবর দেয় এবং এ জীবনের খেলা শেষে প্রতিদান ও প্রতিফল দিবসের কথাও জানায়। কালামে পাকের মধ্যে এমন চমৎকারভাবে এ দুটি জীবনের মেয়াদের বর্ণনা পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে যে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে যে কোনো ব্যক্তির মনে হবে এ দুটি জীবন একটি অপরটির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত এবং দুটি জীবন মিলে গঠিত হয়েছে অবিচ্ছেদ্য এক মহা জীবন।

এই পর্যায়ে এসে আমরা কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্যে সব থেকে কঠিন দৃশ্য দেখতে পাই। সেখানকার নানা দৃশ্য মনের পর্দায় জাগিয়ে তোলে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সূরাটির মধ্যে আদম (আ.)-এর কাহিনী এবং শয়তানের ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া ও জান্নাত থেকে তার ও তার স্ত্রীর বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে, ওই ভয়ানক শয়তান তাদেরকে সেইভাবেই ধোকা দিতে থাকবে যেমন করে জান্নাত থেকে তাদের বাপ মাকে সে ধোকা দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছিলো। আরো জানানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলরা আল্লাহর বাণী নিয়ে আসবেন। এ ক্ষেত্রে এটাও জানানো হয়েছে যে, মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে গিয়ে তেমনি বিভ্রান্ত হতে থাকবে যেমন করে তাদের বাপ মা বিভ্রান্ত হয়েছিলো। এইভাবে তারা প্রমাণ করবে যে, তারা লোভের বশবর্তী হয়ে ধোকা খাওয়া বাপ মায়েরই সন্তান, অতএব তাদের বিভ্রান্তিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। এখন যারা জেনে বুঝে শয়তানের আনুগত্য করবে, তারা নিজেরাই তাদের জান্নাতে ফিরে যাওয়াকে নিজেদের জন্যে অসম্ভব করে তুলবে। আদি পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে আনার পর তাদের সন্তানরা পুনরায় সেখানে প্রবেশ করুক তা শয়তান কখনও চায় না– চাইতে পারে না। তবে যারা শয়তানের সকল কারসাজির বিরোধিতা করবে এবং সকল কাজে, কথায় ও ব্যবহারে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে, তারা পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করবে কেননা এটাই তো তাদের আদি নিবাস। তাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর এই অনুগত বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন, 'তোমরা যে সব (ভালো) কাজ করতে থেকেছ, তারই পুরস্কার স্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হবে।'

যে প্রসংগে এসব দৃশ্যের বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মানুষকে তার অনন্ত জীবনের সুমহান আনন্দ লাভের সুযোগ দান করা। সুদীর্ঘ এক পথ পরিক্রমার পর মানুষ এ সুযোগ পাবে। এ পথে চলার সময় তাকে বেশ কিছু কষ্ট করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে

www.pathagar.com

এবং বেশ কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে হবে। এসব কিছুর বিনিময়েই সে আশা করতে পারে অনন্ত জীবনের শান্তি, আর উপস্থিত এ সব দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে যে রাযি নয়, বরং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে নগদ পেতে চায়, অনন্ত জীবনের শান্তি পাওয়ার অধিকার তার নেই। এই সব বিষয়ে তাকে জানানো হচ্ছে যে, চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির আকাংখী যে নয়, তার জন্যে চিরস্থায়ী দুঃখ ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরাই হচ্ছে ওই সম্প্রদায়ের লোক, যারা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের কথাগুলোকে মিথ্যা বলে দাবী করে আর এ কেতাবের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তারা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা বা ঘটনা দেখানোর দাবী করে। এ ধরনের হঠকারী ব্যক্তিরা কোরআনের ভাষা ও বক্তব্য যে মানবীয় রচনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বরং তা উর্দ্ধজগত থেকেই আগত তা বুঝা সত্তেও নিছক ব্যক্তি স্বার্থের কারণে ও নেতৃত্বের লোভে তারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে চলেছে। অতএব, এ কদর্য ব্যবহারের পরিণতি ভীষণ শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি তাদের কাছে যে কিতাব পাঠিয়েছি, তাকে আমি বিস্তারিত জ্ঞানের ভান্ডার হিসাবেই তাদের সামনে পেশ করেছি.....আর যে সব মনগড়া কথা তারা বানিয়ে বানিয়ে বলছে, সেসব কথা অবশ্যই একদিন ভুল প্রমাণিত হবে।' (আয়াত ৫২-৫৩)

আর এই দীর্ঘ সফর অর্থাৎ, সৃষ্টির সূচনা থেকে তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে সফর, সেই সফরের পর রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট পরবর্তী অবস্থা। এখানেই উলুহিয়্যাতের তাৎপর্য বুঝা যায় এবং সৃষ্টির সকল দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিরাজমান রবুবিয়্যাতেরও প্রকৃত অর্থ এখানে ফুটে ওঠে। আল কোরআনের নিয়মানুযায়ী এ সব সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তার জ্ঞানের চোখ খুলে দেয়। সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যময় বস্তুগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আহবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে মহান স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনা। বস্তুতপক্ষে যারাই সৃষ্টির রহস্যের দিকে খেয়াল করে তাকায় এবং চিন্তা করে, তাদের মধ্যে এসব কিছুর স্রষ্টার প্রতি এমনিই আনুগত্যবোধ জাগে। তার মন বলে ওঠে, নিরংকুশ দাসত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। এমন দ্বিধাহীন দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী আর কেউই হতে পারেনা। তিনিই সবার প্রতিপালক এবং তিনিই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার একক ক্ষমতাধারী। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর ইচ্ছা ও কথাই আইন। তাই বিশ্বের কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জোটের কথা বা মত আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। সৃষ্টি যার, আইন তাঁর। আর তিনিই সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, মনিব ও বাদশাহ। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ....সেই জনপদের জন্যে, যারা শোকরগুজারি করে। *(আয়াত ৫৪-৫৮)*

www.pathagar.com

আবারও আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে এবং বিশেষ এক কাহিনীর বর্ণনাও এখানে পেশ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে মহান ঈমানের জয়গান প্রকাশিত হচ্ছে। ভুল পথে চালিত মানবমন্ডলীর পরিণতির কথা তাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেয়া হচ্ছে এবং তাদের নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনের জায়গা সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। অপরদিকে পথভ্রষ্ট মানুষ অহংকারের কারণে কল্যাণের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তারা সত্যের প্রতি দাওয়াত দানকারীর ওপর যুলুম করে। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যাবাদী জ্ঞানে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। এরপর আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পাকড়াও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট। আকিদার ভ্রান্তির কারণে তাদের জাতির সাধারণ লোকেরা তাদেরকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এমতাবস্থায় সত্যাশ্রয়ীরা একমাত্র আল্লাহকেই গ্রহণ করে ও তাঁর কাছেই সব কিছুর জন্যে প্রার্থনা করে।

এরপর নূহ (আ.)-এর কাহিনীর প্রসংগ আসছে, আসছে একের পর এক হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনাবলী। সংগে সংগে তাদের প্রত্যেকের জাতির ভূমিকাসমূহও পেশ করা হচ্ছে। সকল নবী রসূল একই দাওয়াত ও কর্মধারা নিয়ে এসেছেন, যার কোনো পরিবর্তন নেই। তাদের দাওয়াতকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে,

'হে আমার জাতি, দ্বিধাহীন চিত্তে তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি ছাড়া সর্বময় মালিক, মনিব ও শাসনকর্তা আর কেউ নেই।'

তাদের জাতি একটি কথাতেই তাদের বিরোধিতা করেছে আর তা হচ্ছে, 'প্রভুত্ব, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং সর্বময় মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানুষের ওপর মানুষের হুকুম চালানোর কোনো অধিকার নেই'– এটা কি করে মেনে নেয়া যায় ? একইভাবে, রেসালাত মানুষের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তির ওপর আসবে এতেও ছিলো তাদের ঘোরতর আপত্তি। তাদের মধ্যে এ বিষয়েও অনেকের আপত্তি ছিলো যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহরই বিধান মানতে হবে। তারা মনে করতো পার্থিব কাজ কর্ম পরিচালনার এখতিয়ার তাদের নিজেদের, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবসা বাণিজ্য চালাবে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে– এসব বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার হাত থাকা– এতো সব কি করে মেনে নেয়া যায়! বিংশ শতাব্দির আধুনিক জাহেলী যুগের বহু মানুষও ওই একইভাবে চিন্তা করতে শুরু করছে এবং প্রাচীনকালের এই মূর্খতাপূর্ণ দাবীকে আজকের সমাজে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ওরা সব কিছুর ওপর আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানার বিশ্বাসকে বলে সেকেলে মনোভাব।

এরপর প্রত্যেক নবীর ইতিবৃত্তের বর্ণনা শেষে তাদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেক নবীর কাহিনীতেই দেখা যায়, একই কথা এবং একই আহবান,

'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করো, তোমাদের জন্যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।'

www.pathagar.com

প্রত্যেক নবীই তাদের কাছে সেই সত্যকে পেশ করেছেন, যা তাদের রব পেশ করতে বলেছেন। সকল নবী তাদের সময়কার জনগণের দুর্ব্যবহার ও সত্য জীবনব্যবস্থা থেকে গাফেল থাকার পরিণতি দেখতে পাচ্ছিলেন, যার জন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির জন্যে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আফসোস, ওই সকল অপরিণামদর্শী জাতি তাদের কাজ ও ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করতো না। আর আল্লাহর রসূল যে হৃদয়াবেগ নিয়ে তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌছাচ্ছিলেন, তা কিছুতেই তারা বুঝার চেষ্টা করছিলো না। তাদের কাছে চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির চেয়ে এই ক্ষুদ্র জীবনের নগদ সুবিধাদির গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশী। তারা সেই চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝতেও চায়নি।

নূহ (আ.)-এর কাহিনীই হচ্ছে এ পর্যায়ের প্রথম কাহিনী। এটা উপরোক্ত কথার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মধ্যে শোয়ায়েব (আ.)-এর ঘটনাকে এ প্রসংগে শেষ শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির কাছে.....আর আমি অথৈ পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি তাদেরকে, যারা আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।' (আয়াত ৫৯-৬৪)

'(আরো পাঠিয়েছি) মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে। সে বললো, হে আমার জাতি, আনুগত্য করো একমাত্র আল্লাহর, তোমাদের জন্যে অন্য কোনো প্রভু নেই, মনিব ও বাদশাহ একমাত্র তিনি ছাড়া.....অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বার্তাসমূহ পৌছে দিয়েছি..... সুতরাং (সত্যকে) অস্বীকারকারী জাতির জন্যে কেমন করে আমি আফসোস করবো?' (আয়াত-৮৫-৯২)

এই দুটি জাতির উদাহরণ দ্বারা সূরার মধ্যে বিবৃত বাকী কাহিনীর দৃষ্টান্তগুলো বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য কাহিনীগুলো এই দৃষ্টান্তমূলক দুটি কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা কখনও এসেছে একমাত্র সেই মৌলিক আকিদার যথার্থতা পেশ করার জন্যে যা আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের প্রত্যেক জাতির জন্যে তাঁর বার্তা বহনকারী হিসাবে তাঁর রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন, অথবা চেয়েছেন এর দ্বারা দুনিয়ার অহংকারী নেতৃবৃন্দের সাথে নানা প্রকার দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও হয়ে থাকা এই সত্যের অনুসারীদের মধ্যে সাক্ষাত ও সংযোগ স্থাপিত হোক, অথবা তিনি চেয়েছেন এই আকীদাকে রসূলরা বা তাদের অনুসারীদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতে, অথবা তিনি চেয়েছেন যেন তাদের নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তারা যথাযথ সদুপদেশ দিক ও উৎসাহ দান করুক। এরপর আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, তাদের সত্য বিরোধিতা ও অন্যায়ের ওপর যেদ করে টিকে থাকার মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের সাথে মুসলমানদের সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক এবং পরিশেষে তাদেরকে পাকড়াও করা হোক। মূলত এই ছিলো তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়ার চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়। মিথ্যার ওপর যেদ ধরে টিকে থাকার এটিই হচ্ছে যথার্থ

www.pathagar.com

পরিণতি। এরপর এখানে আলোচনার প্রসংগকে একটি ভিন্ন মোড় দেয়ার জন্যে একটু বিরতি দেয়া হচ্ছে, যাতে করে এ বিরতিতে ওদের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির দৃশ্যটি ওরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এইভাবে মানুষের সাথে তাঁর নির্ধারিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম জানিয়ে দিচ্ছেন। যখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তখন প্রথমে তিনি তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি, আপদ বিপদ, দুঃখ দৈন্য ও মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করে দেন, যাতে এসব প্রতিকূল অবস্থা তাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু এসব দুঃখ দৈন্য যখন তাদের মনে কোনো প্রকার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না, তখন তাদেরকে তিনি ঢিল দিয়ে দেন। এটা যে কোনো বিপদাপদ থেকে আরো বড়ো পরীক্ষা। অতপর তাদের ওপর আল্লাহর বিধান অনুসারে আরো ব্যাপক কষ্ট নেমে আসে । কিন্তু এতেও যখন তারা সাবধান হয় না, তখন হঠাৎ করে একদিন তাদের প্রতি সর্বাত্মক আযাব এমন ভাবে নেমে আসে যে, তারা বুঝতে পারে না কিসে কী হচ্ছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি বিধানের এ নিয়ম বর্ণনা করার পর সেই ভীষণ বিপদের বর্ণনা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে, যা তাদেরকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। সুতরাং এখন তাদেরকে কে বুঝাবে যে, আল্লাহর শাস্তি, তাঁর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাদের ওপর নাযিল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? সর্বাত্মক ধ্বংস কি তাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, যখন তারা ঘুমিয়ে আছে? দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর ভাষ্য–

'আমি যখন কোনো অঞ্চলে কোনো নবী পাঠিয়েছি ..... আমি তো ওদের অধিকাংশকেই মহা-অপরাধী হিসেবে পেয়েছি।' (আয়াত ৯৪-১০২)

এরপর আসছে মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউন ও তার সভাসদদের তর্ক বিতর্কের বিবরণী, তাঁর সাথে ছিলো বনী ইসরাঈল জাতি। এ কাহিনী আল কোরআনের অনেক সূরার মধ্যেই আলোচিত হয়েছে এবং কোরআনের সব থেকে বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে। এখানে তার প্রধান কয়েকটা দিক তুলে ধরা হচ্ছে। কয়েকটি দিকের মধ্যে ওদের শাস্তির বর্ণনা এসেছে, যেমন সূরার শেষের দিকে দীর্ঘ একটি স্থান জুড়ে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনা দেখা যায়।

সূরা আল মোযযাম্মেল, আল ফাজর, ক্বাফ, আল কামার ইত্যাদি সূরাগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মূসা (আ.) ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা এসেছে। ওই সমস্ত স্থানের বিবরণগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ইংগিত দানকারী। এসব বর্ণনার পর এটিই প্রথম সূরা, যার মধ্যে দীর্ঘ স্থান জুড়ে মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পর দেখা যায়, এসব বর্ণনার মধ্যে ফেরাউনের যে প্রসংগ এসেছে তাতে তার আকিদা বিশ্বাসের মৌলিক অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তার ও তার জাদুকরদের সীমাবদ্ধতাকে। এ দুটি বিষয় অন্যান্য আরো বহু সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। ফেরাউনের বংশের লোকদের ওপর উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষ ও

www.pathagar.com

বিপদাপদ নেমে আসে, নেমে আসে ঝড় তুফান, পংগপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্তের আযাব। এসব আযাবের বিস্তারিত বিবরণ এই সূরা ছাড়া অন্য কোনো সূরাতে আসেনি। বর্ণনা এসেছে এই সূরার মধ্যে ফেরাউন ও তার সভাসদসহ তার জাতির লোকদের সম্পর্কে।

এরপর বনী ইসরাঈল জাতির কার্যকলাপের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে মূসা (আ.)-এর কাছে তাদের জন্যে মূর্তি বানিয়ে দেয়ার দাবীর কথা, আর তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উত্থাপিত হয় তখন, যখন তারা ফেরাউনের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে। নীল নদ পার হয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিলো। এ সূরাতে ওই অধ্যায়ের বর্ণনাও এসেছে যার মধ্যে আল্লাহ পাকের সাথে মূসা (আ.)-এর সরাসরি বাক্যালাপের একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে এবং মূসা (আ.) আল্লাহকে নিজ চোখে দেখার জন্যে আব্দার করে বসেন। অতপর পর্বত বিস্ফোরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে, মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে যান এবং সম্বিত ফিরে পেলে তাঁর কাছে অবতরণ করা হয় আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্বলিত ফলকসমূহ।

সূরাটিতে আরো যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মূসার অনুপস্থিতিতে তাঁর জাতির বাছুর পূজা করার ঘটনা। মূসা (আ.) জাতির মধ্য থেকে বাছাই করা সত্তর জনের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং এবং তাদের আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার দাবী ও তাদের ওপর বজ্রধ্বনি নেমে আসার ঘটনা। বনী ইসরাঈল জাতিকে নিকটবর্তী এক এলাকায় প্রবেশ করতে বলা হলে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শনিবারে মাছ শিকার সম্পর্কিত ঘটনা এবং তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরার ঘটনা। এ সূরার মধ্যেই এসব ঘটনার বিস্তারিত এবং পূর্ণাংগ বিবরণ পেশ করা হয়েছে যা অন্য কোনো সূরাতে তেমন পাওয়া যায় না।

এ সূরার মধ্যে যতোগুলো ঘটনার বিবরণ এসেছে সেগুলো সবই শেষ নবী (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে ইংগিত বহন করে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রকৃতি কেমন হবে এবং কী হবে তার শিক্ষা সে সব কিছুই ওই ঘটনাবলীর বিবরণে ফুটে উঠেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমার বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ে হাযির হওয়ার জন্যে মূসা সত্তর জন লোককে বাছাই করলো..... তারাই সফলকাম।' (আযাত ১৫৫-১৫৭)

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই সত্যও মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিত্তিতে এবং নিরক্ষর নবীর সাথে করা সাবেক ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি রেসালাতের কথা প্রকাশ্য ঘোষণা দান করেন, জানিয়ে দেন মানুষকে তাঁর দাওয়াতের মূল কথাগুলো। তাঁর প্রকৃত রব সম্পর্কে জানিয়ে দেন, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যেন বলিষ্ঠভাবে সবাইকে বলে দেন সেই তাওহীদ সম্পর্কে যা নিয়ে এর পূর্বে অন্যান্য সকল নবী-রসূলের আগমন ঘটেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে রসূল), হে মানবমন্ডলী, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহর রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহ।.....

www.pathagar.com

তোমরা নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি (নিজে) আল্লাহ ও তাঁর সকল নিদর্শনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাঁর অনুসরণ করো, হয়তো তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।'

তারপর একটু বিরতি দেয়ার পর কাহিনী নিজ গতিতে আবার চলতে শুরু করলো। এই সময় আল্লাহ তায়ালা আবার বান্দার সাথে প্রদত্ত তাঁর ওয়াদার দিকে পুনরায় ফিরে এলেন। ফিরে এলেন সেই পাহাড়ের বুকে প্রচন্ড বেগে আন্দোলিত হওয়ার ঘটনা এবং তাঁর ওয়াদা গ্রহণের দিকে। বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবমন্ডলীর স্বভাবপ্রকৃতির কাছে সে কথা স্মরণ করাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন ..... তুমি কি আমাদেরকে বাতিলপন্থীরা যে অন্যায় করেছে তাদের সেই দোষের কারণে ধ্বংস করে দেবে?' (আয়াত ১৭২-১৭৩)

এরপর নাফরমানদের প্রতি কী কী শাস্তি নেমে এসেছিলো তার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে– সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের কাছে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর নিদর্শনাবলী এসেছিলো, তারপর তা আসা বন্ধ হয়ে যায়, যেমন বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্য যে সব জাতির কাছে এসব নিদর্শন আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিভাবে সূরা আনয়ামে এসব দৃশ্য তৎকালীন সমাজের কার্যকলাপসহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওদেরকে সেই মহা খবরটি পড়ে শোনাও যা আমি মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছি, সে খবর হচ্ছে আমার নিদর্শনাবলী প্রেরণের খবর ..... ওরা তো চতুষ্পদ জীব জানোয়ারেরই মতো বরং সেগুলো থেকেও বেশী জ্ঞানবিবর্জিত– ওরাই হচ্ছে উদাসী।' (আয়াত ১৭৫-১৭৯)

এরপর আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাসংগিক আলোচনা এগিয়ে চলেছে, আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা বিশেষকরে অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে এমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর কঠিন আযাব ও তার পাকড়াও সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মানুষকে রসূলের মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং তাঁর সাথে যথাযথ ব্যবহার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

'সুন্দর সুন্দর সকল নাম তো আল্লাহরই; অতএব, ওই নামগুলো ধরেই তাঁকে ডাকো ..... আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথপ্রদর্শক আর কেউ নাই, ... দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। (আয়াত ১৮০-১৮৬)

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ওদেরকে রেসালাতের প্রকৃতি এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে দেন। আসলে এ কথাটা

www.pathagar.com

তাদের প্রশ্নের জওয়াবেই বলা হচ্ছে। যেহেতু তাদেরকে তিনি কেয়ামতের ভয় দেখাচ্ছিলেন। তা কখন সংঘটিত হবে একথাটা জিজ্ঞাসা করার কারণেই তিনি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, কখন সংঘটিত হবে সেই কেয়ামত? ..... বলে দাও, আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী এবং ..... সুসংবাদদানকারী মাত্র !' (আয়াত ১৮৭-১৮৮)

এরপর, আদি পুরুষ আদম মানুষদের আল্লাহর আনুগত্যের যে ওয়াদা করেছিলেন– যে আনুগত্যবোধ তাঁর প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এবং শেরক করা তাঁর প্রকৃতির কাছে অপ্রিয়, তার থেকে আজকে মানুষ কেমন করে ফিরে যাচ্ছে তার চমৎকার এক চিত্র এখানে আঁকা হচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালা এই বাক্যটির শেষের দিকে তাঁর রসূল (স.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের অক্ষম দেব দেবীদেরকে পরিত্যাগ করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ডাকো তোমাদের সেই শরীকদেরকে..... আর তুমি দেখছো তাদেরকে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অথচ আসলে ওরা কিছুই দেখছে না'। (আয়াত ১৯৫-১৯৮)

এখান থেকে সূরাটির শেষ অবধি রসূল (স.)-কে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে, কেমন করে মানুষ পরস্পর লেন দেন করে কেমন করে দ্বীনের এ দাওয়াতকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়? কেমন করে তারা ক্লান্তিকর এ জীবন পথে মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়? কেমন করে সে ক্রোধকে সংবরণ করে। অথচ তারই কাছে মানুষের অনিষ্টতা ও ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে? কেমন করে এই মানুষ ও তার পাশাপাশি মোমেনরা খেয়াল করে শোনে আল কোরআনের মধু-মাখা কথাগুলো? সে কথা বলা হয়েছে। কেমন করে সে তার রবকে স্মরণ করে এবং তাঁর সাথে সদা সর্বদা সম্পর্ক বজায় রাখে তাও বলা হয়েছে? এইভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোচ্চ দরবারে মানুষকে স্মরণ করবেন বলেও জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ক্ষমাশীলতার গুণ গ্রহণ করো এবং নির্দেশ দাও এবং হঠকারী জাহেলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ..... অবশ্যই যারা তোমার রবের কাছে রয়েছে, তারা তাঁর আনুগত্য থেকে কখনোই অহংকার ভরে মুখ ফেরায়না। তারা তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলেছে সদা সর্বদা এবং তাঁর সামনেই তারা সেজদাবনত হয়।'

এইভাবে সকল জরুরী কথাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে এই সূরাটির মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্ভবত ওই বিশেষ মুহূর্তগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার বর্ণনা অনুরূপভাবে সূরা আল আনয়ামের মধ্যেও পেশ করা হয়েছে। আর এইভাবে কথাগুলো পেশ করতে গিয়েই আল্লাহর প্রতি আকীদার বিষয়টিকে আরো জোরদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা ইউনুস

কোরআনের প্রতিটি সূরার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্টের দিক দিয়ে তার মক্কী ও মাদানী অংশ উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে অন্যান্য মানবরচিত বাণীর সাথে আল্লাহর কালামের যে পার্থক্য, সে দিক দিয়েও মক্কী ও মাদানী অংশ সমান। এতদসত্তেও কোরআনের মক্কী অংশের কিছু অসাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, রয়েছে তার বিশেষ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট এবং বিশেষ স্বাদও, যা তার আলোচ্য বিষয় দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মক্কী অংশের বিশেষ বাচনভংগির কারণেও তাতে একটা বিশেষ আবেদন অনুভূত হয়ে থাকে। এই বাচনভংগি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। শব্দ চয়ন থেকে বিষয়গত চমৎকারিত্ব পর্যন্ত যাবতীয় ভাষাগত বৈচিত্র্য এই প্রভাব সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। এ বিষয়ে আমরা সূরা আনয়ামেও আলোচনা করে এসেছি। এবার এখানেও ইনশাআল্লাহ কিছুটা আলোচনা করবো।

ইতিপূর্বে পরপর দুটো মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফ রয়েছে। ওই সূরা দুটো ধারাবাহিকভাবে নাযিল না হলেও কোরআনে ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। তারপর এসেছে মাদানী সূরা আনফাল ও তাওবা। উভয়ের রয়েছে মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়, প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি। এবার আমরা যে দুটো মক্কী সূরায় ফিরে যাচ্ছি, তা হচ্ছে সূরা ইউনুস ও হূদ। এ দুটো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে, সেরূপ ধারাবাহিকভাবেই কোরআনে স্থান পেয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সূরা আনয়াম ও আরাফের সাথে এই দুটো সূরার আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। সূরা আনয়ামে ইসলামের আকিদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচিত হয়েছে এ আকিদার প্রতি অজ্ঞতা ও বিরোধিতার বিষয়টিও। অতপর এই অজ্ঞতা তথা জাহেলিয়াতকে বিশ্বাসে, চেতনায়, এবাদাতে ও কর্মে সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সূরা আরাফের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথিবীতে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের গতি ও পরিণতি এবং এ আকিদা কিভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জাহেলিয়াতের মুখোমুখি হয়েছে তাও। সূরা ইউনুস ও হূদেও আমরা আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করি। তবে সূরা আনয়াম সূরা ইউনুস থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। সূরা আনয়ামের বাচনভংগি মনমগযের ওপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারকারী, অনেক দ্রুত ও জোরদার আবেগ সৃষ্টিকারী এবং গতিশীলতায় ও দৃশ্য অংকনে অনেক বেশী তেজস্বী ও নিপুণ। আর সূরা ইউনুস অপেক্ষাকৃত ধীর, ঠান্ডা, কোমল ও প্রাঞ্জল বাচনভংগির অধিকারী। পক্ষান্তরে সূরা হূদ বিষয়বস্তু, বাচনভংগি এবং আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সূরা আরাফের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র সত্তেও সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক সূরারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সত্তা রয়েছে।

কোরআনের মক্কী অংশের সামগ্রিক আলোচ্য বিষয় যা, সূরা ইউনুসের মূল আলোচ্য বিষয়ও হুবহু তাই এবং সেটা আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি। এ সূরা

www.pathagar.com

তার নিজস্ব ভংগিতেই তার আলোচ্য বিষয়কে তুলে ধরে। তার এ বর্ণনাভংগি দ্বারা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সূরার এ ভূমিকায় আমি ওই আলোচ্য বিষয়গুলোকে একে একে সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

সূরাটির শুরুতেই রসূল (স.)-এর কাছে ওহীর আগমন সম্পর্কে ও সেই সাথে প্রাসংগিকভাবে কোরআন সম্পর্কে মক্কার মোশরেকদের দৃষ্টিভংগির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একজন মানুষের কাছে ওহী নাযিল হওয়া তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আর এ কোরআন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো রচিত গ্রন্থও নয়। আয়াত ১, ২, ১৫, ১৬, ৩৭ ও ৩৮ দ্রষ্টব্য।

মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-এর কাছে কোরআন ছাড়া অন্য একটা বস্তুগত অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানাতো এবং শাস্তি আযাবের যে সব হুমকি ও হুশিয়ারী তাদেরকে দেয়া হতো, সেটা তারা তাড়াতাড়ি পেতে চাইতো। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোরআনই হলো ইসলামের নিদর্শন। এর যে অলৌকিক ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ এবং কাফেরদের প্রতি এক উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। নিদর্শন দেখানো না দেখানো নিরংকুশভাবে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর তাদেরকে কখন তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাবেন, সেটাও তিনিই স্থির করবেন। নবী ও রসূল আল্লাহর বান্দা মাত্র। তাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনোই ক্ষমতা নেই। এভাবে প্রকারান্তরে তাদের কাছে আল্লাহর ক্ষমতা ও বান্দার ক্ষমতার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। আয়াত ১৩, ১৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ২০ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহর সৃষ্টির পরিচয় নিয়ে তাদের মনে যে বিভ্রান্তি রয়েছে, রসূল (স.) সেই বিভ্রান্তি দূর করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কিন্তু তারা ওহীকে অস্বীকার করে ও তাতে সন্দেহ পোষণ করে। তারা এমন কোনো নিদর্শন চায়, যা কোরআনের বিশুদ্ধতার প্রতীক। অথচ আদৌ কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না এমন সব বস্তুর তারা পূজা করে থাকে। কারণ তাদের ধারণা ওইসব পূজনীয় বস্তু বা মূর্তি তাদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত এবং একেবারেই যুক্তিপ্রমাণ ছাড়া আল্লাহর সন্তানাদি আছে বলেও দাবী করে থাকে। এর জবাবে এ সূরা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত ইলাহ তার গুণাবলী ও তাদের চার পাশের প্রকৃতিতে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার যে আলামত বিরাজ করছে, তা কী কী। তাদেরকে আরো জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত প্রভুর কী কী নিদর্শন স্বয়ং তাদের নিজ সত্ত্বার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এবং বিপদের সময় তাদের বিবেক তাদের কাছে প্রভুর কি পরিচয় তুলে ধরে। এ সর্বশেষ বিষয়টা এ সূরার বহু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এ বিষয়টি সূরার ৪, ৫, ৬, ১৮, ২২, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬১, ৭০, ৫৫ আয়াতসমূহে দ্রষ্টব্য।

সূরার কিছু কিছু অংশে মানুষকে এই মর্মে সচেতন করা হয়েছে যে, মানুষ যে কাজই করুক অথবা মনে মনে যে কোনো ইচ্ছাই পোষণ করুক, তা করার সময় আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই বিষয়টি তার চেতনা ও স্নায়ুমন্ডলে

www.pathagar.com

ভয়ভীতি, সতর্কতা ও জাগরণ এনে দেয়। ফলে সে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ৬১ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন। 'তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি .....।'

অনুরূপভাবে, এ সূরার কিছু আয়াত মানুষের মনে আল্লাহর আযাবের ভীতি সদা-জাগ্রত রাখে যাতে করে প্রাচুর্য ও সচ্ছলতাজনিত উদাসীনতা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে এবং চারদিকে সমৃদ্ধির জৌলুস দেখে প্রতারিত ও আল্লাহর সম্ভাব্য আকস্মিক আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে না যায়। যেমন ২৪, ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে লক্ষণীয়।

দুনিয়াবী জীবনের সুখ শান্তি পেয়েই কাফেরদের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহীর অনিবার্যতা সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এই বিভ্রান্তিকর পরিতৃপ্তি এবং এই তৃপ্তিদায়ক হীন কারবারের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারপর জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন নিছক পরীক্ষা। কর্মফল শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে। অতপর কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, দুনিয়াতে যাদেরকে মোশরেকরা আল্লাহর শরীক বানাতো, কেয়ামতের দিন সেই শরীকরা কর্তৃক তাদের উপাসকদেরকে অস্বীকার ও আগ্রহ্য করার দৃশ্য, তাদেরকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করে নিজেদেরকে নিরপরাধ বলে দাবী করার দৃশ্য এবং যতো বড় আকারেই জরিমানা সাধা হোক, তা প্রত্যাখ্যাত হবার দৃশ্য। এটা সূরার যে আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়, তা হলো ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৫, ও ৫৪ আয়াত)

এরপর প্রভুত্ব সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও আখেরাতকে অস্বীকার করা এবং ওহী ও তার সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যানের ফলে তাদের ভেতরে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন নিজেই রচনা করার যে প্রবণতা জন্মে সে সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে তাদের পারস্পরিক লেনদেন ও হালাল হারাম নির্ণয়ে স্বেচ্ছাচারমূলক মনোভাব পোষণ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য বাতিল ও ভুয়া প্রভুদের প্ররোচনা অনুসারে এরূপ মনোভাব পোষণের বিষয়েও। বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যার সাথে জড়িত ও তা থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। (আয়াত ৫৯-৬০)

সূরার উল্লেখিত আলোচিত বিষয়গুলোকে শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করা এবং সে জন্য মন ও বিবেককে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে সূরায় আরো কিছু প্রভাব বিস্তারকারী ও তাৎপর্যবহ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা সূরার সামগ্রিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের কয়েকটি বিষয়কে এখানে সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে।

সূরাটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ সব দৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষের মনমগযে আল্লাহর প্রভুত্ব, বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর প্রাজ্ঞ কর্মকান্ড, তৎপরতা, জগতে জীবন ও জীবের জন্ম ও অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বিশেষত মানবজাতির উপযোগী পরিবেশ ও

www.pathagar.com

সামগ্রী সৃষ্টি এবং তার সমস্ত জৈবিক প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিধাতার বিদ্যমানতার বিষয়টিকেও কোরআন এরূপ জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরে, কোনো দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিতর্ক হিসাবে তুলে ধরে না। মহাবিশ্বের ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের দৃশ্য ও রহস্যের মাঝে একটা বোধগম্য ভাষার যোগসূত্র রয়েছে, রয়েছে নিরুত্তাপ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চেয়েও গভীর ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন। আল্লাহর এও জানা আছে যে, মানুষের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতিকে কেবলমাত্র প্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও রহস্যাবলীর প্রতি কৌতূহলী বানিয়ে দেয়াই তাঁর সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্যে যথেষ্ট। তাকে শুধু এতোটুকু উদ্দীপিত করাই যথেষ্ট, যাতে তার সহজাত বোধশক্তি জেগে ওঠে। এ জন্যই কোরআনে মানুষের ফিতরাত তথা জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি ও সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে ৩, ৪, ৩১, ৩২, ৬৭ ও ১০১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

কাফেররা যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা স্বচক্ষে দেখে থাকে এবং তারা যে সব ঘটনার প্রতিনিয়ত ভুক্তভোগী, অথচ সেগুলোর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, সে জাতীয় ঘটনা ও অভিজ্ঞতায় সূরাটা পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে তারা কিভাবে গ্রহণ করে তারও কিছু দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি যে সকল ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কেও উদাসীন ও অচেতন, তাদের সামনেও আয়না রেখে তাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে। সূরার ১২, ২১, ২২, ২৩ নং আয়াতসমূহে এর নমুনা লক্ষণীয়।

আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার পরিণামে যারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের বহু ঘটনা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের সামনে তাদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এ ধরনের পরিণতি তাদেরও হতে পারে। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার একটা ক্ষুদ্র সময় মাত্র। এরপর তাদেরকে চিরস্থায়ী শক্তি অথবা আযাবের স্থানে চলে যেতে হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধির জন্যে ১৩, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৯২ ও ১০২ নং দ্রষ্টব্য।

সূরাটিতে কেয়ামতের বহু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কাফের ও মোমেনদের পরিণামকে অত্যন্ত জীবন্ত ও প্রভাবশালী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পার্থিব জীবনে কাফেরদের ধ্বংস ও মোমেনদের নিস্তার লাভের দৃশ্যের পাশাপাশি আখেরাতেও উভয়ের পরিণামের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৫৪ দ্রষ্টব্য।

সূরার কিছু সংখ্যক আয়াতে ওহী অস্বীকারকারী মোশরেকদেরকে কোরআনের মতো কোনো একটি আয়াত তৈরী করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। দাওয়াত ও চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর রসূল (স.)-কে তাদের নিয়ে চিন্তা না করা ও তাদেরকে তাদের কর্মফলের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কেননা কাফের ও যালেমদের

www.pathagar.com

এটাই চিরন্তন পরিণতি। তাদের প্রতি দাওয়াত পৌছানোর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার পর তাদের নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও কাফেরদের সংস্রব ত্যাগের ঘোষণাই তাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে, তাদের হঠকারিতাকে নড়বড়ে করে দেয় এবং এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, এ নবী তার আনীত সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস পোষণ করে এবং তার প্রভুর সাথে তার সম্পর্ক অটুট। নিম্নের আয়াতগুলোকে এ এ বক্তব্য এসেছে। আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯।

এই চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এই সাথে শেষ হলো এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ সূরাটি সূরা বনী ইসরাঈলের পরে নাযিল হয়েছে। এ সময়ে কোরআন ও ওহীর ব্যাপারে মোশরেকদের আপত্তি ও অস্বীকৃতি এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ তুংগে উঠেছিলো। তাই এ সূরায় কাফেরদের জাহেলী কৃষ্টি ও আকীদা বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের আকীদাবিশ্বাসে যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাও ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। কেননা একদিকে তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী– অপরদিকে ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করতো। তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে সুপারিশ করে আযাব থেকে মুক্ত করতে পারবে বলে ধারণা করতো। এ জন্য তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। আর এরূপ ধারণা বিশ্বাস থেকে তাদের বাস্তব জীবনে যে ভ্রান্ত আচার আচরণ প্রকাশ পেতো, যেমন বিশেষ বিশেষ ফলমূল ও জীবজন্তুকে হালাল বা হারাম বলে তাদের পুরোহিতরা ঘোষণা করতো এবং তার একাংশ আল্লাহর জন্যে ও একাংশ তাদের কল্পিত দেব দেবীর জন্যে নির্ধারণ করতো।

তারা কোরআনের অনুসারীদের সাথে তাদের পরস্পর বিরোধী আকীদা নিয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতো। একদিকে তার রসূল (স.)-এর রেসালাত ও তাঁর কাছে ওহী আসার কথা অবিশ্বাস করতো এবং তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করতো। অপরদিকে তাকেই তারা এমন কোনো অলৌকিক প্রমাণ দেখাতে বলতো, যা দ্বারা বুঝা যাবে যে, তিনি যথার্থই নবী এবং তাঁর কাছে ওহী আসে। অতপর তারা সেই সব উদ্ভট দাবী তুলতো, যার কথা সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৯ থেকে ৯৩নং আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা ইউনুছের ২০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে তারা রসূল (স.)-এর কাছে এমন একটা বিকল্প কোরআন উপস্থাপনের দাবী তুলতো, যাতে তাদের আকিদা বিশ্বাস, দেব দেবী ও জাহেলী রীতিনীতির কোনো নিন্দা সমালোচনা করা হবে না। সে রকম কোরআন আনা হলে তার ওপর তারা ঈমান আনবে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসের আয়াত ১৫, ১৬ ও ১৭ তে বলেন,

www.pathagar.com

'যখন তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন আমার সাথে সাক্ষাতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা বলতো, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে বদলে দাও.....।'

এই হচ্ছে সূরার পটভূমি। সুরাটা আগাগোড়া পড়লে মনে হয়, এটা একটা অখন্ড সূরা এবং একটা নিকটবর্তী ঘটনাই তার লক্ষ্যবস্তু। ফলে তাকে বিভিন্ন পর্বে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা কঠিন। পক্ষান্তরে অপর একটা মহল এ সূরার ৪০, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ নং আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মনে করে। কেননা এ আয়াতগুলো সূরার মূল সুরের বিপরিত ধারার। আবার এর কোনো কোনো আয়াতকে বাদ দিলে গোটা সূরাই অন্য রকম লাগে।

সূরার সকল অংশের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হওয়ার কারণে তার প্রথমাংশ ও শেষাংশের বক্তব্যে গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে, 'আলিফ-লাম-রা, এ হচ্ছে বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ। মানুষের কাছে এটা কি বিস্ময়কর যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং একটি বলেছি যে, মানুষকে সতর্ক করো ও যারা ঈমান আনে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যে সত্য মর্যাদা রয়েছে।.....' আর শেষ আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তোমার কাছে ওহী যোগে যা পাঠানো হয়, তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। .....' অর্থাৎ সূরার প্রারম্ভিক ও সমাপনী উভয় বক্তব্যই ওহী বিষয়ক। তবে এই প্রারম্ভ ও সমাপনীর মাঝখানে যা কিছু আলোচনা এসেছে, তাও ওহীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই আবর্তিত।

অনুরূপভাবে সূরার বিভিন্ন ভীতিপ্রদ বক্তব্যের মধ্যেও গভীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। আযাবের হুমকিকে দ্রুত কার্যকর করার জন্যে কাফেররা যে দাবী জানাচ্ছিলো, তার জবাবকে আমরা এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে যে, আযাব এমন আকস্মিকভাবে আসবে যে, তখন তারা ঈমান আনলে বা তাওবা করলেও তা কোনো কাজে লাগবে না। এরপর সূরায় এমন কয়েকটা কিসসা কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তাদের জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে কবে এ হুমকি কার্যকরী হবে? ..... প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটা সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের নির্ধারিত সময় আসবে, তখন তা এক মুহূর্ত আগেও আসবে না, এক মুহূর্ত পরেও আসবে না।'..... (আয়াত ৪৭-৫২)

সূরার যে জায়গায় মূসা (আ.)-এর কাহিনী শেষ হয়েছে, সেখানে এ দৃশ্যটা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তা ওই হুমকিরই বাস্তব রূপ।

'আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। ফেরাউন ও তার বাহিনী তৎক্ষণাত পিছু ধাওয়া করলো। ..... (আয়াত ৯০, ৯১, ৯২) এরপর সূরার বিভিন্ন পর্যায়ে ওই জবাব ও এই ঘটনার মাঝখানে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ কিভাবে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করে থাকেন, তার দৃশ্যাবলী একে একে বর্ণনা করা

www.pathagar.com

হয়। এ পাকড়াও এতোই আকস্মিক যে, কেউ তা আগে থেকে কল্পনাও করতে পারে না এবং জানেও না। এভাবে সূরা একই অখন্ড পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে, যার দৃশ্যে, বক্তব্যে ও ভূমিকায় পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে।

অনুরূপভাবে সূরার শুরুতে রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেরদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'কাফেররা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর।' আর ফেরাউন ও তার দল বলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'মূসা যখন তাদের কাছে সত্য নিয়ে এলো, তখন তারা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর। উভয় বক্তব্যে কী অপূর্ব সাদৃশ্য!

সুরায় হযরত ইউনুসের ঘটনা খুব সামান্যই এসেছে। তবু নাম রাখা হয়েছে সূরা ইউনুস। হযরত ইউনুসের ঘটনার উল্লেখ শুধু এতোটুকু,

'এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কোনো জাতি আযাব দেখার পর ঈমান এনেছে, অতপর তার সে ঈমান তার জন্যে ফলদায়ক হয়েছে। কেবল ইউনুসের জাতি ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলাম।'

তবে এতদসত্তেও হযরত ইউনুসের ঘটনা এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যারা আযাব এসে যাওয়ার আগে আত্মশুদ্ধি করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের জন্যে অবশ্যই এটা একটা দৃষ্টান্ত। সময় থাকতে আত্মশুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করার এ এক চমৎকার উদাহরণ। ইউনুসের জাতিই ইতিহাসে একমাত্র জাতি, যারা সামষ্টিকভাবে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, ফলে নবীর প্রত্যক্ষ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের যে পরিণামে হযরত ইউনুস তাদের জন্য আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু তারা পুনরায় সামষ্টিকভাবে আত্মশুদ্ধি করে ঈমান আনে। ফলে আল্লাহ তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেন। এভাবে সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অখন্ড সমন্বয় ও সংযোগ দেখতে পাই যে, সূরাটাকে একটা অখন্ড ও সুসংবদ্ধ একক না মেনে উপায় থাকে না।

এ ভূমিকায় উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, উভয়ের প্রকৃত পরিচয় এবং তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ মানবজীবনে যে পরিবর্তন আসা আবশ্যক, সেটাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ ছাড়া ওহী, আখেরাত ও পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলীসহ অন্য যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা আলোচিত হয়েছে মূলত ওই প্রধান আলোচ্য বিষয়টির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, তার গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের জীবনে, বিশ্বাসে ও কাজ কর্মে তা যে পরিবর্তন কামনা করে, সেটা বুঝানোর লক্ষ্যে।

বস্তুত প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টি শুধু এ সূরার নয়, বরং সমগ্র কোরআনের এবং বিশেষত কোরআনের মক্কী অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। কোরআনের প্রধান আলোচিত বিষয় এই যে, বিশ্বজগতের ইলাহ তথা প্রভু, প্রতিপালক, মনিব, বিধাতা ও সর্বময় অধিপতি কে, তাঁর সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব, দাসত্ব ও তার সীমানা-চৌহদ্দী কি যা অতিক্রম করা যায় না। মানুষকে কিভাবে তার প্রকৃত প্রভু ও

www.pathagar.com

মনিবের দাসে পরিণত করা যায় এবং কিভাবে সেই একমাত্র প্রভু ও মনিবের সর্বময় প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মানুষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। এ ছাড়া আর যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা মানবজীবনে এ সত্যের দাবী কী কী ও কতো সুদূর প্রসারী, তা বোঝানোর জন্যেই আলোচিত হয়েছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এ মহা সত্যের ব্যাপারে কোরআনের এতো বিশদ আলোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কেননা এটা কোরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর জন্যে সকল নবীর প্রেরণ ও সমস্ত আসমানী কেতাব নাযিল করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি যখনই কোনো রসূল পাঠাই, তার কাছে ওহী নাযিল করি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' মানুষের পার্থিব জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে কেবল তখনই, যখন তাদের আকীদা বিশ্বাসে ও বাস্তব জীবনে এ মহাসত্যের নির্ভুল প্রতিফলন ঘটে।

জীবনে এ মহাসত্যের সার্বিক প্রতিফলন না ঘটলে প্রথমত এ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে তার দ্রব্যসমূহ ও প্রাণীদের সাথে আচরণ সঠিক হতে পারে না। কেননা বিশ্বজগতের ও নিজের সর্বময় মনিব ও প্রভু কে, সে কার বা দাস, আর দাস হিসাবে তার করণীয় কী, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস ও বিভিন্ন প্রাণী এমনকি বিভিন্ন কল্পিত সত্ত্বা ও ছায়ামূর্তিকে পর্যন্ত উপাস্য বা প্রভুতে পরিণত করে থাকে, আর নিজেকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তার দাসানুদাসে পরিণত করে এবং ওইসব প্রভু বা মনিবকে নিজের জীবিকার একাংশ দিয়ে দেয়, এমনকি কখনো কখনো এ জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। অথচ ওই জিনিস বা প্রাণীর কোনোই ক্ষমতা নেই। কারো লাভ বা ক্ষতি ঘটানোর কোনো সামর্থ তাদের নেই। এ সব বস্তু ও প্রাণীর মাঝে ঝুলন্ত থাকার কারণে ও তাদের দাসত্ব করার কারণে মোশরেকদের গোটা জীবনই তছনছ ও বিশৃংখলার শিকার হয়ে যায়।

সম্পদ ও সন্তানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করার কী পরিণাম দাঁড়ায়, এ হচ্ছে তার কিছু দৃষ্টান্ত। আল্লাহর পরিবর্তে তার সৃষ্টির জন্যে কোনো সম্পদ নির্দিষ্ট করলে তার ফল এ রকমই হয়ে থাকে। কেননা ওই সব বস্তু বা প্রাণীকে উপাস্য মানা ও সম্পদের অংশ দেয়ার সপক্ষে আল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই।

অনুরূপভাবে, মানুষের পরস্পরের সাথে সহাবস্থানও সুখকর হয় না– যদি তাদের আকীদা বিশ্বাস, এবাদাতে ও কর্মজীবনে দাসত্ব ও প্রভুত্ব সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট না থাকে। যে আকীদায়, আদর্শে ও সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর একক প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও শাসন স্বীকৃত হয় না, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের জীবনের ওপর আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং মানব জীবনের গোপন বা প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে আইন রচনা, হুকুম জারী ও আদেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট থাকে না, সেই আকীদা ও আদর্শে এবং সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ব, মর্যাদা ও প্রকৃত পূর্ণাংগ স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বাস্তবতা এ মহা সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আকিদা বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে যখনই মানুষ আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে মানুষের আনুগত্য করে, তার অনিবার্য ফল দেখা দেয় এই যে, তারা তাদের মানবতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সবই হারায়।

ইসলাম ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ দেয়, তদনুসারে মানব সমাজের ওপর আল্লাহদ্রোহী শাসকদের দৌরাত্ম্য দেখা দেয়ার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য পরিত্যাগ করা। এ বিধান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা প্রভু বলে ঘোষণা করে এ অর্থে যে, প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, শাসন ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকার আল্লাহর– আর কারো নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা যোখরুফে বলেন, 'ফেরাউন তার জনগণকে জিজ্ঞাসা করলো যে, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদনদীগুলো তো আমার হুকুমেই চলে .....।' (আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪)

এখানে সর্বশেষ আয়াতে স্পষ্টই জনগণের ওপর তাদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ফেরাউনের স্বৈরাচারী শাসন চালাতে পারার একমাত্র কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত যে জাতি এক আল্লাহর অনুগত ও বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব ও শাসনাধিকার মানে না, কোনো স্বৈরাচারী শাসক তাদেরকে নিজের গোলাম বানাতে পারে না।

যারা এককভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের কিছু লোককে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া বিধান অনুসারে তাদের ওপর শাসন চালাতে সুযোগ দিয়েছে, তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামদের গোলামীতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আর এ গোলামী তাদের মনুষ্যত্ব, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে কুরে কুরে খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

বিকৃত খৃষ্টধর্মের নামে ফ্যাসিবাদী গীর্জার যুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে ইউরোপ আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসেছিলো। এ গীর্জা চরম স্বেচ্ছাচারী আচরণের মাধ্যমে সকল মানবিক মূল্যবোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। এরপর জনগণ মনে করলো যে, গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভিত্তিক নতুন সমাজব্যবস্থায় তাদের মানবতা, স্বাধীনতা ও সম্মান সংরক্ষিত হয়েছে। মানব রচিত সংবিধান, সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনগত ও বিচার বিভাগীয় রক্ষা ব্যবস্থা, নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর শাসন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে বলে তারা আশা পোষণ করলো। কিন্তু শেষ ফল কী দাঁড়ালো! শেষ ফল দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র, যা সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিছক কল্পনা বা সাইনবোর্ড সর্বস্ব বানিয়ে ছেড়েছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারী শাসনে শোচনীয় গোলামীর জীবন যাপন করছে। কেননা এ সংখ্যালঘুর হাতে দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আর এরই বলে তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। সংবিধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অন্য যে সব রক্ষা কবচের ওপর জনগণ নিজেদের মানবতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার রক্ষক হিসাবে আস্থা স্থাপন করেছিলো, তা কোনো কাজে লাগেনি।

www.pathagar.com

এরপর সেখানে একটি দল পুঁজিবাদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রেণীহীন দলীয় শাসন কায়েম করলো। এতেই বা কী লাভ হলো? আগে ছিলো তারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলাম। এবার হলো সর্বহারা শ্রেণীর গোলাম। পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলামী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের গোলামীতে রূপান্তরিত হলো। আর এটা হয়ে দাঁড়ালো পুঁজিবাদের চেয়েও মারাত্মক।১

মোট কথা প্রত্যেক ব্যবস্থায় মানুষের ওপর মানুষের গোলামী অব্যাহত রইলো। বিপুল অর্থ ও প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবার মানুষের এক শ্রেণীর হাত থেকে আর এক শ্রেণীর হাতে প্রভুত্ব হস্তান্তরিত হতে লাগলো।

বস্তুত গোলামী, দাসত্ব বা আনুগত্য ছাড়া উপায় নেই। সেটা যদি আল্লাহর গোলামী না হয়, তবে মানুষের হবেই। একমাত্র আল্লাহর গোলামী মেনে নিলে মানবজাতির মর্যাদা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সবই বহাল হয়। পক্ষান্তরে মানুষের ওপর মানুষের গোলামী তার স্বাধীনতা ও সম্মান সমূলে বিনষ্ট করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থও ধ্বংস করে।

এ কারণে আল্লাহর সকল কিতাবে ও সকল নবীর দাওয়াতে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। এ সূরায়ও তার কিছু নমুনা প্রতিফলিত হয়েছে। এটা শুধু প্রাচীন জাহেলী সমাজের পৌত্তলিকদের ব্যাপারে নয়, বরং সর্বকালে ও সর্বস্থানে প্রত্যেক মানুষের সাথেই এর সম্পর্ক রয়েছে। এর সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যেক জাহেলিয়াতের সাথে, চাই তা ইতিহাস পূর্ব কালের জাহেলিয়াত হোক বা ঐতিহাসিক যুগের জাহেলিয়াত হোক, কিংবা বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত হোক কিংবা মানুষের ওপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেয় এমন যে কোনো জাহেলিয়াতই হোক না কেন।২

এ কারণে প্রত্যেক রেসালাত ও প্রত্যেক আসমানী কেতাবের মূল কথা ছিলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। সূরার সর্বশেষ বিষয়টি ছিলো এই,

'বলো, হে মানবজাতি! তোমরা যদি আমার পাঠানো বিধান সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আমি তোমরা যার উপাসনা করো, কিন্তু একমাত্র সেই আল্লাহর এবাদাত করবো যিনি আমাদের সকলকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন .....।' (আয়াত ১০৪-১০৯)

---

১. পশ্চিমী গণতন্ত্রে কোনোদিনই যে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন ঘটেনা তা তথাকথিত গণতন্ত্রের ভূখন্ডসমূহের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। ইউরোপ আমেরিকার বিধগ্ধ চিন্তা নায়করাও আজ অকপটে তা স্বীকার করছেন যে এই পদ্ধতিতে হামেশাই সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ওপর শাসন শোষণ করে। ওদিকে সুদীর্ঘ ৭০ বসর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে সে ব্যবস্থার দাড় করানো হলো তা তার ব্যর্থতার কলংক মাথায় নিয়ে পুনরায় ঘৃনীত পুজিবাদের দিকেই ফিরে গেলো। - সম্পাদক

২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াত' এবং মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সূরা হূদ

এ সূরাটি পুরোপুরিই মক্কায় অবতীর্ণ। তবে কারো কারো মতে এর ১২, ১৭ ও ১১৪ নং আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ। এ তিনটি আয়াতকে সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পড়লে মনে হয়, আয়াত তিনটি সূরার যথাস্থানেই আছে এবং ওখান থেকে ওগুলোকে সরিয়ে নেয়া হলে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। তাছাড়া এর আলোচ্য বিষয়গুলো মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্কী বিষয়। এই আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোরায়শ বংশীয় মোশরেকদের দৃষ্টিভংগি, তাদের এই দৃষ্টিভংগির কারণে রসূল (স.) ও তার সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমানের মনে সৃষ্ট উদ্বেগ ও অস্থিরতা এবং এই অস্থিরতা নিরসনে কোরআনের ভূমিকাও এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১২নং আয়াতের কথাই ধরা যাক। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ধন সম্পদ নেমে আসুক তো দেখি কিংবা তার সাথে কোনো একজন ফেরেশতা আসুক তো দেখি'– এ কথা কাফেররা বলার কারণে হয়তো তুমি তোমার কাছে ওহীযোগে প্রেরিত বিধানের কিছু অংশ ছেড়েই দেবে এবং এর দরুন তোমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসছে.....' এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোরায়শের পক্ষ থেকে এ ধরণের হঠকারী বক্তব্য প্রদানের কারণে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া ও তাকে ওহীর বিধানের ওপর অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়ে, এটা মক্কাতেই ঘটেছিলো বিশেষত হযরত খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যু, মেরাজের ঘটনা, স্বয়ং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণের পরে। এটা ছিলো মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক সময়।

আর ১৭ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটা কোরআনের মক্কী অংশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কোরায়শকে লক্ষ্য করেই তা নাযিল হয়েছে। কেননা কোরআন নিজেই রসূল (স.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কাছে নাযিল হয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং বিশেষত মূসার কিতাবও এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবও এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিলো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আহলে কেতাবের কিছু লোক মক্কায়ও বাস করতো। এই সাথে মোশরেকদের নীতি ও দৃষ্টিভংগির নিন্দা, তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কুফরী করার জন্যে দোযখের আযাবের হুমকি দান, রসূল (স.)-কে এ বলে প্রবোধ দান যে, তিনি সত্যের ওপরেই আছেন, কাজেই তাঁর বিচলিত হওয়া ও দাওয়াত বন্ধ করার প্রয়োজন নেই– এ সব বক্তব্য দান থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াতটাও আসলে মক্কী। মূসার কিতাবের উল্লেখ দ্বারা কারো কারো সন্দেহ হয়ে থাকতে পারে যে, আয়াতটা মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু এটা আসলে বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলাও হয়নি কিংবা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও নয়, যা মাদানী কোরআনে সুপরিচিত। আসলে মূসার কিতাবের উল্লেখ এসেছে আহলে কিতাবের কিছু কিছু লোকের স্বীকৃতির পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে এবং মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে নাযিল করা ওহীর প্রতি মূসার কিতাবের সমর্থনের জন্যে।

www.pathagar.com

সূরাটা নাযিল হবার সময় মক্কায় যে কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো এবং সেই পরিস্থিতির যা সুস্পষ্ট দাবী ছিলো, তার সাথে এই ব্যাখ্যা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১১৪ নং আয়াতটার পূর্বে রসূল (স.)-কে প্রবোধ দেয়া হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবের ওপর ইতিপূর্বে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো বলে তিনি নিজের ব্যাপারেও শংকিত ছিলেন। এ আয়াতের পূর্বে রসূল (স.) ও তাঁর সাথে তাওবাকারীদেরকে সত্যের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকদের পক্ষ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর নামায ও ধৈর্যের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে, যাতে সেই কঠিন সময়টার মোকাবেলা করা যায়। এ সব বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতগুলো পড়ে দেখলে স্পষ্টতই মনে হবে যে, ১১৪নং আয়াত মক্কী আয়াত।

সমগ্র সূরাটা সূরা ইউনুসের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলের পর। এর ফলে সূরাটা ঠিক কোন সময়ে নাযিল হয়েছে, তার কিছু লক্ষণ নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস প্রসংগে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ওই সময়টা ছিলো সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর সময়। কেননা তখন চাচা আবু তালিব ও হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেছেন। আবু তালিব বেঁচে থাকতে মোশরেকরা রসূল (স.)-এর সাথে যে সব আচরণ করতে সাহস পায়নি, এ সময় সেই ধরনের আচরণও করতে শুরু করে দিয়েছিলো। বিশেষত বিস্ময়কর মেরাজের ঘটনার পর তারা তার সাথে ব্যংগবিদ্রূপ করতে থাকে এবং কিছু কিছু মুসলমান মুরতাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ সাথে রসূল (স.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালে দুঃসহ একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন। এ সময় রসূল (স.)-এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোশরেকদের ঘোষিত যুদ্ধ নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মক্কা ও তার আশেপাশে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এর অব্যবহিত পরই আল্লাহ প্রথম আকাবা ও দ্বিতীয় আকাবার বায়াতের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিজয়ের দ্বারোদঘাটন করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লিদ ও আবু তালিব একই বছর মারা গেলে রসূল (স.)-এর ওপর বিপদ মুসীবতের পাহাড় নেমে আসে। খাদিজা ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে তাঁর একনিষ্ঠ উপদেষ্টা। আর আবু তালেব ছিলেন তাঁর কাজের সহায়ক, শক্তির যোগানদাতা এবং তাঁর গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষাকারী। এই উভয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে রসূল (স.) বিপদাপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে রসূল (স.)-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে। আবু তালিবের জীবদ্দশায় মোশরেকরা রসূল (স.)-কে এমনভাবে নির্যাতন করার সাহস করেনি, যেমনটি তার তিরোধানের পর করেছিলো। এমনকি কোরায়শের একজন নগণ্য ব্যক্তিও তাঁর সামনে এসে তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে।..... এরপর রসূল (স.) মাথায় মাটি নিয়ে যখন বাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর এক মেয়ে তাঁর কাছে

www.pathagar.com

আসেন। তিনি তাঁর মাথার মাটি ধুয়ে সাফ করতে ও কাঁদতে থাকেন। রসূল (স.) তাঁকে বলেন, কেঁদোনা মা, আল্লাহ তায়ালা তোমার আব্বাকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, আবু তালেবের মৃত্যুর আগে কোরায়শরা আমার সাথে এমন অবাঞ্ছিত আচরণ কখনো করেনি।'

মিকরীনী 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে বলেন, উভয়ের মৃত্যুর ফলে রসূল (স.)-এর ওপর আরো কঠিন মুসিবত নেমে আসে। তাই তিনি ওই বছরটাকে 'দুঃখের বছর' নাম দেন। তিনি বলতেন, 'আবু তালেব বেচে থাকতে কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করেনি।' বস্তুত তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আবু তালেব ছাড়া আর কেউ এমন ছিলো না, যে তাকে সাহায্য করতে পারে।

এ সময়েই সূরা হূদ নাযিল হয়। এর অব্যবহিত পূর্বে নাযিল হয় সূরা ইউনুস। আর এ উভয় সূরার আগে নাযিল হয় সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা আল ফোরকান। এ সময়কার পরিস্থিতি কেমন ছিলো তার আলামত এই সূরাগুলোতে পাওয়া যায়। বিশেষত সূরা হূদের পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়েও এবং বিশেষত রসূল (স.) ও তার সংগীদের মনোবল বৃদ্ধি করা ও প্রবোধ দেয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে এর আলামতগুলো সুস্পষ্ট। এ সময়টার প্রকৃতি ও তার দাবী এ সূরায় যতোটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তার কিছু কিছু তুলে ধরছি,

এ সূরায় সমগ্র মানব ইতিহাসে ইসলামী আকিদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (স.)-এর যুগ পর্যন্ত। বলা হয়েছে যে, এ আন্দোলন একই মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিমালার ভিত্তিতে চলেছে। সেই মৌলিক তত্ত্ব হলো, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং এতে কাউকে শরীক করা যাবে না। একমাত্র তারই গোলামী বা দাসত্ব করা যাবে, আর কারো নয়। এই সাথে এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, দুনিয়ার জীবন ফলাফল ভোগ করার জীবন নয় বরং পরীক্ষার জীবন। আখেরাতেই ফলাফল প্রাপ্তির জীবন। হেদায়াত ও গোমরাহী এই দুটোর যে কোনো একটার পথ বেছে নেয়ার জন্যে আল্লাহ মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটাই এ পরীক্ষার মূল বিষয়।

হযরত মোহাম্মদ (স.) 'এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, যার আয়াতগুলো সুরক্ষিত ও বিস্তারিত। (আয়াত-১) আর এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর আরো এবাদাত করো না.....(আয়াত ২,৩ ও ৪) অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

কিন্তু এই দাওয়াত নতুন নয়। ইতিপূর্বে নূহ, হূদ সালেহ, শোয়ায়ব, মূসা প্রমূখ নবীও এ দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম.....' (আয়াত ২৬ ও ২৭) 'আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। .....' (আয়াত ৫১, ৫২ ও ৫৩) সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে।..... (আয়াত ৬২) 'মাদায়েনের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়ায়বকে।.....' (আয়াত ৮৫, ৮৬ ও ৮৭) এভাবে

www.pathagar.com

দেখা যায় যে, প্রত্যেক নবী একই কথা বলেছেন এবং একই শাশ্বত দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর নবীদের নীতি ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাদের জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান, ব্যংগ বিদ্রুপ, উপহাস, হুমকি ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। অপরদিকে তাঁদেরকে এর মোকাবেলায় ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বহাল রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত নূহের ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'কাফেরদের নেতারা বললো, তোমাকে তো আমরা আমাদের মতোই মানুষ দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে যারা একেবারেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ, তারা ছাড়া আর কেউ তোমার অনুসারী হচ্ছে এমন তো দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো। (আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪)

হযরত হূদের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই নিম্নরূপ দৃশ্য,

'তারা বললো, ওহে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ আনতে পারেনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের ছেড়ে ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।

অতপর যখন আমার ফয়সালা এলো, আমি হূদ ও তার মোমেন সাথীদেরকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করলাম..... আ'দ জাতিকে এই দুনিয়ায় ও কেয়ামতের দিন অভিশাপ দেয়া হলো। ..... সাবধান, হূদের জাতি আদের ওপর অভিসম্পাত।'.....(আয়াত ৫৪-৬১)

সালেহ (আ.)-এর ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'সামুদ জাতি বললো, ওহে সালেহ, তুমি আমাদের অনেক আশা ভরসার পাত্র ছিলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে গেছে তার পূজা করতে কি তুমি আমাদের নিষেধ করছো ?.....যখন আমার আযাব এলো, তখন আমি সালেহ ও তার মোমেন সাথীদেরকে রক্ষা করলাম..... ফলে তারা তাদের ঘরেই পড়ে রইলো।.....(আয়াত নং ৬৩, ৬৪ এবং ৬৭ ও ৬৮)

শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

'তারা বললো, ওহে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে আদেশ দেয়, যেন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাসিত দেবদেবীর পূজা করবো না?..... অতপর যখন আমার আযাব এলো, আমি শোয়ায়ব ও তার মোমেন সাথীদেরকে অব্যহতি দিলাম, আর যালেমদেরকে বিকট শব্দ আক্রমণ করলো। ফলে তারা তাদের ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। যেন তারা কোনো দিন সেখানে বাস করেনি .....!' (আয়াত নং ৮৮ থেকে ৯৬ পর্যন্ত)

এই কিসসা কাহিনীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার সম্মানিত সাথীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে প্রবোধ দেয়া হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে সাহায্য নাযিল করেছেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য নবীর মতো

www.pathagar.com

তাকেও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁর ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত দাবী সম্পূর্ণ সত্য।

নূহ (আ.)-এর ঘটনার শেষে আমরা নিম্নরূপ মন্তব্য দেখতে পাই,

'এ হচ্ছে অদৃশ্য জগতের কিছু খবর, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করি। তুমি বা তোমার জাতি এগুলো ইতিপূর্বে জানতে না। অতএব, ধৈর্য ধারণ করো। সর্বশেষ সাফল্য সংযমশীল লোকদের জন্যে।'

এ সূরার সব কটা ঘটনার শেষে সূরার শেষ পর্যন্ত আমরা নিম্নরূপ দীর্ঘ মন্তব্য দেখতে পাই,

'এ হচ্ছে জনপদসমূহের অধিবাসীদের কিছু কাহিনী, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।..... আমি কিন্তু তাদের ওপর যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।..... তোমার প্রভু যখন কোনো যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন এভাবেই করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক..... (আয়াত ১০১ থেকে ১১৭ পর্যন্ত)

এভাবেই কোরআনের নির্দেশাবলীতে আন্দোলনের দিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই, কোরআন দাওয়াত ও আন্দোলনকে প্রত্যেক পর্যায়ে উপযুক্ত নির্দেশাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, কোরআনের কিসসা কাহিনী আন্দোলনের দাবী এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবীকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ও জীবন্তভাবে তুলে ধরে। এ কিসসা কাহিনী সূরার অন্যান্য অংশের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সংগতিশীল, চাই তা আইন ও বিধানের আকারে হোক বা সাধারণ নীতিমালা ও উপদেশমালার আকারে হোক।

সূরা ইউনুসে হযরত নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, হযরত মূসার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত কাহিনী এবং হযরত ইউনুসের অতীব সংক্ষিপ্ত কিসসা আলোচিত হয়েছে। তবে এ সূরায় কিসসা কাহিনী যা কিছুই আলোচিত হয়েছে, তা সূরার কাংখিত আকিদা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য হিসাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সূরা হূদে কেসসা কাহিনী হয়ে উঠেছে সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদিও এ সূরায়ও কেসসা কাহিনী তার আলোচিত আকিদা বিষয়ক তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবেই এসেছে, কিন্তু উপস্থাপনের ধরন দেখে মনে হয় যে, মানবেতিহাসে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতি ও পরিণতি পর্যালোচনা করাই এর প্রধান ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। এ জন্যেই এ সূরাকে আমরা আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে তিনভাবে বিভক্ত দেখতে পাই,

প্রথম ভাগে আকিদা বিষয়ক তথ্যসমূহ, যা সূরার শুরুতে একটু সীমিত পরিসরে বিদ্যমানসমূহ।

দ্বিতীয় ভাগে এই আকিদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এবং এটাই এ সূরার বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগে রয়েছে এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য এবং তা খুবই সীমিত পরিসরে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, মৌলিক আকীদা বিষয়ক যে তথ্যের আলোচনা এ সূরার প্রধান লক্ষ্য, সেই বিষয়সংক্রান্ত আলোচনার সাথে এ সূরার সব কটা অংশের পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সাযুজ্য রয়েছে। প্রত্যেকটি অংশেই ওই অংশের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বর্ণনাভংগি অনুসারে আকীদা বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বর্ণনাভংগি কেসসা কাহিনী, নির্দেশাবলী ও সাধারণ আলোচনা থেকে অনেকাংশে পৃথক।

যে মৌলিক আকিদাগত তথ্যগুলো আলোচনা করা এ সূরার সার্বিক লক্ষ্য, তা নিম্নরূপ,

রসূল (স.) যে মৌল তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন এবং পূর্বেকার নবীরা যে মৌল তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। এ মৌল তত্ত্বের সারকথা হলো, এক আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, এ আনুগত্যের পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর রসূলদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই মানবজাতি একদিন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

রসূল (স.)-এর দাওয়াতের মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে সূরার প্রথম ভাগে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে,

'আলিফ লাম রা, এটা এমন কিতাব, যার আয়াতগুলোকে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংহত করা ও তার পর বিস্তৃত করা হয়েছে। তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না, আমি তোমাদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।' (আয়াত ১ ও ২)

'তারা কি বলে যে, এ কোরআন তার মনগড়া? বলো, তাহলে তোমরা এ ধরনের দশটা আয়াত নিয়ে এসো.....'। (আয়াত ১৩ ও ১৪)

নবীদের কাহিনী বর্ণনা করার সময়ও তাদের দাওয়াতের মূল বিষয় এবং ওই আকিদার ভিত্তিতে তাঁদের জাতি ও আপনজনদের সাথে তাদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষিত হয়েছে। যথা,

'আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠালাম যেন সে তাদেরকে বলে তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না।..... (আয়াত ২৫, ২৮, ৪৫ ও ৪৬)

'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না.....। (আয়াত ৫০)

'সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহ (আ.)-কে। সে বলেছিলো, 'হে আমার জাতি। তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো.....।' (আয়াত ৬১ ও ৬৩)

'আর মাদায়েনে পাঠিয়েছিলাম শোয়ায়বকে। সে বলেছিলো যে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।' (আয়াত ৮৩ এবং ৮৮)

www.pathagar.com

সূরার উপসংহারে দাওয়াতের মূলতত্ত্ব ও মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে জনগণের সাথে রসূলদের বিচ্ছেদের বিষয়টা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

'যালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। .....।' (১১৩)

'আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অজানা তথ্য।' (আয়াত ১২৩)

এভাবে সূরার তিনটি অংশেই আকীদা বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

মানুষ যাতে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়, সেজন্যে সূরাটা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে বলেছে যে, সমগ্র মানবজাতি পৃথিবীতে আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তারা আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে চূড়ান্ত কর্মফল দেবেন। এ বিষয়টাও এ সূরার তিনটি অংশেই আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে,

'সাবধান, তারা তারা কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর জন্যে তাদের বুককে সংকুচিত করে থাকে। সাবধান, তারা যখন তাদের পোশাকে আবৃত হয়, তখন আল্লাহ জানেন তারা কী কী লুকাচ্ছে এবং কী কী প্রকাশ করছে। .....' (আয়াত ৫-৮)

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ সৌন্দর্যের জন্যে লালায়িত, তাকে আমি তার সৎকর্মের প্রতিফল দুনিয়াতেই পুরো মাত্রায় দিয়ে দেবো। ... (আয়াত ১৫ ও ১৬)

নবীদের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে নিম্নরূপ আয়াতসমূহ এসেছে,

'আমি আমার ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছি। এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবন আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ নয়.....।' (আয়াত ৫৬ ও ৫৭)

'সামুদের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম.....।' (আয়াত ৬১)

আর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রভু যখন অপরাধী জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন, তখন এ রকমই করেন.....।' (আয়াত ১০২, ১১১, ১১৭, ১১৮,১১৯)

এভাবে তিনটে অংশেই আল্লাহর ও আখেরাতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে,

এ সূরার লক্ষ্য আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং একমাত্র আল্লাহই যে পালনকর্তা তথা আইনদাতা, হুকুমদাতা ও মানবজীবনের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী, সেটা প্রমাণ করাই এর লক্ষ্য। বস্তুত আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কখনো মতভেদ হয়নি। মতভেদ হয়েছে শুধু আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা ও হুকুমদাতা মনিব কিনা– তা নিয়ে। সকল নবীকে এ বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করতেই সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সর্বশেষ নবীকেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার আইনগত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কেবল আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অপরিহার্যতা এ সূরার প্রতিটি অংশেই আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলো মন মগযে বদ্ধমূল করা, সমগ্র অন্তরাত্মায় তার চেতনা সঞ্চারিত করা, সমগ্র মানবসত্ত্বার শিরায় শিরায় তাকে সঞ্চালিত করা, সমগ্র মেরুমজ্জায় তাকে চলন্ত ও জীবনীশক্তির আকারে এমনভাবে প্রবাহিত করা যেন তা একটা ইতিবাচক, প্রেরণাদায়ক 'এবং মানুষের ভাবাবেগ, চিন্তাধারা, কাজ ও গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত হয়'– এ সূরার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলোকে এরূপ একটা কার্যকর শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সূরাটাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনাময় বক্তব্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যা মানব সত্ত্বাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে।

প্রথমত এমন বহু আয়াত এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন করা ও আশ্বাস দেয়া হয়। একদিকে কাউকে শরীক না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াতকে যে ব্যক্তি মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্যে এবং মানবজাতির কল্যাণ, সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আগ্রহী করে তোলে। অপরদিকে যারা এই দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে এবং আল্লাহদ্রোহীদের পথ অনুসরণ করে, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাব ভোগ করার ভীতি প্রদর্শন করে। নিম্নে এই ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের কিছু নমুনা দেয়া গেলো,

'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। আমি তোমাদের জন্যে তার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা.....।' (আয়াত ২-৩)

'যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য সুষমা কামনা করে, তাদের কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই পুরোপুরি দিয়ে দেবো.....।' আখেরাতে তাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই.....।' *(আয়াত ১৫ ও ১৬)*

'আচ্ছা, যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ... সে তো তার ওপর ঈমান রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি কুফরী করে, আগুনই তার প্রতিশ্রিত কর্মফল.....।' *(আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪)*

'আর হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, অতপর তাওবা করো, তাহলে তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন.....।' *(আয়াত ৫২)*

'আর যদি এ কথা অমান্য করো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আনীত বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছি.....।' *(আয়াত ৫৭)*

'আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে..... দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ওপর অভিসম্পাত.....।' *(আয়াত ৯৬-৯৯)*

এ সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী যে দীর্ঘ কিসসা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের গোটা ইতিহাস জুড়ে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও বিশ্বাসীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে, বিশেষত বন্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে যা প্রমাণিত হয়েছে, তাও এ

www.pathagar.com

সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, 'নূহকে ওহীযোগে জানানো হলো যে, তোমার জাতির মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া কেউ কখনো ঈমান আনবে না.....।' তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহীর নির্দেশের সাহায্যে জাহাজ তৈরী করো.....।' *(আয়াত ৩৬-৪৪)*

সুখসমৃদ্ধি ও দুঃখকষ্ট দ্বারা চলমান ঘটনাবলীর মোকাবেলা করার সময় মানবমনে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তারও কিছু কিছু প্রতিচ্ছবি এ সূরায় অংকন করা হয়েছে। যারা রসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে নবী রসূলদের চ্যালেঞ্জ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়, তাদের সামনে তাদের সেই সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যখন তারা সত্য সত্যই আযাবের কবলে পড়বে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ও সুখ সমৃদ্ধি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যে শোচনীয় দুর্দশার কবলে পড়বে, তাও মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুনরায় সংকট ঘুচে গেলে ও সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখলে মানুষ নতুন করে যে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়, তাও চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন,

'আর আমি যদি আযাবকে কিছুদিনের জন্যে বিলম্বিত করি, তাহলে তারা বলে যে, আযাবকে থামিয়ে রাখলো কে? সাবধান, আযাব যেদিন আসবে, সেদিন তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না.....।' *(আয়াত ৮, ৯, ১০ ও ১১)*

কোনো কোনো স্থানে কেয়ামতের কিছু দৃশ্য, সেদিন কাফেরদের শোচনীয় দুর্দশা, আল্লাহর রসূলদেরকে অমান্য করার পর তাঁর সামনে তাদের উপস্থিতি, অপমান এবং দেব দেবী ও সুপারিশকারীদের সুপারিশ না পাওয়ার দৃশ্য তুলে ধারা হয়েছে। যেমন, 'সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?' *(আয়াত ১৮-২৩, ১০৩-১০৮)*

মানুষের কাছে আল্লাহ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন এবং তার মনের কোণে লুকানো কথাবার্তা পর্যন্ত তিনি জানেন– এ সত্য মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম। বিশেষত যে কাফেররা আল্লাহর উপস্থিতিকে মানে না, তার সর্বব্যাপী জ্ঞানের ধারণা রাখে না তাদের জন্যে এ উক্তি অত্যন্ত ভীতিসঞ্চারক। বস্তুত তারা যতই অস্বীকার করুক, তারা নিজেরাই অন্যান্য সৃষ্টির মতো আল্লাহর মুঠোর মধ্যে অবস্থিত।

'আল্লাহর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে .....।' *(আয়াত ৪, ৫,৬ ও ৭৬)*

সূরার আরেকটা প্রেরণাদায়ক উপাদান হলো, যুগে যুগে নবীদের নেতৃত্বে যে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সত্যের বাণীর সাহায্যে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছে, তাদের কাহিনী বর্ণনা। সত্যের এ কাফেলাগুলোর ছিলো অবিচল ঈমান ও অটুট প্রত্যয়। এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, নবীদের অভিন্ন ভূমিকা ও অভিন্ন মূলনীতি, সর্বকালে তারা যে সত্য দ্বারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছেন, সেই সত্যের অভিন্নতা, এমনকি তাদের বক্তব্যের পর্যন্ত অভিন্নতা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

সূরা ইউসুফ

এটা একটা মক্কী সূরা। এটা সূরা হূদের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা ইউনুস ও সূরা হূদের ভূমিকায় যে চরম সংকটজনক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করেছি, এই সূরাও সেই একই পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে। রসূল (স.)-এর দুই প্রধান সহায় আবু তালেব ও খাদিজার ইন্তেকালের বছরটি রসূল (স.)-এর জীবনের বিষাদময় বছর হিসাবে চিহ্নিত। সেই বছর থেকে নিয়ে আকাবার প্রথম বায়য়াত ও দ্বিতীয় বায়য়াত পর্যন্ত সময়টাকে বলা যায় এই চরম সংকটকাল পরিস্থিতি, যাকে উপলক্ষ করে সূরা ইউনুস, হূদ ও ইউসুফ নাযিল হয়েছিলো। আকাবার বায়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.) ও তার সাথী সাহাবীদের জন্যে মদীনায় হিজরতের ও মক্কার অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ সুগম করে দেন। সুতরাং সূরা ইউসুফ হচ্ছে ওই চরম সংকটকালে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। গোটা সূরা ইউসুফই মক্কায় নাযিল হয়েছে। তবে কারো কারো মতে ১, ২, ৩, ৪ ও ৭ নং আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম চার আয়াতসহ গোটা সূরা এক সাথে নাযিল হয়েছে এ কথা বলার যৌক্তিকতা প্রথম তিন আয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 'আলিফ লাম রা, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ, আমি এ গ্রন্থকে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি তোমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করছি তোমার কাছে এই কোরআন ওহী করার মাধ্যমে। ইতিপূর্বে তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না।' এ তিনটি আয়াত পরবর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা শুরু করার স্বাভাবিক ভূমিকা। সেই আয়াতটা (৪ নং) হলো, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে পিতা, আমি এগারোটা নক্ষত্র এবং চাঁদ ও সূর্যকে আমার সামনে সাজদারত দেখেছি।' তারপর সূরা শেষ পর্যন্ত এভাবে অব্যাহত থেকেছে।

সুতরাং 'আমি তোমার কাছে সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি,' ..... আল্লাহর এই উক্তি কেসসা নাযিল হবার স্বাভাবিক ভূমিকা বলেই প্রতীয়মান হয়।

এ ছাড়া 'আলিফ লাম-রা' এই বিচ্ছিন্ন আয়াতগুলো, এই অক্ষরগুলো আল্লাহর কেতাবের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করা এবং আল্লাহ তায়ালা এই কেতাবকে আরবী কোরআনরূপে নাযিল করেছেন- এ কথা বলাও এ সূরার মক্কী সূরা হওয়ার লক্ষণ। মক্কার মোশরেকরা প্রচার করতো যে, একজন অনারব লোক এসে মোহাম্মদ (স.)-কে কোরআন শিখিয়ে যায়। তাদের এ দাবীর জবাবেই বলা হয়েছে যে, এ কোরআন তো আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এটা একজন অনারবের শেখানো কেতাব হলে তা তো আরবী ভাষায় হতে পারে না। উপরন্তু তা এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে এসেছে, যা তাঁর একেবারেই অজানা ছিলো।

আরো একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সূরার এই ভূমিকা এর শেষে বর্ণিত উপসংহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরার শেষাংশে একটা আয়াতে বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

'এগুলো অদৃশ্য জগতের তথ্যসমূহ, যা আমি তোমার কাছে পাঠাই .....' (আয়াত ১০২)

কাহিনীর ভূমিকা ও উপসংহারের এই গভীর সংযোগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা ও উপসংহার উভয়ই কেসসার সাথে নাযিল হয়েছে।

সপ্তম আয়াত ছাড়া সূরার বক্তব্য আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এটা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয় যে, সূরাটা মক্কায় নাযিল হয়েছে। অথচ সপ্তম আয়াত মক্কায় নাযিল হয়নি, আবার মদীনায় গিয়ে ওটাকে নাযিল করে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ অষ্টম আয়াতের 'কালু' (অর্থাৎ তারা বললো) শব্দটিতে একটা সর্বনাম রয়েছে, (তারা) যা দ্বারা ইউসুফের ভাইদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, সপ্তম ও অষ্টম উভয় আয়াত এক সাথে নাযিল হয়েছে এবং তা সূরার একই পর্বের অংশ।

সমগ্র সূরা ইউসুফের বিষয়বস্তু, পটভূমি, বক্তব্য, শিক্ষা সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটা একটা অখন্ড ও একক সূরা এবং এতে মক্কী সূরার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। উপরন্তু এতে রসূল (স.)-এর জীবনের এই চরম সংকটময় পরিস্থিতির লক্ষণই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কোরায়শদের জাহেলী সমাজে রসূল (স.) যখন আবু তালেব ও খাদিজার মৃত্যুজনিত বিষাদময় বছর থেকে শুরু করে চরম নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সহচর মুসলমানরাও নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে তাঁর মহান ভাই হযরত ইউসুফের কাহিনী শুনান। রসূল (স.) ও মুসলমানরা কোরায়শদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ভোগ করেন, তার মধ্যে দৈহিক নির্যাতন, নির্বাসন এবং সামাজিক অবরোধও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র ও হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফও তাঁর ভাইদের পক্ষ থেকে রকমারি যুলুম নির্যাতন ভোগ করেন। ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কুয়ায় নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা চালায়, নিজের অনিচ্ছা সত্তেও ক্রীতদাস হয়ে একটা পণ্যদ্রব্যের মতো এক হাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকেন, তাঁর পিতামাতা বা পরিবার পরিজনের কাছ থেকে সাহায্য ও সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকেন, মিসরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী এবং অন্য নারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রথমে অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনা দেয়া হয়, পরে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসানো হয়, কারাযন্ত্রণা ভোগ করানো হয়, তারপর তিনি প্রাচুর্য ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে জনগণের খাদ্য ও ভোগ্য দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশেষে তিনি মানবিক ভাবাবেগের অগ্নিপরীক্ষায় জর্জরিত হন এবং তাঁর সেই ভাইদেরই মুখোমুখি হন, যারা তাঁকে শুধু কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো তা নয়; বরং তাঁর যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার কারণও ছিলো। এসব দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনে হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু ধৈর্য ধারণই করেননি; বরং এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজও চালিয়ে গেছেন। এভাবে এসব কঠিন পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের চরম সাফল্যের স্তরে

www.pathagar.com

উপনীত হন। এ স্তরটি ছিলো তাঁর পিতামাতার সাক্ষাত–যা ছিলো তাঁর সূর্য চন্দ্র ও এগারোটা নক্ষত্র কর্তৃক তাঁকে সাজদা করার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। এ স্তরে পৌঁছে তিনি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এই সর্বশেষ স্তর ও আল্লাহর প্রতি তাঁর এই আত্মসমর্পণের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে সূরার ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং আয়াতে।

'অতপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে নিজের কাছে পুনর্বাসিত করলেন.....' ক্ষমতা ও প্রাচর্যের মধ্যেও তাঁর সর্বশেষ দোয়া ছিলো, 'আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দেন এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' এতো দীর্ঘ দুঃখকষ্ট ভোগ, এমন জাঁকজমকপূর্ণ সাফল্য লাভের পরও এই ছিলো তার একমাত্র দাবী।

সুতরাং হযরত ইউসুফের এই কাহিনী এবং এর উপসংহার বর্ণনার মাধ্যমে এ সূরা যদি রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের অমানুষিক যুলুমের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে সান্ত্বনা হিসাবে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বরঞ্চ আমার তো মনে হয়, এ সূরা দ্বারা রসূল (স.)-কে এরূপ একটা আভাসও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে এমন একটা নতুন জায়গায় পুনর্বাসিত করা হবে, যেখানে বিজয় তার নিত্যসংগী হবে, যেমন হযরত ইউসুফকে মা বাবার কোল থেকে নিয়ে বিস্তর দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয় ও সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানো হয়। মাতৃভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই পর্বটা ভীতি ও শংকার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকলেও পরিণামের দিক দিয়ে তা ছিলো সাফল্যের সূচনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এভাবেই আমি ইউসুফকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় আসীন করেছি.....' (আয়াত ২১)

হযরত ইউসুফ যে মুহূর্তে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে পদার্পণ করেন, এমনকি যখন তিনি দাস হিসাবে বিক্রি হবার মতো একজন তরুণ মাত্র, তখন থেকেই তার ক্ষমতা লাভের পালা শুরু হয়েছে। সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা আমাকে এতো অভিভূত করেছে যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, শুধু সামান্য আভাস দিতে পারি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককেই শুধু ওহী পাঠাতাম..... রসূলরা যখনই হতাশ হয়ে যেতো এবং ভাবতো যে, তাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য আসতো..... '

এ আয়াত তিনটায় আল্লাহর নবীরা হযরত ইউসুফের মতো হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে পড়লে আল্লাহ তায়ালা কোন রীতি অবলম্বন করেন তার বর্ণনা রয়েছে। সেই সাথে এই মর্মে ইংগিতও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পর প্রত্যাশিত সাফল্য দান করেন। এ ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত মোমেন বান্দারা এ পর্যায়ক্রমিক সাফল্য যথাযথভাবেই উপলব্ধি করে থাকেন।

www.pathagar.com

এই সূরার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে হযরত ইউসুফের কাহিনীটা পূর্ণাংগভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফের কাহিনী ছাড়া কোরআনে অন্য যতো কাহিনী রয়েছে, তা সাধারণত এক একটা সূরায় আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওই সূরার মূল বক্তব্যের সাথে মিল রেখেই কাহিনীর অংশটা নির্বাচন করা হয়েছে। কোনো সূরায় একটা কাহিনী পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করা হলেও তা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন হযরত হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়বের কাহিনী। একমাত্র হযরত ইউসুফের কাহিনীই একই সূরায় পরিপূর্ণভাবে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দিক থেকে সূরা ইউসুফ কোরআনের অন্য সব সূরার তুলনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই বিশিষ্টতা কাহিনীর প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল এবং সেই প্রকৃতিকে তা পূর্ণভাবে তুলে ধরেছে। সূরার সূচনা হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি হয়েছে ওই স্বপ্নের বাস্তব রূপ লাভের মধ্য দিয়ে। এর অংশবিশেষ এই সূরায় এবং অপর অংশ অন্য সূরায় থাকলে তা মানানসই হতো না। সূরার এই বৈশিষ্ট্য তাকে একটা পরিপূর্ণ বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য সফল হওয়া ও তার উপসংহারে যে শিক্ষা ও মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেটা এ সূরার অতিরিক্ত অবদান।

এবার আমি এই সূরায় কোরআনের যে বিশিষ্ট বর্ণনাভংগির সাক্ষাত পাওয়া যায়, তাতে কাহিনী বর্ণনার যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে তা একটু বিশদভাবে আলোচনা করবো।

সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে গল্প বলার ইসলামী রীতি কী, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সূরা ইউসুফ এ ক্ষেত্রে একটা অনুকরণীয় আদর্শ, যা মনস্তাত্ত্বিক, আকীদাগত ও আন্দোলনগত– সর্বদিক দিয়েই একটা পূর্ণাংগ মডেল। যদিও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভংগিতে কোরআন সর্বত্রই এক অভিন্ন, তথাপি সূরা ইউসুফকে দেখে মনে হয়, এটা যেন শৈল্পিক প্রকাশ নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে নির্ধারিত একটা প্রদর্শনী সূরা।

এই কাহিনীতে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। তিনিই সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের জীবনের সকল দিক ও কর্মক্ষেত্র, সকল কর্মক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত নীতি ও আচরণ, এই ব্যক্তিত্ব যেসব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, যথা অভাব ও দৈন্যের পরীক্ষা, প্রাচুর্যের পরীক্ষা, অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনার পরীক্ষা, ক্ষমতাসীন হওয়ার পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও নীতির ব্যাপারে মানবীয় ভাবাবেগের পরীক্ষা– এই সব পরীক্ষায় এ পুণ্যময় ব্যক্তিত্বের সফল উত্তরণ এবং তাঁর একনিষ্ঠ আল্লাহভক্তি ও আল্লাহভীতির নিখুঁত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রধান ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এ সূরায় আরো কিছু ভিন্ন মানের ও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মানবীয় মনস্তত্ত্বের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত ইয়াকুবের পুত্রস্নেহ ও নবীসুলভ সংযমের নমুনা, হিংসুটে, ঈর্ষাকাতর ও কূচক্রী ভাইদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাদের বিব্রতবোধ ও

www.pathagar.com

ঘাবড়ে যাওয়ার নমুনা, তাদের মধ্যকার একজনের স্বতন্ত্র আচরণের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর উৎকট যৌনাবেগ ও পরকীয়া প্রেমের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় পরিবেশে তার এ প্রেমকে বৈধ করার অপপ্রয়াসের এবং সেই রাজকীয় ও উচ্চ শ্রেণীর নারী সমাজের নমুনা পেশ করা হয়েছে। নমুনা পেশ করা হয়েছে তৎকালীন নোংরা সামাজিক পরিবেশের এবং সেকালের মিসরীয় নারীদের অদ্ভুত যুক্তিরও। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও তার যুবক-ভৃত্য সম্পর্কে ওই নারীদের বক্তব্য, তাদের পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফকে প্ররোচনাদান ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে হুমকি প্রদান থেকে ওই অদ্ভুত যুক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া হযরত ইউসুফের কারাবাস থেকেও বুঝা যায়, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কি ধরনের চক্রান্তের জাল বোনা হয়ে থাকে। এখানে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রের নমুনাও প্রকাশ পেয়েছে, যিনি স্বীয় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর অপরাধপ্রবণতা দেখেও না দেখার ভান করেন। কেননা তিনি তাঁর শ্রেণী ও পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। প্রকাশ পেয়েছে স্বয়ং সম্রাটের নৈতিকতার নমুনাও, যিনি ক্ষণেকের জন্যে মহানুভবতার চমক দেখিয়েই অন্তর্হিত হয়ে যান যেমনটি হন আযীয অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। এভাবে সূরায় বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব ও বহু সংখ্যক পরিবেশ, বহু সংখ্যক দৃশ্য, তৎপরতা এবং আবেগ অনুভূতিকে পরিপূর্ণ বাস্তবতা ও মানবিকতার পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কাহিনীটা বাস্তবতার মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ বলে তার শৈল্পিক উপস্থাপনায় ইসলামী রীতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনীর উপস্থাপনা যে যথার্থই সত্যনিষ্ঠ, মনোমুগ্ধকর ও নিখুঁত তা সন্দেহাতীত। একদিকে এতে মানবচরিত্রের কোনো বাস্তব দিকই উপেক্ষিত হয়নি আবার অপরদিকে বাস্তবতার নামে পাশ্চাত্যের নোংরা এবং অশ্লীল চিত্রও তুলে ধরা হয়নি।

কাহিনীতে নানা মানবিক দুর্বলতা, এমনকি যৌন আবেগের মুহূর্তটাকেও নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে বটে। এ ক্ষেত্রে কোন বাস্তব অবস্থা মোটেই বিকৃত করা হয়নি, কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক নৈতিক পরিমন্ডল বিষিয়ে তুলতে পারে এমন অশ্লীল বিবরণ দেয়া হয়নি, যাকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে 'বাস্তবতা', 'স্বাভাবিকতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সত্যের কতো গভীরতা ও কতো শালীন বাস্তবতা থাকলে কেসসা কাহিনী এতো চমকপ্রদ হতে পারে, তা এই সূরায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্ব ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা পূর্ণাংগ অথচ চমকপ্রদ, পরিচ্ছন্ন ও শালীন কাহিনী উপহার দিয়েছে সূরা ইউসুফ।

প্রথমে দেখা যাক হযরত ইউসুফের ভাইদের পরিচিতি কিভাবে এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এতো বেশী হিংসুটে ছিলো যে, ভ্রাতৃহত্যা যে একটা ও ঘৃণ্য অপরাধ, সে ধারণাই তাদের বিবেক থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিলো। উপরন্তু এমন একটা 'আইনগত ছুতো'ও তারা পেয়ে গিয়েছিলো যা তাদের ওই অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। আল্লাহর বিশিষ্ট নবী হযরত ইয়াকুবের ছেলে, হযরত

www.pathagar.com

ইসহাকের পৌত্র ও হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র হওয়ার কারণে তাদের চিন্তায়, আবেগে ও ঐতিহ্যে ধর্মীয় পরিবেশের যে ছাপ ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ হত্যাকান্ডটা যাতে যুক্তিসংগত প্রমাণিত হয় এবং এর বীভৎসতা যাতে হালকা হয়, সে জন্যে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটা যুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলো। তাদের এ পরিচিতি সূরার আয়াত নং ৭ থেকে আয়াত নং ১৮ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

এরপর কাহিনীর প্রতিটি পর্যায়ে আমরা তাদের মধ্যে এই একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বহাল দেখতে পাই। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট একজনের আচরণও কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম দেখতে পাই। তিনি তাদের ইউসুফের ভাইকে সাথে করে আনার নির্দেশ দেয়ার পর তারা যখন তাকে নিয়ে এলো, তখন তারা তাঁকে চিনতেই পারলো না। তারা ভাবলো, এ তো হচ্ছেন মিসরের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছে তারা কেনান থেকে এসেছে দুর্ভিক্ষের সময় গম কিনতে। এই সময় আল্লাহ হযরত ইউসুফের জন্যে কৌশল তৈরী করলেন তার ভাইকে তাদের কাছ থেকে রেখে দেয়ার। তার পণ্যসম্ভারের মধ্যে রাজার পানপাত্র পাওয়া গেছে এ অজুহাতে তাকে রেখে দেয়া হলো। এই কৌশল দেখে এবং এর পশ্চাতের রহস্য বুঝতে না পেরে তাদের মনে ইউসুফ বিরোধী পুরনো বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা বলে উঠলো,

'ও যদি চুরি করে থাকে তবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? ইতিপূর্বে ওর ভাই ইউসুফও তো চুরি করেছিলো।.....' (আয়াত ৭৭)

অনুরূপভাবে তারা যখন তাদের পিতা হযরত ইয়াকুবের মনে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আঘাত দিলো, তখনও তাদের একই চরিত্র বহাল দেখা গেলো। তারা যখন দেখলো, তাদের পিতা আবারো ইউসুফের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছেন, তখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মনোকষ্টের কথা বিবেচনায় আনা তো দূরের কথা, তাদের মনে আগের সেই হিংসা পুনরায় জেগে উঠলো।

ইয়াকুব (আ.) তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। তাঁর চোখ দুটো মর্মযাতনায় সাদা হয়ে গেলো....।' তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, অমনি ইউসুফের কথা স্মরণ করতে করতে মরণাপন্ন হয়ে..... যাবেন।' (আয়াত ৮৪ ও ৮৫)

শেষ পর্যায়ে যখন ইউসুফ (আ.) পিতার কাছে নিজের জামা পাঠিয়ে দিলেন এবং সে সময়েও যখন তারা দেখলো, তাদের পিতা ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছেন, তখন ইউসুফের প্রতি পিতার এ গভীর মমত্ববোধ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তারা পিতাকে এ জন্যে ভর্ৎসনা না করে ছাড়েনি।

'ইয়াকুব বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ....' (আয়াত ৯৪-৯৫)

এরপর আসে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রসংগ। এ মহিলা ইউসুফের প্রেমে এতো বেশী উতলা হয়ে ওঠে যে, নারীসুলভ লজ্জা, ব্যক্তিগত মর্যাদা, শীর্ষস্থানীয় সামাজিক অবস্থান কিংবা পারিবারিক কেলেংকারি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে সব রকমের

www.pathagar.com

নারীসুলভ ফন্দি ফিকির ও ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে, যাতে নিজেরও মতলব সিদ্ধ হয় এবং নিজের নির্লজ্জতা সম্পর্কে সমাজের প্রচারণার জবাবও দেয়া যায়। যে ইউসুফ তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাকে সে এমন শাস্তি দেয় যা প্রাণঘাতী হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী মহিলাদের দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে তাদের সামনে নির্লজ্জের মতো নিজের প্রেমের সাফাই গায়। যা তখনকার মিসরের অভিজাত নারী সমাজে মোটেই দূষণীয় ছিলো না। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের আচরণ ও এই বিশেষ মুহূর্তের স্বাভাবিক তৎপরতার নিখুঁত এবং বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি কোরআন তার স্বভাবজাত পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা বজায় রেখেছে। কোরআনের এই বর্ণনাভংগি নিসন্দেহে ইসলামী বর্ণনাভংগির শ্রেষ্ঠতম নমুনা। এমনকি সর্বাত্মক উন্মত্ততা ও পাশবিকতা নিয়ে যে মুহূর্তে মানসিক এবং দৈহিক কামনা বাসনার নগ্ন বহিপ্রকাশ ঘটে, সে মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়েও কোরআন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না। শৈল্পিক নৈপুণ্যের নামে দুর্ভাগা আধুনিক সভ্যতা 'স্বাভাবিক বর্ণনা' ও 'বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার' মোড়কে সাহিত্যের যে নোংরা আঁস্তাকুড় রচনা করে, কোরআন তার ধারে কাছেও যায় না। সূরার ২১ নং থেকে ৩৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষ্য করুন।

আমরা পুনরায় এই মহিলার সাক্ষাত পাই, যখন ইউসুফ এই মহিলা ও তার বান্ধবীদের ষড়যন্ত্রের ফলে জেলে ঢুকেছেন। জেলে থাকাকালে রাজা একটা স্বপ্ন দেখলেন, ইউসুফের সাথে জেলে অবস্থানকারী তরুণটি স্মরণ করলো, একমাত্র ইউসুফই স্বপ্নের তাবীর জানে, রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ইউসুফ তার ওপর কলংক লেপনকারী অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আসতে অস্বীকার করলেন। রাজা এ মহিলা ও তার বান্ধবীদের ডাকলেন। মহিলা এলে দেখা গেলো, সময়, বয়স ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার ভেতরেও পরিবর্তন এসেছে এবং দীর্ঘ এক তরফা প্রেম নিবেদনকালে ইউসুফের যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সে পেয়েছিলো, তার কারণে তার হৃদয়ে ঈমানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো..... ' (আয়াত ৫০-৫৩)

এবার এ সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত ইউসুফের প্রসংগে আসা যাক। আল্লাহর এক সৎ ও পুণ্যময় বান্দা ইউসুফ (আ.)। তবে তিনি একজন মানুষও বটে। কোরআন তাঁর মানবীয়তা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি। তিনি যদিও এক নবী পরিবারে জন্মেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন, তথাপি একজন মানুষের যতো দুর্বলতা থাকতে পারে, সেসব সহকারেই তিনি এ গুরুতর ঝুঁকিপূর্ণ বিপদের মোকাবিলা করেছেন। মহিলাটি যখন তাঁর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন এক পর্যায়ে তিনিও মানবিক দুর্বলতাবশত তার প্রতি ঝুঁকেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অধপতন থেকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেও টের পেয়েছিলেন যে, নারীদের ফন্দি ফিকির, ইসলামবিরোধী পরিবেশ, প্রাসাদ পরিবেশ ও প্রাসাদবাসী নারী সমাজের মোকাবেলা করায় তার দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু তিনি দৃঢ় ও অবিচল ভূমিকা অবলম্বন করলেন। ব্যক্তিত্বের স্বভাব

www.pathagar.com

ও বাস্তবতা সম্পর্কে একটা কথাও বিকৃত করা হয়নি। অথচ এই বর্ণনায় জাহেলী নোংরামিকেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। কেননা এটাই একমাত্র নিখুঁত সঠিক বাস্তবতা।

এখন আসুন 'আযীয' অর্থাৎ মিসরের প্রধানমন্ত্রী প্রসংগে। তাঁর নেতৃত্ব ও পদের দম্ভ, সামাজিক পদমর্যাদা, সমাজের চোখে নিন্দনীয় দোষগুলো লুকানো ও সংরক্ষণের প্রবণতা– এ সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে তার এ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়।

এবারে দেখা যাক ওই সময়কার মিসরীয় নারী সমাজের অবস্থা কি রূপ ছিলো সেদিকে। এ সমাজেরই একজন বিশিষ্ট রমণী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। তিনি তার ক্রীতদাস ইউসুফের প্রেমে পড়েন এবং তাকে কু-কর্মের প্ররোচনা দেন। সাধারণ নারীরা প্রথমে তার নিন্দায় সোচ্চার হয়, কিন্তু সে নিন্দার আসল কারণ ওই অপকর্মের প্রতি ঘৃণা নয়; বরং মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা। এরপর আকস্মিকভাবে তারা ইউসুফকে দেখতে পায়। দেখামাত্রই তারা ওই মহিলার প্রেমের প্রতি সমর্থন দিয়ে বসে, যাকে ইতিপূর্বে তারা নিন্দা করতো। এরপর প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী যখন অনুভব করলো, তার নিন্দুকিনীরা সবাই তার পূর্ণ সমর্থক হয়ে গেছে, তখন সে নিজেকে একেবারেই নিরাপদ মনে করে বল্গাহীন হয়ে উঠলো। কেননা তারা সবাই ওই মহিলার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলো। উপরন্তু ইউসুফকে সবাই মিলে বিপথগামী করতে সচেষ্ট হচ্ছিলো। অথচ একটু আগেই তারা তার নৈতিক পবিত্রতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাকে 'মানুষ নয়; বরং সম্মানিত ফেরেশতা' বলে আখ্যায়িত করেছিলো। তারা যে তাকে সম্মিলিতভাবে বিপথগামী করতে চেয়েছিলো তা বুঝা যায় হযরত ইউসুফের এই কথা দ্বারা! 'হে আমার প্রতিপালক, ওরা যে দিকে আমাকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্যে ভালো। তুমি যদি ওদের চক্রান্ত নস্যাত করে আমাকে রক্ষা না করো, তবে আমি .....অজ্ঞ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।' (আয়াত-৩৩)

বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একাই নয়; বরং গোটা নারী সমাজই ইউসুফের প্রেমে পড়েছিলো।

পরবর্তী যে বিষয়টা এই সূরায় লক্ষণীয় তা হলো মিসরের সার্বিক পরিবেশ। ওপরে যে বিষয়গুলো আলোচিত হলো তার মধ্য দিয়ে এবং ইউসুফের নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে কারাদন্ড দেয়ার মধ্য দিয়ে বুঝা যায়, সেখানকার সার্বিক পরিবেশ সৎলোকদের নয় বরং অসৎ লোকদের অনুকূল ছিলো। হযরত ইউসুফকে কারাদন্ড দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এক অভিজাত নারীর কেলেংকারি এবং তার আলামত ধামাচাপা দেয়া, তাতে ইউসুফের মতো একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে তো করুক! (আয়াত ৩৪)

আমরা যখন ইউসুফের ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করি, তখন কাহিনীর কোনো একটি পর্যায়েও তার ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহত্বের একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত থাকতে দেখি না। সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে এক সৎ বান্দা ও নবী পরিবারের একজন সদস্য

www.pathagar.com

হিসেবে তাঁর মধ্যে যে উচ্চতর নৈতিক এবং ধর্মীয় গুণবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার কথা তা সর্বাবস্থায় বহাল থাকতে দেখা যায়। এমনকি কারাগারের যাতনাময় অন্ধকার কুঠুরীতে বসেও তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তা সহকারে কারাসংগীদের ইসলামের দাওয়াত দিতে ভোলেন না, বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে হৃদয় জয় করার নিখুঁত কৌশল অবলম্বন করে দৃঢ় ও অনমনীয়ভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন। সেই সাথে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সততা এবং দ্বীনদারীকেও দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেন।

'তাঁর সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন মদ তৈরী করছি।.....' (আয়াত ৩৫-৪১)

এসব সত্তেও তিনি মানুষ। তাঁর ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা কিছু না কিছু ছিলো। যেমন তিনি রাজাকে নিজের খবরাখবর জানিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা চালান। এ দ্বারা তিনি আশা করেন, রাজা হয়তো সেই কুটিল ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করবেন, যার কারণে তিনি জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইউসুফ মুক্তি পাবার আশায় আশান্বিত লোকটাকে বললো, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো, কিন্তু শয়তান তাকে ..... ভুলিয়ে দিলো....।' (আয়াত-৪২)

এর কয়েক বছর পর আমরা হযরত ইউসুফের ভূমিকা দেখতে পাই। তখন রাজা এক স্বপ্ন দেখেন এবং জ্যোতিষীরা ও ধর্মীয় পুরোহিতরা তার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। ঠিক তখনই জেলখানার সংগীর ইউসুফের কথা মনে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আল্লাহ তার এই পুণ্যময় বান্দাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এতোটা উৎকর্ষ দান করেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্যে যে পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত হয়ে যান। এমনকি তিনি রাজার স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়ার পর রাজা যখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন, তখন তিনি সেই মুক্তির সুযোগও গ্রহণ করতে রাযি হলেন না। তিনি মুক্তির জন্যে শর্ত দিলেন, আগে তাঁর নামে আরোপিত অভিযোগের তদন্ত করে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে।

'রাজা বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সাতটা মোটা মোটা গাভীকে সাতটা চিকন চিকন গাভী গিলে খেয়ে ফেলছে .....' (আয়াত ৪৩-৫৫)

এই সময় আমরা দেখতে পাই হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, পরিপক্ব শান্ত, শিষ্ট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। আর এই পর্যায়েই আমরা দেখতে পাই, তিনি মিসরের সকল ঘটনার একক নায়ক ও মধ্যমণি হয়ে উঠলেন, আর রাজা, প্রধানমন্ত্রী (আযীয), নারী সমাজ ও বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ কোথায় যেন ক্রমান্বয়ে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। কাহিনীর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পটভূমি সম্পর্কেই কোরআন বলেছে,

'এইভাবে আমি দেশে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যার ফলে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলো.....' (আয়াত ৫৬-৫৭)

www.pathagar.com

আর এই সময় থেকেই দেখতে পাই, হযরত ইউসুফ নতুন বিচিত্র কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপক্বতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হন।

আমরা দেখতে পাই, কুয়ায় নিক্ষেপের পর প্রথম বারের মতো হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের মুখোমুখি হয়েছেন। এ সময় তিনি তাদের তুলনায় সর্বদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাবান, কিন্তু তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযমের লক্ষণ সুস্পষ্ট। (আয়াত ৫৮-৬১)

আরো দেখতে পাই, আল্লাহর শিখানো কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে তিনি নিজের ছোট ভাইকে কাছে রেখে দিলেন। এখানেই আমরা দেখতে পাই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, গাম্ভীর্য, সংযম ও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা। (আয়াত ৬৯-৭৯)

এরপর আমরা সেই অবস্থার সাক্ষাত পাই, যখন হযরত ইয়াকুবের সকল দুঃখকষ্টের অবসান ঘটে, আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল পরীক্ষার সফল পরিসমাপ্তি ঘটান। হযরত ইউসুফ পিতামাতা ও পরিবারের সাথে মিলিত হন। তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তাদের কাছে নিজের পরিচয় মৃদু তিরস্কার সহকারে তুলে ধরেন এবং তাদের ক্ষমা করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে এ ধরণের আচরণই কাংখিত। (আয়াত ৮৮-৯৩)

সর্বশেষে সেই মহান ও চমকপ্রদ পর্যায়টা ঘনিয়ে আসে, যখন হযরত ইউসুফ তার পিতামাতা ও সকল ভাইয়ের সাথে মিলিত হন এবং তার স্বপ্ন সফল হয়। অথচ তিনি এই গৌরবময় সাফল্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহর সাথে একান্ত সংলাপে নিরত হন, 'হে আমার প্রতিপালক,..... আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং সৎলোকদের সাথে যুক্ত করো।' (আয়াত ১০১) এভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্বকে একটা পূর্ণাংগ একক ও বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

এরপর হযরত ইয়াকুবের প্রসংগ। একজন অত্যন্ত স্নেহময় ও পুত্রবৎসল পিতা এবং আল্লাহর এক প্রিয় নবী হিসাবে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইউসুফের স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি একাধারে আশা ও আতংকে দুলতে থাকেন। তিনি এ স্বপ্নের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস যেমন পান, তেমনি শয়তান তাঁর ছেলেদের মনে কোনোরকম কু-প্ররোচনা ঢুকিয়ে দিয়ে কোন অঘটন ঘটায় কিনা, সেই ভাবনায়ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। (আয়াত ৪-৬)

অতপর আমরা দেখতে পাই, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছ থেকে তাঁর ছেলেরা অনেক অনুনয় বিনয় করে ইউসুফকে নিয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ফিরে এসে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনালো।

এ সময় তিনি মানবসুলভ ও নবীসুলভ বাস্তব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। (আয়াত ১১-১৮)

আমরা পুনরায় এ ব্যক্তিত্বকে তাঁর যাবতীয় বাস্তব ও স্বাভাবিক গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে দেখতে পাই। এ সময় ছেলেরা পুনরায় তাঁর কাছে আবদার তোলে তাঁর

www.pathagar.com

কলিজার আরেক টুকরো অর্থাৎ ইউসুফের সহোদর ছোট ভাইকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্যে। কেননা মিসরের প্রধানমন্ত্রী হযরত ইউসুফ তাকে নিয়ে যেতে বলেছেন আরো এক ভাগ বাড়তি গম আনার জন্যে, যা দুর্ভিক্ষের সময় অত্যন্ত জরুরী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মিসরের এ নয়া প্রধানমন্ত্রী যে তাদেরই ভাই ইউসুফ, তা তারা চিনতেই পারেনি।

'তাদের পিতার কাছে তারা বললো, আব্বা, আমাদের গমের একটা অংশ দেয়া হয়নি। কাজেই আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন।' .....(আয়াত ৬৩-৬৮)

এরপর হযরত ইয়াকুব যখন তাঁর দ্বিতীয় মর্মবিদারী ঘটনার সম্মুখীন হন, তখনো তাঁকে দেখতে পাই একজন স্নেহশীল পিতা ও একজন আল্লাহ প্রিয় নবী হিসাবে। হযরত ইউসুফ যখন তার ভাইকে রেখে দিলেন, তখন হযরত ইয়াকুবের এক ছেলে তাদের সাথে আর বাড়ী ফিরে যায়নি। এ ছেলে তাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলো। সে ভয় পাচ্ছিলো, পিতার সাথে এক কঠোর অংগীকার করে আসার পর এখন তাঁর সাথে কিভাবে দেখা করবো? হাঁ, পিতা অনুমতি দিলে বা আল্লাহ কোনো ফয়সালা করলে সেটা আলাদা কথা।

'যখন তারা ছোটো ভাই সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলো, তখন তাদের বড়োজন বললো, তোমরা কি জানোনা যে আব্বা আমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন .....?' (আয়াত ৮০-৮৭)

এই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ মর্মন্তুদ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দেখতে পাই এক অলৌকিক ঘটনা! তিনি ইউসুফের জামায় ইউসুফের ঘ্রাণ পান। এতে ছেলেরা তাঁকে তিরস্কার করলেও তিনি তাতে অবিচল থাকেন এবং তাঁর প্রতিপালকের প্রতি সুধারণায় কিছুমাত্র সন্দেহ সংশয় পোষণ করেন না। (আয়াত ৯৪-৯৮)

বস্তুত এ ছিলো এক অসাধারণ নবীর ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আবেগ, বাস্তবানুগতা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাকার যাবতীয় অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। কোনো বিকৃতি ও ঘাটতি এতে স্থান পায়নি।

সত্যনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ বাস্তবানুগতা শুধু মানুষের ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ তা ঘটনা, বর্ণনা, স্থান, পরিবেশ, তার সত্যতা ও স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। এর ফলে প্রতিটা কাজ, কথা ও চিন্তা উপযুক্ত সময়ে এবং প্রত্যাশিতরূপেই সংঘটিত হয়। তার গুরুত্ব, ভূমিকা ও জীবন প্রবাহের প্রকৃতি অনুসারে তা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যে এ জিনিসগুলো যথাযথভাবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এমনকি এ সূরার কাহিনীতে যৌন আবেগের মুহূর্তগুলো ও তার বিভিন্ন পর্যায় সংক্রান্ত আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তা পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতার সীমার মধ্যেই থেকেছে এবং 'মানুষে'র জন্যে যতোটা প্রয়োজন ততোটা শালীনতার মধ্যেই থেকেছে। মানবীয় বাস্তবতার ব্যাপক সত্যানুগ ও সম্পূরক রূপকে এতে

www.pathagar.com

কিছুমাত্র বিকৃত ও ম্লান করা হয়নি, কিন্তু অন্যান্য ঘটনা ও ভূমিকার সাথে যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে ওই মুহূর্তগুলো তুলে ধরার অর্থ এ নয় যে, যৌনতাকে মানুষের সমগ্র বাস্তবতা, তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত আমাদের এটাই বুঝাতে চায়।

জাহেলিয়াত শৈল্পিক বস্তুনিষ্ঠতার নামে। মানুষের সাময়িক যৌন আবেগকে সে এমনভাবে তুলে ধরে যেন ওটাই মানবজীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। এভাবে সে একটা বিরাট ও সুগভীর আঁস্তাকুড় তৈরী করে এবং সেই সাথে তাকে শয়তানী ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে।

জাহেলিয়াত এ কাজটা এ জন্যে করে না যে, সে এটাকেই বাস্তব ও সত্য মনে করে এবং এ জন্যেও করে না যে, সে এই বাস্তবতার চিত্র অংকনে নিষ্ঠ। সে এ কাজটা করে শুধু এ জন্যে যে, ইহুদীবাদী সংস্থাগুলো তার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করে। মানুষকে তারা মনুষ্যত্বহীন নিছক একটা পশু বানিয়ে ফেলতে চায়। যাতে বিশ্ববাসীর সামনে একমাত্র ইহুদীরাই মানবীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত না হয়। তারা চায় সমগ্র মানবজাতিই পাশবিকতার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হোক এবং ওই আঁস্তাকুড়েই সমস্ত শক্তি নিশেষিত হোক। মানবজাতিকে ধ্বংস করার সবচেয়ে নিশ্চিত অব্যর্থ পন্থা এটাই। এভাবে মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার পর তাকে অভিশপ্ত সম্ভাব্য ইহুদী সাম্রাজ্যের সামনে নতজানু করা যাবে বলে তারা আশা করে। এর পাশাপাশি তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদসমূহ প্রচার করে ওই একই উদ্দেশ্যে। এসব বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ডারউইন তত্ত্ব', 'ফ্রয়েড তত্ত্ব', 'মার্কসবাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। এই সব ক'টা মতবাদই ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সমভাবে কার্যকর রয়েছে।

হযরত ইউসুফের কাহিনী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর ঐতিহাসিক অবস্থানকাল চিহ্নিত করে দিয়েছে। সেই ঐতিহাসিক সময়টা চিহ্নিত করার জন্যে কয়েকটা প্রতীকী বক্তব্যের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

ওই সময়টাতে মিসর ফেরাউন নামে সুপরিচিত মিসরীয় রাজপরিবার দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো না; বরং এক শ্রেণীর 'পশুপালক' দ্বারা শাসিত হতো এবং হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব তাদেরই কাছাকাছি সময়ে জীবন যাপন করে গেছেন। আল্লাহর এই নবীদের কাছ থেকে এই শাসকরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা লাভ করেছিলো। এই শাসকরা যে ফেরাউন ছিলো না তার প্রমাণ হলো, কোরআনে এই শাসকদের ফেরাউনের পরিবর্তে 'মালিক' তথা রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ হযরত মূসার আমলের রাজাকে ফেরাউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে মিসরে হযরত ইউসুফের আগমনের সঠিক সময়কাল কোনটা তা বুঝা যায়। এটা ছিলো ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ রাজপরিবারের মধ্যবর্তী সময়। এ পরিবারগুলো ছিলো রাখাল পরিবার। মিসরীয়রা এদের ঘৃণাবশত 'হাকসুম' বলে আখ্যায়িত করতো।

www.pathagar.com

প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় হাকসুম অর্থ হলো 'শূকর' বা 'শূকরের রাখাল।' এ সময়টা প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

এ সময়টাই ছিলো হযরত ইউসুফের নবুওতের সময়। তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ কারাগারে বন্দী থাকাকালেই শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এ দ্বীনকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও তাঁর পিতা-পিতাম হযরত ইবরাহীম, এসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেন।

সূরা ইউসুফের ৩৬ থেকে ৪০ নং পর্যন্ত আয়াত ক'টায় তাঁর এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

এ হচ্ছে ইসলামের সুস্পষ্ট, পূর্ণাংগ, নিখুঁত ও সর্বাত্মক রূপ। আল্লাহর নবী রসূলদের সবাই এই ইসলাম নিয়েই এসেছেন। এর মৌলিক আকীদা বিশ্বাস হলো আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত আনুগত্য করা, তাঁর সাথে আর কাউকে মোটেই শরীক না করা। আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁকে চিনতে হবে। তিনি হচ্ছেন এক, একক ও মহা প্রতাপশালী। এ আয়াত ক'টাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কোনো শাসন ক্ষমতাই নেই। সকল শক্তি ও শাসন ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রভুত্ব করা মানুষকে গোলাম বানানোর শামিল, যা এক আল্লাহর এবাদাতের সুস্পষ্ট লংঘন। এবাদাতের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে কারো শাসন ক্ষমতার আনুগত্য করা ও কারো প্রভুত্ব মেনে নেয়া। এখানে আল্লাহর দ্বীনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এই যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা ও একমাত্র তাঁর এবাদাত করা। বস্তুত হুকুম মানা ও এবাদাত করা সমার্থক। 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত না করো। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক দ্বীন।' বস্তুত এটাই হলো ইসলামের সবচেয়ে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, পূর্ণাংগ ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ।

এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মিসরের ক্ষমতার মসনদে আসীন হলেন, তখন তিনি এরূপ ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। বস্তুত মিসরে তাঁর হাতেই ইসলামের বিস্তার ঘটে। এ সময় তিনি শধু ক্ষমতার আসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বরং মানুষের জীবন জীবিকা ও দন্ডমুন্ডের কর্তাও ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফলে সঞ্চিত খাদ্যভান্ডার থেকে খাদ্য খরিদ করার জন্যে যেসব প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রতিনিধি দল আসতো, সেসব দেশেও ক্রমান্বয়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা দেখেছি, অন্যান্য দেশের ন্যায় জর্ডানের কেনান থেকে হযরত ইউসুফের ভাইয়েরাও মিসর থেকে খাদ্য কিনতে এসেছিলো। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় সমগ্র এলাকা জুড়ে কী সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো!

কাহিনীতে এ মর্মেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, মেষপালক গোষ্ঠীভুক্ত শাসকরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলো এবং হযরত ইউসুফের

www.pathagar.com

দাওয়াতের পর এই আকীদা বিশ্বাস ব্যাপকতা লাভের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছিলো। অন্তত দু'টো জায়গায় আমরা শাসকগোষ্ঠীর ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রভাবের লক্ষণ দেখতে পাই।

প্রথমটা হলো, হযরত ইউসুফ যখন মহিলাদের সামনে বেরিয়ে এলেন তখন তাদের মুখে আল্লাহ ও ফেরেশতার উল্লেখসহ স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ঘটে। তারা বললো

'হায় আল্লাহ, এ তো মানুষ নয়! এ তো সম্মানিত এক ফেরেশতা!' (আয়াত-৩১)

অনুরূপভাবে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রী স্বীয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাতেও এই প্রভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট। যেমন,

'ইউসুফ, তুমি এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাও। আর হে বেগম, তুমি তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো।' (আয়াত- ২৯)

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুস্পষ্ট ইংগিতটা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তার এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সে ইউসুফের আকীদাবিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামও গ্রহণ করেছে। কোরআনে তার যে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হলো,

'আযীযের (প্রধানমন্ত্রীর) স্ত্রী বললো, এখন সত্য বেরিয়ে পড়েছে। আমিই ওঁকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং ওঁ অবশ্যই সত্যবাদী।' ..... (আয়াত ৫২-৫৩)

যখন জানা গেলো, তাওহীদবাদী আকীদাবিশ্বাস মিসরের ক্ষমতায় হযরত ইউসুফের আরোহণের আগেই এতটা ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলো, তখন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের পর ইসলাম আরো ব্যাপক ও স্থিতিশীল হয়েছিলো। এরপর রাখাল রাজাদের আমলেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। পরে অষ্টাদশ রাজপরিবারের শাসনামলে যখন ফেরাউনরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করলো, তখন তারা তাওহীদী ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিরোধ শুরু করলো। কেননা ফেরাউনদের ক্ষমতার ভিত্তিই ছিলো পৌত্তলিকতা। ওদিকে হযরত ইয়াকুবের বংশধররা (যাদের অপর নাম বনী ইসরাঈল) ততোদিনে মিসরে এক বিরাট জনশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তারাই ছিলো একমাত্র ইসলামী জনগোষ্ঠী।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, ফেরাউনী শাসনামলে বনী ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের ওপর নির্যাতনের রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্য কারণ কী ছিলো?

রাজনৈতিক কারণটা হলো এই যে, হযরত ইয়াকুবের বংশধররা রাখাল রাজাদের আমলে কেনান থেকে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাসীন হয়। এরপর যখন মিসরীয়রা রাখাল রাজাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে, তখন তাদের সহযোগী বনী ইসরাঈলকেও বিতাড়িত করে। এর আসল কারণ হলো আকীদা বিশ্বাসের বৈপরীত্য। কেননা একমাত্র আকীদাগত বৈপরীত্যই অতো বড় পৈশাচিক নির্যাতনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ সঠিক তাওহীদী আকীদার

www.pathagar.com

বিস্তার ফেরাউনদের রাজত্বের ভিত্তিই ধসিয়ে দিতে সক্ষম। তাওহীদী আকীদাই স্বৈরাচারী আল্লাহদ্রোহী শাসকদের শাসন ও তাদের প্রভুত্বের আসল শত্রু।

সূরা মোমেনের এক জায়গায় এই মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউন এক পর্যায়ে যখন মূসা (আ.)-কে হত্যা করে তাওহীদী আকীদার মূলোৎপাটন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, তখন ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন, তিনি হযরত মূসার পক্ষ নিয়ে ফেরাউনের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ওই সূরায় বলা হয়েছে,

'ফেরাউন বললো, আমি মূসাকে হত্যা করবোই। সে তার খোদাকে ডাকুক। .....ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখেছিলো। সে বললো, এক ব্যক্তি 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক' এই কথাটা বলেছে– 'এ দোষেই কি তোমরা তাকে হত্যা করবে?' ..... (সূরা মোমেন ২৬-৩৫)

বস্তুত আসল দ্বন্দ্ব সংঘাতই ছিলো তাওহীদ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে। কেননা তাওহীদ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না এবং আর কারো সার্বভৌমত্ব মানে না। পক্ষান্তরে পৌত্তলিকতা ছাড়া ফেরাউনী স্বৈরাচার টিকেই থাকতে পারে না।

হযরত ইউসুফ মিসরে যে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, সম্ভবত তারই কিছু অসম্পূর্ণ ও বিকৃত রূপের সাথে হযরত মূসার আমলের মিসরীয় সম্রাট ফেরাউন আখনাতুনের পরিচয় ঘটেছিলো। বিশেষত এ কথা যদি সত্য হয় যে, আখনাতুনের মাতা ফেরাউনের বংশোদ্ভূত ছিলো না; বরং এশীয় ছিলো।

যা হোক, হযরত মূসা (আ.)-এর আমল সংক্রান্ত এ আনুষংগিক আলোচনাটুকুর পর আমরা পুনরায় হযরত ইউসুফের কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি। ইতিহাসের যে স্তরটাতে এ ঘটনা ঘটেছিলো সেই স্তরটার প্রকৃতি নির্দেশক আলোচনায় আবার ফিরে যাচ্ছি। এই আলোচনায় ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ ঘটনা শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মিসরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনা সমগ্র যুগের চরিত্রটাই তুলে ধরেছে। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এই যুগটা সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত। অথচ এগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশে বা জাতিতে সীমিত থাকে না। আমরা দেখতে পাই, হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ও তার তাবীরে এ বৈশিষ্ট্যটা সুস্পষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যটা হযরত ইউসুফের দুই কারাসংগী এবং স্বয়ং রাজার স্বপ্নেও উপস্থিত। স্বপ্নের দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই এ বৈশিষ্ট্যটা গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করে, যা গোটা যুগের সামগ্রিক চরিত্র নির্দেশক।

সংক্ষেপে এ কথাটাও বলা দরকার যে, এ কাহিনীতে রয়েছে পর্যাপ্ত শৈল্পিক, মানবীয় এবং আবেগের উপাদান। সূরার বর্ণনাভংগির মধ্য দিয়ে এ উপাদানগুলো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তদুপরি কোরআনের স্বভাবগত প্রভাবশালী ও তাৎপর্যবহ প্রকাশভংগির বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই, যা প্রত্যেক স্থানেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে সুরেলা মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এ কাহিনীতে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন গুণগত মানে পিতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইউসুফ ও তাঁর সহোদরসহ, তাঁর অন্য ছেলেদের প্রতি হযরত ইয়াকুবের স্নেহের মধ্য দিয়ে এবং সমগ্র কাহিনী জুড়ে ইউসুফের সাথে জড়িত ঘটনাবলীতে তাঁর নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃস্নেহের আকৃতিগত তারতম্য ও পার্থক্য দেখে বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে নানা বিরোষ বিদ্বেষ ও আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্বয়ং ভাইদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ায়ও কতো পার্থক্য ঘটে, তা এখানে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পার্থক্যটা এরূপ যে, কেউ কেউ ইউসুফকে গোপনে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়, আবার অন্যরা ইউসুফকে শুধু কুয়ায় ফেলে দেয়া যথেষ্ট মনে করে। কোনো বিদেশী কাফেলা তাকে কুড়িয়ে নেয় তো নিক। এভাবে অন্তত খুনের অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এ কাহিনীতে ধোঁকাবাজির উপাদানটাও লক্ষণীয়। ইউসুফের সাথে তাঁর ভাইদের এবং নিজের স্বামী ও মহিলাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর ধোঁকাবাজি এর আওতাভুক্ত। যৌন আবেগের তাড়না, এই তাড়নার শিকার হয়ে অন্যের রূপে মুগ্ধ হওয়া ও মিলনাকাংখা পোষণ করা এবং অন্য জনের এই তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করা এ কাহিনীর আরেকটা উপাদান। তা ছাড়া অনুতাপ, ক্ষমা ও বিচ্ছিন্ন স্বজনদের পুনর্মিলনজনিত আনন্দও এ কাহিনীর অন্যতম উপাদান। জাহেলী সমাজ ও সমাজের শাসক মহলের অবস্থাভেদে এই উপাদানগুলো দৃশ্যমান।

কাহিনীটার সূচনা হয়েছে পিতার কাছে ইউসুফের নিজের দেখা স্বপ্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পিতা হযরত ইয়াকুব সাবধান করে দিলেন যেন তিনি তাঁর ভাইদের এ স্বপ্নের কথা না জানান। তিনি ইউসুফকে জানালেন, তাঁর বিপুল মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে। এ স্বপ্নের কথা তাঁর ভাইরা জানলে তাদের মধ্যে হিংসার সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। এরপর কাহিনীর ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, তা স্বপ্নের তাবীর এবং হযরত ইয়াকুবের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন বলেই মনে হতে থাকে। অবশেষে যখন স্বপ্নের তাবীর শেষ হলো, অমনি হযরত ইউসুফের কিসসার সমাপ্তি ঘটলো, 'প্রাচীন পুস্তকে'র লেখকদের ন্যায় কোরআন আর এ কাহিনী বর্ণনা অব্যাহত রাখেনি। কেননা তার আসল ধর্মীয় উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে।

কাহিনীর স্বভাবজাত শৈল্পিক উপাদান এ কাহিনীতে বিদ্যমান। স্বপ্ন দিয়ে কাহিনীর শুরু হয়েছে। তারপর এর ব্যাখ্যা অজানা থেকে যায়। একটু একটু করে ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় এবং উপসংহারে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাহিনী শেষ করে দেয়া হয়।

কাহিনীটা কয়েকটা পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্বে কিছু দৃশ্য রয়েছে। তবে এক দৃশ্য ও অপর দৃশ্যের মাঝে কিছু শূন্যতা রয়েছে, যা পাঠক আপন চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফের কাহিনীর শৈল্পিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর্যায়ে এ পর্যন্ত যেটুকু নিবেদন করেছি, আমরা সেটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চাই। এর বর্ণনায় ইসলামী ও কোরআনী ভাবধারার যেটুকু স্ফুরণ ঘটেছে, আমরা আপাতত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। কেননা প্রকৃত শালীন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে যেটুকু উপাদান প্রয়োজন তা এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা হলো ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে এ কাহিনীর শিক্ষা ও তাৎপর্য। এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে চাই।

এই ভূমিকার শুরুতে আমরা ইংগিত দিয়েছি যে, এ সূরা নাযিল হবার সময়ে মক্কায় ইসলামী আন্দোলন যে কঠিন নির্যাতনের শিকার ছিলো, তার সাথে ইউসুফের কাহিনীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। রসূল (স.)-এর একজন আদর্শিক ভাই হযরত ইউসুফ যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, তা তাঁর মতো একজন সম্মানিত নবীর কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। পরিণামে হযরত ইউসুফের মতোই রসূল (স.)-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠান এবং পরাক্রমলাভও খুবই শিক্ষাপ্রদ।

কাহিনীর বিশ্লেষণ প্রসংগে ইসলামের সেই স্পষ্ট, পূর্ণাংগ, সর্বাত্মক ও সূক্ষ্ম রূপটি আমরা তুলে ধরেছি, যা হযরত ইউসুফ তুলে ধরেছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে একটু বিশ্লেষণে যাওয়া আবশ্যক।

ইসলামই সকল নবীর একমাত্র আকীদা ও একমাত্র ধর্ম– একথা সূরার সূচনা থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সকল রসূলের জন্যে ছিলো একই। সকল নবীরই বক্তব্য ছিলো পূর্ণাংগ তাওহীদের সপক্ষে। সবাই একবাক্যে বলেছেন, আল্লাহই মানব জাতির একমাত্র প্রভু, মালিক, মনিব ও আইনদাতা এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই গোলাম বা দাস। যারা 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে'র নামে বলে যে, মানবজাতি প্রথমে একাধিক ইলাহতে বিশ্বাস করতো এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার ন্যায় তাওহীদের জ্ঞানও তারা পর্যায়ক্রমে অর্জন করেছে– তাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। এ সব ধ্যান ধারণার মোদ্দাকথা দাঁড়ায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মও মানুষের তৈরী।

এ কাহিনী থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, তাওহীদবাদী ধর্মের প্রকৃতিও সকল নবীর আমলে একই রকম ছিলো। অর্থাৎ কোনো নবী এ কথা বলেননি যে, সৃষ্টিকর্তা তো এক, কিন্তু মানুষের জন্যে আইনদাতা ও সার্বভৌম প্রভু এক নয়; বরঞ্চ মানুষের এক, তার আইনদাতাও এক অভিন্ন। মানুষের জীবনের সকল ব্যাপারে হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, আর কারো নয়। এ কথা স্বয়ং আল্লাহর আদেশক্রমেই স্থির হয়েছে। তিনিই বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করা তথা হুকুম পালন করা যাবে না। কোরআন এ ক্ষেত্রে এবাদাতের সঠিক মর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবাদাত হলো এক কথা, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুমদান আর মানুষের পক্ষ থেকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন।' এটাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। সুতরাং মানুষ যতোক্ষণ একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন না করবে

www.pathagar.com

ততোক্ষণ তাকে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জীবনের কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মানে এবং কোনো কোনো ব্যাপারে মানে না, তাকেও আল্লাহর এবাদাতকারী বলা যাবে না। আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মানলে তাকে একমাত্র মাবুদও মানতেই হবে। আর এর অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহই হুকুমদাতা ও আইনদাতা এবং একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত তথা হুকুম ও আইন পালন করতে হবে। বস্তুত এই শব্দ দু'টো অর্থাৎ এবাদাত ও রবুবিয়াত সমার্থক। যে এবাদাত করলে মানুষ মুসলমান এবং না করলে অমুসলমান হয়ে যায়, তা হলো একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হওয়া এবং আর কারো অনুগত না হওয়া। যে কোনো যুগে যে কোনো স্থানে মানুষের মুসলমান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটায় কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম পক্ষে এ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের যে কোন ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো হুকুম পালন করে সে মুসলমান নয় এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না, সে মুসলমান এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে অন্য কোনো বক্তব্য দেয়া ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে বিতর্ক তোলে সে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধেই বিতর্ক তোলে।

এ কাহিনীর আর একটা শিক্ষা এই যে, ঈমান একটা নির্ভেজাল বিশ্বাসের নাম, যা আল্লাহর দুই নিষ্ঠাবান বান্দা ইয়াকুব ও ইউসুফের মনে বদ্ধমূল হয়েছিলো।

হযরত ইউসুফ কেমন একনিষ্ঠ মোমেন ছিলেন, তা তাঁর এ দোয়া থেকে জানা যায়–

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছো এবং আমাকে বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (আয়াত ১০১)

তবে শুধু এ সর্বশেষ অবস্থানই যে তাঁর একমাত্র অবস্থান তা নয়। আসলে এ সূরায় তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই রকম অবস্থানে দেখা যায়। যেমন এক যুবতী নারীর নগ্ন বিপথগামিতার আহ্বানে তিনি জবাব দেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, তিনি আমার মনিব, আমাকে উত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। যালেমরা কখনো সুপথ প্রাপ্ত হয় না।'

অপর এক পর্যায়ে তিনি নিজের দুর্বলতা ও বিপথগামিতার আশংকা অনুভব করে বলেন.....।' (আয়াত-৩৩)

ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দেয়ার সময় তিনি বলেন,

'আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহভীতি ও ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।'

www.pathagar.com

এ সবই এমন ভূমিকা ও অবস্থান, যার প্রয়োজনীয়তা শুধু মক্কার ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বরং সর্বকালের ইসলামী আন্দোলনেরই এর আবশ্যকতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরেও আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় সদাজাগ্রত। যখনই তাঁর বিপদ মসিবত তীব্র আকার ধারণ করে তখনই তার মনে তাঁর প্রভুর সেই পরিচয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই তাঁর মন বিনয়ী হয়। শুরুতেই যখন ইউসুফ তাঁর কাছে নিজের স্বপ্নের বিবরণ দেন তখন তিনি বলেন,

'এভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে গ্রহণ করবেন। তোমাকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন, তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশধরের ওপর নিজের অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর পূর্ণ করেছেন।' (আয়াত ৬)

ইউসুফের ব্যাপারে প্রথম আঘাত খেয়েই তিনি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে কোনো চক্রান্ত তৈরী করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। তোমরা যা কিছু বলছো, সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।' (আয়াত ১৮)

নিজের ছেলেদের যখন তিনি সতর্কতার শিক্ষা দেন এবং একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন, তখনো তিনি ভুলে যান না যে, এই সতর্কতা আল্লাহর যে কোনো পদক্ষেপ থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না; বরং আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে থাকে। এটা হলো কেবল মনের একটা বাসনা, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফয়সালা থেকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়।

'ইয়াকুব বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।' (আয়াত ৬৮)

চরম বার্ধক্য, দুর্বলতা, দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন ছেলের ব্যাপারে দ্বিতীয় আঘাত প্রাপ্ত হন তখনো এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর অন্তরে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশার সৃষ্টি হয়নি! তিনি বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে একটা চক্রান্ত প্রস্তুত করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। আশা করি আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন .....' (আয়াত-৮৩)

এরপর আল্লাহর পরিচিতি তাঁর অন্তরে আরো স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ছেলেরা তাঁকে ইউসুফকে নিয়ে অতিমাত্রায় দুর্ভাবনা, কান্নাকাটি ও কাঁদতে কাঁদতে চোখ সাদা করে ফেলতে দেখে তিরস্কার করা সত্তেও তিনি তাদের জানান, তিনি নিজের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তা তারা করেনি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা তারা জানে না। এ কারণে তিনি শুধু আল্লাহর কাছেই নিজের মনের দুঃখ জানান এবং তাঁর রহমতের আশা করেন।

'ইয়াকুব তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, হায় আফসোস, ইউসুফের ওপর! .....' (আয়াত ৮৪-৮৭) এরপর যখন তিনি ইউসুফের ঘ্রাণ পাওয়ার

www.pathagar.com

কথা জানালেন, তখনও ছেলেরা তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলো। তিনি আবারো তাদের বললেন, তিনি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা জানেন তা তারা জানে না। 'যখন কাফেলা রওনা হয়ে গেলো তখন তাদের পিতা বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ...' (আয়াত ৯৪-৯৬)

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়ের স্বচ্ছতম স্তর, যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দারা ছাড়া আর কেউই অনুভব করতে পারে না। এতে মক্কার মুসলিম সংগঠনের দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনের সময়; করং সর্বকালের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে।

সর্বশেষে সুদীর্ঘ কাহিনীর যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে, সেখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রথম মন্তব্যটাতে সরাসরি রসূল (স.)-এর কাছে নাযিল হওয়া ওহীর প্রতি কোরায়শদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের জবাব দেয়া হয়েছে। এই জবাব দেয়া হয়েছে ওই কাহিনীরই বিভিন্ন দিকের প্রতি ইংগিত দিয়ে, যা সংঘটিত হওয়ার সময় রসূল (স.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

'এ হচ্ছে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলীরই অন্যতম, যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমেই নাযিল করছি। ইউসুফের ভাইরা যখন ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আঁটছিলো, তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না।' (আয়াত-১০২) সূরার ভূমিকায় ৩ নং আয়াতে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তার সাথে এ মন্তব্যের গভীর মিল রয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি এই কোরআন তোমার কাছে ওহী করার মাধ্যমে তোমাকে সর্বোত্তম কাহিনী শুনাচ্ছি। ইতিপূর্বে তুমি এ কাহিনী জানতে না।'

বস্তুত সূরার ভূমিকায় ও উপসংহারে করা মন্তব্যগুলো এ সূরার বক্তব্যকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করেছে, এর তত্ত্ব ও তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছে এবং অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের দাঁতভাংগা জবাব দিতে সাহায্য করেছে।

এতে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের গোয়ার্তুমি, একগুঁয়েমি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবজ্ঞা যে সীমাহীন; তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ ঈমান আনার জন্যে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীই যে কোনো সুস্থ বিবেকের পক্ষে যথেষ্ট।

'তুমি প্রত্যাশা করলেও অধিকাংশ লোক মোমেন হবে না। .....' (আয়াত ১০৩-১০৭)

মানুষ যখন আল্লাহর সঠিক দ্বীনের অনুসরণ করে না তখন তার স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্বের ওপর আনুপাতিক হারেই এগুলো প্রভাবশালী হয়। বিশেষত আল্লাহর এই উক্তিতে মানুষের এ স্বভাবের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে, 'তাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি শেরেক মিশ্রিত ঈমান ছাড়া ঈমান আনে না।' (আয়াত ১০৬)

বস্তুত এ হচ্ছে শেরেক মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী অনেকেরই সঠিক চিত্র। তারা তাওহীদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে মত স্থির করে না। এরপর আসছে রসূল (স.)-কে অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী ভংগিতে দেয়া সত্য এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বনের আপসহীন সুস্পষ্ট নির্দেশ।

'বলো, এ হচ্ছে আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। ..... নিখুঁত প্রজ্ঞার ওপর আছি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (আয়াত-১০৮)

এরপর সূরার সর্ব শেষাংশে সমগ্র কোরআনের কেসসা কাহিনীর অভিন্ন শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এ শিক্ষা এ সূরা ও অন্যান্য সূরায় সমভাবে বিদ্যমান। প্রাথমিকভাবে এ শিক্ষা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনকে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা, সুসংবাদ ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও সতর্কবাণী। ওহী ও রেসালাতের সত্যতাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। আর সত্যকে করা হয়েছে সব রকমের কু-সংস্কার ও অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে তো এমন সব ব্যক্তিকেই রসূল করে পাঠিয়েছি যারা জনপদবাসীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো।.....' (আয়াত ১০৯-১১১)

বস্তুত এ হচ্ছে এ সূরার সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

এবার আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনীর সাথে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইংগিতপূর্ণ সমন্বিত কোরআনী বর্ণনাভংগি অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জিনিসগুলোর কিছু বিশ্লেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

কোরআনের অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাতেও এমন কয়েকটা বক্তব্য বার বার তুলে ধরা হয়েছে যা সূরার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এলেম বা জ্ঞান এবং অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতার কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কতকগুলো আয়াতে। যেমন,

৬, ২১, ২২, ৪৩, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৫, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯৬ ও ১০১ নং আয়াতগুলো লক্ষণীয়। এ আয়াতগুলো মহাগ্রন্থ কোরআনের কয়েকটা রহস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়ত এ সূরায় আল্লাহর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সার্বভৌমত্ব। এটা কখনো বা হযরত ইউসুফের মুখ দিয়ে 'আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের ইচ্ছাকৃত আনুগত্য' অর্থে, আবার কখনো বা হযরত ইয়াকুবের মুখ দিয়ে 'অনিচ্ছা সত্তেও আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য' অর্থে উচ্চারিত

www.pathagar.com

হয়েছে। এভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা নেহাত কাকতালীয়ভাবে নয় বরং সুপরিকল্পিতভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

মিসরের শাসকদের প্রভুত্ব যে অযৌক্তিক ও আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী, সে কথা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই ইউসুফ (আ.) বলেন,

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়। নানা প্রভু ভালো, না মহাপ্রতাপান্বিত এক আল্লাহই ভালো? ..... সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। এটাই হলো, অটল ও অকাট্য দ্বীন।' (আয়াত ২৯ ও ৩০)

পক্ষান্তরে আল্লাহর ফয়সালা অপ্রতিরোধ্য, এই মর্মে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হযরত ইয়াকুব বলেন, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তবে এ আদেশ দ্বারা আমি তোমাদের আল্লাহর কোনো ফয়সালা থেকে রক্ষা করছি না। সর্বময় শাসনক্ষমতা কেবল আল্লাহর। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করছি এবং তাঁর ওপরই সকলের নির্ভর করা উচিত।' (আয়াত-৬৭)

বস্তুত সার্বভৌমত্ব তথা সর্বময় শাসন ক্ষমতার অর্থের এ পূর্ণতা থেকে বুঝা যায় যে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য না করলে 'দ্বীন' পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। উভয় প্রকারের আনুগত্যই ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংগ। শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক ও অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করাই ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং শরীয়তের ইচ্ছাকৃত অংশেও আল্লাহর আনুগত্য করা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

এ সূরার চমকপ্রদ বর্ণনাভংগির আরো একটা আকর্ষণীয় দিক এই যে, হযরত ইউসুফ সূক্ষ্মদর্শিতাকে আল্লাহর একটা গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা এমন এক জায়গায় করেছেন যেখানে সূক্ষ্মদর্শিতাই যথার্থ মানানসই। যেমন ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, '..... নিশ্চয় আমার প্রভু যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।'

সূরার আরেকটা চমকপ্রদ দিক ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি হলো সূরার ভূমিকা ও উপসংহারের বক্তব্যের অপূর্ব মিল এবং উপসংহারে দীর্ঘ শিক্ষামূলক বক্তব্য প্রদান। আর এসব মন্তব্যেরই মূল বক্তব্য প্রায় একই। সূরার শুরু ও শেষে একই বিষয়ে আলোচনা।

সূরা ইবরাহীম

সূরা ইবরাহীম একটা মক্কী সূরা এবং এর মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস যথা ওহী, রেসালাত, তাওহীদ, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল দান ইত্যাদি, যা সাধারণত মক্কী সূরাগুলোতে আলোচিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তবে এই সূরায় এ বিষয়গুলো ও তার মূল তথ্যসমূহ তুলে ধরতে গিয়ে একটা বিশেষ ধরনের বাচনভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। কোরআনের প্রত্যেকটা সূরারই বিশেষ ধরনের বাচনভংগি থাকে, যা দ্বারা তাকে অন্যান্য সূরা থেকে পৃথক করা ও চেনা যায়। সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভংগি, যে প্রেক্ষাপটে তার প্রধান প্রধান তথ্য আলোচিত হয় এবং এসব তথ্যের ধরন, যা সাধারণত অনুরূপ অন্যান্য সূরায় বিষয়গতভাবে পৃথক নয়, কিন্তু একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলোচিত হয়– এগুলো দ্বারাও সেই বিশেষ সূরাটিকে চেনা যায়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার কারণে ওসব আয়াতের তাৎপর্যও বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সূরার আকার আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফলে তার কোনো দিক বিস্তৃত ও কোনো দিক সংকুচিত হয়ে যায়। এভাবে সূরায় 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' আসার কারণে পাঠকের কাছে সূরাকে নতুন মনে হয়। 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' পরিভাষাটা প্রয়োগ করছি এজন্যে যে, এটা কোরআনের বাচনভংগিতে মোজেযা বা অলৌকিক রূপবৈচিত্র্যের স্ফুরণ ঘটায়।

মনে হয়, এ সূরার নাম সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। হযরত ইবরাহীম, যিনি নবীদের পিতা, পরম কল্যাণের প্রতীক, পরম কৃতজ্ঞ, আল্লাহর অনুগত, অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ, তাঁর নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আর যেসব পেক্ষাপট এই গুণাবলীর উপস্থিতির দিক থেকে বাঞ্ছিতও। সেগুলোও সূরার সামগ্রিক পরিবেশের অংগীভূত। এতে আলোচিত তথ্যসমূহ এবং বাচনভংগিও সূরার সার্বিক পরিবেশনার আওতাভুক্ত।

সূরাটায় একাধিক ইসলামী আকীদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্য থেকে দুটো প্রধান বিষয় সূরার সমগ্র আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিষয় দুটো সূরার মধ্যে আলোচিত হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিষয় দুটো হলো, সকল যুগের নবী ও রসূলদের সমমতাবলম্বী হওয়া, তথা তাদের সকলের দাওয়াতের ঐক্য এবং স্থান কাল নির্বিশেষে আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারী জাহেলিয়াতের বিরোধিতায় তাঁদের সকলের ঐক্যবদ্ধতা, মানুষের ওপর আল্লাহর অজস্র নেয়ামত দান ও শোকরের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি এবং অধিকাংশ মানুষ কর্তৃক নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। এই দুটো প্রধান বিষয় বা শিক্ষা ছাড়াও আরো অনেক বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই দুটো বিষয় অন্য সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করেছে। সূরার ভূমিকায় এই বিষয়টার দিকেই আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আল্লাহর রসূল ও রসূলকে প্রদত্ত কেতাবের ভূমিকা তথা উদ্দেশ্য লক্ষ্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা। (আয়াত ১)

এই একই বক্তব্য দিয়ে অর্থাৎ তাওহীদতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। (সর্বশেষ আয়াত)

www.pathagar.com

আর এরই মাঝে স্মরণ করানো হয়েছে যে, মূসা (আ.)-কেও মোহাম্মদ (স.)-এর মতো একই ওহী ও কেতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো,

'আমি মূসাকে আমার আয়াতগুলো দিয়ে পাঠিয়েছিলাম .....।' (আয়াত ৫)

আরো স্মরণ করানো হয়েছে যে, সকল রসূলেরই কাজ ছিলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

'আমি প্রত্যেক রসূলকেই পাঠিয়েছি তাঁর জাতির ভাষায়, যাতে সে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে .....।' (আয়াত ৪)

রসূলের কাজ, তার পাশাপাশি চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনাও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত রসূল যে মানুষ, সেই বাস্তবতাই তার কাজ নির্ধারণ করে। তিনি প্রচারক, ভীতি প্রদর্শক, উপদেশদাতা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী বটে, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি কোনো অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারেন না। তিনি বা তার জাতি যখন চান তখন নয়, স্বয়ং আল্লাহ যখন চান তখনই তিনি অলৌকিক কিছু দেখাতে পারেন। অনুরূপভাবে রসূল তাঁর জাতিকে সুপথে চালিত করবেন না বিপথে চালিত করবেন, সেটাও তাঁর আয়ত্তাধীন থাকে না। আল্লাহর বানানো যে প্রাকৃতিক নিয়ম আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, মানুষের সুপথ ও কুপথে চালিত হওয়া সে নিয়মের সাথেই যুক্ত।

সকল জাতি নিজ নিজ জাহেলী যুগে অর্থাৎ তাদের কাছে নবী আসার আগে যুগে এই বিষয়েই আপত্তি তুলতো যে, মানুষ কেন রসূল হয়ে আসে। ১০ নং আয়াতে তাদের এই আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর জবাবে নবী রসূলরা যে জবাব দিতেন, তাও উদ্ধৃত হয়েছে। (আয়াত ১১

সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুধুমাত্র 'আল্লাহর ইচ্ছাতেই' সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক রসূল তাঁর জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর 'আল্লাহই যাকে চান হেদায়াত করেন, যাকে চান গোমরাহ করেন।'

এ সব বিবরণ দ্বারা রসূলের প্রকৃত পরিচয় স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠে। আর এই পরিচয় দ্বারাই জানা যায় রসূলের কাজ কী। নবীদের মানবীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর কোনো কিছুর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এভাবে আল্লাহর একত্ব থেকে যায় সব রকমের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত, নির্ভেজাল ও খালেস।

অনুরূপভাবে সূরায় এই সত্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের সাথে ও তাঁর প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমান আনয়নকারী মোমেনদের সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। পৃথিবীতে আল্লাহর সাহায্য ও খেলাফাতের দায়িত্ব দানের মাধ্যমে এবং আখেরাতে আল্লাহর অবাধ্যদের আযাব ও মোমেনদের সুখশান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ওয়াদা বাস্তবায়িত করা হয়। সূরায় এই মহাসত্যটি রসূল ও তার জাতির মধ্যে সংঘটিত সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়। (আয়াত ১৩, ১৪ ও ১৫)

www.pathagar.com

কেয়ামতের দৃশ্যাগুলোর বিবরণ সম্বলিত ২৩ নং এবং ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে এ মহাসত্য তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং আয়াতেও উদাহরণের মাধ্যমে এটি তুলে ধরা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে দুটি বিষয় সমগ্র সূরায় প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং যা পরম অনুগত, মহা কৃতজ্ঞ ও নবীদের সুমহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীমের সাথে সুসমন্বিত, সেই বিষয় দুটোর প্রথমটা হলো, সকল রসূলের মতের ঐক্য, দাওয়াতের ঐক্য এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। আর দ্বিতীয়টা হলো, সকল মানুষের ওপর আল্লাহর সাধারণ অনুগ্রহ এবং আল্লাহর প্রিয় মানুষদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ। এই দুটো বিষয় আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

প্রথম বিষয়টাকে সূরায় অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ও চমকপ্রদ ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো সূরায় এ বিষয়টা পৃথক পৃথকভাবে এক একজন নবীর দাওয়াতের ঐক্যের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক রসূল তার জাতির কাছে নিজের বক্তব্য দেন এবং আপন কর্তব্য সমাধা করেন। তারপর আরো একজন রসূল এবং তারপর আরো একজন রসূল আসেন। প্রত্যেকে একই বক্তব্য দেন, জাতির কাছ থেকে একই জবাব পান, তাতে প্রত্যাখ্যানকারীরা অন্যদের মত পার্থিব শাস্তি পায়, আবার কোনো কোনো জাতি পৃথিবীতে কিছু সময় পায়, কেউ বা কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পায়, কিন্তু শুরু থেকে প্রত্যেক রসূলকে চলন্ত ক্যাসেটের ন্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এর নিকটতম উদাহরণ হচ্ছে সূরা আল আরাফ ও সূরা হুদ।

পক্ষান্তরে সূরা ইবরাহীম সকল নবীকে এক কাতারে এবং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের আর এক কাতারে রেখে আলোচনা করেছে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটে, অতপর তা এখানেই শেষ হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমরা দেখতে পাই যে, স্থান কালের ব্যবধান সত্তেও নবীদের অনুসারীরা ও জাহেলিয়াতের অনুসারীরা যেন একই ময়দানে সমবেত। স্থান ও কাল দুটো অস্থায়ী ও নশ্বর জিনিস। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সত্য হলো ঈমান ও কুফরী এবং তা স্থান কালের চেয়ে বড় দর্শনীয়। এ বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে ৯ থেকে ১৭ নং আয়াতে।

এখানে হযরত নূহ থেকে শুরু করে সকল প্রজন্ম ও সকল নবী একত্রিত হন, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচে যায় এবং সবচেয়ে বড় সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, নবী ও রসূলরা সবাই একই বাণী বহন করে এনেছেন, তাদের কাছে অজ্ঞ লোকেরা সব সময় একই আপত্তি তুলে ধরে, মোমেনদের আল্লাহ সাহায্য করেন। সৎ লোকদের তিনি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেন, স্বৈরাচারী বলদর্পীদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা এবং তাদের আযাব ভোগ করা অবধারিত। এখানে রসূল (স.)-এর সাথে সূরার ১ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তি এবং হযরত মূসার সাথে আল্লাহর ৫ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে একটা অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়।

www.pathagar.com

ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত দুনিয়াতেই শেষ হয় না; বরং আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেমন ২১ থেকে ২৩ নং আয়াত। ৪২ ও ৪৩ নং আয়াত এবং ৪৬ থেকে ৫০ নং আয়াতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত আয়াত ইংগিত দিচ্ছে যে, ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত একই সংঘাত, যা দুনিয়া থেকে শুরু হয় ও আখেরাতে গিয়ে শেষ হয়। এর একটা অপরটার পরে আসে।

অনুরূপভাবে যে সকল উদাহরণ দুনিয়াতে শুরু হয় ও আখেরাতে শেষ হয়, তা উভয় পক্ষের মধ্যকার সংঘাতের আলামতগুলো ও তার ফলাফল পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে। কালেমায়ে তাইয়েবা তথা উত্তম বাক্য উত্তম বৃক্ষের মতো। আর এই উত্তম বৃক্ষ হলো নবুয়তের বৃক্ষ, ঈমানের বৃক্ষ ও কল্যাণের বৃক্ষ। পক্ষান্তরে খারাপ কথা হলো খারাপ গাছের মতো। আর খারাপ গাছ জাহেলিয়াতের গাছ, বাতিলের গাছ, মিথ্যা অন্যায় ও আগ্রাসনের গাছ।

দ্বিতীয় সত্যটা হলো আল্লাহর নেয়ামত, তার শোকর ও নাশোকরী সংক্রান্ত। এটাও সমগ্র সূরার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং সূরার সর্বত্র এর ছাপ ও রেশ ছড়িয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতিকে দুনিয়ার জীবনে যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ মোমেন হোক বা কাফের হোক, সৎ হোক বা অসৎ, পাপী হোক বা পুণ্যবান অনুগত হোক বা অবাধ্য– সবার জন্যেই আল্লাহ অসংখ্য নেয়ামত বরাদ্দ করেছেন। এটা আল্লাহর বিরাট দয়া, করুণা ও উদারতা যে, তাঁর মোমেন, পুণ্যবান ও অনুগত বান্দাদের ন্যায় কাফের ফাসেক এবং অবাধ্য লোকদেরও পৃথিবীতে বহু নেয়ামত বিতরণ করেছেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সমস্ত নেয়ামতকে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল ও সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন দৃশ্যের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করেছেন। এসব নেয়ামতের বিবরণ ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে রয়েছে। এ ছাড়া সূরার প্রথম আয়াতে মানুষের হেদায়াতের জন্যে রসূল ও কেতাব প্রেরণকেও একটি নেয়ামত হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা অন্যান্য বস্তুগত নেয়ামতের সমান অথবা তার চেয়ে বড়। বস্তুত নূর বা আলো মহাবিশ্বে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এখানে নূর বলতে সেই বৃহত্তর আলো বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানব সত্ত্বা বিশেষত তার হৃদয় মন ও অন্তর্নিহিত সত্ত্বা আলোকিত হয়। আর এটাই ছিলো হযরত মূসা ও অন্য সকল নবীর কাজ।

নবীরা যে মানুষকে তাদের গুনাহ মাফ করানোর জন্যে ডাকেন, এটাও নূরের মতোই একটা নেয়ামত।

নেয়ামত সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটেই হযরত মূসা তার জাতিকে তাদের নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। (৬ নং আয়াত) এই পটভূমিতে আল্লাহ রসূলদের কাছে প্রদত্ত নিজের সেই ওয়াদার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, যা ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে তাদের ভবিষ্যত বিজয় ও সাফল্যের আভাস দেয়।

এটাও আল্লাহর এক বিরাট ও বিশাল নেয়ামত।

www.pathagar.com

শোকর দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধির তথ্যও বর্ণিত হয়েছে ৭ নং আয়াতে। সেই সাথে ৮ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, মানুষ শোকর না করলেও আল্লাহর কিছু আসে যায় না এবং তিনি তাদের শোকরের মুখাপেক্ষী নন। আরো বলা হয়েছে যে, মানুষের সাধারণত আল্লাহর নেয়ামতের যেমন শোকর করা উচিত তেমন করে না। (আয়াত ৩৪ দেখুন।)

কিন্তু যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং তার ফলে তাদের হৃদয়ের চোখ খুলে যায়। তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করে। এগুলোতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

এ ধৈর্য ও শোকরের সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহর পবিত্র কাবা ঘরের সামনে বসে তিনি বিনীতভাবে যে দোয়া করছিলেন তা এ সবর ও শোকরের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ৩৫ থেকে ৪১ নং আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

আর যেহেতু আল্লাহর নেয়ামত, নেয়ামতের শোকর ও না-শোকরীর বিবরণ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই এর বিভিন্ন ছোটখাট বক্তব্যও এই সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন,

'তাদের বিভিন্ন ফলমূল দান করো। হয়তো তারা শোকর করবে।'

'এগুলোতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

'যারা আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার রূপ দিয়েছে তাদের কি দেখনি?'

'তোমাদের ওপর আল্লাহর যে নেয়ামত এসেছিলো তা স্মরণ করো।'

'সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি বার্ধক্যে আমাকে দিয়েছেন ইসমাঈল ও ইসহাক।'

নবীদের মানুষ হওয়ার ওপর কাফেরদের আপত্তির জবাবে নবীরা বলেছেন,

'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের যাকে চান অনুগৃহীত করেন।'

সুতরাং সূরার সামগ্রিক পটভূমি হলো নিয়মিত শোকর ও না-শোকরী। আর উপরোক্ত জবাব এই পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরাটা সামগ্রিকভাবে দু'টো পর্বে বিভক্ত।

প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের তাৎপর্য, রসূলের অনুসারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের দ্বন্দ্ব এবং পবিত্র কালেমা ও অপবিত্র কলেমার উদাহরণ। আর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে মানুষের ওপর আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত, যারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী ও অহংকার করেছে তাদের পরিণাম, যারা ঈমান এনেছে ও শোকর করেছে তাদের পুরস্কার, তাদের প্রথম ও প্রধান নমুনা হযরত ইবরাহীম, যালেম ও অকৃতজ্ঞদের ওপর কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি এবং এভাবে সূরার সমাপ্তি।

'এ হচ্ছে মানব জাতির উপকারার্থে প্রচার যাতে তাদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা জেনে নেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং যাতে বুদ্ধিমান লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।'

www.pathagar.com

সূরা আল হেজর

এ সূরার প্রথম মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কাফের ও মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে অপেক্ষমান ভয়ানক পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ। এই মূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রয়েছে আনুষংগিক বিভিন্ন বিষয়ে কিছু আলোচনা, যা না-ফরমানদের ভয়াবহ কঠিন পরিণতির চিত্রটি আরো শানিত করে তাদের বিবেককে আঘাত করতে পারে। এ জীবন শেষে চিরস্থায়ী আর এক জীবনের দিকে তাদেরকে যেতে হবে, যেখানে অতীত জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে তাদের সকল কাজ কর্মের চুল চেরা হিসাব নেয়া হবে এবং সেই বিচার অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হবে এবং কাউকে পুরস্কৃত করা হবে, এসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ এখানে পেশ করা হয়েছে। সৃষ্টির দৃশ্যসমূহ ও কেয়ামতের সেই বিভীষিকার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এ আলোচনার মধ্যে।

ইতিমধ্যে সূরায়ে রা'দের আলোচনায় তার প্রেক্ষাপটের সাথে যেমন করে সূরায়ে আনয়ামের মিল দেখা গেছে, তেমনি করে সূরায়ে হেজরের প্রেক্ষাপটের সাথে সূরায়ে আ'রাফের প্রেক্ষাপটও খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সূরাটির আলোচনা শুরু হয়েছে কেয়ামত এর ভীতি প্রদর্শন করে সে ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে, আর এটা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে সামান্য কিছু শাব্দিক রদবদল থাকলেও সতর্কীকরণই হচ্ছে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

সূরায়ে আ'রাফের শুরুতে ভীতিপ্রদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, 'এ হচ্ছে তোমার কাছে অবতীর্ণ এক গ্রন্থ, সুতরাং এর দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করার ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো দ্বিধা সংকোচ যেন না আসে, আর এ কেতাব মোমেনদের জন্যে এক অতি মূল্যবান উপদেশ।' আর চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা কতো দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি অতপর আযাব এসেছে রাতের বেলায় অথবা দুপুরের খাবার খেয়ে যখন তারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থেকেছে– তখন। তারপর এ সূরাতে আদম (আ.) ও ইবলিসের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এমনি করে প্রসংগক্রমে আরো অনেক বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে। অবশেষে জানানো হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং সবাইকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে তারা সতর্কীকরণের বাস্তবতাকে তারা প্রত্যক্ষ করবে.... বর্তমানের আলোচনায় সৃষ্টিজগতের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেমন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী, রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর নির্দেশে পরিচালিত তারকারাজি, বাতাস-মেঘ-পানি ও নানাবিধ ফলমূল.... আরো আমরা এখানে দেখতে পাবো–নূহ, হুদ, সালেহ, লূত শোয়ায়ব ও মূসা (আ.)-এর ঘটনা। আলোচ্য সূরার কাহিনী সত্যিই মহান সতর্ককারী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেও সূরায়ে হেজরের শুরুতে একইভাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এমন ভাষা ও ভংগীতে কথাগুলো পেশ করা হয়েছে যে পাঠকের হৃদয় অজানা এক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যার কারণে– 'কাফেররা অনেক সময় মনে করে, হায় যদি তারা

www.pathagar.com

মোসলমান হয়ে যেতে পারতো। (কিন্তু পার্থিব স্বার্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মুসলমান হতে পারে না।) তাই ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা ভোগবিলাসের মেতে থাকুক, সুখ সম্পদের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিক এবং তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখুক, শীঘ্রই তারা তাদের পরিণতি জানতে পারবে, আর আমি, যে সব এলাকাকে ধ্বংস করেছি, তা তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ছিলো না বরং তার সিদ্ধান্ত পূর্বেই জানা এক গ্রন্থের মধ্যে লিখিত ছিলো। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো জাতির ধ্বংস নেমে আসবে না বা ওই সময়ের পরেও ধ্বংস আসবে না'।.... তারপর এখানে প্রসংগক্রমে সৃষ্টিলোকের কিছু দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, এই যে সুউচ্চ আকাশ এবং এর মধ্যে অবস্থিত কেল্লাসম সুরক্ষিত স্তরসমূহ, সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং এর গভীরে প্রোথিত পাহাড়-পর্বত, পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে উৎপাদিত বৃক্ষ-তরুলতা গুল্ম, পানি ভর্তি ভারী বাতাস, যা জমাট বেঁধে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং পানি আকারে নেমে আসে, এর দ্বারা সিঞ্চিত হয় শুকনা মৃতপ্রায় যমীন এবং এর মধ্যে মৃতপ্রায় প্রাণ বৃষ্টির ফল্গুধারায়, পুনরায় ফিরে পায় নতুন জীবন, আবার সব কিছুর পরিসমাপ্তিতে আসবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান.... এসব কিছু আদম ও ইবলিসের করুণ কাহিনীর সূত্র ধরে একের পর এক এসেছে বলে জানা যায়। পরিশেষে আসছে আদম (আ.)-এর অনুসারী মোমেনদের পরিণতি.... এসব ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে নযরে পড়ে ইবরাহীম, লূত শোয়ায়েব ও সালেহ (আ.)-এর ঘটনা এবং তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও জানা যায় যারা এ মহান নবীদেরকে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বানিয়েছিলো।

যাই হোক, সূরা দুটির মূল আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। এতদসত্তেও সূরা দুটির মধ্যে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, ওই সব অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক কিছু মিল থাকলেও একটি আর একটির মতো পুরোপুরি এক নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী এসব অবস্থাকে বিভিন্ন কায়দায় ও বিভিন্ন চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে এগুলোর মধ্যে একাধারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়টি সুসামঞ্জস্য রূপে দেখা যায়। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়কে যে বারবার বলা হচ্ছে তাও নয় এবং একটা যে আর একটার সাথে পুরোপুরি মিল খাচ্ছে তাও নয়।

সূরাটিকে চার অথবা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। এসব অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে এক একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রেসালাত, এর ওপর ঈমান এবং ঈমানকে অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর যে অমোঘ নিয়ম সে সম্পর্কে যার মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ আলোচনার শুরুতে এমন ভাষা ও ভংগীতে সতর্ক করা হয়েছে যা শোনার সাথে সাথে মনের ওপর এক অভূতপূর্ব আতংক ছেয়ে যায়। দেখুন, প্রথম আয়াতটির দিকে, অনেক সময় কাফেররা চায়, হায় যদি তারা মুসলমান হয়ে যেতে পারতো (তাহলে ওই ভয়াবহ আযাব থেকে তারা বেঁচে যেতো, তবে পার্থিব স্বার্থ অথবা সাময়িক সামাজিক মান মর্যাদা তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখছিলো অতএব), তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা পরম

www.pathagar.com

পরিতৃপ্তির সাথে (দুনিয়ার জীবনে) সর্বপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য খাবার খেয়ে দেখে নিক এবং প্রাণ ভরে ভোগ করে নিক দুনিয়ার মাল মাত্তা, আর তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে গাফেল করে রাখুক, শীঘ্রই তারা (তাদের পরিণতি) জানতে পারবে।' অর্থাৎ, এ কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে মিথ্যা আরোপকারীরা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই সত্যকে অস্বীকার করে, ঈমান আনালে ক্ষতি হবে মনে করে নয়, তাই বলা হচ্ছে,

'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা, যদি তাদের সামনে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং সেই দরজা দিয়ে তারা ওপরের দিকে উঠে যেতে থাকতো, তবুও বলতো না, না, আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়– বরং আমাদেরকে নযরবন্দী করে ফেলা হয়েছে অথবা আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে বলেই আমরা এ রকম দেখছি।'.... আর ওদের সবাই এই একই মনোভাব রাখে, তারা নবীকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ও ঈমান আনবে না,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, সৃষ্টির কিছু নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানের কিছু দৃশ্যের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে, এসব কিছু তো মহা বিজ্ঞানময় বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, সুনিপুণ এক কৌশলে পয়দা করেছেন, আর সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতোই সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যা কিছু রয়েছে (এ বিশাল সৃষ্টির বুকে) তার মূল ভান্ডার রয়েছে আমার কাছে, আর আমি সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো পাঠাই।'

আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল এবং প্রত্যেকেই দুনিয়ায় বেঁচে আছে এক নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত ও সুবিদিত (পূর্ব নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি আল্লাহ তায়ালা, জীবন দেই, মৃত্যু দেই এবং সবশেষে আমিই হবো সবকিছুর মালিক, আর অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং জানি পরবর্তীদেরকেও আর নিশ্চয়ই তোমার মালিক ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন নিশ্চয়ই তিনি মহা বিজ্ঞানময় মহা জ্ঞানবান।'

তৃতীয় অধ্যায়ে মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাদেরকে সত্যের মূল উৎস সম্পর্কে, তাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয়েছে। আরো জানানো হয়েছে সত্যের উৎস মূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানুষ এবং অনুসারীদের পরিণতির কথা। এ আলোচনায় জানানো হয়েছে যে, আদম (আ.)-কে তৈরী করা হয়েছিলো পচা মাটিকে শুকিয়ে শক্ত ঠনঠনে বানানোর পর সেই মাটি দিয়ে, তারপর সেই কঠিন মাটির মধ্যে আল্লাহর তৈরী আত্মাগুলোর একটিকে ফুঁক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর দেখানো হয়েছে ইবলিস কিভাবে তাকে ধোঁকা দিলো, নিজ অহংকারী হওয়ার কারণে কেমন করে পথভ্রষ্টদেরকে পরিচালনা করে তার পথে, নিয়ে গেলো কিন্তু পারলো না আল্লাহর মোখলেস বান্দাদের সাথে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে অতীত জাতির সত্যবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে, বিশেষ করে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)-এর জাতিরা যে অহংকার প্রদর্শন করেছিলো তার পরিণতিতে তাদের যে দুরাবস্থা হয়েছিলো সে সম্পর্কে। এসব বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কথাটি দিয়ে শুরু করেছেন। 'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমিই মাফ-করনেওয়ালা মেহেরবান এবং আমার আযাবও বড়ো বেদনাদায়ক।' তারপর দেখুন বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা এগিয়ে চলেছে, যার মধ্য দিয়ে ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমতের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)–এর জাতির প্রতি আল্লাহর গযবের কথাও।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকার কথা। এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ইংগীতও পাওয়া যায়, তারপর একথাও জানা যায় যে, যে কোনো ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের শাস্তিও অবশ্যম্ভাবী, রসূল (স.)-এর দাওয়াতেও একথাগুলো ছিলো মূখ্য। আর সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষের মধ্যে এটাই হচ্ছে সকল সত্যের বড় সত্য।

সূরা আন নাহল

এ সূরাটার সূর, তাল ও লয় শান্ত ও স্বাভাবিক। তবে এর আলোচিত বিষয়বস্তু অনেক ও রকমারি। এর প্রেক্ষাপট ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এর ঝংকার প্রভাবশালী ও বহু সংখ্যক এবং এর ভেতরে উৎসারিত প্রেরণা ও অত্যন্ত গভীর।

রসূল (স.)-এর মক্কী জীবনে নাযিল হওয়া অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাটাও আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য, ওহী ও পরকাল-এই তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তবে এই প্রধান বিষয় কয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু আনুষংগিক বিষয়ও আলোচ্য সূচীর আওতাভুক্ত। যেমন এতে ইবরাহীম (আ.) ও মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত আল্লাহর বিধানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী তাওহীদ এবং ঈমান, কুফুরী, হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত মানবীয় ইচ্ছা ও আল্লাহর ফয়সালার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচিত হয়েছে রসূলের দায়িত্ব, রসূলকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি, হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করা ও এ বিষয়ে পৌত্তলিকদের ধ্যান ধারণা, আল্লাহর পথে হিজরত, মুসলমানদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা, ঈমানের পর পুনরায় কুফুরী করা আল্লাহর কাছে এ সবের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি, পারস্পরিক লেনদেন, ন্যায়-বিচার, পরোপকার, আল্লাহর পথে দান এবং ওয়াদা পালন ইত্যাদিও, যা ওই প্রধান আকীদাভিত্তিক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। মোটকথা বহু সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ে সুরাটা পরিপূর্ণ।

কিন্তু যে পটভূমিতে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এবং যে ময়দানে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এই পটভূমি ও ময়দানের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী, আকাশ থেকে নামা বৃষ্টি, ক্রমবর্ধনশীল বৃক্ষ, রাত দিন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র, সাগর, পাহাড় পর্বত, নদ নদী ও রাস্তাঘাট। এক কথায় বলা যায়, গোটা মানব জীবন, তার ঘটনাবলী ও পরিণাম, গোটা পরকালীন জীবন, তার মূল্যবোধ ও দৃশ্যতার এবং সমগ্র অদৃশ্য জগত, তার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য, মানব সত্ত্বা ও প্রকৃতির ওপর তার সুগভীর প্রভাব– এ সবকিছু নিয়ে এ সূরার আলোচনা ও পটভূমি গঠিত।

এ বিস্তীর্ণ ময়দানে এসে সূরাটা তার বক্তব্য পেশ করে। এ বক্তব্য যেন পথনির্দেশ দান, মনমগযকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিবেক বুদ্ধিকে অনুপ্রেরণা জোগানোর একটা বিরাট উদ্যোগ ও অভিযান। এ অভিযান খুবই শান্ত ও ধীর লয়ে পরিচালিত। তবে সেখানেও বৈচিত্র্য রয়েছে। রয়েছে একাধিক সুরের ব্যঞ্জনা। তাতে যদিও বজ্রের তুর্যনিনাদ নেই কিংবা সংগীতের মিহি সুর নেই, কিন্তু তা তার সমস্ত মৃদুমন্দতা সত্তেও মানব সত্ত্বার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ও প্রতিটি প্রত্যংগকে সম্বোধন করে এবং তার বিবেক-বুদ্ধি ও ভাবাবেগকে একই সাথে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। সে তার চোখকে দেখতে, কানকে শুনতে, স্নায়ুকে অনুভূতিশীল হতে, আবেগকে সচেতন হতে এবং বিবেক বুদ্ধিকে চিন্তা গবেষণা করতে বলে। সে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে তথা আকাশ ও পৃথিবীকে, সূর্য ও চন্দ্রকে, রাত ও দিনকে, পাহাড় ও সাগরকে, নদ নদী ও উপত্যকাকে, ছায়া ও আশ্রয়স্থলকে, উদ্ভিদ ও ফলমূলকে এবং পশু ও পাখীকে একই সমতলে সমবেত করে। একই সমতলে সমবেত করে দুনিয়া ও আখেরাতকে এবং দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুকে। এ সবই মানুষের অংগ প্রত্যংগে, স্নায়ুতন্ত্রীতে এবং হৃদয় ও বিবেকে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সৃষ্টির হাতিয়ার। একমাত্র নিষ্ক্রীয় বিবেক, মৃত হৃদয় ও বিকৃত চেতনা ছাড়া আর কোনো কিছুই এ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

এই সূরা মানুষকে একদিকে যেমন প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শন ও মানুষকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতগুলোর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি কেয়ামতের দৃশ্য, মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার দৃশ্য এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্রও তার সামনে তুলে ধরে। সেই সাথে মানুষের সেই সব ভাবাবেগকেও জাগিয়ে তোলে, যা মানব হৃদয়ের সুপ্ত চিন্তা চেতনার সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় মাতৃগর্ভে থাকাকালে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে, দুর্বল ও শক্তিমান অবস্থায়, স্বচ্ছল ও দারিদ্র অবস্থায় মানুষ কিভাবে জীবন ধারণ করে, তারও। অনুরূপভাবে উদাহরণা ও সহজ সরল ঘটনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাও পেশ করে।

সূরার সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় অংশ হলো প্রকৃতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো যা সৃষ্টির মাহাত্ম্য, সম্পদের বিশালতা এবং জ্ঞান ও কুশলতার বিরাটত্বকে ফুটিয়ে তোলে। এগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের সাথে যুক্ত। এই বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি জগত, যা মহান স্রষ্টার সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে সৃজিত ও পরিচালিত, যাতে তা মানুষের সুখ শান্তির উপকরণ হয় এবং তাদের শুধু অপরিহার্য প্রয়োজনই পূরণ করে না, বরং তাদের বিভিন্ন শখও পূরণ করে। একদিকে তা প্রয়োজনও পূরণ করে, অপরদিকে তাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ

www.pathagar.com

হিসাবেও গ্রহণ করা হয়, তা দ্বারা দেহ ও মনের আনন্দ ও পরিতৃপ্তিও সাধিত হয়। মানুষ যাতে আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়, সে জন্যেই এতো সব নেয়ামতের ব্যবস্থা।

এ কারণেই এ সূরায় নেয়ামত ও তার শোকরের বিষয় আলোচিত হয়েছে, এ সবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ সব বিষয়ে সূরার বিভিন্ন অংশে মন্তব্য করা হয়েছে, বিভিন্ন উদাহরণ এবং বিভিন্ন নমুনাও পেশ করা হয়েছে। নেয়ামতের শোকর আদায়ের শ্রেষ্ঠতম নমুনা পেশ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। বলা হয়েছে, তিনি (হযরত ইবরাহীম) আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গোযার ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

এ সব আলোচনাই সম্পন্ন হয়েছে পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে। সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচিত দৃশ্য, বক্তব্যসমূহ ও আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে।

প্রথমে সূরার প্রথম এ অধ্যায়টার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ। এ তাওহীদের মাধ্যম হলো সৃষ্টি জগতে বিরাজিত আল্লাহর নিদর্শন, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান।

সূরা বনী ইসরাঈল

এ সূরাটা মক্কী। সূরাটা আল্লাহর তাসবীহ দিয়ে শুরু ও হাম্‌দ দিয়ে শেষ হয়েছে। এতে একাধিক বিষয় আলোচিত হয়েছে, যার অধিকাংশই আকীদা সংক্রান্ত। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের বিধি ও নিয়ম আলোচিত হয়েছে, যা ওই আকীদা থেকেই উৎসারিত। বনী ইসরাঈলের কিছু ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে, যা মাসজিদুল আকসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রসূল (স.)-এর 'ইসরা' তথা নৈশভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিলো যা মেরাজের একটা অংশ। সেই সাথে এ সূরায় হযরত আদম ও ইবলীসের কাহিনীর একাংশ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সম্মানিত করার বিষয়টাও আলোচিত হয়েছে।

তবে সূরার প্রধান ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাথে কোরায়শদের আচরণ, তাঁর আনীত কোরআনের বৈশিষ্ট্য কোরআন মানুষকে কোন্ পথে চালিত করে এবং আরববাসী তার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া দেখায়–তা আনুষংগিকভাবে আরো আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়-এমন ধরনের অলৌকিক ঘটনা, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের বৈশিষ্ট্য, এর ফলে প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত রেসালাতকে অস্বীকার করলে যে সর্বব্যাপী অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়তে হয় তা থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের অব্যাহতি লাভ। আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে সুপথপ্রাপ্তি বা পথভ্রষ্টতার পরিণামের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক ও ভ্রান্ত পথ অনুসরণের কুফল সামাজিক পর্যায়ে বিস্তৃত হওয়া সংক্রান্ত আল্লাহর নীতি সংক্রান্ত কথাবার্তা। এ সবের আগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সুসংবাদ, সতর্কবাণী ও বিস্তারিত জীবন বিধান দিয়ে তাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজন এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, তারা আর কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে।

সূরায় একাধিকবার আল্লাহকে যাবতীয় অলীক ও অসংগত ধারণা থেকে পবিত্র ঘোষণা, তাঁর গুণকীর্তন ও তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে,

'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাত্রে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন।'

অন্যত্র বনী ইসরাঈলকে এক আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে আযাব থেকে মুক্তি লাভকরা মোমেনদেরই বংশধর।

'আর নূহ তো ছিলো একজন কৃতজ্ঞ বান্দা।'

মোশরেকরা তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে যে সব গালভরা দাবি উচ্চারণ করতো, তার উল্লেখ প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছে,

'তারা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্দ্ধে, তাঁর জন্যে সাত আকাশ তাসবীহ পড়ে ....।'

কোরআন পাঠ শুনে কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবের উচ্চারিত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'আর তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।' সূরার শেষ আয়াতেও আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে।

'আর তুমি বলো, আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা ....'

যে প্রধান আলোচ্য বিষয়ের কথা আমরা বলে এসেছি, তাকে ঘিরে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলোই এই সূরায় পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা। 'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তার বান্দাকে এক রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন' সেই সাথে এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই।' মাসজিদুল আকসা প্রসংগে মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত কিতাব ও ওই কিতাবে বনী ইসরাঈলের দু'বার ধ্বংসযজ্ঞ ও দেশ ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তাদেরই অবাধ্যতা ও অপরাধের কারণে তৃতীয় ও চতুর্থবার সতর্ক করা সত্তেও। 'আর যদি তোমরা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করো, তাহলে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেবো।' এরপর বলা হয়েছে যে, 'শেষ কিতাব কোরআন সবচেয়ে স্থীতিশীল ব্যবস্থার দিকে নির্দেশ করে।' অথচ মানুষ দ্রুততা প্রবণ ও আবেগ প্রবণ হওয়ার কারণে নিজের ঝোঁক ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর কৃতিত্ব ও দায়-দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব এবং সামাজিক আচরণের দায় দায়িত্ব সমাজের ওপর অর্পিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তাওহীদের নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারকে সে তাওহীদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়

www.pathagar.com

এবং এগুলোকে এই মূলনীতির সাথে সমন্বিত করে- যে মূলনীতি ছাড়া জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাহেলী ও পৌত্তলিক সমাজে প্রচলিত ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে, যা আল্লাহর সাথে শরীক করা ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করার উদ্ভট ও অলীক খেয়ালের সাথে সম্পৃক্ত। এই অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে আখেরাতের কথা এবং আরবদের পক্ষ থেকে তাকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করার বিষয়টি। আলোচিত হয়েছে কোরআন সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বক্তব্য, রসূল (স.) সম্পর্কে তাদের আজে বাজে কথা এবং মোমেনদেরকে ভালোভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কী কারণে মোহাম্মদ (স.)-কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অলৌকিক ঘটনাবলী দিয়ে পাঠানো হয়নি। এগুলোকে প্রাচীনকালের লোকেরা অস্বীকার করেছিলো এবং এর ফলে আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। অনুরূপভাবে এতে উল্লেখ করা হয়েছে মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসূল (স.)-এর স্বপ্নের ঘটনা অস্বীকার করা এবং এ জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী। এই প্রসংগে ইবলীসের ঘটনার একটা অংশ এবং তার এ ঘোষণাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সে অচিরেই আদমের বংশধরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ইবলীসের ঘটনার এ অংশটা মোশরেকদের গোমরাহীর কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। এর উপসংহার টানা হয়েছে আল্লাহর আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করা, তাকে সম্মানিত করার আকারে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্যদের জন্যে যে পরিণাম অপেক্ষা করছে তার বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে, 'যে দিন আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো, সেদিন যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ, সে আখেরাতেও অন্ধ ও অধিকতর বিপথগামী হবে।'

সূরার শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে মোশরেকদের ষড়যন্ত্র, তাঁর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ থেকে তাকে বিপথগামী করা এবং তাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে মোশরেকদের অপচেষ্টা। বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করতো এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজেই হিজরত না করতেন, তাহলে পূর্বেকার কাফের জাতিগুলো তাদের রসূলদেরকে হত্যা বা বহিষ্কার করার কারণে যেভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, সেভাবে তারাও ধ্বংস হয়ে যেতো। এই সাথে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর নামায, কোরআন পাঠ, আল্লাহর কাছে নিজের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্যে উত্তম স্থান প্রার্থনা করা এবং সত্যের আগমন ও বাতিলের বিনাশ সাধনের ঘোষণা দান অব্যাহত রাখেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে মন্তব্য করছেন যে, যে কোরআনের অংশবিশেষ থেকে তারা রসূল (স.)-কে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলো তাতে

www.pathagar.com

মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তা জানে না।

এরপর কোরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। মোশরেকরা চাইতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত কোনো অলৌকিক ঘটনা। তারা চাইতো, রসূল (স.)-এর সাথে ফেরেশতা নেমে আসুক, তাঁর অসাধারণ কারুকার্য খচিত প্রাসাদ থাকুক, আংগুর ও খেজুরের এমন বাগান থাকুক, যার মাঝখান দিয়ে ঝর্ণা বা খাল প্রবাহিত হবে অথবা তিনি আকাশে আরোহন করে একখানা পুস্তক নিয়ে আসবেন, যা তারা নিজেরা পড়ে দেখবে। এ ধরনের আরো বহু প্রস্তাব তারা দিতো, যার উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের ধৃষ্ঠতা ও উদ্ধত্য প্রকাশ করা-হেদায়াত বা বুঝ লাভ করা নয়। এসব প্রস্তাবের জবাবে বলা হয়েছে যে, এসব রসূল (স.)-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতার বহির্ভূত জিনিস এবং সম্পূর্ণরূপে তা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। এই সাথে যারা এ সব প্রস্তাব তুলেছে, তাদের সমালোচনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহের সমস্ত ভান্ডার তাদের হাতে থাকতো-যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই-তাহলে তারা খরচ করার ভয়ে তা আটকে রাখতো। সমগ্র সৃষ্টি জগত যে আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ করে এটা উপলব্ধি করাই তাদের ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট ছিলো, বস্তুগত মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিলো না, আর তাতে কোনো লাভও হতো না। কেননা এ ধরনের মোজেযা নিয়ে হযরত মূসা (আ.) এসেছিলেন। কিন্তু তার হঠকারী জাতি তার ওপর ঈমান আনেনি। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আযাব নাযিল করেন।

কোরআন ও তার ভেতরে বিদ্যমান প্রকৃত সত্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই কোরআন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। এই কোরআনকে রসূল (স.) প্রয়োজন অনুসারে নিজে জাতির কাছে একটু একটু করে পেশ করতে থাকবেন, যাতে তারা তা দ্বারা প্রভাবিত হয় ও কার্যকরভাবে তা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে যারা ওহীর জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের অনেকে এ কোরআনকে শুনে এতো প্রভাবিত হয় যে, তারা কাঁদে ও সাজদা করে। সর্বশেষে সেই আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে, যার কোনো সন্তান নেই। বিশ্ব পরিচালনায় যার কোনো শরীক নেই এবং যাকে হীনতা থেকে রক্ষা করার কোনো অভিভাবক নেই। সূরাটার সূচনায় আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসাসূচক বাক্য রয়েছে।

সূরার শুরুতে রয়েছে ইসরা ও মেরাজের যুগান্তকারী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইসরা ও মেরাজ দুটোই একই রাত্রে ঘটেছিলো। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদেসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত তিনি যে নৈশ ভ্রমণ করেন তাকে ইসরা বলা হয়। আর বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ্ব আকাশে, সেদরাতুল মোনতাহায় এবং আমাদের অজানা ও অদৃশ্য জগতে তিনি যে ভ্রমণ করেন, তাকে বলা হয় মেরাজ। এই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে এবং এ ঘটনা নিয়ে কাফের মোশরেকরা প্রচুর বিতর্কও সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

কোন্ জায়গা থেকে তিনি এই নৈশ ভ্রমণ শুরু করেন, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যারা বলেন, মাসজিদুল হারাম থেকে তাদেরটাই অধিক প্রচলিত মত। কেননা তিনি বলেছেন, 'আমি মাসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদের কাছে কাবা শরীফের কাছে যখন ঘুমন্ত ও জাগ্রত এ দুই -এর মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম-তখন জিবরাইল বোরাক নিয়ে আমার কাছে এলেন।'

আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর চাচাতো বোন আবু তালেব কন্যা উম্মে হানীর ঘর থেকে যাত্রা করেন। এখানে মাসজিদুল হারাম দ্বারা হারাম শরীফ বুঝানো হয়েছে, যা মাসজিদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র হারাম শরীফই মাসজিদ।

বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানীর ঘরে এশার নামাযের পর ঘুমিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মাসজিদুল আকসায়। তারপর একই রাত্রে ফিরে আসেন এবং উম্মে হানীর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে নবীদেরকে উপস্থিত করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে নিয়ে আমি নামায পড়েছি। এরপর তিনি মাসজিদুল হারামের দিকে পা বাড়াতেই উম্মে হানী তার কাপড় টেনে ধরেন। রসূল (স.) বলেন, কী ব্যাপার? উম্মে হানী বলেন, তুমি তোমার জাতিকে এ ঘটনা জানালে তারা তোমাকে মিথ্যুক বলবে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বললেন, আমাকে তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে করুক। তবুও আমার বলতে হবে। অতপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আবু জাহল তার কাছে এসে বসলো। রসূল (স.) তাকে রাতের ভ্রমণের ঘটনা জানালেন। আবু জাহল কোরায়শের সবাইকে ডেকে জড়ো করলো। অতপর সে তাদের সবাইকে ঘটনাটা জানালো। এতে কেউ বা হাতে তালি দিলো, কেউ মাথায় হাত রেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করলো। ইতিপূর্বে রসূল (স.)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে বসলো। কিছু লোক হযরত আবু বকরের কাছে ছুটে গেলো এবং তাকে ঘটনার কথাটা জানালো। আবু বকর বললেন, এটা কি মোহাম্মদ (স.) বলেছেন? তারা বললো, হাঁ। আবু বকর (রা.) বললেন, তিনি যদি বলে থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই বলেছেন। তারা বললো, একই রাত্রে তাঁর সিরিয়া যাওয়া এবং সকাল হওয়ার আগে মক্কায় ফিরে আসার কথা তুমি বিশ্বাস করো? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তাঁর আরো দূরের কথাও বিশ্বাস করি। তিনি আকাশের খবর জানান। তাও আমি বিশ্বাস করি।' এ কারণেই তাকে সিদ্দীক নাম দেয়া হয়। কোরায়শ গোত্রে বাইতুল মাকদেস ভ্রমণ করেছে এমন অনেকেই ছিলো। তারা রসূল (স.)-কে মাসজিদের বিবরণ দিতে বললো। তখন গায়বীভাবে মাসজিদকে তার সামনে হাযির করা হলো, তিনি তার দিকে তাকিয়ে মাসজিদের পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তখন সবাই বললো, তাই তো, বিবরণ তো ঠিকই দিয়েছে। তারা বললো, 'হে মোহাম্মদ, আমাদের একটা কাফেলা সিরিয়ার পথে রয়েছে। তার বিবরণ দাও।'

রসূল (স.) ওই কাফেলার উটের সংখ্যা ও অবস্থা জানালেন। তিনি বললেন, কফেলাটা অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় আসবে এবং তার সর্বাগ্রে থাকবে একটা সবুজ

www.pathagar.com

উট। নির্দিষ্ট দিনটাতে লোকেরা মক্কার প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটে গেলো কাফেলার অগ্রভাগ দেখার জন্যে। যথার্থই একটা কাফেলা দেখা গেলো। জনৈক দর্শক বললো, আল্লাহর কসম, এখন সূর্য উঠছে। আর একজন বললো, হাঁ, আল্লাহর কসম, ওই তো কাফেলা এসেছে, ওর অগ্রভাগে সবুজ উটও রয়েছে, ঠিক যেমনটি মোহাম্মদ বলেছে। কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনলো না।.... একই রাতে রসূল (স.) বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ আকাশে আরোহণ করেন।

রসূল (স.)-এর এই নৈশ সফর বা 'ইসরা' তার জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিলো না স্বপ্নে-এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, রসূলের দেহ বিছানা থেকে অদৃশ্য হয়নি, কেবল তার আত্মা সফরে গিয়েছিলো।' হযরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন, দেখেছিলেন।' অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, দেহ ও আত্মা-উভয়ই এই সফরে গিয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর বিছানাও গরম ছিলো।

এ সংক্রান্ত সব কটা হাদীসের সমন্বয়ে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তা হচ্ছে, রসূল (স.) উম্মে হানীর বাড়ীতে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে মাসজিদুল হারামে যান, কাবা শরীফের কাছে হাজরে আসওয়াদে অবস্থানকালে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হন, ঠিক তখনই তাকে ইসরা ও মেরাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তিনি তার বিছানা ঠান্ডা হওয়ার আগেই ফিরে আসেন।'

রসূল (স.)-এর জীবনে এই ঘটনা যে ঘটেছিলো, তা সুনিশ্চিত। তবে এর ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে আগেও বিতর্ক ছিলো, আজও আছে। আমি সেই বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি যে, ইসরা ও মেরাজের ঘটনা সশরীরেই ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারেই ঘটুক এবং এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটুক, উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মূলত ঘটনার প্রকৃতি এই যে, এর মাধ্যমে রসূল (স.)-কে বহু দূরবর্তী জগত ও দূরবর্তী স্থানগুলোকে এক নিমিষেই দেখানো হয়েছে। এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায় ঘটুক, কিংবা সশরীরে ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারে ঘটুক-কিছুই এসে যায় না। যারা আল্লাহর শক্তি ও নবুওতের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত, তারা এ ঘটনায় অবাক হবার মতো কিছু দেখতে পাবেন না। যে সমস্ত কাজ মানুষ নিজের দৃষ্টিতে তার নিজের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তি অনুসারে এবং তার নিজস্ব অভ্যাস ও দৃষ্টিভংগীর বিচারে কঠিন বা সহজ মনে করে, আল্লাহর শক্তির সামনে তা সবই সমান। মানুষ নিজ ভুবনে যা কিছু দেখতে অভ্যস্ত, সেই অনুসারে আল্লাহর ক্ষমতাবলে সম্পাদিত বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করা তার পক্ষে বেমানান। তাছাড়া নবুওতের প্রকৃতিও সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করার মতো বিষয় নয় নবুওতের প্রকৃতিই হলো উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ, যা সাধারণ মানুষের আন্দায অনুমান ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। দূরবর্তী স্থান ও দূরবর্তী জগত পরিদর্শন ও পরিচিত বা অপরিচিত কোনো বাহন দ্বারা সেখানে পৌছার এই কাজটা উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগের চেয়ে বেশী বিস্ময়কর কিছু নয়। হযরত আবু বকর (রা.) যথার্থই বলেছেন যে, আমি

www.pathagar.com

তো তাঁর সম্পর্কে এর চেয়েও দূরের ব্যাপার বিশ্বাস করি। তিনি সুদূর আকাশ থেকে যে খবর এনে দেন তাও বিশ্বাস করি, বায়তুল মাকদেস তো পৃথিবীরই আওতাভুক্ত। রসূল (স.) কর্তৃক কাফেলার নির্ভুল বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এই ঘটনার সত্যতা মোশরেকদের কাংখিত বস্তুগত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো এই ঘটনা অতিমাত্রায় বিস্ময়কর বিধায় লোকেরা বিশ্বাস করবে না-এই মর্মে উম্মে হানী ভীতি প্রদর্শন করা সত্তেও রসূল (স.) তাতে কর্ণপাত করেননি। কেননা রসূল (স.) যে সত্য বহন করে এনেছেন এবং যে সত্য ঘটনা তাঁর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে, তাতে তাঁর বিশ্বাস এতো দৃঢ় ছিলো যে, সে সম্পর্কে জনগণের মতামত কী হবে, তা ভেবে দেখেননি, বরং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ঘটনা শুনে কোনো কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো এবং অনেকে এটাকে ব্যংগ-বিদ্রূপের ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে তিনি এটা প্রচার না করে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। যারা ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্যে এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদেরও কর্তব্য সত্যকে নির্ভয়ে ও নিসংকোচে প্রচার করে যাওয়া এবং কে কি ভাববে, কে খুশী বা নাখোশ হবে তার কোনো তোয়াক্কা না করা।

আরো লক্ষণীয় যে, জনগণ প্রকাশ্য ও বস্তুগত অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোর জন্যে অনেক পিড়াপিড়ি করা সত্তেও এবং অন্তত রসূলের বাইতুল মাকদাস সফরের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও রসূল (স.) এ ঘটনাকে নিজের রেসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে একটা অলৌকিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ ইসলামের দাওয়াত অলৌকিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। এটা শুধু ইসলামী জীবন বিধানের স্বভাবানুগতা ও সুস্থ বিবেকের কাছে তার স্বতস্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং রসূল (স.) এই ঘটনাটা প্রকাশ করার জন্যে যেরূপ আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেটা এ জন্যে নয় যে, তিনি তার রেসালাতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে এর ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন, বরং এর প্রকৃত কারণ ছিলো এই যে, তিনি সত্যকে অকাট্যভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন।

সূরা আল কাহ্‌ফ

কিসসা কাহিনীই হচ্ছে এই সূরার প্রধান উপাদান। এর শুরুতেই রয়েছে 'আসহাবুল কাহাফের' ঘটনা। এরপর দুটো বাগিচার কিসসা। তারপর ইবলীস ও হযরত আদমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মাঝখানে হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা এবং সবার শেষে যুল কারনায়নের ঘটনা। এই সূরার অধিকাংশ ঘটনাগুলোই বিস্তৃত। সূরার মোট একশো দশ আয়াতের মধ্য থেকে ৭১ আয়াত জুড়েই রয়েছে এসব কাহিনী। বাদ-বাকী আয়াতগুলোরও বেশীর ভাগ এসব কাহিনীসংক্রান্ত মন্তব্যে পরিপূর্ণ। এই কিসসা কাহিনীর পাশাপাশি কেয়ামতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, আরো রয়েছে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দৃশ্য।

www.pathagar.com

তবে সূরার যে কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে তার আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পৃক্ত এবং তার গোটা আলোচনা যে বিষয়টির ওপর কেন্দ্রীভূত, তা হলো মানুষের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন এবং এই আকীদা বিশ্বাসের নিরীখে মূল্যবোধগুলোর সংশোধন। আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনমূলক বক্তব্য সূরার শুরুতেও রয়েছে, শেষেও রয়েছে। শুরুতে রয়েছে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি তার বান্দার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন ...।' (আয়াত ১-৫) আবার সূরার শেষে রয়েছে, 'বলো, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, আমার কাছে ওহী আসে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ।.....'

এভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণে, শেরেক বাতিল করণে, ওহীর সত্যতা প্রতিষ্ঠায় এবং আল্লাহর অবিনশ্বর সত্ত্বা ও তাবত সৃষ্টির নশ্বর সত্ত্বার মধ্যে চূড়ান্ত বৈপরীত্য প্রমাণে এ সূরার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলোর সমতান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। সূরার একাধিক জায়গায় এ বিষয়টা বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। 'আসহাবুল কাহফের' ঘটনায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যুবকদের এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, 'আমাদের প্রভু হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু। আমরা কখনো তাকে ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে মাবুদ মানবো না। তখন যা বলেছি, ভুল বলেছি।'

এরপর এই কিসসার উপসংহারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো অভিভাবক নেই। তার শাসনে আর কারো অংশীদার হবার অধিকার নেই।'

দুটো বাগিচা সংক্রান্ত ঘটনায় ঈমানদার ব্যক্তিটি তার সংগীর সাথে কথা বলার সময় বলেছিলো, 'যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে এবং পরে এক ফোঁটা পঁচা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর একজন পূর্ণাংগ ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। তাঁকে তুমি অস্বীকার করলে?'

আর এই ঘটনার উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, ... অভিভাবকত্ব একমাত্র আল্লাহর–যিনি পরম সত্য। তিনি উত্তম প্রতিদান দাতা ও উত্তম শান্তিদাতা।'

কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'যেদিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়েছিলে, তাদেরকে ডাকো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ডাক শুনবে না, আর আমি তাদের মাঝে রেখে দেবো একটা ধ্বংসকূপ।'

অন্য একটা দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তবে কি কাফেররা ভেবেছে যে, আমাকে বাদ দিয়ে তারা আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক মেনে নেবে? আমি জাহান্নামকে কাফেরদের আপ্যায়নের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।'

এরপর আসে চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগি সংশোধনের প্রসংগ। এ বিষয়টা মোশরেকদের প্রমাণহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এবং অজানা বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন সূরার শুরুতে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা একজন পুত্র গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই, তাদের বাপদাদারও নেই।'

আর গুহাবাসী (আসহাবুল কাহফ) তরুণরা বলেছে, 'এই হচ্ছে আমাদের স্বজাতির অবস্থা। তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যকে উপাস্য মেনে নিয়েছে। সেই উপাস্যদের পক্ষে ওরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন?' তারা নিজেদের অবস্থানকাল নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এ সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। 'তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা কতোদিন অবস্থান করেছ।'

ঘটনার বিবরণ দান প্রসংগে এক জায়গায় যারা তাদের সংখ্যা বিষয়ে অনুমান নির্ভর কথা বলে, তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, 'কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটা তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটা তাদের কুকুর.... (আয়াত ২২) আর আল্লাহর সৎ বান্দার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় রয়েছে যে, তার যে সব কার্যকলাপে মূসা (আ.) অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, তার আসল রহস্য উদঘাটন করে বললেন, 'তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এটা করা হয়েছে। আমি এগুলো নিজ উদ্যোগে করিনি।' (আয়াত ৮২) এখানেও বিষয়টাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আকীদা বিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধের পরিশুদ্ধির বিষয়টাও বিভিন্ন আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঈমান ও সৎকাজকে। এছাড়া অন্য যেসব জড়বাদী মূল্যবোধ রয়েছে, তাকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যতো ভোগবিলাসের সামগ্রী রয়েছে তা নিছক পরীক্ষার জন্যে। সেগুলোর শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়, 'আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জিনিসকে পৃথিবীর সৌন্দর্যবর্ধক বানিয়েছি, যেন পরীক্ষা করতে পারি মানবজাতির মধ্যে কে অধিকতর সৎ কর্মশীল তারপর মৃত্তিকায় পরিণত করবো।' (আয়াত ৭-৮)

এই পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, মানুষ যতো কঠিন ও সংকীর্ণ পর্বতগুহায় আশ্রয় নিক না কেন, আল্লাহর আশ্রয়টাই অধিকতর প্রশস্ত। গুহাবাসী মোমেন যুবকরা তাদের স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে বলেছিলো, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যকে ওরা পূজা করে তাদের যখন তোমরা ত্যাগ করেছো, তখন চলো, পর্বতগুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর রহম করবেন এবং তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করবেন।' (আয়াত ১৬)

রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যেন তিনি মোমেনদের সাথে ধৈর্য সহকারে অবস্থান করেন এবং দুনিয়া-পুজারীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। (আয়াত ২৮-২৯)

www.pathagar.com

দুটো বাগান সংক্রান্ত ঘটনায় দেখানো হয়েছে, কিভাবে একজন মোমেন অর্থসম্পদ ছাড়াই কেবল ঈমানী সম্পদ দ্বারা সম্মানিত হয়ে থাকে, কিভাবে সে দর্পিত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মোকাবেলা করে এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে। (আয়াত ৩৭-৪১)

পার্থিব জীবন এবং তার সমৃদ্ধির পর ত্বরিত ধ্বংস প্রাপ্তির উদাহরণ দিয়ে এই কেসসার ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। (আয়াত ৪৫) অনুরূপভাবে ধ্বংসশীল মূল্যবোধ ও চিরঞ্জীব মূল্যবোধের বিবরণও দেয়া হয়েছে এই ঘটনার উপসংহারে। (আয়াত ৪৬)

একজন সম্রাট বলে নয়, বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসাবে আলোচিত হয়েছেন যুল কারনায়ন। দুটো বাঁধের মাঝখানে বসবাসকারী একটা জাতি যখন তাকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার নিমিত্তে একটা বাঁধ নির্মাণের অনুরোধ জানালো এবং সেজন্যে তারা তাকে টাকা পয়সা দিতে রাযী হলো, তখন তিনি টাকা পয়সা নিতে অস্বীকার করে জানালেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দিয়েছেন, তা অনেক উত্তম। (আয়াত ৯৫)

যখন বাঁধ নির্মাণ শেষ হলো, তখন ওই কাজের জন্যে নিজের মানবীয় ক্ষমতার কৃতিত্ব যাহির করলেন না, বরং এটা আল্লাহর রহমতের অবদান বলে ঘোষণা করলেন। (আয়াত ৯৮)

সূরার শেষে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর কোনো হুকুম অগ্রাহ্য করেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেছে। বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের অন্যান্য কাজ কর্মকে যতোই ভালো মনে করুক, আসলে তার কোনো গুরুত্ব বা মূল্য নেই। (আয়াত ১০৩-১০৫)

এভাবে আমরা দেখতে পাই, এ সূরাটার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো আকীদাবিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন এবং আকীদাবিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার পরিশুদ্ধি।

কয়েকটা অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটা শুরুই হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান এবং আল্লাহর পুত্র আছে-এই মিথ্যা উক্তিকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। এরপরই শুরু হয়েছে আসহাবুল কাহাফের ঘটনার বিবরণ। এ কেসসা আসলে পার্থিব সম্পদের ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার দানের এবং ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহায় আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর রহমত কামনারও দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হয়েছে রসুল (স.)-কে ধৈর্য সহকারে মোমেনদের সাথে অবস্থান করার আদেশ দানের মধ্য দিয়ে। এরপর এসেছে দুই বাগানের মালিকদের ঘটনা, এ ঘটনার মাধ্যমে আসল ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কেয়ামত সংক্রান্ত কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর মাঝখানে রয়েছে আদম ও ইবলীসের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শেষে এসেছে

www.pathagar.com

যালেমদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুসৃত নীতির বর্ণনা। সেখানে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাপীদের ওপরও যথেষ্ট দয়ালু এবং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা পুরোপুরিই ব্যয়িত হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা বর্ণনায়। পঞ্চম অধ্যায় যুল কারনাইনের কিসসার বিবরণ দানে। উপসংহারে আলোচিত হয়েছে সূরার সূচনা পর্বের বিষয়গুলো। যথা মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন, ওহীর সত্যতা প্রমাণ এবং আল্লাহকে শেরেক থেকে পবিত্র ঘোষণা।

সূরা মারইয়াম

অধিকাংশ মক্কী সূরার ন্যায় এই সূরাটিতেও তাওহীদ, পুনরুত্থান এবং লা-শরীফ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য সূরার প্রধান উপাদান হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ। এতে গোড়ার দিকে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারইয়াম, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, হারুন, ইসমাঈল, ইদ্রিস এবং আদম ও নূহ (আ.) প্রমূখ নবী রসূলদের আংশিক আলোচনাও এসেছে। সূরার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই এসব ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ, পুনরুত্থান, আল্লাহ তায়ালা সন্তানহীন ও শরীকহীন, সত্য পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শ এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শের স্বরূপ।

এর পর আলোচনায় স্থান পেয়েছে কেয়ামতের কিছু চিত্র এবং পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের সাথে কিছু তর্ক বিতর্ক।

শেরককে বর্জন করা, আল্লাহর সন্তান হওয়া দাবীকে অস্বীকার করা, ইহকালে ও পরকালে কাফের মোশরেকদের করুণ পরিণতির বিষয়টি উপস্থাপন করা, এসব কিছুই এসেছে সূরায় মূল বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ফলে এসব আলোচনা সূরার মুল প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

সূরায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় একটা তীব্র আবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই আবেগ অনুভূতি মানব হৃদয়ে যেমন পরিলক্ষিত, তেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে পারিপার্শ্বিক জগতে। এই সে বিশাল জগত যা আমাদের কাছে এক অনুভূতিহীন জড় পদার্থ বলে মনে হয়, সেই জগতই আলোচ্য সূরার বর্ণনায় একটা অনুভূতিশীল ও সংবেদনশীল জীবন্ত অস্তিত্ব রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আমরা আকাশকে চরম ক্রোধে বিদীর্ণ হতে দেখতে পাই, প্রচন্ড আক্রোশে পাহাড়কে দিখন্ডিত হতে দেখতে পাই। অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় এসব জড় পদার্থও যে প্রভাবিত হয় তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। (এই আশংকার কারণ হচ্ছে এটাই) যে, এরা দয়াময় আল্লাহর জন্যে ..... হিসেবে উপস্থিত হবে না। (আয়াত ৯০-৯২)

www.pathagar.com

অপরদিকে মানবীয় আবেগ অনুভূতির বিষয়টির বর্ণনা এসেছে সূরার গোড়ার দিকে এবং শেষের দিকে। সূরায় বর্ণিত মূল ঘটনা জুড়ে রয়েছে এসব আবেগ অনুভূতির আলোচনা, বিশেষ করে মারইয়াম (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মানবীয় আবেগ অনুভূতির আধিক্য ও প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

সূরার অন্তর্নিহিত ভাব ও ভঙ্গির মাঝে দয়া, করুণা, সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর যোগসূত্রের চিত্রটি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। সূরার গোড়ার দিকেই যাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রসঙ্গ এসেছে। অপরদিকে যাকারিয়া (আ.) স্বীয় প্রভু ও মালিকের সাথে যে একাকী ও নিভৃতে নিজের মনের বাসনা ও আরযিটুকু সকাতর ভাষায় তুলে ধরছেন– সে প্রসংগও এসেছে। সূরার একাধিক স্থানে 'রহমত' শব্দ বা এর সমার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাথে সাথে 'পরম করুণাময়' শব্দের অধিক ব্যবহারও এখানে লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, পরকালে মোমেনরা যে সব নেয়ামত ভোগ করবেন সেগুলোকে 'ভালোবাসা' রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে সেটাকে 'স্নেহ বা মমতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তদ্রুপ ঈসা (আ.)-কে যে মাতৃভক্তি ও মাতৃ প্রীতির গুণ দান করা হয়েছে সেটাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'নম্রতা' ও 'কোমলতা' বলে।

মোটকথা, প্রতিটি শব্দে ও প্রতিটি বাক্যের পরতে পরতে আপনি দয়া, মায়া ও মমতার কোমল স্পর্শ অনুভব করবেন। অপরদিকে যেখানে 'শেরক' এর প্রসংগ এসেছে সেখানে আপনি গোটা সৃষ্টি জগতের মাঝে এক প্রচন্ড দ্রোহ ও ক্ষোভ অনুভব করবেন। মনে হবে যেন আকাশ পাতাল ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। কারণ, একমাত্র আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা মহাপাপ। এই পাপের কথা শুনে আকাশ পাতাল ও প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়তে উপক্রম হয়।

বর্ণনাভংগির মাঝেও এক বিচিত্র ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এখানে রয়েছে ছোট ছোট ও ছন্দময় বাক্য। প্রতিটি বাক্যের সমাপ্তি ঘটেছে একটি সুষম মাত্রা ও তালের মাধ্যমে। কোথাও লঘু আবার কোথাও গুরু। ক্ষোভ, আক্রোশ ও দ্রোহ যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেখানে শব্দের শেষের অক্ষরটি দ্বিত্ব রূপে এসেছে। ফলে ছন্দ ও তালের মাঝে দৃঢ়তা গাম্ভীর্য ও রুক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে যেমন, মাদ্দা, দিদ্দা, এদ্দা, হাদ্দা, এয্যা ও আয্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ বক্তব্যের বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে ছন্দ ও মাত্রার মাঝেও বৈচিত্র্য এসেছে এই সূরার প্রতিটি জায়গায়।

বিবৃতি বা কাহিনী ধর্মী বক্তব্যে ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। পক্ষান্তরে যেখানে মন্তব্য বা বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তব্য এসেছে সেখানে বর্ণনা ভংগি সরল ও গদ্যময়। এই ভাবে বক্তব্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্ণনা ভংগির মাঝেও পরিবর্তন এসেছে সূরার একাধিক স্থানে।

www.pathagar.com

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু তিনটি পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এসেছে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারিয়াম ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা। ঘটনা বর্ণনা শেষে মন্তব্যের পালা এসেছে। এখানে ঈসা (আ.)-এর জন্মকে কেন্দ্র করে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে বিতর্ক চলে আসছে তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা এসেছে। এই ঘটনার বর্ণনায় তার পিতাসাথে ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রসংগ এসেছে। শেরকবাদী সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎ ও ন্যায় পরায়ন সন্তান-সন্ততির আকারে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তারও বর্ণনা এসেছে। এর পর নবী রসূলদের প্রসংগ এসেছে। সঠিক পথের অনুসারীদের শুভ পরিণতির বক্তব্যও এসেছে। সাথে সাথে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের অশুভ পরিণতির প্রসংগও উল্লেখিত হয়েছে। এই পর্যায়ে সব শেষে লা-শরীক আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা, অধিকার ও আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, (কিছু সংখ্যক মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার .....পুনরুত্থিত হবো? (আয়াত ৬৫)

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়টি এসেছে। এ প্রসংগে কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে শেরক ও খোদাদ্রোহীতার প্রতি গোটা সৃষ্টি জগতের প্রচন্ড ক্ষোভ ও আক্রোশের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে যুগে যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলোর করুণ দৃশ্যের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, (এই মূর্খ) লোকেরা বলে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। (আয়াত ৮৭)

সূরা ত্বাহা

এই সূরার শুরু ও সমাপ্তি দুটোই হয়েছে রসূল (স.)-কে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে যে, তার ওপর কোনো দুর্ভাগ্যও চাপিয়ে দেয়া হয়নি, তাঁকে কোনো শাস্তিও দেয়া হয়নি। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত দেয়া ও স্মরণ করানো, সুসংবাদদান ও ভীতি প্রদর্শন, তারপর সমগ্র মানব জাতিকে একমাত্র সেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি সৃষ্টিজগতের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি অন্তর্যামী, সমগ্র সৃষ্টি যার বশীভূত এবং অবাধ্য ও অনুগত নির্বিশেষে সকল মানুষ যার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য। রসূল (স.) এ দায়িত্ব পালন করার পরও যারা আল্লাহর অবাধ্য থাকবে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে, তাদের জন্যে তিনি দায়ী থাকবে না এবং তাদের মিথ্যা আরোপ ও অবাধ্যতার কারণে কোনো ভাগ্য বিপর্যয়ও ঘটবে না।

উক্ত সূচনা ও সমাপ্তির মাঝখানে কয়েকটা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর

www.pathagar.com

নবুওতলাভ থেকে শুরু করে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়া, বিশেষত আল্লাহ তায়ালা ও মূসা (আ.)-এর মাঝে কথোপকথন, মূসা ও ফেরাউনের বিতর্ক এবং মূসা ও যাদুকরদের মাঝে যাদুর প্রতিযোগিতার বিবরণ। এই কাহিনীর বিবরণের মধ্য দিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন তোমাকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করিয়েছি এবং নিজের জন্যেই করিয়েছি। তারপর তাকে ও তার ভাইকে বলেছেন, 'তোমরা দু'জন ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি, সব কিছুই দেখছি ও শুনছি।'

এ সূরায় হযরত আদমের কাহিনীও আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে ও ক্ষুদ্র আকারে। সেখানে দেখানো হয়েছে একটা ভুল কাজ করেও কিভাবে হযরত আদম আল্লাহর অনুগ্রহ ও হেদায়াত লাভ করলেন। সেই সাথে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আদমের বংশধরকে সদুপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শনের পর হেদায়াত ও গোমরাহী– এই দুটোর যেটাই গ্রহণ করতে চাইবে, করার স্বাধীনতা দেবেন।

পুরো কাহিনীটা কেয়ামতের দৃশ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটা হযরত আদমের বেহেশতে থাকাকালীন কাহিনীর প্রাথমিক অংশের পরিশিষ্ট স্বরূপ। আল্লাহর অনুগত বান্দারা সে বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং অবাধ্যরা যাবে দোযখে। হযরত আদম যখন সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার পর পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এ জন্যে সূরাটা দুই অংশে বিভক্ত। রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে কথা সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে সেটা রয়েছে প্রথম অংশে, সে কথাটা হলো, 'আমি তোমার কাছে এ জন্যে কোরআন নাযিল করিনি যে, 'তুমি দুর্ভোগ পোহাবে; বরং আল্লাহভীরুদের উপদেশ দেয়ার জন্যে নাযিল করেছি।' এর অব্যবহিত পরই মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাদের তার দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে নির্বাচিত করেন, তারা তার তত্ত্বাবধানেই থাকে। তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তারা দুর্ভোগ পোহায় না।

আর দ্বিতীয় অংশে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী ও হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী সূরার প্রথমাংশ ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করছে। এরপর রয়েছে সূরার সমাপনী বক্তব্য, যা সূরার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সূরার পটভূমির সাথে সুসমন্বিত।

সূরার একটা বিশেষ তাৎপর্যময় প্রভাব রয়েছে। সে প্রভাব গোটা প্রেক্ষাপটক বেষ্টন করে রেখেছে। অতি উচ্চস্তরের এই প্রভাবের কাছে সকলের মনমস্তিষ্ক নতিস্বীকার করে রয়েছে। এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে পবিত্র তুয়া ময়দানে নিস্তব্ধ নিশীথে একাকী হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর সুদীর্ঘ একান্ত সংলাপে। কেয়ামতের মাঠেও মহান আল্লাহর অলৌকিক আবির্ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রভাব। 'দয়াময় আল্লাহর সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি ক্ষীণ পায়ের

www.pathagar.com

আওয়ায ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবে না। ..... সেদিন সব মুখমন্ডলই সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকবে।' (আয়াত ১০৮-১১১)

সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের শেষে 'আলিফ মাকসূরা' বিশিষ্ট শব্দের অবস্থানে এক সুমধুর ছন্দময় ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে।

সূরা আল আম্বিয়া

এ সূরাটা মক্কী। অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

এই আকীদাগত বিষয়গুলো এ সূরায় প্রাকৃতিক জগতের বড়ো বড়ো নিয়ম ও উপাদানের বিবরণ দানের মাধ্যমে এবং আকীদা বিশ্বাসকে তার সাথে সংযুক্ত করণের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত আকীদা বিশ্বাস মহাবিশ্বের সৃষ্টিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তার প্রধান প্রধান নিয়ম ও উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এইসব নিয়ম ও উপাদান সেই মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার ওপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যার ভিত্তিতে আকাশ ও পৃথিবী পরিচালিত। এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম ও উপাদান এবং এই মহাবিশ্ব মোটেই উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন নয়, নয় তা নেহাত লীলাখেলা। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা দোখানে বলেছেন, 'আমি আকাশ ও পৃথিবীকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।'

এ জন্যে সূরাটা মানুষের হৃদয়, দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে মহাবিশ্বের কয়েকটা জোড়া জোড়া অংশ যথা আকাশ ও পৃথিবী, পাহাড় ও সমতল, দিন ও রাত এবং সূর্য ও চন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এইসব সৃষ্টিকে পরিচালনা ও শাসনকারী প্রাকৃতিক বিধানের একত্বের দিকে। এই প্রাকৃতিক বিধানের একত্ব দ্বারা যে প্রাকৃতিক জগত তথা সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতির একত্বই প্রমাণিত হয় সে বিষয়ের দিকেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ কথাও উপলব্ধি করার আবেদন জানানো হয়েছে যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যেমন অন্য কেউ আল্লাহর সাথে শরীক ছিলো না, তেমনি তার মালিকানায়, আধিপত্যে ও কর্তৃত্বেও কেউ তার অংশীদার নেই। বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুও থাকতো, তাহলে সে দুটোই ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এরপর মানুষের বিবেককে এ কথা উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রাণীজগত একই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত এবং সমুদয় প্রাণীর জীবন একই উৎস থেকে উৎসারিত। বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকটি প্রাণীকে আমি পানি থেকে তৈরী করেছি।' এমনকি সমুদয় প্রাণীর জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটে একইভাবে, 'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেই' এবং মৃত্যুর পরে সবাই একই গন্তব্যের দিকে ফিরে যাবে। 'অতপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে আসবে।'

তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত মৌল আকীদা সেসব প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান ও নিয়মের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই আকীদাও চিরদিন এক ও অভিন্ন, যদিও যুগে যুগে বহু নবী ও রসূল দুনিয়ায় এসেছেন,

www.pathagar.com

'আমি তোমার পূর্বে যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, তার কাছে এই ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাই তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত করো।'

রসূলরা সবাই মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিক, এটাই আল্লাহর শাশ্বত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমার পূর্বে আমি শুধু কিছু মানুষকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।'

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস যেমন মহাবিশ্বের বড়ো বড়ো নিয়ম কানুন ও উপাদানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, এই আকীদা বিশ্বাসের পার্থিব বৈশিষ্ট্যগুলোও তেমনি। তাই বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন রীতি হলো, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বে সত্যই বিজয়ী এবং বাতিল পরাজিত হবে। সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের অন্যতম স্তম্ভ এবং তার বিজয় আল্লাহর শাশ্বত নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং আমি সত্যকে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যায়।'

অনুরূপ, অত্যাচারী ও মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস এবং রসূল ও মোমেনদের মুক্তি লাভও আল্লাহর এক চিরন্তন নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছি, তাদেরকে ও অন্য যাদেরকে ইচ্ছা করেছি, মুক্তি দিয়েছি এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছি।'

পৃথিবীটা আল্লাহর সৎ লোকদের অধিকারভুক্ত থাকুক এটাও আল্লাহর অন্যতম নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর মালিক হবে।'

এ জন্যে এই সূরায় সকল রসূলের উম্মাতদেরকে একই উম্মাত গণ্য করে তাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনা সূরার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থান করছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ, সোলায়মান, নূহ, মূসা, হারুন, লূত, ইসমাঈল, ইদ্রীস, যুলকিফল, যুন্নুন, যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষেপে।

এ আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার শুরুতে আলোচিত তত্ত্বসমূহকে বাস্তব ঘটনার আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে যা সাধারণ নীতিমালা ও আদর্শের আকারে বিবৃত হয়েছে, পরবর্তীতে তা নবীদের জীবন ও আন্দোলনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বাস্তবতার রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরায় কেয়ামতের কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এসব দৃশ্যের মধ্য দিয়েও সে সব তত্ত্ব ও নীতিমালা কেয়ামতের বাস্তবতার আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এভাবে সূরার বিভিন্ন দৃশ্য একই লক্ষ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেই লক্ষ্য হলো মানুষের মনকে সেই মহাসত্য উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা, যা শেষনবী (স.) এর আনীত আকীদা ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে মানুষ সেই মহাসত্য সম্পর্কে উদাসীন ও বিমুখ থাকতে পারবে না। এই মহাসত্য সম্পর্কে তাদের

www.pathagar.com

উদাসীনতা ও বিমুখতার বিষয়টি সূরার প্রথম তিন আয়াত জুড়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা তা থেকে উদাসীন ও বিমুখ রয়েছে।'..... (১-৩)

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর এই সৃষ্টিজগত যেমন সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা, নবী ও রসূলদের আনীত বাণী ও দাওয়াতও তেমনি সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা। কাজেই তা ঠাট্টা ও উপহাস করে যেমন উড়িয়ে দেয়া চলে না। তেমনি তার সমর্থনে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চাওয়াও সমীচীন নয়। গোটা বিশ্ব নিখিলে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যখন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই সমুদয় সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র সর্বশক্তিমান সত্ত্বা এবং নবীর আনীত বাণী ও বার্তা সেই অসীম শক্তিধর একক স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছে, তখন এর প্রমাণ হিসেবে আর কোনো অলৌকিক ঘটনার দাবী সংগত নয়।

শব্দ ও সুরের দিক দিয়ে এ সূরার সার্বিক কাঠামো প্রতিবেদনমূলক এবং তার আলোচ্য বিষয় ও পূর্বাপর পটভূমির সাথে তার পূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান। সূরা মারইয়াম ও সূরা ত্বা-হার সাথে এ সূরার তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে দুটো সূরার সুর অত্যন্ত উদার ও বিনীত এবং সূরা দুটোর সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ সূরার সুর গম্ভীর, স্থিতিশীল এবং সূরার আলোচ্য বিষয়ও পটভূমির সাথে সংগতিশীল।

এই পার্থক্যটা তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সূরা মারিয়ামে ও আলোচ্য সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনাধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। সূরা মারইয়ামের হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার পিতার মধ্যে উদার ও বিনীত কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সূরায় যে কথোপকথন হয়েছে, তা মূর্তিভাংগা ও ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের মতো চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এভাবে উভয় জায়গাতেই সূরার বর্ণনাভংগী শাব্দিক কাঠামো, পটভূমি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

সূরা আম্বিয়ায় চারটি পর্ব বা অধ্যায় দেখা যায়ঃ প্রথম পর্বটা শুরু হয়েছে বিবেককে জোরদার আঘাত করে জাগিয়ে তোলা ও মন মগযকে প্রচন্ড ধাক্কা ও ঝাঁকুনী দিয়ে ভুলে যাওয়া আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচকিত করার মধ্য দিয়ে। এর প্রথম আয়াত হলো

'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে আসছে, অথচ তারা উদাসীন ও বিমুখ.....।'

অতপর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য বর্ণনাপূর্বক আরো একটা ধাক্কা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন এবং বিভ্রান্তি ও অপরাধে নিমজ্জিত ছিলো।

'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা যুলুম অত্যাচারে ডুবেছিলো, ...'। (আয়াত ১১-১৫)

www.pathagar.com

এরপর দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে এবং প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আরো যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তাওহীদী আকীদা ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও বিধাতার একত্ব এবং সকল নবী ও রসূলের প্রচারিত আকীদা ও বিধানের অভিন্নতার মধ্যে, জীবনের আরম্ভ ও অবসান এবং উৎস ও পরিণতির অভিন্নতার মধ্যে।

দ্বিতীয় পর্বটায় রসূল (স.)-এর সাথে ব্যাংগ বিদ্রূপকারী কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এমন অকাট্য সত্য ও গুরুতর বাস্তবতাকে উপহাস করা তোমাদের উচিত নয়। তাদের চারদিকে বিরাজমান গোটা পরিবেশ যখন সচেতন ও সচকিত হবার আহ্বান জানাচ্ছে তখন তা নিয়ে তামাশা করা এবং আযাব যখন আসন্ন, তখন আযাব পাঠানোর জন্যে তাড়াহুড়ো করা খুবই অন্যায় ও অসংগত। এখানে কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যারা নবীদেরকে ব্যংগ বিদ্রূপ করতো, তাদের পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই। মহান আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হাত কিভাবে পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিজনিত উদাসীনতা থেকে সতর্ক ও সচেতন করা যায়।

এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে রসূল (স.)-কে তাঁর আসল কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করার মধ্য দিয়ে। যথা, 'বলো, আমি তো শুধু ওহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করছি।' তাদের উদাসীনতার অশুভ পরিমাণ সম্পর্কে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে এই বলে, 'বধিররা কোনো সতর্কবাণী শুনতে পায় না।' আরো বলা হয়েছে যে, তারা উদাসীন থাকতে থাকতে একদিন কেয়ামত এসে পড়বে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের পর্যালোচনা। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে যে তায়ালা, সকল নবীর একই দাওয়াত, একই আকীদা বিশ্বাস ও একই ধর্ম ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার সৎ বান্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেন এবং কাফেরদেরকে পাকড়াও করেন।

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্বে আলোচিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত প্রসংগ। সূরার শেষের কথাগুলো প্রথম দিককার কথাগুলোর মতো জোরদার সতর্কীকরণমূলক।

সূরা আল মোমেনুন

আলোচ্য সূরাটি হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন'। সূরাটির এই বিশেষ নামই এর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তার দিকে ইংগিত করছে। সূরাটি শুরু হচ্ছে মোমেনদের গুণাবলীর কথা দিয়ে। এরপরই আলোচনার গতি ফিরে যাচ্ছে মানুষের নিজেদের মধ্যে ও প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ঈমানের প্রমাণগুলো পেশ করার দিকে, তারপর সেইভাবে ঈমানের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য পেশ করা হয়েছে যেমন করে নূহ (আ.)

www.pathagar.com

থেকে নিয়ে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল রসূল পেশ করেছেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে সেসব সন্দেহ সংশয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে যা ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অতীতে অনেক সময় রসূলরা সেসব হঠকারী ব্যক্তির অযৌক্তিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করা ও মোমেনদের সাহায্য করার জন্যে দোয়াও করেছেন। তারপর আলোচনার গতি ফিরে গেছে রসূলদের ইন্তেকালের পর, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কেউ নয়–এই প্রশ্নে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা নানা প্রকার মতপার্থক্যের দিকে। এখান থেকে আবার প্রিয় নবী মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে মোশরেকদের আপত্তিকর মন্তব্যসমূহের দিকে আলোচনার মোড় ফিরেছে এবং সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে কেয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের শাস্তির দৃশ্যের একটি স্বার্থক চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, সে কঠিন অবস্থার দৃশ্যের বর্ণনা দ্বারা সন্দেহবাদীদের অন্তরকে চিন্তান্বিত করতে চাওয়া হয়েছে, বরং পরোক্ষভাবে তাদেরকে সে আযাব এসে পাকড়াও করবে বলে ধমক দেয়া হয়েছে। যাতে করে তারা আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করে ও সময় থাকতেই শুধরে যায়।

এই হচ্ছে সূরা 'আল মোমেনূন' অথবা সূরাতুল ঈমান, যেখানে মোমেননদের সকল প্রকার গুণাবলী ও ঈমানের অকাট্য প্রমাণাদির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এই গুণাবলী বর্ণনা করাই সূরাটির লক্ষ্য ও মূল আলোচ্য বিষয়। সূরাটিকে প্রধানত চারটি অংশে ভাগ করে ঈমানদারদের চারটি অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে, মোমেনদের কৃতকার্য হওয়ার জন্যে জরুরী শর্তগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই মোমেনরা কৃতকার্য হবে.....।'

একথা ঘোষণা দেয়ার পর পরই তাদের মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলোর প্রসংগে, বলা হয়েছে এসব গুণ থাকলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে। তাদের জন্যে কৃতকার্য হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কথাগুলো বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং গোটা পরিবেশে ঈমানের এসব প্রমাণ থাকতে হবে। এরপর মানবজীবনের সূচনা তথা ভ্রূণ থেকে নিয়ে পূর্ণাংগ মানুষ সৃষ্টির যেসব পর্যায় এসেছে এসব অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে, আরো যে সব স্তর মানুষকে সাধারণভাবে অতিক্রম করতে হয় সেগুলোরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তারপর কেয়ামত দিবসে পুনরায় মানুষ যখন যিন্দা হয়ে উঠবে সেই সময় পর্যন্ত মানুষের পর্যায়ক্রমিক অবস্থারও একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরপর কথার গতি পরিবর্তন হয়ে এগিয়ে গেছে মানবজীবন থেকে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত প্রমাণাদির দিকে। আকাশ সৃষ্টি, বৃষ্টির পানি বর্ষণ, ফল ফসল, বৃক্ষ ও তরুলতাদি উৎপন্ন হওয়া এবং জীবজন্তু সব কিছুকে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করার দিকে, আর সে সব নৌযান এবং ভারবাহী পশুগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষ ও পণ্য বহন করে সাগরের উত্তাল তরংগ ও মরু মরীচিকার বুক চিরে চিরে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা এসেছে মানবপ্রকৃতি থেকে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যরাজি ও সেই ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে, যা মানবমনে মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই যে রসূলরা মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়। আল্লাহর আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, 'হে আমার জাতি, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো মাবুদ নেই।'

একথা যেমন নূহ (আ.) উচ্চারণ করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে আগত সকল নবী রসূলরা এই একই কথার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, যার ধারা এসে সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী ও রসূল মোহাম্মদ-(স.)-এ এসে। কিন্তু আফসোস কোরায়শ জাতির জন্যে, তাদের মধ্যেই লালিত-পালিত এবং তাদের পরম প্রিয়জন ও আস্থাভাজন এমন মধুর মানুষটিকে একথা বলে তারা উপেক্ষা করেছে যে, 'আরে, এতো তোমাদের মধ্যে বাস করে, এতো একজন সাধারণ মানুষ! এর কাছে কি করে আল্লাহর বার্তা আসবে! 'এ কাজের জন্যে চাইলে তো আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকেই নাযিল করতে পারতেন!' ....একইভাবে পুনরুত্থান সম্পর্কে রসূলের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতো 'এ ব্যক্তি কি তোমাদের কাছে এ ওয়াদাও করছে যে, তোমরা মরে যাবে এবং সবাই মাটিতে পরিণত হওয়ার পর আবার তোমাদের জীবিত করা হবে?' আর সকল রসূলদের একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে সবাই আল্লাহরই কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন এবং কামনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের দোয়া কবুল করেন। অতপর তিনি যেন সকল প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দেন .....আর এই পর্যায়টি সকল রসূলের প্রতি নির্দেশের সাথে শেষ হচ্ছে যে,

'হে রসূলরা খাও .....এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব একমাত্র আমাকে ভয় করো।'

এরপর আসছে তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা রসূলদের অবর্তমানে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ-অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। এক আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক প্রশ্নে যেহেতু সবাই এক এবং এই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন প্রত্যেক রসূল, 'অতপর, তারা এই মৌলিক বিষয়টি..... তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মত ও পথ নিয়ে খুশী।' (আয়াত ৫৩)

আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন তার শোকরগোযারী না করে তারা ভুলে গেছে যে, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সময়টি মোটেই চিরদিনের নয় এবং খাওয়া পান করা ও বিলাসিতার করার জন্যে নয়। এ জীবন যে অবশ্যই একটি পরীক্ষা, এ কথাটা একেবারেই তারা বে-মালুম ভুলে বসে আছে। আর ভাবছে, আজকে যেমন আছে এমনই চিরদিন চলবে। অবশ্য, মানুষের মধ্যে আল্লাহর কৃপাধন্য আত্মসমর্পণকারী আর একটি দলও রয়েছে , তারা আল্লাহকে ভয় করে, যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চালচলনে সদা-সর্বদা সাবধানে থাকে, পাছে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এ চিন্তা তাদেরকে কোনো ব্যাপারেই বে-পরওয়া হতে দেয় না।

www.pathagar.com

তারা বিনা শর্তে ও দ্বিধাহীন চিত্তে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করে, তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর ক্ষমতায় ও তাঁর গুণাবলীতে অন্য কাউকে তারা শরীক করে না, কিছুতেই তারা মেনে নেয় না যে, শক্তি-ক্ষমতা বা অন্য কোনো গুণাবলীতে অন্য কারো এতটুকু অংশ আছে। তবুও সার্বক্ষণিক এ ভয় তাদের লেগে থাকে, কিছু বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে না তো! আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অনুভূতিতে খুশী হয়ে তাদের কথা গর্বভরে তাঁর পাক পবিত্র কালামে বর্ণনা করছেন,

'তাদের অন্তরগুলো ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে।'

আর পাশাপাশি তাদের চিত্র আঁকা হচ্ছে যারা অপরিণামদর্শী, যারা আজকের এ নগদ নিয়ে বড়ই খুশী, এদেরকে হঠাৎ করে যখন অকল্পনীয় আযাবে পেয়ে বসবে, তখন তারা চরমভাবে অস্থির হয়ে যাবে, কিন্তু তখন কোনো উপায়ই থাকবে না। এজন্যে এখনই তাদেরকে আযাবের ভয় দেখিয়ে সাবধান হতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই আমার বিধিনিষেধ তোমাদের কাছে এসেছিলো, কিন্তু তোমরা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অহংকারী হয়ে চলতে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারটা বড়োই অদ্ভূত, তাঁকে তারা চির সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও সত্যপন্থী বলে জানতো, চিনতো, তাঁর কোনো কাজে তারা অসন্তুষ্ট ছিলো না এবং তাঁকে কোনো সময়ই তারা বিমুখ করেনি, অথচ যখন তিনি তাদের কাছে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন, তখন তারা তাঁর আনীত সত্যকে অস্বীকার করছিলো? অথচ তারা আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর মালিক বলে জানতো ও মানতো, আসমান যমীনের রব বা কর্তা হিসাবেও তাঁকে তারা মানতো, আর এটাও মানতো যে বিশ্বের সব কিছুর ওপর তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে, এতদসত্তেও তারা 'মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে' কথাটাকেই মানতে চাইতো না। তারা মনে করতো আল্লাহর সন্তান আছে, নাউযুবিল্লাহ!– তিনি মানবীয় এসব ধারণা কল্পনা ও দুর্বলতার সম্পূর্ণ ঊর্ধে! তারা আল্লাহর সাথে অন্য অনেক কিছুকেই শরীক করতো 'অতপর (তাদের জন্যে ঘোষণা) যেসব জিনিসকে (তাঁর সাথে তারা শরীক বানাচ্ছে সেসব কিছুর দুর্বলতা) থেকে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে পবিত্র।'

আর এ সূরার শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শরীকদেরকে পরিত্যাগ করতে ঘোষণা দিচ্ছেন এবং তাদের ধ্যান-ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলছেন তিনি যেন তাদের সকল মন্দ ব্যবহারের জবাব সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা দেন এবং তিনি যেন শয়তানদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি যেন রাগ না করেন, আর ওরা যা কিছু অন্যায় বলছে তার জন্যে হৃদয়কে যেন তিনি কখনো সংকীর্ণ না করেন, আর এসব কথার পাশপাশি কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্য ছবির মতো তিনি তাঁর সামনে ফুটিয়ে তুলছেন, যার ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্যে করছেন– সে দৃশ্য হচ্ছে তাদের নিরন্তর অপমান ও সদা-সর্বদা ভীতি প্রদর্শনের দৃশ্য। তারপর সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার সাথে। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'মহা মহীয়ান আল্লাহ, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রকৃত সম্রাট। তিনি ছাড়া এমন কেউ সর্বশক্তিমান নেই (যার সামনে মাথা নত করা যায়), তিনি মহান আরশের মালিক।'

এখানে আরো দেখা যায়, সূরাটির প্রথমাংশে কৃতকার্যতার শর্তগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে কাফেরদের ব্যর্থতার কথাও পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে ডাকে ..... অবশ্যই তার রব তার হিসাব নিবেন। নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হবে না।' (আয়াত ১১৭)

এ আয়াতে মানুষের মনযোগকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর রহমত ও ক্ষমার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে, 'আরো বলো, হে আমার রব, ক্ষমা কারো এবং রহম কারো অবশ্যই তুমি সর্বোত্তম রহমকারী।'

সূরা আল ফোরকান

পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আল কোরআন নাযিল করেছেন.....? আর তোমার রব তো সব কিছুই দেখছেন।'

আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণভাবে মক্কী। এ সূরাটি রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এক আনন্দ, খুশী ও প্রশান্তির প্রতীক হিসাবে। এমন সময় এ সূরাটি রসূল (স.)-কে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে যখন তিনি কোরায়শ জাতির মধ্যে মোশরেক গোষ্ঠীর মোকাবেলা করছিলেন, মোকাবেলা করছিলেন তাঁর প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের। নবুওতপ্রাপ্তির পর থেকেই অবিরতভাবে তারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে আসছিলো, নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করছিলো এবং সত্যের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

এমনই এক কঠিন সময়ে এ সূরাটি তাঁর কাছে এক অনাগত দিনের সুসংবাদ বয়ে আনলো এবং তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে মধুর পরশ বুলিয়ে দিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাঁর প্রিয়তম বান্দার জন্যে সুসংবাদের এমন ফল্গুধারা নেমে এলো, যা তাঁর সেই ব্যথা বেদনা ও ক্লান্তির ওপর প্রলেপ হিসাবে কাজ করলো। যখন সত্যবিরোধীদের ঘৃণা-বিদ্বেষ তাঁর অন্তরকে ভেংগে দিচ্ছিলো, সেই কঠিন সময়ে সূরাটি তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করলো, আর তাঁর মনে এ নিশ্চয়তা জাগালো যে পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরিচালনা করছেন।

আবার পরক্ষণেই দেখা যায়, সূরাটি সত্যকে অস্বীকারকারী, সত্যবিরোধী ও অবাধ্য জনগণের সাথে অবশ্যম্ভাবী এক চূড়ান্ত সংগ্রামের পূর্বাভাস্ও দান করেছে। এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছিলো। তারা যুক্তিহীনভাবে সত্য থেকে দূরে সরে থাকছিলো, তাদের শত্রুতা দীর্ঘায়িত হচ্ছিলো। আসলে এই বিদ্বেষ পোষণ করে তারা নিজেরাই কষ্ট পাচ্ছিলো, কারণ যে সত্য তাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে সাফল্যের পথ দেখাচ্ছিলো তার থেকেই তারা দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলো।

www.pathagar.com

মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে পাষাণ হৃদয় জনগণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকেই ফিরে যাচ্ছিলো, এরশাদ হচ্ছে,

'(ওরা বলছিলো), 'এটা মনগড়া এক মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়, আর তাকে এ কাজে অন্যরাও সাহায্য করে থাকে'..... অথবা ওরা বলে প্রাচীন লোকদের কাহিনী লিখে নেয়া হয়েছে, যা সকাল সন্ধ্যা তাকে পড়ে শোনানো হয়।' কোরায়শদের কাফেররা সম্মানিত রসূল (স.) সম্পর্কে এ কথাগুলোই বলে থাকে। তারা আরও বলে, 'তোমরা যাদুর স্পর্শে জ্ঞানহারা এক ব্যক্তির অনুসরণই তো করছো'.....অথবা ওরা মস্কারি করে বলে, 'হায়, এই নাকি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?'..... এমনই এক হতভাগা জাতি ওরা যে, এতো সব বাজে কথা বলেও ওরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহর দোষ ধরতেও দ্বিধাবোধ করেনি, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা করো মহা দয়াময় আল্লাহকে, তখন ওরা বলে, দয়াময় (রহমান) আবার কে? আমরা কি সাজদা করবো তাকে যাকে তুমি সাজদা করতে বলবে? এভাবে, তারা আরও দূরে সরে যাবে, তাদের থেকে বেশী কিছু ফায়দা হবে না।' (আয়াত ৬০)

আর আল্লাহর আয়াত নাযিল হতে দেখে অনেক সময়ে ওরা কষ্ট পায় এবং বলে, 'আমাদের ওপর কেন ফেরেশতা দল নাযিল হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না?' আর এটাই হচ্ছে সত্য বিরোধীদের চিরাচরিত নিয়ম। প্রাচীন কাল থেকে এরা এইভাবেই বলে এসেছে। নূহ (আ.)-এর সময় থেকে নিয়ে শেষ রসূল পর্যন্ত বরাবর একই নিয়ম দেখা যাচ্ছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে সে যালেম জাতির আপত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে কেন রসূল বানাবেন, অর্থাৎ রসূলের দায়িত্ব পালন ও মর্যাদা লাভের জন্যে মানুষ হওয়াটাই তাদের কাছে আপত্তিকর। এজন্যে তারা বলতো, 'এ আবার কেমন রসূল, যে খায়-দায় এবং বাজার ঘাটে হেঁটে বেড়ায়? তার কাছে একজন ফেরেশতা কেন নাযিল হয় না যে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে কাজ করতে পারতো!' এরপর তারা মোহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক যোগ্যতা বা সম্পদশালী হওয়া না হওয়ার ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুললো। ওরা বললো, 'অথবা তার ওপর যদি প্রচুর ধন সম্পদ বর্ষিত হতো অথবা যদি তার মালিকানায় এক সুবিশাল বাগিচা থাকতো, যার থেকে সে (ফলমূল) ভক্ষণ করতো।'

আবার আল কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতো, বলতো, 'কেন (এক কোরআন) একবারেই সবটুকু নাযিল হয় না?'

এসব প্রশ্নের মধ্যে যেসব বে-আদবী নিহিত ছিলো তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও উপহাস বিদ্রূপ করা। আর এটা তার প্রতি মিথ্যারোপ করা থেকেও ছিলো গুরুতর। এর অর্থ দাঁড়ায় স্বয়ং আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করা। তাঁর ক্ষমতার প্রতি এটা এক চ্যালেঞ্জও বটে!

www.pathagar.com

রসূল (স.) ধীরস্থিরভাবে ও পরম দৃঢ়তার সাথে, এসব দুঃসহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলেছিলেন যদিও তিনি একা, সহায়-সম্পদহীন, একমাত্র তাঁর রবের ওপরই তিনি নির্ভরশীল, যার কারণে শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এসব হৃদয়বিদারক শেল তাকে আহত করলেও তাঁকে কখনো ধরাশায়ী করতে পারেনি বা ভিন্ন কোনো পথেও তাকে চালিত করতে পারেনি! দেখুন, সে অবস্থায় তিনি তাঁর রবের করুণা প্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছেন, 'হে আমার রব, তোমার গযব থেকে যদি আমি বেঁচে যেতে পারি, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট, এতে যতো কিছু দুঃখ কষ্ট সইতে হয়– সবই সইবো। এতে আমার যতো কষ্টই হোক না কেন, তাতে আমার কোনো পরওয়া নেই, একমাত্র তোমার করুণা আমি ভিক্ষা চাই, চাই শুধু তোমার সন্তুষ্টি!'

অতপর, দেখা যাচ্ছে এই সূরাটির মধ্যে তাঁর রব তাঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁকে নিজ রহমতের ছায়াতলে টেনে নিচ্ছেন আর তাঁর ক্লান্তি ও ব্যথা বেদনাকে মুছে দিচ্ছেন, তিনি তাঁকে এই চরম দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং শত্রুদের সে ঘৃণ্য আচরণ থেকে তাঁর নযরকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর জাতি তাঁর ও তাঁর সংগী সাথীদের ওপর দিনের পর দিন ধরে যেসব যুলুম করে যাচ্ছিলো সেগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করার জন্যে তাঁর মনকে তিনি প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। অতি সহজভাবে তিনি এই কথাটাই গ্রহণ করছেন যে, যে হতভাগারা আপন সৃষ্টিকর্তা ও রেযেকদাতাকেই মানে না, তখন তারা এসব দুর্ব্যবহার করবে– এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা অন্যদের দাসত্ব করে যারা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না.....'আর ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আরো এমন অনেককে তাদের এবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসাবে গ্রহণ করে যারা ওদেরকে মৃত্যু দেয়ার মালিক নয় বাঁচিয়ে রাখার মালিকও নয় এবং পুনরায় কবর থেকে তুলতেও তারা পারবে না।.....আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা কর রহমানকে ওরা বলে, রহমান আবার কে?'

মোহাম্মাদুর রসূল (স.) কোনো নবাগত বা অপরিচিত ব্যক্তি নন, তিনি তো তাদেরই মধ্যে লালিত পালিত। তাঁর স্বভাব চরিত্র ও মান সম্মান সবার জানা। এমন মহান ব্যক্তিকে তারা এমন হৃদয়হীনভাবে লাঞ্ছিত করছে, উপহাস-বিদ্রূপ করছে এবং তাঁর সাথে এতো হিংস্র ব্যবহার করছে, যার প্রতিক্রিয়া তাদের নিজেদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সে কঠিন অবস্থার চিত্র যখন সামনে আসে তখন বুঝা যায় যে কী ধ্বংসাত্মক অবস্থার মধ্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো–গড়াগড়ি দিচ্ছিলো তারা কী ঘৃণা পংকিলতার মধ্যে! এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি চিন্তা করে দেখেছো, যে ব্যক্তি তার কূ-প্রবৃত্তিকে তার মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার অভিভাবক হয়ে যাবে? ..... ।' (আয়াত ৪৩-৪৪)

এ হঠকারী ও তর্কে নিয়োজিত কাফেরদের যুক্তিহীন ব্যবহারের এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা করছেন, তিনি তাকে জানাচ্ছেন,

www.pathagar.com

'ওরা তোমার সাথে তর্ক করতে গিয়ে যতো উদাহরণই পেশ করুক না কেন আমি সত্য বিষয়টিকে অতি সুন্দর ব্যাখ্যাসহ অবশ্যই তুলে ধরবো।' (আয়াত ৩৩)

এসব ঝগড়া ও তর্কের কথাগুলো জানানোর পর অতীতের হঠকারী অনুরূপ-যুক্তিহীন বচসাকে পেশ করা হচ্ছে, এরা বিভিন্ন যুগে একইভাবে নবীদের সাথে ঝগড়া করেছে। এরা বাস করত মূসা, নূহ, আদ, সামুদ ও কূপবাসী এবং ওদের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে।

এরপর একের পর এক, তাদের সামনে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরে তাদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.)-কে অবহিত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(ওরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। এদের সেই বাসস্থানটা হবে বড়োই নিকৃষ্ট .....।'

'সেদিন (প্রত্যেক) যালেম ব্যক্তি নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রসুলের পথ ধরতাম! হায়রে দুর্ভাগ্য আমার! যদি গ্রহণ না করতাম অমুক ব্যক্তিকে আমার বন্ধুরূপে তাহলে কতোই না ভালো হতো!.....।' (আয়াত ২৭-২৮)

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলে করীম (স.)-কে সান্তনা দিতে গিয়ে বলছেন,

'আর তোমার পূর্বে আমি যতো রসূলকে পাঠিয়েছি তারা (সবাই) খাদ্য খাবার খেতো এবং বাজার-ঘাটে চলাফেরা করতো'.....। 'আর এমনি করেই আমি অপরাধী লোকদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর জন্যে কোনো না কোনো শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তোমার জন্যে তোমার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি দৃঢ়তার সাথে সবর করেন এবং অপরকেও সবর করার জন্যে উৎসাহিত করেন এবং তাঁর কাছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যে জ্ঞান-ভান্ডার রয়েছে তা দিয়েই যেন তিনি কাফেরদের মোকাবেলা করেন, কেননা এ পাক কালাম যথেষ্ট পরিমাণ মযবুত যুক্তি-প্রমাণ সহ সত্যের পক্ষে কথা বলেছে, যা হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, কাফেরদের অনুসরণ করো না এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হও।'

এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে যে, ৬৮-৭০নং আয়াত ছাড়া সূরাটির বাকী অংশ অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুসলমানদের হাতে কোনো বস্তুগত আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো উপকরণ ছিলো না। এতদসত্তেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন তাঁর মালিক পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা করে সত্যের ওপর টিকে থাকেন এবং অপরকেও সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং তাঁর দায়িত্ব পালনে কোনো সময়ে যেন তিনি বিরত না হন, বরং

www.pathagar.com

অবিরাম গতিতে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা জারি রাখেন। এর প্রতিক্রিয়ার কোনো পরওয়া না করে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করেই যেন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে থাকেন। একবার যে কদম সামনে বেড়েছে তা যেন আর কখনো পিছিয়ে না যায়। দেখুন, কী বলিষ্ঠ আল্লাহর নির্দেশ,

'ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্ত্বার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতিত্ব বর্ণনার সাথে সাথে ঘোষণা করো যে তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার উর্ধে, তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে খবর রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

এভাবে সূরাটির বর্ণনা এগিয়ে চলেছে। এ বর্ণনা ধারাতে কোনো সময়ে দেখা যাচ্ছে রসূল (স.)-এর প্রতি তাঁর মহব্বত ও স্নেহের ঝর্ণাধারা বিগলিত ধারায় ঝরছে, কখনো তাঁকে আনন্দ দান করা হচ্ছে, কখনো তাঁর প্রতি দয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, আবার কখনো বা দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর শক্তি-ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাঁর রসূলের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করছেন। আবার কোনো কোনো আয়াতে দেখা যাচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নিজ শক্তি ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে উৎসাহিত করছেন। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কাফের-মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসা সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট আরো কিছু দিন সয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে উজ্জীবিত করছেন। সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সত্যবিরোধী চক্রের ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে সকল শক্তি ক্ষমতার লাগাম। এ লাগামকে তিনি এ জন্যেই একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন যাতে শত্রুপক্ষ দৌরাত্মের চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তারপরই যখন তাদের তিনি পাকড়াও করবেন তখন সেই পাকড়াও থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই আর তাদের থাকবে না, পাশাপাশি মেহেরবান মালিক তাদের অন্তরে তাঁর আদব মহব্বতের মধুর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন যারা তাঁর দয়ার ভিখারী হয়ে তাঁরই হুকুম মেনে চলেছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা প্রেমের সুরভিত বায়ুর খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে গেছে, যারা চিরন্তন সুন্দর জীবনের সুসংবাদে সকল দুঃখ জ্বালা ভুলে গেছে, যাদের অন্তর জান্নাতের সুনিশ্চিত আশ্বাসে নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, যারা দুঃসহ নির্যাতনের মাঝেও সত্য পথকে আঁকড়ে ধরে থাকার পরম প্রশান্তি লাভ করেছে.....এই কথাটাই অনুরণিত হচ্ছে আল্লাহর উচ্চারিত আদরের ভাষায়, 'এবাদুর রহমান' মহা দয়াময়, যাঁর রহমতের বারি ধারা সকল মানবকুলের ওপর ঝরে পড়ে– সেই প্রেমময়ের একান্ত ভক্ত অনুগত তারা'– তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

'তারা পৃথিবীর বুকে বিনয়াবনতভাবে চলাফেরা করে। আর যখন তাদেরকে হঠকারী জাহেল ব্যক্তিরা যুক্তিহীন কথা বলে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' .....।'

www.pathagar.com

একথা দ্বারা সে সব পাষাণ হৃদয় মূর্খ নাদানের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধানোকে এড়িয়ে চলা বুঝানো হয়েছে, যারা জেনে-বুঝেই ভুল পথ গ্রহণ করে নিজেদের জন্যে কঠিন শাস্তিদায়ক স্থান জাহান্নামকে অবধারিত করে নিয়েছে।

সূরাটি শেষ হচ্ছে সে সুন্দর মনোরম মানবগোষ্ঠীর ছবি তুলে ধরে, যারা আল্লাহর সামনে বিনম্র-ভদ্র, বিনয়াবনত সর্বপ্রকার অহংকার বর্জিত। কেন মোমেনদের হৃদয়গুলো তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করবে না, কেন ডাকবে না তারা তাঁকে বিনয়ের সাথে! তারা যে আল্লাহর মহব্বতের পরশ পেয়ে গেছে! এদের বাইরে যারা অহংকারী হঠকারী গোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্যে উচ্চারিত হচ্ছে (হে রাসূল), 'বলে দাও আমার রব এতোটুকু পরওয়া করবেন না তোমাদের, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো। তোমরা সত্যকে অস্বীকার করেছো এবং (মহান নবীকে) মিথ্যাবাদী সাজিয়েছ সুতরাং তোমাদের জন্যে আশু আযাব অনিবার্য হয়ে গেছে।'

ওপরে আলোচিত কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির বাকি কথাগুলো ও অন্যান্য কিছু বিষয় আবর্তিত হয়েছে। আলোচিত বিষয়গুলো একটি আর একটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত, যেগুলোর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা বেশ কঠিন, তবে বিষয়গুলোকে মোট চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে এ কথার সাথে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরম প্রিয় বান্দার কাছে এই পাক কালাম আল কোরআনকে নাযিল করেছেন যাতে করে এই গ্রন্থ নিয়ে তিনি সারাবিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, আর নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি যেন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন ও আজীবন তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকেন। তাঁকে আরো জানানো হচ্ছে যে, তাঁর মূল দায়িত্ব হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা, সবাইকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে তিনিই সব কিছুর তাঁর মালিক, নিজস্ব প্রজ্ঞা ও শক্তি ক্ষমতা বলে তিনি সব কিছু পরিচালনা করছেন ও সব কিছুর ব্যবস্থাপনা আনজাম দিচ্ছেন।

তারপর উল্লেখ করা হচ্ছে যে এতদসত্তেও মোশরেকরা এমন আরো অনেককে মাবুদ বানায়, যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট জীব। রসূল (স.) আল্লাহর কাছ থেকে যে বাণী বহন করে এনেছেন সে কথা তো ওরা অস্বীকার করেই, উপরন্তু ওরা আরো দাবী করে যে, তিনি নিজে এসব মনগড়া কথা নিজ থেকে তৈরী করে বলেন, আরো বলে যে এগুলো হচ্ছে সব প্রাচীনকালের কাহিনী, যা তিনি নিজে লিখিয়ে নিয়েছেন। তারা এসব কথাও দাবী করে বলে যে তিনি সাধারণ একজন মানুষ হয়ে রসূল হন কেমন করে? তিনি তো সাধারণ মানুষেরই মতো খানা পিনা করেন, বাজার ঘাটে চলাফেরা করেন। তারা আল্লাহর সমালোচনা করে একথাও বলে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলই যদি পাঠাবেন, তাহলে কোনো ফেরেশতাকে কেন রসূল বানিয়ে পাঠালেন না? আর মানুষকেই যদি রসূল বানানো প্রয়োজন হয়েছিলো তাহলে তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে সবার ওপর তাকে প্রভাবশালী কেন বানালেন না!

www.pathagar.com

এরপর দেখুন, তাঁর কুসুম কোমল নির্মল চরিত্রের পর দোষারোপ করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, তিনি যাদুগ্রস্থ এক ব্যক্তি.....আসলে এ কথার দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, আর এই কারণে রসূল (স.)-কেও অপমান করা হচ্ছে.....এভাবে তারা সঠিক পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে এবং অন্যদিকে আখেরাতকেও অস্বীকার করা হচ্ছে, অতপর এসব কিছুর পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জাহান্নামের আগুনে হাত পা বেধে নিক্ষেপ করবেন বলে ওয়াদা করছেন– সে স্থানটা হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ।

এর পাশাপাশি চিত্র আঁকা হচ্ছে জান্নাতবাসী মোমেনদের

'সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে তাই যা তাদের অন্তর চাইবে, চিরন্তন হবে সে জীবন।'

হাশরের দিনের সেই দৃশ্য সদা-সর্বদা মোমেনদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং অতীতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যাদের বন্দেগী তারা করতো তাদের করুণ অবস্থাও যেন তাদের চোখের সামনে তারা দেখতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে মোশরেকরা যে শেরক করে আর এ কারণে তারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে.....এ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, সকল রসূলের অবস্থা একই ছিলো, তারাও খাওয়া দাওয়া করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো, তাদের এই একই প্রকার দুর্ব্যবহার করা হতো। অতপর রসূল (স.)-কে এসব কথা বলে সান্ত্বনা দান শেষে এ অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে।

এরপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়, যার মধ্যে বর্ণনা এসেছে সে সব ব্যক্তির, যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রশ্নে রসূল (স.)-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে তারা বলতো, 'কেন নাযিল করা হয় না আমাদের ওপর ফেরেশতা অথবা কেন আমরা আমাদের রবকে দেখি না?' অর্থাৎ, যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে থাকবে সেই দিনের দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আর সে দিনটা কাফেরদের জন্যে বড়োই কঠিন হবে....সেদিন প্রত্যেক যালেম ব্যক্তি (দুখের চোটে) নিজ নিজ হাত কামড়াতে থাকবে, বলবে, হায় আফসোস, যদি আমি রসূলের সাথে পথ ধরতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো! আর সেদিন, তাদের এই সত্যবিরোধিতার কারণে রসূল (স.) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ দায়ের করবেন।

দেখুন, তাদের ধৃষ্ঠতা কতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে, তারা কোরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কেও আল্লাহর ওপর প্রশ্ন তুলছিলো এবং বলছিলো, 'কেন তার ওপর সমগ্র কোরআন একযোগে নাযিল হয়নি?' তাদের এই বেয়াদবীপূর্ণ প্রশ্ন তোলার কারণে কেয়ামতের দিন তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, অথচ আজকে তারা সেই রোয কেয়ামতকেই অস্বীকার করছে। উপরন্তু, তাদের সামনে তাদের পূর্বেকার জাতি নূহ, আদ, সামূদ কূপবাসী এবং আরো বহু জাতির ভীষণ শাস্তির দৃশ্য ছবির মতো তুলে ধরা

www.pathagar.com

হচ্ছে। একথাও কি সত্য নয় যে তারা গযবপ্রাপ্ত লূত জাতির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করে তখন তারা নিজেরাই বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু তবুও তারা শিক্ষা নেয় না। কিন্তু রসূল (স.)-এর ওপর তারা যে বাড়াবাড়ি করছিলো তার জন্যে তারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছিলো। আবারও দেখুন, আল্লাহর কাজের ওপর তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে বলছে, এই ব্যক্তিটাকেই কি আল্লাহ তায়ালা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? তারপর তাদের এই বিদ্রূপাত্মক ব্যবহারের কারণে তারা কতো হীন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তা জানাতে গিয়ে এবং আল কোরআন এর ভাষায় তাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'ওরা অবিকল পশুরই মতো, বরং ভুল পথে চলার দিক দিয়ে তারা পশু থেকেও খারাপ।'

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা, গোটা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার বিবরণ দিতে গিয়ে এ আলোচনা এগিয়ে চলেছে। তারপরই পাঠকের দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে রাত দিনের আনাগোনার দিকে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে প্রাণ সঞ্চারকারী পানিবাহী সুশীতল নির্মল বায়ুর সুসংবাদের দিকে, চিন্তা করতে বলা হচ্ছে যে এই তুচ্ছ পানি থেকেই তো মানুষের সৃষ্টি..... আর এতদসত্তেও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছু বন্দেগী করছে, যা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না– বা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর এরপর তারা তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রগলভতাও দেখাচ্ছে, আর যখন তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদাত করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তখন তারা নানা প্রকার ওযর আপত্তি দেখাচ্ছে.....এরশাদ হচ্ছে, 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, সাজদা করো রহমানকে, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে?'..... 'আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশের মধ্যে নিরাপত্তাপূর্ণ স্তরসমূহ বানিয়েছেন এবং তার মধ্যে বাতি ও উজ্জ্বল চাঁদ বানিয়েছেন। তিনিই তো রাত ও দিনকে বানিয়েছেন..... যে চাইবে শোকরগোযারি করতে অবশ্যই সে এর থেকে সর্ব প্রকার শিক্ষা পাবে।'.....

কিন্তু হায়, দুঃখ তাদের জন্যে, তারা এর থেকে কোনো প্রকার শিক্ষা না নেয়, না তারা কোনো শোকরগোযারি করে।

এরপর আসছে তৃতীয় অধ্যায়টি, যার মধ্যে 'দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের চিত্র আঁকা হয়েছে, যারা তাকে সেজদা করে এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করে এবং তারা তাদের সেই অবস্থানগুলো নির্ণয় করে যা তারা তাদের মহৎ গুণাবলী দ্বারা অর্জন করেছে, তিনি সেসব লোকের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দিয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহর পথে চলতে শুরু করে, আর পাশাপাশি সেই নেককার ব্যক্তিদের পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন যারা ঈমান আকীদার ওপর মযবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করে এবং সর্বাবস্থায় চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের সবর এখতিয়ার করার কারণে তাদেরকে জান্নাতের সুসজ্জিত কক্ষ দান করা হবে এবং সেখানে তাদের অভিভাদন জানানো হবে।'

এই কথা দ্বারা সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে যে, যে যাই হোক না কেন, আল্লাহর সামনে মানুষ অতি তুচ্ছ ও অতি ছোট, অতএব তাঁর সামনে সদা-সর্বদা মানুষের বিনয়াবনত থাকা উচিত। মানুষের অন্তর যদি অনুগত না হয়, আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয় এবং আল্লাহকে যদি সে না চেনে তাহলে এসব অস্বীকারকারী মানুষ জীব জানোয়ারের মতোই জীবনের কঠিন পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং নিজেকে সে চরম অধপতনের দিকে নামিয়ে দেবে।

আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে মানুষ কতো নীচে নামতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রসূল (স.)-এর সাথে তাদের ব্যবহারে। এতো নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা কিভাবে করতে পারে তার কিছু কারণ এ সূরাটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় কি লক্ষ্যই বা কি তা জানানো হয়েছে এবং এ আলোচনার ধারা এমনই মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ যা আমাদেরকে আল কোরআনের এক অনবদ্য বর্ণনা ভংগি সম্পর্কে অবহিত করবে।

সূরা আশ শোয়ারা

তা-সীন-মীম, এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ .....আর অবশ্যই তোমার রব বড়ই শক্তিমান মেহেরবান।

এই মৌলিক সূরাটির আলোচ্য বিষয় সবটুকুই হচ্ছে মক্কী যিন্দেগী কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সূরাটিতে আকীদা সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে। আকীদা বা অন্তরের মধ্যে আগত মৌলিক গভীর বিশ্বাসের প্রধান কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একা এবং একাই তিনি সকল ক্ষমতার মালিক, 'অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শক্তি ক্ষমতার মালিক (ইলাহ) রূপে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হয়ে যাবে।' (আয়াত ২১৩) .....

এরপর আলোচনা এসেছে আখেরাতের ভয় সম্পর্কে,

'হে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আমাকে অপমান করো না, যেদিন সম্পদ সন্তানাদি কোনো কিছুই কোনো কাজে লাগবে না, তবে সেই ব্যক্তিই নাজাত পাবে যে সেদিন শেরক মুক্ত মন নিয়ে আসবে।

আকীদার অন্তর্গত তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে একথাকে বিশ্বাস করা, এরশাদ হচ্ছে,

'এ পবিত্র ওহী নাযিল হয়েছে রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে। এ পাক পবিত্র বাণী নিয়ে রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত ঐশী দূত) জিবরাঈল (আ.) নাযিল হয়েছেন।'

আকীদার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা, কেননা সত্য বিরোধীরা হয় দুনিয়াতে আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস

www.pathagar.com

প্রাপ্ত হবে, নতুবা আখেরাতের আযাবে পতিত হবে, যা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলো, অতপর ওরা সত্য সম্পর্কে যেসব উপহাস বিদ্রূপ করলো, সে পরিণতির সংবাদ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।'

সূরা আন নামল

এই সূরাটি একটি মক্কী। সূরা শোয়ারার পরই এটা নাযিল হয়। এর বর্ণনাভংগিও সূরা শোয়ারার মতোই। সূরার আলোচ্য বিষয় একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারে স্থান পেয়েছে। একইভাবে ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝখানে কেসসা-কাহিনী দ্বারা আলোচ্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব কেসসা-কাহিনীতে মক্কার মোশরেক গোষ্ঠী ও পূর্ববর্তী বিবিধ জাতির চরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে আল্লাহর শাশ্বত নীতি এবং ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের চিরন্তন রীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়।

অন্যান্য সকল মক্কী সূরার মতোই এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় আকীদা বিশ্বাস তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই এবাদাত করা, আখেরাত এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করা, ওহীর প্রতি বিশ্বাস করা, অদৃশ্য বিষয় যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না– একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র স্রষ্টা, জীবিকাদাতা, সম্পদের একমাত্র দাতা, তা বিশ্বাস করা, মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, আল্লাহ তায়ালাই যে সকল শক্তির উৎস ও মালিক এবং তিনি ছাড়া কোনো আইনদাতা নেই, একথা মেনে নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

এই সমস্ত বিষয়কে সমর্থন করা, যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে তাদের পুরস্কার এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার জন্যেই স্থানে স্থানে ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

সূরার ভূমিকার অংশের পর পরই হযরত মূসা (স.)-এর কাহিনীর একাংশ আলোচিত হয়েছে। কাহিনীর এ অংশের বর্ণনা দেয়ার জন্যেই কেসসাটি আলোচিত হয়েছে।

সূরায় ভূমিকায় কাহিনীর এই অংশে রয়েছে হযরত মূসার আগুন দর্শন ও আগুনের কাছে গমন, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন ও ফেরাউনের কাছে তাকে নবী হিসেবে যাওয়ার আদেশদান। অতপর অতিদ্রুত গতিতে ফেরাউন ও তার দলবলের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টা জানানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই নিশ্চিতভাবে জানতো যে, হযরত মূসা সত্যিই নবী। এই সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কী, তাও তারা জানতো। 'তারা নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ তাদের মন তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। তারা এটা করলো নিছক যুলুম ও ঔদ্ধত্য সহকারে। অতএব, দেখে নাও নৈরাজ্যবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।'

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর ব্যাপারেও মক্কার মোশরেকরা অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলো।

হযরত মূসার কাহিনীর পর পরই এসেছে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে দেয়া আল্লাহর অসাধারণ নেয়ামতের কথা, তারপর রয়েছে পিঁপড়ে, হুদহুদ পাখি, সাবা জাতি ও তার রাণীর সাথে হযরত সোলায়মানের কাহিনী। এ সূরার মধ্যেই রয়েছে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের পাওয়া আল্লাহর নেয়ামত ও তার জন্যে তাঁর শোকরের বিবরণ। তাঁর প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান, রাজত্ব, নবুওত এবং জ্বিন ও পাখির তাঁর অনুগত হওয়া। এই সাথে এর ভেতর প্রকাশ করা হয়েছে সেই মৌলিক আকীদা ও আদর্শ, যার প্রতি প্রত্যেক নবী আহ্বান জানাতেন। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে সাবা জাতি ও তার রাণী কর্তৃক হযরত সোলায়মানের চিঠির প্রতি জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার কথা– যদিও তিনি আল্লাহর বান্দাদেরই একজন। পরিশেষে কোরায়শ কর্তৃক আল্লাহর কেতাবের বিরূপ অভ্যর্থনার কথা। কোরায়শরা নবীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর সাবা ও তার রাণী ঈমান এনেছিলো ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলো। হযরত সোলায়মানকে যা কিছু দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালাই তা দিয়েছিলেন, যা কিছু তার অনুগত করা হয়েছিলো আল্লাহ তায়ালাই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু জানেন। হযরত সোলায়মানের রাজত্ব ও জ্ঞান আল্লাহর এই সীমাহীন রাজত্ব ও জ্ঞানের সমুদ্রেরই একটা বিন্দু মাত্র ছিলো।

এরপর এসেছে সামুদ জাতির সাথে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে হযরত সালেহ ও তার পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্র। তারপর দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সে জাতির বিরুদ্ধে পাল্টা কৌশল অবলম্বন করেছেন, সামুদ জাতি ও তার কূচক্রীদের ধ্বংস করেছেন এবং হযরত সালেহ ও তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের রক্ষা করেছেন। ..... কোরায়শও রসূল (স.)-কে হত্যা ও নির্যাতন করার জন্যে চক্রান্ত আঁটতো, যেমনটি আঁটা হতো হযরত সালেহ ও তার সাথী মোমেনদের বিরুদ্ধে।

সূরার কাহিনী অধ্যায় শেষ হয়েছে হযরত লূত ও তাঁর জাতির কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারা হযরত লূতকে 'পবিত্র মানুষ' হওয়ার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলো। হযরত লূত যখন তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, তারপর তাদের কী পরিণতি হয়েছিলো, সেটা ছিলো এ সূরার সর্বশেষ কাহিনী।..... কোরায়শও তাঁর হিজরতের সামান্য আগে রসূল (স.)-কে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

কেসসা-কাহিনী শেষ হয়ে গেলে শুরু হয়েছে উপসংহার। 'বলো, আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তায়ালা ভালো, না যাদর তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা?' ..... অতপর প্রাকৃতিক দৃশ্য

www.pathagar.com

ও মানব সত্ত্বার ভেতরকার দৃশ্যসমূহ দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিশ্ব বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, জীবিকা সরবরাহকারী এবং অদৃশ্য বিষয়ে অবগত একমাত্র সত্তা মহান আল্লাহর কুশলী হাতের কৃতিত্ব। বলা হয়েছে যে, সবাইকে একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতপর তাদের কাছে কেয়ামতের একটা আলামত, কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্য এবং সেদিন কাফেরদের জন্যে যে আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা এমন এক বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে, যা তার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। বক্তব্যটা হলো, 'আমাকে তো কেবল এই নগরীর প্রতিপালকের এবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাকে তিনি সংরক্ষিত ও সম্মানিত করেছেন, তাঁরই জন্যে সব কিছু, আর আমাকে আত্মসমর্পণকারী হবার আদেশ দেয়া হয়েছে।..... আর তোমার প্রভু তোমাদের কাজ সম্পর্কে উদাসীন নন।'

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো এলেম বা জ্ঞান। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় জিনিস, বিশেষত অদৃশ্য বিষয় ও মানুষের কাছে প্রকাশিত প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান, হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে প্রদত্ত জ্ঞান, হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পাখির ভাষার জ্ঞানদান এবং এ দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করার বিষয়টি এর আওতাভুক্ত। এ জন্যে সূরার ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাকে কোরআন শেখানো হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।' আর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে তা তারা জানে না, বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। .....' 'তোমার প্রভু যা তারা গোপন করে ও প্রকাশ করে তা জানেন।' ..... সবার শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবেন, তখন তোমরা তা জানবে।' হযরত সোলায়মানের কাহিনীতে বলা হয়েছে, 'দাউদ ও সোলায়মানকে আমি জ্ঞান দান করেছি.....' হযরত সোলায়মানের উক্তি! 'হে মানবসকল, আমাদের পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।' অনুরূপভাবে হুদহুদের উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ' যিনি আসমান ও যমীনের সকল গোপন বস্তু বের করে আনেন এবং তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো তা জানেন।' আর যখন হযরত সোলায়মান সাবার রাণীর সিংহাসন হাযির করতে চান, তখন একটি জ্বিন জাতীয় দানব সে সিংহাসনকে চোখের পলকে হাযির করতে পারলো না, 'বরং আল্লাহ তায়ালা কেতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে' এমন একজন জ্বিনই ওটা চোখের পলকে হাযির করতে পারলো।

এভাবে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রসংগে জ্ঞানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সমগ্র সূরা এই আবহের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। আর এটা অগ্রসর হয়েছে আমাদের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ধারাক্রম অনুসারেই।

www.pathagar.com

সূরা আল কাছাছ

আলোচ্য সূরাটি মক্কা মোয়াযযামায় অবতীর্ণ। এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য এবং নানা প্রকার দুর্বলতাও তাদের ঘিরে রেখেছিলো। অপরদিকে মোশরেকরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পেশীশক্তি ... সব দিক থেকেই শক্তিশালী ছিলো। ঠিক এই সময়ে সূরাটি নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে তাদের শক্তি ও মূল্যবোধকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর এ আয়াতগুলো এই কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলো যে, এই সৃষ্টিজগতের সবখানে একটি শক্তিই কাজ করে যাচ্ছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি; সমগ্র বিশ্বের একটি জিনিসেরই স্থায়ী মূল্য আছে, আর তা হচ্ছে 'ঈমান'। সুতরাং এটা মানতেই হবে, যাদের সাথে আল্লাহর শক্তি রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই, যদিও শক্তি প্রকাশের যতো প্রকার মাধ্যম আছে বাস্তবে তখনো তার কোনোটাই তাদের হাতে আছে বলে দেখা যায় না; যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর শক্তি মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের না আছে নিরাপত্তা, না আছে শান্তি, এমনকি তাদের অবস্থানকে সমর্থন দেয়ার মতো নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণ হাযির করা সত্তেও তাদের মনের মধ্যে সদা সর্বদা প্রচন্ড এক দুর্বলতা বিরাজ করতে থাকে। যার কাছে ঈমানের সঠিক মূল্য আছে সে সবচেয়ে বেশী কল্যাণের অধিকারী, আর এই মূল্যবোধটা যে হারিয়ে ফেলে সে মূলত কোনো জায়গা থেকেই কোনো কল্যাণ পেতে পারে না।

সূরাটির শুরুতে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী পেশ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সূরাটির মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে, ফুঠে উঠেছে কারুন তার জাতির সাথে যে ব্যবহার করেছিলো তার মধ্য দিয়েও। অবশেষে মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে বহু শিক্ষামূলক কথাও এখানে এসেছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সূরাটি সর্বপ্রথম যে কাহিনী পেশ করেছে তা হচ্ছে মিসরের তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শনের কথা। এ প্রসংগে অহংকারী, বিদ্রোহী ও অত্যাচারী ফেরাউনের শক্তি প্রদর্শন ও মানুষের মধ্যে তার পক্ষ থেকে প্রচন্ড আতংক সৃষ্টি করে রাখার কথা বলা হয়েছে, এর মোকাবেলায় বর্ণিত হয়েছে মূসা (আ.)-এর কথা, যিনি ছিলেন তারই ঘরে লালিত পালিত এক দুগ্ধপোষ্য শিশু (সম), তার না ছিলো কোনো শক্তি, না ছিলো কোনো আশ্রয়, আর না ছিলো তার জন্যে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা। অথচ ফেরাউন ছিলো তৎকালীন পৃথিবীতে সর্বাধিক ক্ষমতাধর বাদশাহ। সে তার প্রজাদের তার জন্যে নিরেদিতপ্রাণ ভক্ত বানিয়ে রেখেছিলো এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে সকল দিক থেকে দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও অবস্থায় ফেলে রেখেছিলো, তাদের ছেলেদের সে হত্যা করতো এবং মেয়েদের রাখতো। এই ভাবে সে গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে তার কব্জার মধ্যে রেখে আতংকগ্রস্ত করে রেখেছিলো, কিন্তু যখন নবুওতের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মূসা (আ.) নির্ভীক চিত্তে এই যালেম শাসকের দরবারে হাযির হলেন, তখন ফেরাউনের দর্প,

www.pathagar.com

শক্তি-সাহস, ঔদ্ধত্য ও আত্মসম্মানবোধ সবই এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো যে, বাস্তবে তার মনোবল, জনবল, শক্তি সরঞ্জাম সবই যেন ভোঁতা হয়ে গেলো।

কি মহা আশ্চর্যের ব্যাপার, নিজেকে যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান বলে দাবী করে এসেছে, যে নিজের শক্তি ক্ষমতা নিষ্কন্টক রাখার জন্যে এতো লোককে হত্যা করে এসেছে, আজ সে তারই ঘরে লালিত পালিত সে দিনকার এক শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন এক অজানা অদেখা ভয় তার হৃদয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। এমন এক আতংক তাকে পেয়ে বসেছে যে, মূসা (আ.)-এর ওপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, তার সামনে থেকে যেন সরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। কেন এমন হচ্ছে? কার ইচ্ছা এখানে কাজ করছে, মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে কার শক্তি-ক্ষমতার বহিপ্রকাশ ঘটছে? আসলে বাহ্যিক দিক দিয়ে মূসা (আ.) শক্তিহীন, সাথীহীন ও নিরস্ত্র হলেও তিনি যে অদেখা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রত্যক্ষ খবরদারিতে রয়েছেন, যাঁর শক্তির বেষ্টনী এমনভাবে তাকে ঘিরে রেখেছে যে তার দিকে রক্ত চক্ষু তুলে তাকায় এমন সাহস কারও নেই! বরং মূসা (আ.)-এর এক একটি কথা তার বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধছে, প্রবল এক ভয় তার কলিজার মধ্যে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, সে কি করবে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে সে বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তো! আমি মূসাকে কতল করে ফেলি, সে তার রবকে ডাকুক। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমাদের ধর্ম-কর্ম সব বদলে ফেলবে, অথবা সারা রাজ্যে সে এক প্রচন্ড বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে। (আয়াত ৪০, ২৬)

এই আয়াতটিতে ফেরাউনের কি অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে! তাকে কে ধরে রেখেছিলো যে, ছাড়তে হবে? সে না সর্বশক্তিমান? তাহলে কেন সে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারছে না যে তার গোটা রাজ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে দেবে বলে সে আশংকা করছে? আসলে, এ কথা বলে সে পিঠটান দিতে চায়। মহাশক্তিমান সিংহ সে, কিন্তু এখন ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিজ গর্তে ফিরে যেতে পথ পাচ্ছে না। কাপুরুষের মতোই তার অন্তর কাঁপতে শুরু করেছে। তাই মূসা (আ.)-এর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার অন্তরের মধ্যে সে ভয়ে কিভাবে চুপসে গেছে তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারছে।

দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি এ সূরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে, যার সাথে জ্ঞানের যোগ রয়েছে। এ মহামূল্য সম্পদ যেমন মানুষের উপকার করে, তেমনি মানুষকে হিংস্র পশুর স্তরেও নামিয়ে দেয়। এই সম্পদই মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই দেখা যায়, কারুন তার জাতির মধ্যে এই সম্পদ নিয়ে চরম জাঁকজমকপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয়েছে। এমনভাবে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলো যে মানুষের মধ্যে এ কথাটা সাধারণভাবে জানাজানি

www.pathagar.com

হয়ে গিয়েছিলো, তার অর্থভান্ডারের চাবিগুলো বহন করতে গিয়ে শক্তিশালী একদল[১] লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন 'দল' বলতে যদি দশ জনও হয় তাহলে দশ জন শক্তিশালী লোক কমপক্ষে দশ মণ বোঝা বইতে পারে। কমপক্ষে দশ মণ যদি চাবির বোঝা হয়, আর সে চাবিগুলো যদি কামরার বা বাক্স সিন্দুকের হয়, তাহলে কতোগুলো বাক্স ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আবার জ্ঞানের কারণেও কারুন অহংকার করতো এবং সে মনে করতো, এই যে বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদের মালিক সে হয়েছে– এটা তার জ্ঞান ও জ্ঞানগত যোগ্যতারই ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কওমের মধ্যে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, তারা সম্পদ কম হলেও কারুনের তুলনায় নিজেদের কখনো ছোট মনে করতো না, বা কারুনের জাঁকজমক ও জৌলুস দেখে হীনমন্যতায় ভুগতো না; বরং সাধনা করা ও সঠিক পথে থেকে জীবন যাপন করা এবং অপরকে সাহায্য করার বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছেই প্রতিদান আশা করতো। তারা জানতো যে আল্লাহ তায়ালাই উত্তম এবং তিনিই চিরস্থায়ী।

তারপর যখন কারুনের অহংকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাতে হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাকে তার সহায় সম্পদসহ মাটির মধ্যে ধসিয়ে দিলেন। সে সময়ে তার ধন সম্পদ ও জ্ঞান তাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলো না।

অবশ্যই বনি ইসরাঈল জাতির ওপর ফেরাউন চরম যুলুম করেছিলো। একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন ক্ষমতা চালিয়ে গোটা দেশে এক চরম নৈরাজ্য ও চরম অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলো। একভাবে কারুনও তার অর্থ সম্পদ ও জ্ঞানের দাপট দেখিয়ে মানুষকে বশীভূত করে রেখেছিলো। ফলে তার সেই একই পরিণতি হয়েছিলো, যা হয়েছিলো ফেরাউনের। তাকে তার ধনদৌলত ও বাড়ীঘর দুয়ারসহ পৃথিবীর বুকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে সীমা-লংঘনকারী, বলদর্পী আল্লাহর সে দুশমন ফেরাউন ও তার দোসরদের দিকে লক্ষ্য করুন। কেমন করে গভীর সাগরের উত্তাল তরংগাভিঘাতে হাবুডুবু খেয়ে তারা মরছে, কতো অসহায়ভাবে তারা বাঁচার জন্যে হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু হায়, এ যে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছে! ভূধরে, সাগরে, অন্তরীক্ষে এমন কেউ নেই যে তাঁর হুকুম রদ করতে পারে। আল্লাহর যমীনে বাস করে যারা তাঁর না-ফরমানী করবে, তাঁর ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার দৌরাত্ম্য দেখাবে, তার নিজের শক্তি ক্ষমতা কায়েম করতে চাইবে তাদের অবস্থাও হবে এমনি। বিদ্রোহী, ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ওপর যখন আল্লাহর গযব নেমে আসবে তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। আলোচ্য সূরার এ বর্ণনাটি আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছে। সুস্পষ্টভাবে এ সূরাটি আমাদের জানাচ্ছে যে, মানুষের জীবন যখন এ ধরনের অহংকারী বিদ্রোহী শাসকের নিষ্পেষণে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, তখনই সত্যাশ্রয়ীদের জন্যে গায়বী মদদ এবং বিদ্রোহীদের জন্যে চূড়ান্ত ও অলংঘনীয় শাস্তি নেমে আসে।

১. দল বলতে বুঝায় দশ বা দশের ওপরের কোনো সংখ্যা। যেমন সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আ.)–এর ভাইয়েরা বলেছিল, আমরা তো একটি দল। তারা সংখ্যায় ছিলো এগার জন। আর একটি পরিভাষা 'বিদউন-অর্থাৎ তিন থেকে নয়, সুতরাং দল (উসবাতুন) বলতে বিদউনের ওপরের যে কোনো সংখ্যাই হবে।

www.pathagar.com

এ কাহিনী থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যখন কোনো এলাকায় অবিচার, দুর্নীতি ও পাপাচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ন্যায়নীতি কোণঠাসা হয়ে যায়, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ থাকে না এবং হকপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কুদরতী হাত প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সকল উদ্ধত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। তখন কোনো সৃষ্টি জীবের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রকাশ্য সাহায্য মানুষের সামনে ভেসে ওঠে। অসত্যকে দমন এবং সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহর গায়বী মদদ এ জন্যে নেমে আসে যে, তিনি সকল অন্যায় অবিচার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সকল প্রকার সীমালংঘন করা থামিয়ে দেন।১

ফেরাউন ও কারূন এই দুই ব্যক্তির কাহিনীর মধ্যে মোশরেকদের সাথে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তাতে সত্যের পক্ষে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ হাযির করা হয়েছে। এ প্রমাণপত্র এতোই উজ্জ্বল যে, কোনো ব্যক্তি বুঝতে চাইলে অতি সহজেই সত্যকে বুঝতে পারবে। যদি একবার অতীতের জাতিসমূহের কর্মকান্ড ও তাদের পরিণতির দিকে তাকায়, আর একবার যদি কেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে কাহিনী দুটোর মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেক ঘটনাই তাদের জন্যে উপকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সে দুই ব্যক্তির সাথে সংঘটিত ঘটনা তাদের আস্তে আস্তে সত্য পথের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর অমোঘ নিয়মসমূহ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে।

১. সূরা 'তা-হা'-র মধ্যে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। এমন এক সময় ছিলো যখন গোটা বনী ইসরাঈল জাতিকে যালেম ফেরাউনের হাতে তাদের হীনতা-দীনতার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সে বনী ইসরাঈল কওমের ছেলেদের এই অপরাধের কারণে হত্যা করছিলো যে, কোনো এক জ্যোতির্বিদ বলেছিলো, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। ফেরাউন তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকছিলো এ জন্য যে, তাদের কেউ ক্ষমতার অন্তরায় হবে না, কিন্তু কুদরতের হাত কে রুখতে পারে? যার মাধ্যমে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এবং শাস্তি দেবেন, তাকে তিনি ঠিকই বাঁচিয়ে রাখলেন। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে তাদের এই জরিমানা দিতে হচ্ছিলো। তাদের হীনতা-দীনতা ও চরম অপমানের যিন্দেগী কাটাতে হচ্ছিলো, সদা-সর্বদা এই ভয়-ভীতি তাদের লেগে থাকতো যে, আবার কোনো নতুন শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায় কিনা! এই দুঃসময়ে যারা মূসা (আ.)-এর সাথে থেকে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো এবং তাদের অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো– এই অপরাধের কারণে(?) যারা শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো, তারা সে অবস্থায়ও দমে যায়নি; বরং মাথা উঁচু করে তারা ফেরাউনের মুখের ওপর ঈমানের কথা উচ্চারণ করেছিলো। তখন তারা একটুও থতমত খায়নি, প্রকম্পিত হয়নি, কোনো দুশ্চিন্তাও করেনি, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোনো নমনীয় ভাবও প্রদর্শন করেনি। আসলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তর-প্রাণের মধ্যে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাণী প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে অবস্থাটাই এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটাই যথার্থ। এ সূরার প্রাসংগিক আলোচনাও এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। সূরা ত্বা-হা-তেও কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ এই একই কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির হাত যে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের সাহস যোগাচ্ছিলো, কিন্তু এ চরম অত্যাচারী অহংকারী যালেম বাদশাহর মুখের ওপর ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং হক কথা উচ্চারণ করার পরই আল্লাহর সর্বশেষ সাহায্য নেমে এলো।

www.pathagar.com

কি যুক্তিহীনভাবে মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলছে, '(আপনার আনীত) হেদায়াতের পথ গ্রহণ করলে আমাদেরকে আমাদের যমীন থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।' এসব কথা বলে আসলে তারা সত্য থেকে দূরে থাকতে চাইতো। সত্য গ্রহণ না করার জন্যে তারা নানা প্রকার খোঁড়া ওযর পেশ করতো। বলতো যে, দেশ থেকে উৎখাৎ হয়ে যাওয়ার ভয়েই তারা সত্য গ্রহণ করছে না। কারণ বাপ-দাদার আমল থেকে তারা যেসব পূজা পার্বণ করে আসছিলো, এখন সমাজপতি সমাজ নেতাদের কথা অমান্য করে সেগুলো বাদ দিলে এসব সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দ তাদের মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত করে অপমানজনকভাবে দেশ থেকে বের করে দেবে।

এ জন্যে এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনাটি পেশ করেছেন, তাদের দেখিয়েছেন, নিরাপত্তা এবং ভয় কোত্থেকে আসে। তিনি উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে এ কথা জানাচ্ছেন যে, যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর কাছে থেকেই নিরাপত্তা লাভ করা যেতে পারে। যখন মানুষ দেখে কোনোভাবেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না তখনই আল্লাহনির্ভর ব্যক্তিদের জন্যে অভাবনীয়ভাবে তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেমে আসে এবং তখন মানুষ মনের মধ্যে এক বেহেশতী নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা অনুভব করে। একথা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কারুনের ঘটনাটা তুলে ধরেছেন।

তাদের সম্পর্কে এসব তথ্য পরিবেশন করার পর বলা হচ্ছে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি তাদের জন্যে এই নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ শহরটি প্রতিষ্ঠিত করিনি আমার পক্ষ থেকে যাবতীয় জীবন ধারণ সামগ্রীর সমাবেশ ঘটানো হবে, কিন্তু (তবুও তাদের) অধিকাংশ মানুষ জানে না। এখানে তাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে মহান সত্ত্বা তাদের যাবতীয় ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনিই এই শহরটিকে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ বানিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্যে এই নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী করবেন, অথবা (তাদের নাফরমানীর কারণে) তিনি নিজেই তাদের এই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করবেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা অহংকার ও নাশোকরীর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আরো কতো কতো এলাকাবাসী তাদের প্রাচুর্য অহংকার করেছে, কিন্তু সে সকল এলাকায় পরে আর কেউই বসবাস করেনি– .....

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল আচরণের পরিণতি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ম অতীত হয়ে গেছে, সতর্ককারী কোনো নবী আসার পর যখন তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তখন সেসব প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'..... আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করি না যতোক্ষণ পর্যন্ত তার অধিবাসীরা যালেম না হয়ে যায়।'

www.pathagar.com

এরপর তাদের কাছে কেয়ামতের দিনের দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে, স্মরণ করানো হচ্ছে, যখন তাদের সে শরীকরা সব দূরে সরে যাবে এবং সেসব শেরেকের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করবে। অতপর দুনিয়ার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের আখেরাতের আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, এর আগে তাদের জানানো হয়েছে, কখন কোন কারণে ভয়ভীতি আসবে, আর কখনই বা তাদের নিরাপত্তা দান করা হবে।

এরপর সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে রসূলে করীম (স.)-এর সাথে আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করে। যখন মক্কাবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রসূল (স.) দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি আবার তাকে তার দেশে ফিরিয়ে আনবেন, তখন তিনি তাকে শেরেকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে এবং তাঁর দেশবাসীর ওপর বিজয় লাভ করার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন। অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে রেসালাতের এ মহান দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যদিও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তিনি কোনো অনুমানই করতে পারেননি। মক্কাবাসীরা তাঁর দেশত্যাগ সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে যখন তাঁর ও তাঁর সাথীদের ওপর অত্যাচার চরমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সে সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই তাঁকে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা দিচ্ছেন, শীঘ্রই তাকে তাঁর জন্মভূমিতে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এবং সফলতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসবেন। আলোচ্য সূরার মধ্যে বর্ণিত কেসসাগুলোতে এ কথাগুলোর প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে আভাস দেয়া হয়েছে। যেহেতু মূসা (আ.)ও এভাবে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করার পর সেই দেশে আবার এক নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে এসেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বনী ইসরাঈল জাতিকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিলেন, ফেরাউন ও তার লোকলশকর মূসা এবং তার নাজাতপ্রাপ্ত জাতির সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। জানানো হচ্ছে যে, এ ওয়াদা পূর্ণ হতে চলেছে, এবার শেষ ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক হিসেবে তোমরা ডেকো না। নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া। হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরাটির বাহ্যিক চেহারার দিকে তাকালে এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো সামনে রাখলে বুঝা যাবে, ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোই হচ্ছে সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ সূরটির ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা রাখতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। মূসা (আ.)-এর কেসসা, পরবর্তীতে কি হলো সে বিষয়ে অনুসন্ধান, কারুনের কেসসা এবং মূল জায়গায় ফিরিয়ে নেয়ার এই শেষ প্রতিশ্রুতি .....।

www.pathagar.com

সূরা আল আনকাবুত

সূরা আনকাবুত মক্কী সূরা। কোনো কোনো বর্ণনায় প্রথম এগারো আয়াতকে মাদানী বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই এগারো আয়াতে 'জেহাদ' ও মোনাফেকীন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তবে এতদসত্তেও আমাদের মতে এই সূরার মক্কী হওয়াই অগ্রগণ্য। ৮ম আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওটা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে এ ঘটনার বিবরণ আসছে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ যে মক্কাতেই সংঘটিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আর এ আয়াতটা মতান্তরে মাদানী বলে কথিত এগারো আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে পুরো সূরাটাই মক্কী মনে করা আমার কাছে অগ্রগণ্য। তবে এই আয়াতগুলোতে 'জেহাদে'র উল্লেখের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কেননা জেহাদের উল্লেখ করা হয়েছে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রসংগে। অর্থাৎ মন দিয়ে জেহাদ করতে বলা হয়েছে, যাতে মোমেনরা ধৈর্য ধারণ করে এবং নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমান ত্যাগ না করে বসে। পূর্বাপর আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার। নেফাকের উল্লেখের ব্যাখ্যাও এভাবেই করা যায়। ঈমানের দাবীদারদের একটা শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।

সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের বর্ণনাভংগি পরিলক্ষিত হয়। প্রারম্ভিক বর্ণমালা 'আলিফ-লা-ম-মীম।' এরপর ঈমান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার শুরু। অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল যথার্থ ঈমানের পরিচয় ও দায়দায়িত্ব কী, সেটা দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান শুধু মুখ দিয়ে দাবী করার জিনিস নয়। ঈমান হচ্ছে কষ্টকর ও অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকাই এবং এর দায়দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করার নাম। কেননা ঈমানের পথ দায়দায়িত্বপূর্ণ ও কাঁটা বিছানো।

দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের পরীক্ষা দেয়া যে প্রত্যেক মোমেনের জন্যে অবধারিত, এ বিষয়টাই সম্ভবত এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কেননা সূচনায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার পর সমগ্র সূরা জুড়েই হযরত নূহ, ইবরাহীম, লূত, শোয়ায়ব, আদ, সামূদ, কারূন, ফেরাউন ও হামানের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় এটাই যে, ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরিণামে বিভিন্ন রকমের বাধাবিঘ্ন ও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সকল যুগে সকল প্রজন্মেই অনিবার্য।

এরপর এসব কাহিনীর ওপর পর্যালোচনা চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সত্য প্রকাশ ও হেদায়াতের বাণী প্রচারের পথে কিছু লোক ও কিছু শক্তি বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এ সব শক্তির দাপট দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। কেননা এদের প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করেছেন ও ধ্বংস করেছেন। বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'প্রত্যেককেই আমি তার করা অপরাধের দায়ে পাকড়াও করেছি ...' (আয়াত ৪০)

আর এসব শক্তির উদাহরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, এতে তাদের দুর্বলতা ও নগণ্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন – 'যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো। .....' (আয়াত ৪১)

এরপর যে সত্যের দিকে আল্লাহর নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন আর আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সেই উভয় সত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, আর সকল নবীর দাওয়াত ও মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতকে এক অভিন্ন দাওয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা সবই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। সবই আল্লাহর অনুগত হবার দাওয়াত। এ জন্যে সর্বশেষ কেতাব কোরআন সম্পর্কেও বক্তব্য এসেছে। মোশরেকরা এই বক্তব্য কিভাবে গ্রহণ করেছে তাও জানানো হয়েছে। মোশরেকরা শুধু এই কেতাবে সন্তুষ্ট হয়নি, এই কেতাবে বিশ্বাসীদের জন্যে যে উপদেশ, শিক্ষা ও অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, তা তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি; বরং তারা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চেয়েছে এবং আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে দাবী জানিয়েছে, অথচ জাহান্নাম তো কাফেরদের ঘেরাও করেই রেখেছে।

তারা তাদের যুক্তিতে সব সময় স্ববিরোধী। একদিকে আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিয়ে মৃত পৃথিবীকে কে পুনরুজ্জীবিত করেছে, জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা করেছেন, আর জাহাজে চড়লে তারা কায়মনে আল্লাহকেই ডাকে। অথচ এ সব সত্তেও তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক মানে এবং মোমেনদের নির্যাতন করে।

মোশরেক ও মোমেনদের মধ্যে সংঘটিত এই তর্ক-বিতর্ক প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের তাদের জীবনাদর্শের নিরাপত্তার খাতিরে বিদেশে হিজরত করার আহ্বান জানিয়েছেন (আয়াত ৫৬) এবং এ ব্যাপারে মৃত্যু ও ক্ষুধার ভয় সম্পর্কে নির্ভীক থাকতে বলেছেন। কেননা, 'প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা অনিবার্য'..... (আয়াত ৫৭) এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও সকল প্রাণীর জীবিকা দিয়ে থাকেন।' ..... (আয়াত ৬০)

সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের প্রশংসা এবং তাদের সৎপথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়েছে।

'যারা আমার পথে জেহাদ করে, তাদের আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ তায়ালা এসব সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।' (আয়াত ৬৯)

এভাবে সূরার সূচনায় ও সমাপ্তিতে অপূর্ব মিল দেখতে পাওয়া যায়, সূরার পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে, এর মধ্যে চমৎকার এককেন্দ্রিকতা এবং বিষয়গত সমন্বয় ও একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

সমগ্র সূরায় আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীভূত হলেও সূরাটা তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য ও পরিচয়। নানা রকমের বিপদ মসিবতের আকারে ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর নীতি। মোমেন, কাফের ও মোনাফেকদের পরিণাম এবং অন্যদের বিপথগামী করার দরুন পাপের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের নিজ নিজ পাপের জন্যে নিজেকেই জবাবদিহি করার অপরিহার্যতা।

দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ওপরে যেসব কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো। এসব কাহিনী থেকে ইসলামের দাওয়াতের পথে বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং আল্লাহর শক্তির সামনে সেসব বাধা-বিঘ্ন আরোপকারীদের শক্তির নগণ্যতা সংক্রান্ত বক্তব্য। এই সাথে নবীদের দাওয়াত ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যে একই মহাসত্য নিহিত রয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা উভয়টাই আল্লাহর কাছ থেকে আগত।

তৃতীয় পর্বে কেতাবধারীদের মধ্যে যারা যালেম, তারা ছাড়া অন্য সবার সাথে কেবলমাত্র ভদ্রজনোচিত ও মার্জিত ভাষায় বিতর্ক করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের ধর্ম ও মোহাম্মদ (স.) আনীত ধর্ম যে এক ও অভিন্ন, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সর্বশেষে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জানানো হয়েছে নানা ধরনের পুরস্কার বিনিময়ের কথা।

সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহু স্থানে ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা পাঠকের অনুভূতিতে শিহরণ জাগায় এবং তাকে ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করার অদম্য প্রেরণা যোগায়। ফলে সে হয় ঈমানের দাবী পূরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে, নতুবা তা থেকে পিছু হটে যায় অন্যথায় মোনাফেকীর নীতি অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত ফাঁস করে দেন এবং তাকে অপমানিত করেন।

এ আলোচনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছে তা এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো ছাড়া আর কোনো কিছু দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যেতো না। তাই এখানে সে সম্পর্কে শুধু কিছু আভাস দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

সূরা আর রোম

এ সূরার প্রথম আয়াতগুলো একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটা ছিলো এই যে, আরব উপদ্বীপে রোম সাম্রাজ্যের যে অংশটুকু ছিলো, সেই অংশটি। রোম সাম্রাজের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তার ওপর পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ী হয়। এ ঘটনাটা ঘটে তখন, যখন হিজরতের পূর্বে মক্কার মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক তুংগে উঠেছিলো। রোম সাম্রাজ্য ছিলো খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। খৃষ্টান সম্প্রদায় যে আল্লাহর কেতাব ইনজীল ও আল্লাহর

www.pathagar.com

নবী হযরত ঈসার অনুসারী, সে কথা সুবিদিত। পক্ষান্তরে পারসিকরা মোশরেক এবং অগ্নি উপাসক। তাই এই ঘটনায় মক্কার মোশরেকরা খুব খুশী হয়। তারা পারস্যের অগ্নি উপাসকদের বিজয়কে তওহীদের ওপর পৌত্তলিকতার বিজয়ের সমার্থক এবং মোমেনদের ওপর কাফেরদের বিজয়ের সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে।

এ কারণে এই সূরার প্রথম আয়াত ক'টাতে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা পুনরায় বিজয় ছিনিয়ে আনবে এবং তখন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। কেননা মুসলমানরা মোশরেকদের ওপর আহলে কেতাবের বিজয় হোক এটাই পছন্দ করে।

কিন্তু কোরআন শুধু এই ওয়াদা ও এই ঘটনাতেই নিজের আলোচনা সীমিত রাখেনি। বরং সে নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বক্তব্য পেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে এটা ছিলো একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষকে সামনে রেখে কোরআন মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির সাথে একীভূত করে, আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরন্তন ঐতিহ্য ও নীতি রয়েছে, তার সাথে সেই মহা সত্যের সংযোগ সাধন করে যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর সংযোগ সাধন করে মানব জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝেও। তারপর ইহকালীন জীবনের পর পরকালীন জীবনের বিষয়েও আলোচনা করে। তাদেরকে প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করায়। আরো পর্যবেক্ষণ করায় মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ ও সামগ্রিক অবস্থা এবং সৃষ্ট জগতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ। এই পর্যবেক্ষণের ফলে তারা এমন সব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, যা তাদের জীবনকে উন্নত করে, মুক্ত করে, উদার ও প্রশস্ত করে, তাদেরকে স্থান কাল ও পরিস্থিতির সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে। অতপর তাকে টেনে নিয়ে যায় সৃষ্টি জগতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুপ্রশস্ত বিশালতা এবং প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যোগসূত্রসমূহের দিকে।

এ জন্যে এই মহাবিশ্বে যাবতীয় সংযোগ ও সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে তাদের ক্ষমতার মান উন্নত হয়। তারা বুঝতে পারে যে, মহাবিশ্বকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানব স্বভাব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী বিধানসমূহ কতো বড়ো। তারা আরো বুঝতে পারে মানব জীবন ও তার ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী এবং জয় পরাজয়ের স্থান নির্ণয়কারী, আল্লাহর বিধিসমূহ কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। তারা আরো উপলব্ধি করতে পারে বিশ্ববাসীর কর্মকান্ডের ফলাফল ও মান নির্ণয়কারী, তাদের পার্থিব তৎপরতার মূল্যায়নকারী ও তার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মফল নির্ধারণকারী দাঁড়িপাল্লা কেমন সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে।

এই উন্নততর, ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর চিন্তা ও উপলব্ধির আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামের এ দাওয়াত আসলে একটা বিশ্বজনীন দাওয়াত এবং তা সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত, যদিও এ দাওয়াত এক সময় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলো এবং তার পাহাড় পর্বত ও উপত্যকাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। এ দাওয়াতের ক্ষেত্র এতো ব্যাপক বিস্তৃত যে, তা শুধু এই পৃথিবীর সাথেই যুক্ত নয়, বরং

www.pathagar.com

তা সমগ্র সৃষ্টি জগত ও তার প্রধান নিয়ম নীতির সাথে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সাথেও যুক্ত। এটা শুধু দৃশ্যমান এই পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত নয়, বরং আখেরাত পর্যন্তও বিস্তৃত।

অনুরূপভাবে এর সাথে প্রত্যেক মুসলমানের মনও জড়িত। এর ভিত্তিতে জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অনুভূতি ও ধ্যান ধারণাও গঠিত। এরই আলোকে তার দৃষ্টি পরিচালিত হয় আকাশ ও আখেরাতের দিকে, তার চার পাশের বিস্ময়কর ও রহস্যময় জগতের দিকে এবং তার সামনে ও পেছনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও তার ফলাফলের দিকে। এরই আলোকে সে তার ও তার জাতির অবস্থা উপলব্ধি করে এবং মানুষের বিবেচনায় ও আল্লাহর বিবেচনায় নিজের ও নিজের আকীদা বিশ্বাসের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করে। অতপর সে সচেতনভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে।

সূরাটা সে সব সম্পর্ক ও সম্বন্ধের ওপর আলোকপাত করে এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে ও মানব মনে তার নিদর্শনসমূহকে চিহ্নিত করে। সূরাটা দুটো পর্বে বিভক্ত, প্রথম পর্বে মুসলমানদের বিজয় এবং আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর যে সত্যের সাথে ইহকাল ও পরকালের সমগ্র ব্যবস্থা জড়িত সেই সত্যের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। আর মানুষের মনকে পূর্ববর্তী মানুষদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পরকালীন জীবনটাও যে অবিকল তদ্রূপ, সে কথাও জানানো হয়েছে। এ কারণে তাদের সামনে কেয়ামতের একটা দৃশ্য এবং কাফের ও মোমেনরা সেখানে কেমন কর্মফল পাবে তা দেখানো হয়েছে। পুনরায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিদর্শন ও তার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর মানুষের নিজের ও তার দাসদাসীর উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, শেরেক কতো নিকৃষ্ট ধরনের মতবাদ এবং কোনো সত্যের ওপর বা নির্ভুল জ্ঞানের ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নয়। এই পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে রসূল (স.)-কে সত্যের তথা আল্লাহ তায়ালা যে স্বাভাবিক অবস্থার ওপর (ফেতরাত) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই পথ ও সেই অবস্থার অনুসরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে। এই পথ কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং তা কখনো কারো খেয়ালখুশীর অনুসারী হয় না। তাই এই পথের অনুসারীরা কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এখানে তেমন কিছু ঘটেনা প্রবৃত্তির অনুসারীরা।

দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হয়েছে যে, পরিবর্তন ও স্থীতিহীনতা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই মানুষ যতোক্ষণ কোনো অটল ও অপরিবর্তনীয় বিধানের অনুসারী না হবে, ততোক্ষণ তার ওপর ভিত্তি করে কোনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এই পর্বে সুখে দুঃখে, অভাবে ও প্রাচুর্যে মানুষের কী অবস্থা হয়, তাও দেখানো হয়েছে। এই প্রসংগে সম্পদের ব্যয় বন্টন ও উন্নয়নের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। অতপর পুনরায় শেরেক ও যাদেরকে শরীক মানা হয় তারা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করতে বা দিতেও পারে না, কাউকে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না। জলে ও স্থলে দুর্যোগ ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার জন্যে মানুষের অপকর্মকে দায়ী করা হয়েছে এবং মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে মোশরেকদের কী পরিণতি হয়েছে তা দেখতে বলা হয়েছে। এ

www.pathagar.com

জন্যে রসূল (স.)-কে কেয়ামত আসার আগেই স্বভাব ধর্ম ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে প্রথম পর্বের মতোই। এরপর এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে পথ নির্দেশিকা দেন, সেটাই প্রকৃত পথ নির্দেশিকা। আর রসূল (স.)-এর কাজ প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। যারা আল্লাহর নিদর্শন চোখ দিয়ে দেখতে ও আল্লাহর বিধান কান দিয়ে শুনতে চায় না, সেই সব সেচ্ছাকৃত অন্ধ ও বধিরদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন না। এরপর মানুষের নিজের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শৈশবের দুর্বলতম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামত পর্যন্ত ধাপে ধাপে অগ্রসর করেন। অতপর কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এই সাথেই এই পর্ব শেষ ও সূরার সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তির সময় রসূল (স.)-কে নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্য অবলম্বন করা, মানুষের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার সহ্য করা। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হবে-একথা বিশ্বাস করা এবং কোনোভাবেই যেন তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হন ও অবিশ্বাসীরা যেন তাকে হীনমন্যতায় আক্রান্ত করতে না পারে-সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুরার সার্বিক পটভূমি ও ভাষা একত্রে মিলিত হয়ে এর প্রধান আলোচ্য বিষয়কে চিহ্নিত ও চিত্রিত করতে সহায়তা করেছে। সেই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের বিভিন্ন অবস্থা, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানব জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং প্রাকৃতিক জগতের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উদঘাটন। এই সম্পর্ক উদঘাটন করতে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, এ বিশ্ব জগতের প্রতিটি স্পন্দন ও প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি অবস্থা, প্রতিটি সূচনা ও প্রতিটি সমাপ্তি, প্রতিটি জয় ও প্রতিটি পরাজয়– পরস্পর একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে ও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ এবং প্রত্যেকটা একটা সূক্ষ্ম ও নিখুঁত আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। এর সব কিছুরই আদি অন্ত আল্লাহর হাতে। 'প্রথম ও শেষে সব কিছুই আল্লাহর হাতে।' এই বিষয়টার ওপরই সমগ্র কোরআনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একেই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এই মূলতত্ত্ব থেকেই যাবতীয় ইসলামের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, মূল্যায়ন ও মতাদর্শ আহরিত হয়েছে। এবং এই মূলতত্ত্ব ছাড়া কোন চিন্তাধারা ও কোনো মতাদর্শই নির্ভুল হতে পারে না।

সূরা লোকমান

পবিত্র কোরআন মানুষের সাথে তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলার জন্য নাযিল হয়েছে। কেননা এই কোরআনকে তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি জানেন তার স্বভাব-প্রকৃতির জন্য কোন কোন জিনিস উপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ জিনিস তার স্বভাব প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবে ও বিশুদ্ধ করবে,

www.pathagar.com

যিনি জানেন কোন উপায়ে তার অন্তরে কথা প্রবেশ করানো যাবে। মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতিতে ও সত্ত্বায় যে সত্য আগে থেকেই সুপ্ত ছিল এবং যে সত্যকে তার জন্মগত সত্ত্বা কোরআনের বক্তব্য শোনার আগে থেকেই জানে, সেই সত্যকেই তার সামনে তুলে ধরার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে। কেননা মানবসত্ত্বা ও মানবপ্রকৃতি তার প্রথম সৃষ্টিকালে মূলত এই সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সেই সত্যটা হলো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগানে মুখর সমুদয় সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও এবাদাত করা কিন্তু পরবর্তীকালে উল্লেখিত সত্যের ওপর তার স্বভাব প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত থাকা নানা কারণে কষ্টকর ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যে পৃথিবীর মাটিতে সে বাস করে। সেই মাটি থেকে উঠে আসা বাষ্প তার স্বভাব প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তার রক্ত ও মাংস থেকে সৃষ্ট উত্তেজনা এবং তার প্রবৃত্তিজাত আবেগ উচ্ছাস ও কামনা-বাসনা তাকে বিপথগামী করে দেয়। আর এই বিপথগামিতা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আবির্ভূত হয় কোরআন। সে তার বোধগম্য ভাষা ও যুক্তি প্রয়োগ করে। যে সত্যকে সে ভুলে গেছে, সেই সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে এবং সেই সত্যের ভিত্তিতে তার গোটা জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর ইসলামী আকীদা ও আদর্শের প্রতি তার আনুগত্যকে, জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে তার একাত্মতা ও সংহতিকে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর পথে তার যাত্রাকে মযবুত, অবিচল ও অভ্রান্ত করে।

কোরআন মানুষের সাথে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কথা বলার যে চমকপ্রদ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, আলোচ্য সূরাটা তার একটা নমুনা। উপরোক্ত সত্য থেকে ভ্রষ্ট মোশরেক জনগোষ্ঠীর মনমগজে আকীদা-বিশ্বাসের যে ভ্রান্তি ছিল, এ সূরা সে ভ্রান্তি দূর করে। সকল মক্কী সূরাই এই ভ্রান্তি দূর করতে নানাভাবে চেষ্টা চালায় এবং মানুষের সুপ্ত স্বভাব প্রকৃতিকে জাগ্রত করে। মানুষের মন-মগজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ সূরা সর্বদিক থেকে অভিযান চালায়।

এই আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করে মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ব, একক এবাদাত ও আনুগত্য নেয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা, আখেরাতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণ এবং তা ছাড়া অন্য সমস্ত আকীদা বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জনের শিক্ষা দেয়া হয়।

সূরাটা এই শিক্ষাগুলো এমন ভংগিতে তুলে ধরে যে, তা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজন। চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন মানবীয় মন-মগযকে উদ্বুদ্ধ করার কোরআনী ভংগি আয়ত্ত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার এবাদাত ও আনুগত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই ভংগি আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

সূরা লোকমানে আকীদাবিশ্বাস সংক্রান্ত এই শিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয় কোরআনের চির পরিচিতি প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে– যার ভেতরে রয়েছে আকাশ– পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র, রাত, দিন, সাগর মহাসাগর,

www.pathagar.com

মহাশূন্য, তরংগমালা, বৃষ্টি, গাছপালা ও তরুলতা ইত্যাদি। এই সৃষ্টিগুলো কোরআনে বারবার আলোচিত হয়ে থাকে। কেননা গোটা সৃষ্টিজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শনসমূহ। এসব নিদর্শন মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে পৌছে দেয় তাওহীদের মর্মবাণী। তার অন্তর্জগতকে আলোড়িত ও উজ্জীবিত করে এবং তার সামনে তার চলার পথ তুলে ধরে।

যদিও মূল শিক্ষা একই এবং উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন, তথাপি এটা এ সূরায় চারবার চার পর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রতিবারই তা সেই সুপ্রশস্ত অংগনে মানব হৃদয়কে আলোড়িত করে, প্রতিবারই তার সাথে থাকে মন-মগযকে প্রভাবিত করার নতুন উপাদান এবং প্রতিবারই তা নতুন নতুন প্রকাশভংগীতে উপস্থাপিত হয়। এই চারটা পর্ব বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা প্রত্যেকটা পর্বের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে এমন আশ্চর্যজনক পন্থায় যে, তাতে রয়েছে হৃদয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার মতো প্রচুর দরকারী উপাদান।

আরবী বর্ণমালার কয়েকটা অক্ষর দিয়ে সূরাটার উদ্বোধন হবার পর শুরু হয়েছে এর প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। বর্ণমালার এ অক্ষরগুলোর তাৎপর্য হলো, এ ধরনের বর্ণমালা দিয়েই এই সূরাটা এবং এই বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ রচিত হয়েছে। এই আয়াতগুলো হচ্ছে হেদায়াতের উৎস এবং সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর রহমত লাভের পথনির্দেশক। আর এই সৎকর্মশীল তারাই, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে। এভাবে আখেরাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর এবাদাতের বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। এই সাথে একটা প্রেরণাদায়ক বক্তব্যও দেয়া হয়েছে। সেটা হলো, 'ওরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশনার ওপর আছে এবং ওরাই সফলকাম।'

সফলকাম হতে চায় না এমন কে আছে? অবশ্য একটা মানবগোষ্ঠী রয়েছে, যারা নানা রকমের মনভোলানো কথাবার্তা কিনে আনে, যাতে মানুষকে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিপথগামী করতে পারে এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাসের সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করে। আর এই মানবগোষ্ঠীর জন্যও উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে তাদের উপহাসের সাথে সংগতিশীল এক ভয়ংকর আতংকজনক হুমকি। সেটা হলো, 'তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' অতপর এই গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে,

'যখন আমার আয়াতগুলো তার সামনে পড়া হয়, তখন সে অহংকারের সাথে পেছন ফিরে চলে যায় এবং এমন ভাব প্রকাশ করে যেন সে তা শুনতেই পায়নি।' এই বিবরণের সাথেও রয়েছে এমন একটা মনোজ্ঞ মন্তব্য, যা এই গোষ্ঠীটার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। সেই মন্তব্যটা হচ্ছে, 'যেন তার দু'কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে।' এরপর আরো একটা হুমকি, 'তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ জানাও।' এখানে 'সুসংবাদ' কথাটার মধ্যে কী সাংঘাতিক কটাক্ষ রয়েছে লক্ষ্য করুন। অতপর পুনরায় মোমেনদের প্রসংগ তুলে তাদের সফলতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আখেরাতে তারা

www.pathagar.com

কী প্রতিফল পাবে সেটাও এই সাথেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন জানিয়ে দেয়া হয়েছে অহংকারী ও উপহাসকারীদের শাস্তির কথা। 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত।' (আয়াত-৮ ও ৯)

অতপর এখানে মহাবিশ্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রমাণ হিসাবে। এই প্রমাণ মানুষের স্বভাবগত সত্ত্বা এবং তার জন্মগত বিবেকবুদ্ধি ও মনমগযকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ধরে। তাকে জোরদার ভাষায় সম্বোধন করে এবং যে সত্যকে জনগণ দেখেও অবহেলা করে সেই সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে। যেমন– 'তিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়া ..... ' (আয়াত -১০)

আর এই প্রাকৃতিক প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে চেতনাকে জাগ্রত করা ও অনুভূতিকে শাণিত করার পর আল্লাহ তায়ালার অনবদ্য সৃষ্টিকে দেখেও যারা শেরেকে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিবেকে কষাঘাত করা হচ্ছে, 'এই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাওতো দেখি, অন্যেরা কী কী সৃষ্টি করেছে .....।' (আয়াত-১১)

এই সুগভীর, শাণিত ও অকাট্য প্রাকৃতিক যুক্তিটা পেশ করার মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে সূরা লোকমানের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির উক্তির মাধ্যমে। তবে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রেক্ষাপট এখানে অভিন্নই থাকছে। কেবল বর্ণনাভংগি ও উদ্বুদ্ধকর বক্তব্যের নতুনত্বই এখানে লক্ষণীয়।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি 'লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম।' আর এই জ্ঞানের সারকথা হলো, 'আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো।' এটাও জ্ঞান এবং এটাই বিজ্ঞজনোচিত পথ। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে লোকমান কর্তৃক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দান। এ হচ্ছে একজন জ্ঞানী লোক কর্তৃক নিজের ছেলেকে প্রদত্ত উপদেশ। এ উপদেশ দোষমুক্ত। উপদেশদাতাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ উপদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার অবকাশ নেই। কেননা কোনো পিতা তার সন্তানকে যে উপদেশ দেয়, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আরোপ করা যায় না। প্রথম পর্বে যেমন তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে, এ উপদেশেও তেমনি। সেই সাথে রয়েছে অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী নতুন নতুন বক্তব্য।

'লোকমান যখন তার ছেলেকে উপদেশ ছলে বললো, 'হে বৎস, আল্লাহর সাথে শেরেক করো না। নিশ্চয় শেরেক একটা বড়ো মাপের যুলুম।' এরপর এই উপদেশকে জোরদার করা হচ্ছে আরো একটা উদ্দীপনাময় বক্তব্য দিয়ে যার মধ্যে দিয়ে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ককে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, স্নেহ ও মমতাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। 'আমি মানুষকে তার পিতামাতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছি। ..... ' (আয়াত-১৪)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর শোকরকে পিতামাতার শোকরের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমার ও তোমার পিতামাতার শোকর করো।' অতপর আকীদা ও আদর্শের ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, আদর্শিক সম্পর্ক বংশীয় ও

www.pathagar.com

রক্তীয় সম্পর্কের চেয়ে অগ্রগণ্য। বংশীয় ও রক্তের সম্পর্কে যতোই দৃঢ়তা ও স্নেহমমতা থাকুক না কেন, আকীদার সম্পর্কের পরেই তার স্থান। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করতে চাপ দেয়। তা হলে তাদের আনুগত্য করো না। ..... এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মহত্ব, সুক্ষ্মতা ও ব্যাপকতার এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তা মানবীয় আবেগ-অনুভূতিতে শিহরণ জাগায়। ব্যাপকতর প্রাকৃতিক অংগনে লোকমান এ দৃশ্যটা তুলে ধরেছেন। (আয়াত-১৬)

এরপর লোকমান তার ছেলেকে আরো উপদেশ দেন ইসলামী আদর্শের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে এবং এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে ইসলামের অনুসারীকে যেসব দুঃখকষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে।(আয়াত ১৭)

এরপর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের প্রতিরোধ এবং বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতদাতার আরো একটা জরুরী কর্তব্য হলো, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার না করা। কেননা দুর্ব্যবহারের অর্থ দাঁড়াবে, নিছক মুখের কথা দ্বারা সমাজে যেটুকু সংস্কারের কাজ করার সুযোগ ছিলো তা নিজের আচরণ দ্বারা নষ্ট করলো। ১৯ ও ২০ নং আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে মুখমন্ডলকে বিকৃত করা, ভেংচি দেয়া, ভ্রুকুটি করা ইত্যাদির কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আকীদার বিষয়টা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নতুন তংগিতে ও নতুন আবেশে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদাটাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সাথে এবং এ দুটোতে বিদ্যমান নেয়ামতগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই সব নেয়ামতকে মানুষের আয়ত্তাধীন করেছেন, অথচ তারা এর শোকর আদায় করে না। (আয়াত-২০)

এরই প্রেক্ষাপটে আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে যে কোনরকম বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে প্রকৃতি বিরোধী ও ঘৃণ্য ব্যাপার বলে নিন্দা করা হয়েছে। বিকারমুক্ত ও কলুষমুক্ত বিবেক এ ধরনের আচরণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। অতপর এ কুফরির আচরণের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রাখা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। (২১ নং আয়াত)

এটাকে বিকারগ্রস্ত ও নির্বোধসুলভ আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে হুশিয়ারী জ্ঞাপন করা হয়েছে। আর এ কারণেই ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আখেরাতের কর্মফল ও সেই কর্মফলের সাথে ঈমান ও কুফরের সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে। এরপর ২৪ নং আয়াতে ভয়ংকর আযাবের হুশিয়ারী

www.pathagar.com

উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর অধ্যায়টা শেষ করার আগে মোশরেকদেরকে সৃষ্টি জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এর স্রষ্টা কে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যার জবাবে মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার না করে তাদের উপায়ন্তর থাকে না। অবশেষে অধ্যায়ের শেষ আয়াত দুটোতে ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে এমন একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন জ্ঞান, সার্বভৌম শক্তি এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতঃ আখেরাত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা শুরু হয়েছে একটা বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার মাধ্যমে। এ দৃশ্য মানুষের মনের ওপর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ দৃশ্যে রয়েছে রাত, যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দিনের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়ে যায়। আর রয়েছে দিন যা একইভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রাতের দেহের ভেতরে ঢুকে যায় ও বিলীন হয়ে যায়। এ দৃশ্যে আরো রয়েছে চাঁদ ও সূর্য, যারা মহাশূন্যে নিজ নিজ কক্ষপথে নিতান্ত অনুগত হয়ে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদক্ষিণ করে। সেই সময়সীমা কী, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন, যিনি সূর্য চন্দ্র, আকাশ পৃথিবী, মানুষ ও মানুষের যাবতীয় কাজ-সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (আয়াত, ২৮-২৯)

এরপর মানুষকে দেয়া আল্লাহ তায়ালার অন্য একটা নেয়ামতের কথাও স্মরণ করানো হয়েছে। এ নেয়ামত হলো সাগরে চলাচলকারী নৌকা বা জাহাজ। (আয়াত-৩০) অতপর ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে সময়ে তারা সাগরের ভয়াবহ তরংগমালার সম্মুখীন হয়, ক্ষমতার দর্প চূর্ণ হয় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজ্ঞান তাদেরকে আল্লাহদ্রোহী বানিয়েছে, সেই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে তাদের আর কোনো অহংকার থাকে না, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এ যুক্তি খুবই ধারালো ও যুৎসই। এ যুক্তি দ্বারা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। (আয়াত নং ৩২ দেখুন)

সমুদ্রের ভয়ংকর তরংগমালার সাথে সামঞ্জস্য থাকার সুবাদে ৩৩ নং আয়াতে তাদের কেয়ামত ও আখেরাতের অধিকতর ভয়াল অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ আয়াত আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করে। বস্তুত আখেরাত এমন আতংকজনক জায়গা, যা সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধনগুলোকে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

অতপর যে আয়াত দ্বারা সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে, তাতে কেয়ামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের ভবিষ্যত অবস্থা তথা তার জ্ঞান বুদ্ধি জানা, মানুষের আগামী দিনের উপার্জন এবং তার মৃত্যুর স্থান-এই কটা বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

এই চারটে অধ্যায় এগুলোর নিজস্ব বর্ণনাভংগি, উদ্দীপক বক্তব্যসমূহ, যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাবলীসহ, মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধকরণে কোরআনের গৃহীত কৌশলের প্রকৃষ্ট নমুনা। যিনি হৃদয়গুলোর স্রষ্টা, যিনি হৃদয়গুলোর উপযুক্ত কৌশল ও ভাষা সম্পর্কে অবগত, তিনিই এই কৌশল নির্ধারণ করেছেন।

www.pathagar.com

এবার আমরা এই চারটি অধ্যায়কে দুটো অধ্যায়ে ভাগ করে এর আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। কেননা এর প্রত্যেক দুটো অধ্যায়ের মধ্যে গভীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

সূরা আস সাজদা

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সঠিক আকীদা ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আল কোরআনের মধ্যে ইতিপূর্বে মর্মস্পর্শী আহ্বানের যে সব আদর্শ নমুনা পেশ করা হয়েছে আলোচ্য সূরার মধ্যে সেই রকমেরই আর একটি নমুনা পেশ করা হলো, যা হৃদয়ের মধ্যে পুরোপুরিই গেঁথে যায়; আর তা হচ্ছে, একমাত্র এক ও নিরংকুশ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কথা, যিনি মানবজাতিসহ গোটা বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সামনে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া। একথা মেনে নেয়া যে তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের সব কিছুর পরিচালক এবং এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাত অবশ্যই সত্য; আর এ কথাও মেনে নেয়া যে মানবমন্ডলীকে আল্লাহ তায়ালার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা যে পুনরুত্থান দিবস আছে, একদিন কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে এবং যার যা পাওনা তা পুরোপুরিই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে এসব আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে, আর মক্কায় অবতীর্ণ সকল সূরাতেই বিশেষভাবে অদৃশ্য এসব আকীদা গ্রহণ করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মূল কথাটির প্রতি সকল মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করা হয়েছে তা হচ্ছে সবাইকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এ কথাগুলো সেই মহান সত্ত্বার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে যিনি সর্বজ্ঞ এবং সব কিছুই যাঁর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে। সারাবিশ্বের সকল মানুষের অন্তরের মধ্যে যে চিন্তাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে সবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় অবস্থার খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। তিনিই জানেন সে চিন্তাধারার বাঁকে বাঁকে কতো জটিলতা রয়েছে এবং সেসব চিন্তাস্রোত জীবনের গিরি সংকট ও নানাবিধ বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সময় কতো প্রকার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, তিনিই জানেন কোন বলিষ্ঠ যুক্তি এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে প্রভাবিত করে ও এককেন্দ্রিক করে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল সকল পরিস্থিতির মধ্যে কোন মহামূল্যবান কথা এসব চিন্তাবিদদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

সূরা আস সাজদা আকীদার বিষয়গুলোকে এমন কিছু নতুন এবং অভিনব পদ্ধতিতে পেশ করেছে যা এর পূর্বে অবতীর্ণ সূরা লোকমান পেশ করেনি। এ বিষয়ক কথাগুলোকে প্রথম দিককার আয়াতগুলোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, পরে এসব কথাকে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষা ও পদ্ধতিতে মানবহৃদয়ের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেন অমিয় এ সুধা গাফলতির ঘুমে নিদ্রিত কলবগুলোকে জাগিয়ে তোলে, সত্যের প্রদীপ্ত প্রভায় আত্মাগুলোকে আলোকিত করে, সংসার জীবনের

www.pathagar.com

ঘূর্ণাবর্তে পতিত পেরেশান এবং নগদ প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হৃদয়গুলোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে, যেমন করে পূর্বে অবতীর্ণ অন্যান্য বহু সূরার মধ্যে সৃষ্টি বৈচিত্রের এসব বিষয়ের ওপর বহু যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মানবসৃষ্টির সূচনা ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; আলোচনা এসেছে আখেরাতের সেই দৃশ্য সম্পর্কে, যার মধ্যে জীবন ও জীবনের স্পন্দন থাকবে, আলোচনা করা হয়েছে অতীতের সেই স্বার্থ সন্ধানী ক্ষমতাধর ও বলদর্পীদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে, যার বিবরণ মানুষের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

ওপরে বর্ণিত সূরাটির ভূমিকার সাথে সাথে আরও যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, সূরাটি পাঠকালে অন্তরের মধ্যে প্রচন্ড এক ভীতির সঞ্চার হয় এবং নিজের অজান্তেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মাথা নুয়ে পড়ে, সকল অহংকার ও আত্মম্ভরিতা দুর হয়ে যায়। অপর দিকে সত্যকে অস্বীকারকারী অন্তর, ওপরের বর্ণনার সংস্পর্শে এসে আরও বিদ্বেষী, আরও কঠিন এবং আরও জিদ্দী হয়ে যায়; এই জন্য এ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের পরিণতি সম্পর্কে এমনভাবে জানানো হয়েছে যেন ভালো ও মন্দ সকল ব্যক্তির শেষ পরিণতির ছবিগুলো তাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ভাসতে থাকে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে পেশ করা প্রত্যেকটি বর্ণনা ও দৃশ্যই এমন কিছু বিষয়ের দিকে মানব হৃদয়কে আকৃষ্ট করে যা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে চাংগা করতে থাকে এবং নিদ্রায় ঢলে পড়া মানুষকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে ও চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

আলোচনা প্রসংগে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা সূরাটিকে চার বা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটি পাশাপাশি অবস্থিত এবং একটি শেকলের মাধ্যমে তা পরস্পরের সাথে জড়িত। সূরাটি শুরু হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অক্ষর; 'আলিফ লাম ও মীম' দিয়ে। এর দ্বারা আল কোরআন জানাতে চায় যে এই অক্ষরগুলোর শ্রেণী থেকেই আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এগুলো দ্বারাই আল্লাহর কাছ থেকে আল কোরআনের অবতরণ ও ওহী স্বরূপ আসা নিয়ে সকল সন্দেহের অপনোদন হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সবই রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে আগত বাণী সবই এক, যেন এর দ্বারাও রসূল তাঁর জাতিকে সতর্ক করতে পারেন এরশাদ হচ্ছে, 'যেন তারা হেদায়াত পায়'

আর এইটিই হচ্ছে আকীদার বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম বিষয়, অর্থাৎ ওহীর আগমন এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর বার্তাবাহক হওয়ার সত্যতা।

এরপর পেশ করা হচ্ছে সারা জাহানের মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জীবন-মৃত্যুর একমাত্র ফায়সালা দাতা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এবং অস্তিত্বের বুকে তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও যাবতীয় গুণাবলী ছড়িয়ে থাকার বিষয়, যা আকাশমন্ডলী পৃথিবী

www.pathagar.com

এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু বর্তমান রয়েছে সে সবকে বাস্তবে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির বুকে বিদ্যমান এ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটেছে। পরিশেষে এগুলো সব কিছু যে তাঁর কাছে ফিরে যাবে ও অবশেষে তাঁর কাছেই সবাইকে চলে যেতে হবে, আলোচ্য সূরাতে এ কথাগুলোকে হৃদয়ংগম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। .....এরপর আরও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণীয় যে বিষয়টি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে; মানবসৃষ্টির সূচনা ও দুনিয়ার বুকে তার বিস্তার দান এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলছে এবং তাকে কান, চোখ ও বুঝ শক্তি দেয়া হয়েছে যেন সেগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর এসব সত্ত্বেও মানুষ খুব কমই আল্লাহ তায়ালার শোকরগোযারি করে

এবারে এখানে দ্বিতীয় বিষয়টিকে পেশ করা হচ্ছে; আর তা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মালিক ও সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর গুণবৈশিষ্ট সম্পর্কে জানানোর কাজ। এই 'উলুহিয়্যাৎ' শব্দটির মধ্যে যে গুণগুলো লুকিয়ে রয়েছে তা হচ্ছে; সৃজনী ক্ষমতা, পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষমতা, এহসান করার ক্ষমতা, পুরস্কার দানের ক্ষমতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুণ, দয়ামায়া মমতা ইত্যাদি আর এসব বিষয়ই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও পালন সম্পর্কিত আলোচনার প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আসছে পুনরুত্থানের বিষয়টি; অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন শেষে অবশ্যই মৃত্যু আসবে, তারপর এক নির্দিষ্ট সময় পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সবাইকে আবার যিন্দা হয়ে উঠতে হবে। এই বিষয়টির ওপরই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে যে, পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পর আবার শরীরের অণু-পরমাণুগুলো কিভাবে একত্রিত হবে? এটা এক অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া আর কি? এ জন্য তাদের কথা উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'ওরা বলল, আমরা এ ধরার বুকে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কি নতুন এক সৃষ্টিতে পরিণত হবো?' এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তাপূর্ণ কথা দিয়ে তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

এবার আসছে তৃতীয় বিষয়টি। আর তা হচ্ছে কবর থেকে উঠে এসে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া আর এখানে এসে দেখা যায়, কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্য থেকে একটি দৃশ্যকে পেশ করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে, 'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা যখন অপরাধীরা তাদের রব এর কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে'–

এ সময়ে তারা আখেরাত সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে থাকবে এবং বলবে যে, তাদের কাছে সত্যের যে দাওয়াত পৌছানো হয়েছিলো তা অবশ্যই সত্য, তখন তারা এমন এমন আরও কিছু কথা বলতে থাকবে, যদি তারা দুনিয়ার জীবনে সে সব কথা বলতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হতো! কিন্তু এমন সময় তারা এ কথাগুলো বলবে যখন এতে তাদের

www.pathagar.com

কোনোই ফায়দা হবে না। তখন হয়ত তারা সে ভয়ানক দৃশ্য বাস্তবে দেখার পরেই এসব কথা বলবে। যেহেতু তখন এ দৃশ্যই তাদেরকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু হায়! সংশোধনের সকল সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পরই তাদের চেতনার উদয় হবে এবং তারা নিষ্ফল আক্ষেপের কথা বলবে। বলবে সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তের খবর নবীর মাধ্যমে তাদেরকে পূর্বাহ্নে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন তারা নবীকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে এবং চরম হঠকারিতার সাথে তাঁর আনীত সত্যকে অস্বীকার করেছে।

এ প্রসংগে অনাগত সে কঠিন ও দুঃখ ভরা দিনের পূর্বাভাস দানের পাশাপাশি পৃথিবীর বুকে থাকাকালীন মোমেনদের জীবন কেমন ছিল তারও একটি উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, এরশাদ হচ্ছে, 'প্রকৃতপক্ষে তারাই আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে .....।'

এ হচ্ছে এক প্রাণ উদ্দীপক অবস্থার ছবি যা তাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান মহত্বের সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব পবিত্র দিল, আল্লাহভীরু ও আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যে সে রোজ হাশরের কঠিন দিনে কি কি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই কথাটাকেই এখানে চমৎকারভাবে পেশ করছেন। পেশ করছেন তাদের কথা যারা শেষ রাতের অতি গভীর ও আরামের ঘুম ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালারই মোহব্বতে শয্যা ত্যাগ করে এবং তাঁকে ডাকতে থাকে ভয় ও বুকভরা আশা-আকাংখা নিয়ে। অতএব, সেসব নেক বান্দার জন্যে কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে যে আনন্দঘন ও সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া হবে, তা হবে আজকের এই ক্ষণস্থায়ী মানবমন্ডলীর ধারণা-কল্পনা থেকে বহু বহু উর্ধের বস্তু। এ অবস্থাটি জানাতে গিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জানানো হচ্ছে, 'না, না কেউ জানে না, কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের চোখ জুড়ানোর মতো কতো অসংখ্য মর্যাদার জিনিস সেখানে তাদের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এসবই হবে তাদের অতীতের নেক কাজগুলোর প্রতিদান।'

এরপর খুব দ্রুতগতিতে আর একটি দৃশ্য সামনে আসছে যার মধ্যে পর্যায়ক্রমে মোমেনদের জন্য আমোদ প্রমোদে ভরা জান্নাত এবং মোনাফেকদের জন্যে আগুনে ভরা দোযখের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অপরাধী চক্রের জন্যে আর একটি প্রচন্ড ধমকি প্রদান করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারা সে বেদনাদায়ক পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার আগেই তাদেরকে পৃথিবীর বুকে অবশ্যই কিছু না কিছু শাস্তির মধ্যে ফেলা হবে।

এরপর মূসা (আ.)-এর দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, জানানো হচ্ছে যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) ও মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে মানব মন্ডলীর মুক্তির জন্য সময়ান্তরে একই পয়গাম এসেছে। আলোচনা এসেছে মূসা (আ.)-এর কওমের ব্যাপারে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রচুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সঠিক পথে ছিলো এবং আল্লাহর বাণী নিয়ে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলো।

www.pathagar.com

এ কাজ করতে গিয়ে তারা খুবই দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলো, যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সারা বিশ্বের নেতা বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূসা (আ.) ও তার কওমের এ বিবরণ পেশ করতে গিয়ে মোমেনদেরকে ইংগীতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সত্যের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও মোহাম্মাদ (স.)-কে ও তাঁর আনীত দাওয়াতকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তারা খোদ নবী (স.)-কে যেভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, সেই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় মোমেনদেরকে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, সকল অবস্থায় তাদেরকে অনেক অনেক সবর করতে হবে এবং বিরামহীনভাবে দিকে দিকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে।

এখানে এই সাথে আর যে কাজটি করার জন্য ইংগীত করা হয়েছে, তা হচ্ছে; সারা জাহানের ইসলাম-দুশমনরা সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনে বুঝে ইসলামের সাথে দুশমনি করছে এবং সকল যামানাতেই, নিছক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো শ্রেণীর সাথে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন চক্রান্তে তারা মেতে রয়েছে; অথচ এহেন সংগীন অবস্থায় তথাকথিত মুসলমানরা তাদের বাড়ীতে গাফেল হয়ে বসে থাকতে চায়, ইসলামী দাওয়াতকে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়ার কোনো দায়িত্বই তারা অনুভব করে না। চিন্তা করে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীব-জানোয়ার মতো শুধু খাওয়া পরা ও ফূর্তি করার জন্যই পয়দা করেননি, বরং তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার। এরপরও তাদের নিশিদিনের ব্যস্ততা চলছে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে কেন্দ্র করেই। এ জন্যে তাদেরকে একবার পৃথিবীর যে কোনো এক ভূমির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'তাকিয়ে দেখো হে মানবজাতি, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! কে এ মৃত যমীনকে (একবার মুর্দা বানিয়ে দেয়ার পর) পুনরায় যিন্দা করলো, কে এখানে প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে চলেছে! এইভাবে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্য ও অতীতের পাপিষ্ঠ জাতির ধ্বংসের দৃশ্যাবলী দেখে আশা করা যায়, মানুষ বুঝবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দৃশ্য ও জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

অতপর সূরাটি ওদের একটি কথার উদ্ধৃতি পেশ করার সাথে সমাপ্ত হচ্ছে,

'কখন আসবে এ বিজয়?' অর্থাৎ, ওরা সেই বিজয় দিবস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মন নিয়ে এ প্রশ্ন করে যে দিনে তাদের প্রতি শাস্তির ধমকিকে কার্যকর করা হবে এবং মোমেনরা বিজয় লাভে ধন্য হবে! ওদের এসব সন্দেহের জবাবে এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার সাথে বলা হচ্ছে যে, অবশ্যই মোমেনদের সফলতা এবং সত্যবিরোধীদের ওপর তাদের বিজয় আসবেই। রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তিনি যেন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে তাদের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেন।

www.pathagar.com

সূরা সাবা

ইসলামের প্রধান ও মৌলিক আকীদা আল্লাহর একত্ব, ওহীর সত্যতায় বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাসই এই মক্কী-সূরাটার আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি এতে উক্ত প্রধান আকীদাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মৌলিক তত্ত্বের সত্যায়ন করা হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি নয়, বরং ঈমান ও সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিফল দানের ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই এবং আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশও করতে পারে না।

এ সূরায় যে বিষয়টার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে তা হলো পরকাল, কর্মফল এবং আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের সর্বব্যাপকতা, নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা। এই দুটো পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এ সূরায় বারবার বিভিন্ন ভংগীতে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার ওপর তার প্রভাব পড়েছে।

যেমন পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কাফেররা বলে আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না। তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে।'

কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের য়াতে তিনি কর্মফল প্রদান করতে পারেন .....'

এর কাছাকাছি অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, যারা কুফরি করেছে, তারা বলে, তোমাদের কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আবার নাকি তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? .....'

এ ছাড়া কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য। কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি তিরস্কার, যে আযাবকে তারা মিথ্যা মনে করতো বা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতো, তার বিভিন্ন রূপও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন একটি দৃশ্য হলো, 'যদি তুমি দেখতে, যখন অত্যাচারীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মোমেন হতাম।' (আয়াত ৩১-৩৩)

এ সব দৃশ্য এ সূরার বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এ দিয়ে সূরায় সমাপ্তিও ঘটেছে, যেমন 'যদি তুমি দেখতে, যখন তারা আতংকিত হবে ...' (আয়াত ৫১-৫৪)

আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পর্কে সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে, 'যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে, ভূ-গর্ভ থেকে বের হয়, আকাশ থেকে নামে ও আকাশে ওঠে, সবই তিনি জানেন।'

www.pathagar.com

কেয়ামতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জবাবে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে .....' (আয়াত-৩)

আর সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে, 'বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সত্যকে নিক্ষেপ করেন তিনি অদৃশ্য জ্ঞাতা।' (আয়াত-৪৮)

তাওহীদ বিষয়ে সূরার শুরু করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর মালিক ....'

আর মোশরেকদেরকে একাধিকবার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, 'বল, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের প্রভুত্বের দাবী করো, তারা আকাশ ও পৃথিবীতে কনামাত্র জিনিসেরও মালিক নয়! ....'

এ আয়াতগুলোতে মোশরেকদের পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও জ্বিনদের পূজা করার উল্লেখ রয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে কেয়ামতের একটা দৃশ্য বর্ণনা প্রসংগে। যেমন, 'যেদিন মহান আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন অতপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো? .....' (আয়াত ৪০-৪১) তারা ধারণা করতো যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করবে। এ ধারণা খন্ডন করা হয়েছে ২৩ নং আয়াতে।

যেহেতু তারা শয়তানের পূজা করতো, তাই সেই প্রসংগে হযরত সোলায়মানের ঘটনা এবং তার প্রতি জ্বিনজাতির অনুগত হওয়া তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কাহিনী ১৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে ৩১, ৪৩, ২৮ ও ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

আর মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এসেছে ৩৪ থেকে ৩৮ নং আয়াতে। এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে হযরত দাউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞ বংশধরের কাহিনী, সাবার দাম্ভিক ও কৃতঘ্নদের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্মের শাস্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।

অধিকাংশ মক্কী সূরাগুলোতে এই বিষয়গুলোই বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক সূরায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এবং সেই সাথে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সূরা সাবাতেও একই পন্থায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে আকীদাগত সত্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সুবিশাল আকাশ ও পৃথিবী, অজানা ও অদৃশ্য ভয়াল জগত, ত্রাস সৃষ্টিকারী কেয়ামতের ময়দান, হৃদয়ের গভীরতম ও সূক্ষ্ম জগত, ইতিহাসের জানা ও অজানা অধ্যায় এবং ইতিহাসের বিরল ও বিস্ময়কর দৃশ্যসমূহ। এর প্রত্যেকটা জিনিসই মানবমনকে প্রভাবিত ও উজ্জীবিত করে, তাকে সচেতন করে ও সক্রিয় করতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

সূরার সূচনা থেকেই বিশাল মহাবিশ্বের, তাতে বিরাজমান আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর ও তাঁর সূক্ষ্ম ও সুপ্রশস্ত জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে। (আয়াত ২-৩)

যারা আখেরাত অস্বীকার করে, তাদের এ সূরায় বিভিন্ন গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি দেয়া হয়েছে। ৯ নং আয়াত দেখুন।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ফেরেশতাদের বা জ্বিনদের উপাসনা করে, তাদেরকে উচ্চতর ফেরেশতা জগতে অদৃশ্য সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সুপারিশ সফল হবে না .....।' (আয়াত ২৩)

আবার অন্যত্র কেয়ামতের মাঠে তাদেরকে ফেরেশতাদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, যেখানে কোনো ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হবার অবকাশ থাকবে না। (আয়াত ৪০)

যারা রসূল (স.)-কে অস্বীকার করতো তাঁকে মনগড়া ওহী তৈরী করার দায়ে অভিযুক্ত করতো কিংবা বলতো যে, তাঁর সাথে একটি জ্বিন থাকে। তাদেরকে দাঁড় করা হয়েছে তাদেরই মন ও বিবেকের সম্মুখে। যাবতীয় কৃত্রিম আড়াল ছিন্ন করে ও মনের ওপর কৃত্রিম প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বাদ দিয়েই এটা করা হয়েছে। (৪৭ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন।)

এভাবেই এ সূরাটা মানুষের উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর চারপাশে কেন্দ্রীভূত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কেয়ামতের একটা ভয়াবহ দৃশ্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

সূরাটার ও ব্যাখ্যাকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে তাকে পাঁচটা অধ্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়গুলোর মাঝে কোন সুক্ষ্ম পার্থক্য নেই। এটাই এই সূরার বৈশিষ্ট।

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যিনি চির প্রশংসিত এবং যিনি মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী। তারপর আল্লাহ তায়ালার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রশস্ততম জ্ঞানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে, যা কিছু যমীনে থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে ও আকাশে উঠে যায়, সব কিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। এরপর বলা হয়েছে যে, তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম ও নির্ভুল যে, আকাশ ও পৃথিবীতে একটা ক্ষুদ্র কণা এবং তার চেয়ে ছোটো বা বড়ো কোনো জিনিসই তাঁর অজানা নয়। তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি মোমেনদের ও আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে সক্ষম। সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, তারা নবীর প্রতি নাযিল হওয়া ওহীকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আর যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের নির্বুদ্ধিতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে চরম বিপথগামী ও আযাবের উপযুক্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উপরন্ত তাদেরকে এই মর্মে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি ধসিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে অথবা আকাশের ভাংগা টুকরো তাদের মাথায় ফেলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতে পারে।

এভাবে প্রথম অধ্যায়টা শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হযরত দাউদ (আ.)-এর সেই সব বংশধরের কথা, যারা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তায়ালার যথাযথ শোকর আদায় করে থাকে। পৃথিবীর বহু জিনিসকে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের অন্যতম নিদর্শন। এমন দুর্লভ নেয়ামত পেয়েও তারা কখনও দাম্ভিক বা অহংকারী হননি। এই সব অনুগত ও বশীভূত শক্তির মধ্যে জ্বিনও অন্তর্ভুক্ত। মোশরেকদের কেউ কেউ জ্বিনদের উপাসনা পর্যন্ত করে এবং তাদের কাছে অজানা ও অদৃশ্য খবর জানতে চায়। অথচ জ্বিনেরা অদৃশ্যের কোনো খবরই জানে না। হযরত সোলায়মানের ইন্তেকালের পরও তারা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও লাঞ্ছনাকর কাজ করেছে। কেননা তিনি যে মারা গেছেন, সে কথা তারা জানতেই পারেনি। কৃতজ্ঞতাগুলো ছিলো দৃষ্টান্ত। যেমন সাবা সাম্রাজ্য ও তার রাণীর কাহিনী। আল্লাহ তায়ালার বিপুল নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভোগ করেও তারা তার শোকর আদায় করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এর ফলে আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।' কেননা তারা শয়তানের আনুগত্য করেছিল। শয়তান তাদের ওপর কোনো জোর খাটায়নি; বরং তারা স্বেচ্ছায় তাকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বানিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূচনা হয়েছে মোশরেকদেরকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়ার মাধ্যমে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তারা নিজেদের উপাস্য মনে করে, তাদের ডেকে আনুক ও তারা তাদের কতোখানি সাহায্য করতে পারে দেখুক। 'আসলে তারা আকাশ ও পৃথিবীতে একটা কণার সমানও শক্তি রাখে না এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোথাও তাদের বিন্দুমাত্রও অংশীদারিত্ব নেই.....।' এই সব উপাস্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য একটু সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না, এমনকি তারা ফেরেশতা হলেও নয়। ফেরেশতারা সব সময় আল্লাহ তায়ালার আদেশের অনুগত এবং তারা তাঁর সামনে টু শব্দটিও করার সাহস রাখে না। এ অধ্যায়ের এক জায়গায় প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী থেকে তাদের জীবিকা সরবরাহ করে কে? তারপর তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহ করেন এবং তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। অতপর তাদের যাবতীয় বিরোধ আল্লাহ তায়ালার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনিই তাদের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। এই অধ্যায়ের শুরুর মতো শেষেও আবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, যাদের তারা আল্লাহর শরীক বানায় তাদের দেখিয়ে দেয়া হোক। তারপর বলা হয়েছে, 'কখনো দেখাতে পারবে না।' বরং একমাত্র মা'বুদ হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় একই সাথে ওহী ও রেসালাত, ওহী ও রেসালাতের সাথে কাফেরদের আচরণ, প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইসলামের শত্রুদের আচরণ এবং তাদের জনশক্তি ও অর্থশক্তির গর্ব ও বড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসগুলোর ওপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে ঈমান ও সৎকাজ, জনবল ও ধনবল নয়। সেই সাথে কেয়ামতের একাধিক দৃশ্যে ঈমানদার ও বেঈমানদের পরিণাম তুলে ধরে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন দলমতের অনুসারীরা তাদের নেতৃবৃন্দকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এই সব দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের আসল স্বভাব ও প্রকৃতিকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং রসূলকে প্রত্যাখ্যান না করে। যে রসূল তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চান না এবং যিনি মিথ্যুক নন, পাগলও নন, তাকে যেন অস্বীকার না করে। উভয় অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে। আর সর্বশেষে সূরার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে কয়েকটা গুরুগম্ভীর বক্তব্যের মাধ্যমে, 'তুমি বলো, আমার প্রভু সত্য নিক্ষেপ করেন, তিনি যাবতীয় অদৃশ্য তত্ত্ব জানেন। বলো, সত্য এসে পড়েছে। অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, পুনসৃষ্টিও করতে পারে না। বলো, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবো, আর যদি আমি সৎপথের ওপর থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। তিনি তো সব শোনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন।' অতপর কেয়ামতের একটা ভয়াল ও ক্ষুদ্র দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সূরা ফাতের

এই মক্কী সূরাটির ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে যে বিশেষ ধরনের বিন্যাস রয়েছে, তার সাথে সূরা 'রাদ'-এর বিন্যাসের একটা নিকটতম সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, ঝাঁকি দেয় এবং উদাসীনতা ও শৈথিল্য থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে, যাতে সে সৃষ্টি জগতের বিশালতা ও চমৎকারিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে, সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে ভাবতে পারে, তাঁর নেয়ামতসমূহ স্মরণ রাখে, তাঁর দয়া ও করুণাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, অতীতের কাফেরদের ইহকালীন ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং পরকালীন শোচনীয় পরিণতিকে উপলব্ধি করে, মহান আল্লাহর অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো, সৃষ্টি জগত, মানব জীবন, ইতিহাসের ঘটনাবলী ও মানবাত্মার গভীরতম প্রকোষ্ঠে মহান আল্লাহর সৃজনী হাতের নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করার সময় তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয় এবং এই অতুলনীয় বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো ও তাঁর এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টিজগতে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে প্রেরিত

www.pathagar.com

সত্য বিধান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সুদক্ষ সুনিপুণ সৃজনী হাতের অখন্ড একত্ব দেখে তা অনুভব করতে পারে। আর এই সব কিছুই যেন এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় সম্পন্ন হয়, যাতে কোনো অনুভূতিশীল হৃদয়ই সত্যের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত না হয়। সূরাটা এমন অখন্ড ও ঘনিষ্ঠ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একক যে, একে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। কেননা পুরো সূরাটা জুড়ে একই বিষয় আলোচিত, মানব হৃদয়ের ওপর একই ঐকতান ঝংকৃত এবং প্রকৃতি, মানবাত্মা, জীবন, ইতিহাস ও পরকালের উৎস থেকে উদ্ভূত এই সত্য এর সর্বত্র উচ্চারিত, তাই এ সূরা মানব হৃদয়কে সর্বদিক থেকে ঈমান, প্রত্যয় ও বিনয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ সূরার আয়াতগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহকেই সকল তৎপরতার শক্তির উৎস নির্ধারণ করে, তাঁর হাতকেই সকল তৎপরতার মূল শক্তিদাতা ও প্রেরণাদাতা হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ঘোষণা করে যে, সব কিছুর সুতো তাঁর হাতেই নিবদ্ধ, তিনিই এই সুতো ছাড়েন বা টানেন, ঢিল দেন বা সংকুচিত করেন। কেউ এ ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দিতে পারে না, তাঁর সাথে শরীক হতে পারে না বা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

সূরার শুরু থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আমরা দেখতে পাই, এক মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি এই মহাবিশ্বকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করে,

'আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা'..... (আয়াত-১)

স্রষ্টা হওয়ার সুবাদে সৃষ্টির ওপর তাঁর এই জোরদার নিয়ন্ত্রণ আবার তাঁর দয়ালু হওয়ার কারণে শিথিলও হয়। তখন আল্লাহর দয়া করুণা মুষলধারে বর্ষিত হয়। পুনরায় সেই করুণার ধারাও নিয়ন্ত্রিত এবং বন্ধ হয়। এর কোনোটাতেই এখানে অন্য কারো কিছু করণীয়ও থাকে না।

'আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে করুণাধারা উন্মুক্ত করেন, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর যা তিনি বন্ধ করেন তা কেউ পুনরায় চালু করতেও পারে না।.....'(আয়াত-২)

হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর এই করুণাধারা উন্মুক্ত করা অথবা বন্ধ করার ফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী করেন, যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করেন।'..... 'আল্লাহ তায়ালা যাকে চান শোনান। যারা কবরে আছে, তাদের তুমি শোনাতে পারবে না। তুমি তো সতর্ককারী মাত্র।' মহান আল্লাহর এই হাতই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করে এবং পরকালে মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করে।

'আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা. যিনি বাতাস প্রেরণ করেন, অতপর মেঘমালা চালু করেন....'(আয়াত-৯) এরপর ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব সম্মান মর্যাদা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং এর একমাত্র উৎসও তিনি।

www.pathagar.com

'যে ব্যক্তি সম্মান চায় তার জানা উচিত যে, সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর।'.....

১১ নং আয়াতের বক্তব্য এই যে, বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টির নির্মাণ, বংশ বৃদ্ধি ও আয়ুষ্কাল নির্ধারণ সব কিছুরই সুতো আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে..... ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি আর আল্লাহর হাতই যে তার সুনির্দিষ্ট পন্থায় সমগ্র সৃষ্টিজগতে সক্রিয় রয়েছে এবং জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, মানুষ ও জীবজন্তুকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে, সে কথা বলা হয়েছে ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে।

আর এই হাতই মানবজাতির বংশ বিস্তার ঘটায় এবং এক প্রজন্মকে আর এক প্রজন্মের উত্তরাধিকারী বানায়, এ কথা রয়েছে ৩২ ও ৩৯ নং আয়াতে। এই হাতই আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে, ৪১ নং আয়াতে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর এই হাতই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর কেউ তাঁর এ কাজে বাধা দিতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সূরার কয়েকটা বক্তব্য লক্ষণীয়; 'তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' ..... 'তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়', 'সব জিনিসই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।' 'তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত', 'রাজত্ব কেবল তাঁরই', 'আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন', 'তিনি প্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল', গুণগ্রাহী, 'তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী, সর্বোত্তম', তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় জানেন', 'তিনি অন্তর্যামী' 'তিনি ধৈর্যশীল', 'তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

এসব বক্তব্য এবং এই সব আয়াত নিয়েই সূরাটা গঠিত, আর এগুলো দ্বারাই বুঝা যায় সূরার বৈশিষ্ট্য কি এবং মনের ওপর তা সাধারণভাবে কি প্রভাব বিস্তার করে।

সূরার এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি একে ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ংগম করার সুবিধার্থে ছয়টা অংশে ভাগ করেছি। তবে প্রত্যেকটা অংশের বক্তব্য এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে, পুরো সূরাটা আসলে একটা অধ্যায় বলেই প্রতীয়মান হয়।

সূরা ইয়াসিন

এই মক্কী সূরাটা ঘন ঘন বিরতির সাথে ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতে পরিপূর্ণ। এজন্যে পঁয়তাল্লিশ আয়াত বিশিষ্ট পরবর্তী সূরা ফাতেরের চেয়ে ছোট হওয়া সত্তেও এ সূরার আয়াত সংখ্যা তিরাশি। ঘন ও ঝংকারপূর্ণ ছন্দময় ছোট ছোট আয়াতের কারণে সূরাটা বৈশিষ্ট্যময় হয়ে আছে। এ কারণে সূরাটা স্নায়ুমন্ডলীর ওপর ক্রমাগত ধাক্কা ও ঝাঁকুনি দিতে থাকে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে ক্রমাগত যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা এর আয়াতগুলোর প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে পাঠকের মনে সূরার যে ছাপ পড়ে, তা অত্যন্ত গভীর, নিবিড় ও বিচিত্র।

www.pathagar.com

সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই। আকীদার ভিত্তি গড়া-ই এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। শুরু থেকেই এতে আলোচিত হয়েছে ওহীর প্রকৃতি ও রেসালাতের সত্যতা, ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম, তুমি অবশ্যই রসূলদের অন্যতম। তুমি নির্ভুল পথের ওপরে আছো। এ কেতাব মহাপরাক্রমশালী দয়াময়ের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে .....।' কিছুক্ষণ পরেই আসছে গ্রামবাসীর কাছে রসূলদের আগমনের ঘটনা। এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো ওহী ও রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। ঘটনায় এই পরিণামটা দেখানো হয়েছে কোরআনের নির্ধারিত রীতি অনুসারে।

নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ঘটনাবলীর সাহায্য নেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন সব সময় এই রীতি অনুসরণ করে থাকে। সূরার সমাপ্তির কাছাকাছি গিয়ে সে এই বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করে– 'আমি তাকে কবিতা শেখাইনি এবং সেটা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো কেবল স্মরণিকা এবং সুস্পষ্ট কোরআন, যাতে সে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে, যার ভেতরে এখনো উজ্জীবনী শক্তি রয়েছে, আর যাতে কাফেরদের ওপর আল্লাহর বাণী কার্যকর হয়।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এতে শেরেকের প্রতি ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে এমন এক মোমেন ব্যক্তির মুখ দিয়ে, যে রসূলদের ব্যাপারে নিজ জাতির সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলো। সে বলছিলো, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর এবাদাত করবো না কী কারণে? অথচ তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।..... সূরার শেষভাগে এই বিষয় নিয়ে আবারো আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে বদ দিয়ে কতকগুলো মাবুদকে গ্রহণ করেছে আর ভেবেছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অথচ তারা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়.....।'

যে বিষয়টার ওপর এ সূরায় সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো আখেরাত ও কেয়ামত। এ বিষয়টা সূরার একাধিক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরার প্রথম ভাগে রয়েছে, আমিই তো মৃতদের জীবন দেই, এবং তারা যা কিছু সৎকাজ করে তা ও তার ফলাফল আমি লিখে রাখি।.....'

গ্রামবাসীর ঘটনায় মোমেন ব্যক্তিটার ওপর যে শোচনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছিলো, আয়াতে তার তাৎক্ষণিক প্রতিফল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার বেহেশতে প্রবেশকে, 'তাকে বলা হলো, বেহেশতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়, আমার জাতি যদি জানতো যে, আমাকে আমার প্রভু ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন'– সূরার মাঝখানে আবার আলোচিত হয়েছে। যেমন তারা বলে, 'এই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে, যদি তুমি সত্যবাদী হও? তারা একটা চিৎকার ছাড়া আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না .....' এরপর কেয়ামতের একটা পূর্ণাংগ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শেষভাগে এ বিষয়টা একটা সংলাপের আকারে বিবৃত হয়েছে, 'সে আমার কাছে একটা নমুনা

www.pathagar.com

তুলে ধরেছে আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। সে বলেছে, হাড়গুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর কে ওগুলো জীবিত করবে! বলে দাও, যিনি ওগুলো প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই এখন জীবিত করবেন। তিনি তো প্রত্যেকবারের সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞ।'

আকীদাকে তার ভিত্তিমূল থেকে গড়ে তোলার সাথে সংশ্লিষ্ট এসব যুক্তিতর্ক মক্কী সূরায় বার বার উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে তা প্রত্যেকবার একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। প্রতিবার তার পটভূমি ও বর্ণনাভংগিও হয় ভিন্ন রকমের এবং তার প্রভাবও পড়ে ভিন্ন ধরনের।

আলোচ্য সূরার এই সাড়া জাগানো বক্তব্যগুলো বিশেষভাবে কেয়ামতের দৃশ্যগুলো থেকে সংগৃহীত। তা ছাড়া এতে বর্ণিত কাহিনীটার বিভিন্ন দৃশ্য, তার সংলাপ ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা, যুগে যুগে যারা আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তদের ধ্বংসযজ্ঞ, রকমারি তাৎপর্যবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, যেমন উর্বর মাটিতে উর্বরতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারের দৃশ্য, দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর রাতের অন্ধকার নেমে আসার দৃশ্য, সূর্যের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণের দৃশ্য, চাঁদের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পুরনো খেজুরের ডালের মত আকৃতি গ্রহণের দৃশ্য, অতীতের মানুষদের বংশধরকে বহনকারী জাহাজের দৃশ্য, মানুষের অনুগত পশুদের দৃশ্য সবই আলোচনায় এসেছে। সামান্য এক ফোঁটা বীর্য থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত বাকপটু মানুষের জন্ম লাভের দৃশ্য এবং সবুজ গাছ থেকে আগুন জ্বলার দৃশ্য থেকে এগুলো সংগৃহীত।

এ সব দৃশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু সাড়া জাগানো চিত্র রয়েছে, যা মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করে ও জাগ্রত করে। তন্মধ্যে সেসব কাফেরের চিত্র অন্যতম, যারা ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তাদের ঘাড়ের ওপর শেকল লাগিয়েছি, যা থুতনি পর্যন্ত চলে গেছে। ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে.....তারা দেখতে পায় না।' এর মধ্যে তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সত্ত্বার চিত্রও রয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানের সামনে সমভাবেই উন্মোচিত। এর মধ্যে তাদের সৃষ্টি পদ্ধতির বিবরণও রয়েছে, যা একটা মাত্র শব্দের মধ্যেই সীমিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি যখন কিছু চান তখন তার একমাত্র আদেশ হয়ে থাকে এই যে, তিনি বলেন, 'হও', আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।' এ সবই মানব হৃদয় স্পর্শকারী প্রভাবশালী উপকরণ। প্রকৃতির অংগনেও এগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায়। সূরার মূল ভাষ্যে এর বিষয়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে পেশ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগটা শুরু হয়েছে দুটো অক্ষর সহযোগে অর্থাৎ 'ইয়াসীন' এই নামে শপথ করার মধ্য দিয়ে। সেই সাথে শপথ করা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) অবশ্যই রসূল এবং তিনি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর বহাল আছেন। সঠিক পথের ওপর বহাল থেকে তিনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী উদাসীন লোকদের সেই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন। সেই ভয়াবহ পরিণতি হলো যে, তারা আর কখনো হেদায়াতের পথ পাবে না এবং এ কথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ওহীর সতর্কবাণী শুধুমাত্র তাদের

www.pathagar.com

জন্যেই লাভজনক হয়ে থাকে যারা ওহীর স্মরণিকা অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে। ফলে তাদের হৃদয় হেদায়াতের যুক্তি প্রমাণগুলো ও ঈমানের আহ্বান গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে। এরপর রসূল (স.)-কে গ্রামবাসীর ঘটনা বর্ণনা করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে আল্লাহর নবীর দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণাম কী হয়ে থাকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর পাশাপাশি মোমেনের হৃদয়ে ঈমানের প্রকৃতি কিরূপ এবং ঈমানের সুফল কী হয়ে থাকে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ জন্যে দ্বিতীয় অংশটা শুরু হচ্ছে সেই বান্দাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যারা অনবরতই রসূলদের প্রত্যাখ্যান করতে অভ্যস্ত, যারা প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না এবং সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিপুলসংখ্যক নিদর্শন দেখেও যাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। সূরার ভূমিকায় বর্ণিত সেসব প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং কেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণও এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

তৃতীয় অংশে সূরার সব কটা আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তা কোনো কবিতা তো নয়ই, এমনকি কবিতার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই। এরপর আল্লাহর একত্বের কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর পৌত্তলিকতাকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে যে, যে সমস্ত মূর্তি তারা স্বয়ং সংরক্ষণ করে, তাদের তারা কিভাবে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়? এ অংশে কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রথম বার তাদের জন্ম হয়েছে বীর্য থেকে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যেন তারা বুঝতে পারে, মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়গোড় পুনরায় জীবিত করা প্রথম বারের জন্মের মতোই। এতে অবাক হবার কিছুই নেই।

এরপর শেষ কথাটা বলা হয়েছে এই যে, 'তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। অতএব সেই সত্ত্বার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, যাঁর হাতে যাবতীয় জিনিসের সর্বময় ক্ষমতা ও মালিকানা নিহিত এবং তাঁর কাছেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

সূরা আছ ছাফফাত

পূর্ববর্তী সূরার মতোই এই মক্কী সূরাটা ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত, প্রভাব বিস্তারকারী, বিচিত্র দৃশ্য চিত্রণকারী, প্রচন্ডভাবে আঘাতকারী ও তীব্র আবেগ সৃষ্টিকারী বর্ণনার সমষ্টি।

অন্য সমস্ত মক্কী সূরার মতো এটাও অন্তরে ঈমানের আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চায়, সব ধরনের শেরেকের কলুষতা থেকে অন্তরাত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র করতে চায়। তবে আরবে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান এক বিশেষ ধরনের শেরেকের

www.pathagar.com

মূলোৎপাটন-এর বিশেষ লক্ষ্য। এই বিশেষ ধরনের শেরেক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে তার উচ্ছেদ সাধনে নানাভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। শেরেকের এই বিশেষ ধরনটা আরবের জাহেলী যুগে খুবই সমাদৃত হতো। ধারণাটা ছিলো এ রকম যে, মহান আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জ্বিনদের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং সেই স্ত্রীর পেটে ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছিলো, আর এই ফেরেশতারা সবাই আল্লাহর মেয়ে। (নাউযু বিল্লাহ!)

এই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর ওপর এই সূরায় প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে। এতে এই ধারণার প্রতি প্রচন্ড ধিক্কার দেয়া হয়েছে এবং একে অত্যন্ত জঘন্য ও একেবারেই ভুয়া অভিমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার এটা একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই ফেরেশতাদের বিভিন্ন দলের উল্লেখ করেই সূরার সূচনা করা হয়েছে। 'শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অতপর যারা ধমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে, অতপর যারা মুখস্থ আবৃত্তি করে..... ' এর অল্প পরেই রয়েছে বিদ্রোহী শয়তানদের প্রসংগ, যাদের উর্ধ্বজগতের কাছে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে উল্কা নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হয়। উল্কা নিক্ষেপের ফলে তারা উর্ধ্বজগতে যা কিছু আলোচিত হয় শুনতে পায় না। জাহেলী সমাজে ভূত-প্রেত শয়তানদের যতোটা শক্তিশালী ও মর্যাদাশালী মনে করা হতো, তা যদি সত্য হতো, তাহলে এভাবে উল্কার ধাওয়া খেয়ে তাদের পালাতে হতো না। অনুরূপভাবে জাহান্নামে যে যাক্কুম গাছের ফল দিয়ে অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়া হবে, তার আকৃতি শয়তানের মাথার মতো বলে শয়তানকে ধিকৃত ও নিন্দিত করা হয়েছে। সূরার শেষভাগে আবার সেই কল্পিত তত্ত্বের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালানো হয়েছে এভাবে, 'অতএব তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রতিপালকেরই কি সমস্ত কন্যা সন্তান, আর ওদের সমস্ত পুত্র সন্তান? আমি কি তাদের চোখের সামনেই ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে সৃষ্টি করেছি? (আয়াত ১৪৯-১৫৮)

জাহেলী যুগের বিভিন্ন রকমের শেরেকের মধ্য থেকে এই বিশেষ ধরনের শেরেকটার সমালোচনা ছাড়া এ সূরায় সাধারণ মক্কী সূরাগুলোর ন্যায় অন্যান্য আকীদার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা তাওহিদী মতাদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের মাবুদ একজন। তিনি আকাশ পৃথিবী, উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার এবং পূর্ব দিকের প্রতিপালক।' (আয়াত ৪-৫)

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এই শেরেকই হবে আযাব ভোগ করার কারণ। 'তারা সেদিন একই সাথে কঠোর আযাব ভোগ করবে.....।'

অনুরূপভাবে এ সূরায় পুনরুত্থান ও কেয়ামতের হিসাব নিকাশের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন 'তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু। আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনরুজ্জীবিত হবো নাকি? ..... ' এরপর এ প্রসংগে কেয়ামতের এক সুদীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ওহী ও রেসালাতের বিষয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'আমরা একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো নাকি? অতপর এর জবাবে বলা হয়েছে, 'বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং রসূলদের সত্য প্রতিপন্ন করেছে।'

তাদের বিপথগামিতা ও প্রত্যাখ্যান প্রসংগে বেশ কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, তার পুত্ররা, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুসের কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব কাহিনীতে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যানকারীদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করে থাকেন। যেমন 'তাদের পূর্বে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। আমি তাদের কাছে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছি। দেখো, তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিলো। তবে আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।'

এ সব কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্টতার দাবী রাখে পুত্র ইসমাঈলের সাথে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী। এ কাহিনীতে আছে হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টা ও তার পবিবর্তে দুম্বা কোরবানী হওয়ার কথা। এতে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর কাছে আত্মসর্পণের সবচেয়ে বিস্ময়কর সবচেয়ে মহৎ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ আনুগত্য এতো উঁচুস্তরে পৌঁছেছে, যে একনিষ্ঠ ঈমান ছাড়া আর কোনোভাবে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সূরার আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপনের সাথে সাথে যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রথমত আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, উল্কা ও উল্কা দিয়ে বিতাড়নের দৃশ্যে। যেমন, 'নিশ্চয় আমি সর্বনিম্ন আকাশকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে। প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে.....?

দ্বিতীয়ত কেয়ামতের দৃশ্যসমূহে, কেয়ামতের লোমহর্ষক ঘটনায়, তার নযিরবিহীন আকস্মিকতা এবং তার তীব্র প্রভাবের বর্ণনায় এ সূরায় যে দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে, তা যথার্থই নযিরবিহীন। তৃতীয়ত বিভিন্ন কাহিনী ও তার শিক্ষা সংক্রান্ত মন্তব্যে, বিশেষত হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে যবাই করার চেষ্টার ঘটনা হৃদয়ের মর্মমূলে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দেয়। এ ছাড়া ছন্দোবদ্ধ সূরের মূর্ছনা এ সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলী, দৃশ্যাবলী, শিক্ষা ও নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরাটি তার আলোচ্য বিষয়গুলো মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে পেশ করেছে।

প্রথম অংশটায় রয়েছে শপথের মাধ্যমে সূরার সূচনা। এই শপথ করা হয়েছে ইতিপূর্বে বর্ণিত কয়েক শ্রেণীর ফেরেশতার নামে। এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ধমক দিয়ে ভীতি সঞ্চারকারী ও আবৃত্তিকারী ফেরেশতারা। শপথ করা হয়েছে এই মর্মে যে, উদয়াচলসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

www.pathagar.com

তিনি আকাশকে নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। এরপর রয়েছে শয়তানের প্রসংগ, ঊর্ধ্বজগতের ফয়সালাগুলো তাদের আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা এবং তাদের উজ্জ্বল উল্কা দিয়ে বিতাড়িত করার বিবরণ। তারপর মানবজাতির কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, সৃষ্টির দিক দিয়ে তাদের সৃষ্টিই কি জটিলতর, না আমার অন্যান্য সৃষ্টি? অর্থাৎ ফেরেশতা, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, শয়তান ও উল্কা। এ প্রশ্ন দ্বারা তারা যা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করে তার বাস্তবতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ জন্যে আখেরাতে পুনরুত্থান, হিসাব, বেহেশতের নেয়ামত ও দোযখের শাস্তির দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিবরণ যথার্থই নযিরবিহীন।

দ্বিতীয় অংশের শুরু হয়েছে যে বক্তব্যের মাধ্যমে তা হলো, এসব বিপথগামী লোকের (মক্কার মোশরেকদের) সাদৃশ্য অতীতের কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের কাছেও নবী ও রসূলরা সতর্কবাণী নিয়ে আসতেন। তথাপি তাদের অধিকাংশই বিপথগামী থেকে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে রয়েছে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, হারুন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুস (আ.)-এর জাতিসমূহ। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের পরিণাম কেমন ছিলো এবং যারা ঈমান আনেনি তাদের পরিণাম বা কেমন হয়েছে, তা স্মরণ করতে ও চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে রয়েছে সেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর বিবরণ, অর্থাৎ জ্বিন ও ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর আত্মীয়তার কাহিনী। এতে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিরও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূলদের বিজয়ী করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্যে ইতিপূর্বে আমার প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তাদের অবশ্যই সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীগুলো অবশ্যই বিজয়ী হবে।' এ অংশটা সূরার সমাপ্তি পর্যন্ত চলেছে, যেখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর রসূলদের ওপর সালাম প্রেরণ করে মহান আল্লাহর দ্বারা বিশ্বজগতের প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, এই হচ্ছে সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরা ছোয়াদ

এই সূরাটা মক্কী। মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত যেসব বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে, এ সূরায়ও প্রধানত সেগুলোই আলোচিত হয়েছে। যেমন, তাওহীদ, মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে প্রেরিত ওহী এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ। এই তিনটি বিষয় সূরার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বক্তব্যের ওপরে যে ১৬টা আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, এগুলো নিয়েই সূরার প্রথম অধ্যায়। মক্কার নেতৃস্থানীয় মোশরেকদের যখন রসূল (স.) আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয় বলে তাদেরকে জানাতেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রসূলরূপে মনোনীত করার কথা অবহিত করতেন, তখন তারা যে বিস্ময় প্রকাশ করতো, সেটাই এ আয়াতগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়। (আয়াত ৪-৮)

অনুরূপভাবে তারা এ দাওয়াত অস্বীকার করলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে বলে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, সেই হুমকির প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন (আয়াত-১৬ বলা

www.pathagar.com

হয়েছে) 'তারা বললো! হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রাপ্য অংক হিসাবের দিনের আগেই দিয়ে দাও।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহী নাযিল করার জন্যে তাদের ভেতর থেকেই একজনকে বিশেষত আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ (স.)-কে মনোনীত করতে পারেন এটা তাদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিলো। কেননা ইতিপূর্বে তিনি সমাজের কোনো পর্যায়ে কোনো নেতৃত্ব দেননি। এ জন্যে সূরার শুরুতে তাদের এই বিস্ময় প্রকাশের ওপর এবং তাদের 'আমাদের সবার মধ্য থেকে শুধু ওর ওপরই স্মরণিকা নাযিল হলো নাকি?' এই উক্তির ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন; 'তোমার পরম দাতা, মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সমস্ত রহমতের ভান্ডার কি ওদের কাছে? অথবা আকাশ, পৃথিবীর রাজত্ব কি ওদের? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওরা রশি ঝুলিয়ে আকাশে উঠে যাক।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়াবশত যখন তাঁর কোন মনোনীত ব্যক্তিকে কিছু দিতে চান তখন তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে না। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনো মানুষেরই কোনো হাত নেই। তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও জীবিকার যতোটুকু যাকে দিতে চান দেন। এই প্রসংগে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে কি বিপুল অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, নবুওত ও রাজত্ব দান করেছেন, পাহাড় ও পাখিদের তার হুকুমের অনুগত করে দিয়েছেন, জ্বিন ও বাতাসকে তার তাবেদার বানিয়েছেন, এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, দ্রব্যসামগ্রী ও পৃথিবীর অগাধ ধন সম্পদ তো ছিলোই।

এসব সত্তেও তারা উভয়ে নিছক মানুষ। মানুষ হিসাবে তারা স্বভাবসুলভ দুর্বলতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নন। কেবল আল্লাহর মেহেরবানী ও পৃষ্ঠপোষকতা তাদের দুর্বলতা অক্ষমতা দূর করে দেয়, তাদের তওবা ও আনুগত্য গ্রহণ করে এবং তাদের আল্লাহর পথে বহাল রাখে।

এই কাহিনী দুটোর সাথে সাথে রসূল (স.)-কে কাফেরদের পক্ষ থেকে আগত অত্যাচার ও নিপীড়নে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উপদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করার। হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনীতে এই শিক্ষাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অনুরূপভাবে হযরত আইয়ুবের কাহিনীতেও আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের কিভাবে কঠিন বিপদ ও রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। হযরত আইয়ুবের ধৈর্য অতি উচ্চাংগের ধৈর্যের নমুনা। এ কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, ধৈর্যের ফলে হযরত আইয়ুব শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পান, আল্লাহর রহমত লাভ করেন এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় স্নেহময় হাতের পরশ দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করেন। এ কাহিনী বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর মক্কায় অবস্থানকালে আপতিত নির্যাতনের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, এই পরীক্ষার পেছনে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত রয়েছে এবং আল্লাহর ভান্ডার থেকে সেই রহমত যখন তিনি ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণে বিতরণ করেন।

www.pathagar.com

ভূমিকার পরে এই কাহিনীগুলো সূরার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে। সূরার দ্বিতীয় অধ্যায় এগুলোরই সমষ্টি।

অনুরূপভাবে সূরাটায় কাফেরদের পক্ষ থেকে আল্লাহর আযাব তাড়াতাড়ি নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে। 'তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আযাবের প্রাপ্য অংশ বিচারের দিনের আগেই দিয়ে দাও।' এর জবাবে কাহিনীগুলোর পর কেয়ামতের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্যে আল্লাহভীরু সৎলোকদের জন্যে যে নেয়ামত সঞ্চিত এবং কাফেরদের জন্যে যে জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াতে যারা ক্ষমতাশালী ও অহংকারী ছিলো, আখেরাতে তারা নিজেদের পরিণামও দেখবে, আর সেসব দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের দেখবে, যাদের সাথে তারা দুনিয়ায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। তারা কোনো মান্যগণ্য প্রভাবশালী লোক না হয়েও আল্লাহর কৃপা করুণা লাভ করতে পারবে, এটা ছিলো তাদের কল্পনারও অতীত। সেখানে মোত্তাকীদের জন্যে থাকবে পরম শান্তিময় নিবাস। (আয়াত ৫০-৫২)

আর আল্লাহদ্রোহীদের জন্যে থাকবে জঘন্যতম আশ্রয়স্থল। (আয়াত ৫৫, ৫৬ ও ৫৭) তারা জাহান্নামে পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে, ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকবে এবং মোমেনদের সাথে কিভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তা স্মরণ করবে। 'তারা বলবে ব্যাপার কি, যে লোকগুলোকে আমরা দুষ্কৃতকারী বলে গণ্য করতাম, এখানে তাদের দেখি না কেন?' (আয়াত ৬২, ৬৩ ও ৬৪)

বস্তুত তাদেরকে তারা জাহান্নামে কোথাও খুঁজে পাবে না। তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা জান্নাতে অবস্থান করছে। এভাবেই তাদের তাড়াতাড়ি আযাব নাযেল করার আবদারের জবাব দেয়া হয়েছে। আখেরাতের এ দৃশ্যটা নিয়ে সূরার তৃতীয় অধ্যায় গঠিত হয়েছে।

এরপর চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, রসূল (স.)-এর ওপর ওহী নাযেল হওয়ার বিষয়টা কাফেররা অস্বীকার করতো। এ অধ্যায়ে তার জবাব দিতে গিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে ঊর্ধ্বজগতে ঘটনাটা ঘটেছিলো, সেখানে তো রসূল (স.) উপস্থিত ছিলেন না। স্বয়ং আদম (আ.) ব্যতীত আর কোনো মানুষই তা দেখেনি। তাহলে মোহাম্মদ (স.) সে ঘটনা কিভাবে জানলেন? একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ওহীর মাধ্যমে এটা জানিয়েছেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইবলীস হযরত আদমকে দেয়া অগ্রাধিকার মেনে নেয়নি বলেই মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়েছে। মক্কার কোরায়শরাও ঠিক তেমনিভাবে তাদের আর সবাইকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ (স.)-কে ওহী নাযেলের জন্যে মনোনীত করায় তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের এ ভূমিকা ও আচরণ ইবলীসের আচরণের সাথে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রাখে।

এই চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এর শেষ বক্তব্যে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের জানিয়ে দেন যে,

www.pathagar.com

তিনি যে দাওয়াত দেন তাতে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই, এ জন্যে তিনি পারিশ্রমিক চান না এবং এ দাওয়াত কতো গুরুত্বপূর্ণ তা তারা অচিরেই জানতে পারবে। (আয়াত ৮৬, ৮৭ ও ৮৮)

সূরার আলোচ্য বিষয়গুলো এই চারটি অধ্যায়ে এভাবে আলোচিত হয়েছে। এর ভেতর দিয়ে এক পর্যায়ে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে যারা রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের বড়াই জাহির করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১১, ১২, ১৩ ও ১৪)

আল্লাহর রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরাজয় ও ধ্বংসের বিবরণ সম্বলিত মানবেতিহাসের এই মর্মান্তিক ও দৃষ্টান্তমূলক অধ্যায়টাকে মানুষের চিত্তপটে আরো একবার তুলে ধরা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদের কিভাবে সম্মানিত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং সাহায্য ও করুণায় ভূষিত করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন হযরত দাউদ, সোলায়মান ও আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনীতে।

উক্ত উভয় প্রকারের পরিণতি এই ইহকালীন জগতেই ঘটেছে। এরপর মানুষকে দেখানো হয়েছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামত পরবর্তী বেহেশতের নেয়ামত, সম্পদ, সন্তোষ এবং ভালো ও মন্দ কর্মফল। আখেরাতের অবিনশ্বর জগতের উক্ত কর্মফল হলো তা থেকে ভিন্ন ধরনের।

সর্বশেষ অধ্যায়টাতে মানবজাতির প্রথম প্রজন্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজাতি তার প্রথম শত্রুর পক্ষ থেকে হিংসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এ কাহিনীতে। এই শত্রু চিরদিন তাকে বিপথগামী করে থাকে, অথচ মানুষ সব কিছু জেনেও তার সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

কেসসা কাহিনীর এক পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে নিহিত এক মহাসত্যের প্রতি মানবজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই মহাসত্যটাই নবী রসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে এক মহাসত্য বদ্ধমূল করতে চান। সে সত্যটা এই যে, আমি আকাশ ও পৃথিবী নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এ ধরনের মনোযোগ আকর্ষণী বক্তব্যের বহু দৃষ্টান্ত কোরআনে রয়েছে। মক্কী কোরআনের মৌলিক আকীদাগত বিষয়ের মধ্যে এটা একটা বহুল আলোচিত বিষয়।

সূরা আয যুমার

এই সূরাটা বলতে গেলে পুরোপুরিই তাওহীদের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সমগ্র সূরা জুড়েই বার বার এ বিষয়টিকেই মানুষের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই আলোচ্য বিষয়। যেটুকু বিভিন্নতা, তা কেবল বর্ণনাভংগিতে, বিষয়বস্তুতে নয়।

www.pathagar.com

সূরার শুরু থেকেই এই একই বিষয় গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে! বলা হয়েছে, 'এটা মহাবিজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। আমি তোমার কাছে ন্যায়সংগতভাবেই কিতাবখানা নাযেল করেছি। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাত করো।'

এ ধরনের বক্তব্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, 'তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাত করি.....।' (আয়াত ১১-১৫) অথবা, 'বলো, ওহে অজ্ঞ লোকেরা, তোমরা কি আমাকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করার আদেশ দিচ্ছো?' (আয়াত ৬৪-৬৬) আর পরোক্ষভাবে যেমন 'আল্লাহ তায়ালা এক ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন.....।' (আয়াত ২৯) অথবা, 'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?' ...(আয়াত ৩৬) তাওহীদের বিষয়টা ছাড়াও এ সূরায় আমরা মহান আল্লাহর এমন কিছু বাণীও পাই, যা মানুষের মনমগযে চেতনা ও জাগরণের সঞ্চার করতে চায়, তার উদ্দীপনা ও প্রেরণা বৃদ্ধি করতে চায় এবং ঐশী আদেশ গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তীব্রতর করতে চায়। যেমন (আয়াত ১৭, ১৮, ২৩ ও ৮)। এ সূরার আরো একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আখেরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। পাঠকের বেশীর ভাগ সময় আখেরাতের স্মরণেই কেটে যায়। এ বিষয়টা এ সূরায় বার বার আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টভাবে হোক অথবা আভাসে ইংগিতে হোক, খুব ঘন ঘন কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক জায়গায় কেয়ামত ও আখেরাতের বিশদ বিবরণ এসেছে। তাছাড়া নিম্নের আয়াতগুলোতে সংক্ষিপ্ত বিবরণও লক্ষণীয় (আয়াত ৯, ১৩, ১৯, ২৩, ২৬, ৩২, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮)।

অন্যান্য মক্কী সূরায় প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী করার প্রচেষ্টা নানা ভংগিতে ও বিপুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এ সূরায় তার উপস্থিতি খুবই কম।

সূরার প্রথম দিকে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে (আয়াত ৫০)। অন্যান্য আয়াতে আর একটা দৃশ্য তুলে ধরে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন ইংগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরায় মানবজীবনের বিভিন্ন বাস্তব দিক এবং মনস্তত্ত্বিক বিষয়ের বক্তব্য রাখা হয়েছে।

সূরার শুরুতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে। ৮ নং আয়াতে সুখে দুঃখে মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণানা করা হয়েছে। ৪৯ নং আয়াতেও এ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ৪১ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, নিদ্রিত অথবা জাগ্রত উভয় অবস্থায় মানুষের প্রাণ আল্লাহর মুঠোর মধ্যে থাকে। আখেরাত সংক্রান্ত বক্তব্যও বিস্তৃত রয়েছে সমগ্র সূরা জুড়েই। এমনকি সূরার শেষ আয়তটাতেও কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে; 'তুমি ফেরেশতাদের দেখবে আরশ বেষ্টন করে রেখেছে.....।'

www.pathagar.com

সূরার সামগ্রিক পরিবেশ ও এর বিভিন্ন মর্মস্পর্শী আলোচনার সাথে এ দৃশ্যটার মিল রয়েছে। কেননা সূরার সামগ্রিক পরিবেশটায় আখেরাত সংক্রান্ত ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র সূরায় আমরা এমন সব দৃশ্যের সাক্ষাত পাই যা মানুষের মনকে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত করে। যেমন এক আয়াতে এমন একজন এবাদাতকারীর দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যে, আখেরাতের ভয়ে এবং আল্লাহর রহমতের আশায় দাঁড়িয়ে ও সাজদা করে রাত কাটিয়ে দেয়। আর এক আয়াতে আল্লাহর সেই সব বান্দার দৃশ্য অংকন করা হয়েছে যাদের চামড়া কোরআন শুনে শিউরে ওঠে, আবার তা নরম হয়ে যায় এবং তাদের মন আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হয়। কয়েকটা আয়াতে বিশেষভাবে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, যেমন (আয়াত ১০, ১৩ ও ১৬)। কেয়ামত ও তার ভয়ভীতি এবং বিনয় ও আনুগত্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে।

সূরাটা ছোট ছোট বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং সবগুলো অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাওহীদ ও আখেরাত। প্রায় প্রতিটা অংশই কেয়ামতের কোনো না কোনো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। শীঘ্রই এই অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে দেয়ার চেষ্টা করবো। কেননা এ সূরাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন। এর আয়াতগুলোর প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাকার। সমষ্টির বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ।

সূরা আল মোমেন

এ সূরাটায় প্রধানত হক ও বাতিল, ঈমান ও কুফর, দাওয়াত ও তা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সর্বশেষে পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে একনায়কত্ব ও জবরদস্তি প্রয়োগ এবং একনায়ক ও জবরদস্তি প্রয়োগকারীদের ওপর আল্লাহর শাস্তির বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুগত মোমেনদের ভূমিকা ও তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য, তাদের জন্যে ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দোয়া কবুল করা এবং আখেরাতে তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতি পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ কারণেই সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বলে প্রতীয়মান হয়। এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের যুদ্ধ, ঈমান ও আল্লাহদ্রোহিতার যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারদের সাথে আল্লাহর সেই ভয়াবহ আযাবের যুদ্ধ, যা তাদেরকে পদে পদে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত করে। আর এর মাঝে যখন মোমেনদের প্রসংগ আসে, তখন আল্লাহর করুণা ও সন্তোষের সুবাতাস বয়ে যায়।

সূরার প্রেক্ষাপটে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে। আর এই দুটো বিষয় সূরার আয়াতগুলোতে খুবই লক্ষণীয়ভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলোকে সূরার সঠিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে সূরার প্রেক্ষাপটে

www.pathagar.com

যে কঠোরতা রয়েছে, আলোচ্য বিষয়গুলোতেও তা রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য সূরার উদ্বোধনী অংশেও পরিলক্ষিত হয়। একটা বিশেষ ছন্দময় সুরেলা ঝংকারের সাথে বলা হয়েছে, 'তিনি গুনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদানকারী এবং মহাশক্তিধর....।' (আয়াত ৩)

এ আয়াতের শব্দগুলো যেন হাতুড়ি দিয়ে তাল মিলিয়ে পিটিয়ে ঘন্টা বাজানোর ধ্বনি। এর আঘাতের প্রভাব যেন স্থায়ী। এর প্রত্যেকটা শব্দ যেন স্বতন্ত্র এক। এর প্রত্যেকটা শব্দের অর্থও এর ঝংকৃত সুরের সমর্থক ও শক্তি যোগানদাতা। বা'স, বা'সুল্লাহ ও বা'সুনা (আযাব, আল্লাহর আযাব ও আমার আযাব) শব্দটাকেও বারবার সূরার বিভিন্ন জায়গায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া এর কাছাকাছি অর্থের আরো বহু শব্দ রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, সমগ্র সূরাটা মানুষের মনের ওপর তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করা ও গভীর দাগ কাটার মতো বহু উপাদানে সমৃদ্ধ। অতীতের ধ্বংস হওয়া জাতিগুলোর কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলী এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কোনো কোনো জায়গায় আবার হৃদয়ের ওপর কোমল পরশ বুলানো কথাবার্তাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আরশবহনকারী ও আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের জন্যে দোয়া করা, প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শন ও মানুষের নিজ সত্ত্বার ভেতরে বিরাজমান নিদর্শনাবলীর উল্লেখ ইত্যাদি। নিম্নে সূরার এইসব বিষয় ও পটভূমি নির্দেশকারী কয়েকটা আয়াত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি,

অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী ৫, ২১, ২২, নং আয়াতসমূহ। কেয়ামতের দৃশ্যাবলী, ১৮, ৭০, ৭১ ও ৭২ নং আয়াতসমূহ। আর কোমল পরশ বুলানো আয়াত ৭, ৮, ৯ নং আয়াত লক্ষ্য করুণ। প্রকৃতিতে ও মানবসত্ত্বায় বিরাজিত নিদর্শনাবলীর উল্লেখ, ৬৭, ৬৮, ৬৪, ৬৫, ৬১ নং আয়াত লক্ষ্য করুন।

এসব আয়াত থেকে সূরার সামগ্রিক পটভূমি ও আলোচ্য বিষয় জানা যায়। আর এগুলো দ্বারা এর বিষয়বস্তুর সাথে এর প্রকৃতির সমন্বয় ঘটানো যায়। সূরাটা মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত এবং এর প্রত্যেকটা অংশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী,

প্রথম অংশটায় রয়েছে সূরার উদ্বোধনী পর্ব, যা বর্ণমালার দুটো অক্ষর দ্বারা শুরু হয়েছে। যেমন, 'হা-মীম, এটা মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাব।' (আয়াত ১ ও ২) এরপর রয়েছে সেই অপূর্ব ছন্দময় সুরে ঝংকৃত আয়াত, গুনাহ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী .....।' (আয়াত ৩)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত। মানুষের ভেতর থেকে কিছু কাফের ছাড়া বিশ্বজগতের কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে তর্ক করে না। তর্ককারী এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলো সমগ্র সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই ধন সম্পদের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা যতোই পাল্টে যাক রসূল (স.)-এর কাছে তাদের কোনোই গুরুত্ব নেই। কেননা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই তাদের পরিণাম

www.pathagar.com

হবে শোচনীয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং এমন শাস্তি দিয়েছিলেন, যা অহংকারীদের যথার্থই প্রাপ্য। আর শুধু দুনিয়ার শাস্তিই তো শেষ নয়, তাদের জন্যে আখেরাতের আযাবও অপেক্ষা করছে। ওদিকে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের এবাদাত করে ও দুনিয়াবাসী মোমেনদের মাগফেরাত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দিন কাফেরদের কী শোচনীয় পরিণতি হবে তাও দেখানো হয়েছে। মোমেনদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতোটা ক্ষুব্ধ হচ্ছো, তোমাদেরকে যেদিন ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো, আর তোমরা সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলে, সেদিন আল্লাহর ক্রোধ আরো সাংঘাতিক ছিলো।'

দুনিয়ার জীবনের অহংকার ও গর্ব সেদিন ধুলোয় মিশে যাবে। সেদিন তারা চরম বিনয়ের সাথে নিজেদের সমস্ত পাপের স্বীকারোক্তি করবে এবং তাদের প্রতিপালককে মেনে নেবে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিও মেনে নেয়াতে কোনো লাভ হবে না। আসলে তারা শুধু তাদের পার্থিব জীবনের শেরক দাম্ভিকতা ও যাবতীয় অপকর্মই স্মরণ করবে। আখেরাতে আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থান প্রসংগে দুনিয়ার কথা পুনরায় স্মরণ করানো হবে,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন।'

তিনি এসব নিদর্শন স্মরণ করান এ জন্যে যেন তারা তাদের প্রতিপালকের অনুগত হয় এবং একমাত্র তার এবাদাত করে, 'অতএব আল্লাহর এবাদাত করো একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

এরপর সেই কঠিন দিন সম্পর্কে যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছিলো এবং ওহী পাঠানো হয়েছিলো, তার উল্লেখ করে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য পুনরায় তুলে ধরা হচ্ছে,

'যেদিন তারা আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তাদের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।'

সেদিন বড় বড় দাম্ভিক, একনায়ক ও বিতর্ককারী সবাই উধাও হয়ে যাবে। সেদিন বলা হবে 'আজকের রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।' এরপর এই দিনের আরো কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে, যেদিন আল্লাহ তায়ালাই এককভাবে শাসন ও বিচার পরিচালনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যা কিছুর পূজা উপাসনা করা হতো সেদিন সে সবের আর কোনো পাত্তা থাকবে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যারা অবাধে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো ও জনগণের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতো, তাদেরও আর কোনো খোঁজ থাকবে না।

দ্বিতীয় অংশটা প্রাচীনকালের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা এসেছে ফেরাউন, হামান ও কারূণের সাথে হযরত মূসার ঘটনাবলী বর্ণনার ভূমিকা হিসাবে। সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে ফেরাউনের ভূমিকার বর্ণনা প্রসংগে এখানে এমন একটা ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যা

www.pathagar.com

হযরত মূসার কাহিনীতে ইতিপূর্বে কখনো উল্লেখ করা হয়নি এবং এই সূরায় ছাড়া আর কোথাও তার উল্লেখ নেই। এই ঘটনা হলো, ফেরাউনের অনুসারীদের মধ্য এমন এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ, যিনি এ যাবত তার ঈমান গোপন রেখে আসছিলেন। হযরত মূসাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হতে দেখে এই ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারেননি। তিনি এই হত্যার ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে সচেষ্ট হন। প্রথমদিকে তিনি সত্য ও ঈমানের কথা অত্যন্ত সন্তর্পণে ও বিনীতভাবে প্রকাশ করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি ফেরাউনের সাথে অত্যন্ত জোরালো ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তর্ক করেন। তাকে ও তার দলবলকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্যও তুলে ধরেন এবং তাদের ও তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। এ প্রসংগে তিনি হযরত ইউসুফ ও তার রেসালাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। এভাবে এ কেসসা বর্ণনা করতে করতে ফেরাউনের আখেরাতে কী অবস্থা হবে, তাও ব্যক্ত করেন। সূরার এই পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন।

সূরার তৃতীয় অংশটা শুরু হয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে যে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য থাকে বলেই তারা এটা করে। অথচ তারা এই সত্যের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। এরপর আল্লাহর সৃষ্টি করা এই বিশাল বিশ্বজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির চেয়েও বিরাট ও বিশাল। অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা যদি আল্লাহর সৃষ্টির বিশালত্বের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্রত্বকে অনুধাবন করতো, তাহলে তারা এমন অন্ধ ও গোঁড়া হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চক্ষুস্মান ব্যক্তি ও অন্ধ ব্যক্তি, আর সৎকর্মশীল ব্যক্তি ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি সমান হয় না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'

এই পর্যায়ে মানুষকে কেয়ামতের আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং দোয়া কবুলকারী মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা দাম্ভিকতা দেখায়। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু কিছু প্রাকৃতিক নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যার কাছ দিয়ে তারা উদাসীনভাবে চলাচল করে। রাতকে অবকাশ যাপন ও বিশ্রামের সময় এবং দিনকে আলোকোজ্জ্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবীকে অবস্থানের জায়গা ও আকাশকে ছাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে, আর তাদের নিজেদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি কতো সুন্দর গঠন ও আকৃতি দান করেছেন। অতপর তাদেরকে একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দান করেছেন। রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাদের মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন, তাদের দেব দেবী থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে আল্লাহর

www.pathagar.com

আদেশ জনগণকে অবহিত করেন, তাকে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করার আদেশ প্রচার করেন। জনগণের মনে এই সত্য বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রথমে মাটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। অতপর পুনরায় রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ককারীদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে কেয়ামতের আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সেদিন তাদের ঘাড়ের ওপর বেড়ি ও শেকল পরানো হবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে টেনে নেয়া হবে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।'

যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো তারা সেদিন সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে। এমনকি স্বয়ং মোশরেকেরাও দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো এবং ওখানে চিরদিন অবস্থান করো। দাম্ভিকদের আবাসস্থল কতই না জঘন্য!'

এ দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর রসূলকে পুনরায় ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আস্থা রাখতে বলছেন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, চাই এই প্রতিশ্রুতির কিছু অংশ দুনিয়াতেই কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে থাক অথবা তার আগেই মারা যাক। সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই।

সূরার শেষ ভাগটি তৃতীয় অংশের সাথেই সংযুক্ত। রসূল (স.)-কে ধৈর্যধারণ ও অপেক্ষা করতে আদেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আগে বহু রসূল পাঠিয়েছেন। 'কোনো রসূলই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতে পারে না।' সাধারণভাবে বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র এবং সকলের চোখের সামনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে সবাই উদাসীন। যেমন ধরা যাক, এইসব জীবজন্তু যারা মানুষের ইংগিতে চলে। কে তাদেরকে মানুষের অনুগত করলো? আর এইসব নৌযান, যা মানুষকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। নিদর্শন তারা কি দেখতে পায় না? আর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের বৃত্তান্ত কি তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না? কোনো উপদেশই কি তাদেরকে দেয় না? সূরাটার সমাপ্তি টানা হয়েছে কাফেরদের ধ্বংসের কাহিনী সম্পর্কে একটা জোরদার মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে। তারা আল্লাহর আযাব দেখে ঈমান এনেছিলো। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এই সমাপনী বক্তব্য থেকে দাম্ভিক লোকদের পরিণতি কী হয়, তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

সূরা হা-মীম আস সাজদা

আকীদাসংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্বসমূহ তথা তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও দাওয়াতদাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সূরায় আর যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা উক্ত তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সাক্ষ্য প্রমাণের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় আল্লাহর নিদর্শনাবলী

www.pathagar.com

প্রদর্শন, এইসব নিদর্শনকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি, অতীত প্রজন্মসমূহের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিনে কাফেরদের পরিণতির দৃশ্যাবলী এ সূরার অন্যতম উপাদান। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করে, তারা ছাড়া আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, ও ফেরেশতা ইত্যাদি সমুদয় সৃষ্টি এই সব সত্যকে স্বীকার করে, একমাত্র আল্লাহর সামনে সেজদা করে ও আত্মসমর্পণ করে। তাওহীদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো হলো

'বলো, আমি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। তোমাদের সাথে সাথে আমার পার্থক্য হচ্ছে, আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একজন মাবুদ মাত্র। অতএব, তাঁর ওপর অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর মোশরেকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।'..... 'বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন? আর আ'দ ও সামুদ সম্পর্কে জানান যে, তাদের রসূলরাও তাদেরকে এই একই কথা বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। সূরার মাঝখানে বলা হয়েছে! 'তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের সামনে সেজদা করো না। বরং যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সেজদা করো।' সূরার শেষভাগেও এই একই বিষয়ে বলা হয়েছে; 'যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার শরীকরা কোথায়.....?'

আখেরাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে, 'মোশরেকদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয়না এবং আখেরাতে অবিশ্বাস করে।' শেষ আয়াতে বলা হয়েছে! 'শুনে রাখো, তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। জেনে রাখো, তিনি প্রতিটা জিনিসকে ঘেরাও করে রেখেছেন।' অনুরূপভাবে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্যেও এ বিষয়টার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদ্বারা স্বভাবতই কেয়ামতের দিনে যা যা ঘটবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিটাই এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্যে অধিকতর উপযোগী।

ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে এতো বেশী আলোচনা এসেছে যে, এ বিষয়টাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়। সূরার শুরুতেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেয়া হয়েছে। যথা, হা-মীম-পরম দাতা ও দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ..... (আয়াত ১-৬)

সূরার মাঝখানে রয়েছে মোশরেকরা কোরআনের অভ্যর্থনা কিভাবে করতো তার বিবরণ– 'কাফেররা বললো, তোমরা এই কোরআন শুনো না, বরং এর ভেতরে হৈচৈ করো, হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।' এরপর এই অভ্যর্থনার বিস্তারিত বিবরণ ও এর জবাব রয়েছে। (আয়াত ৪১-৪৪)

আর দাওয়াত ও দাওয়াতকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। (আয়াত ৩৩-৩৬)

এই বিষয়গুলো গভীর আবেগোদ্দীপক বিপুলসংখ্যক আয়াতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বিরাট বিরাট নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগত, বিস্ময়কর গঠন

www.pathagar.com

সম্বলিত মানবীয় মনোজগত, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং সর্বশেষে কেয়ামতের লোমহর্ষক কিছু দৃশ্যের বিবরণের মধ্য দিয়ে এ সূরার আকীদা সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সম্বলিত বিশদ বিবরণটা খুবই উপভোগ্য। এ বিবরণটা ৯নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে ১২নং আয়াতের শেষে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাতদিন ও সূর্য-চন্দ্রের নিদর্শন এবং ফেরেশতাদের এবাদাত, পৃথিবীর বিনীত এবাদাত ও ভূপৃষ্ঠে জীবনের সমারোহের বিবরণও এ সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ৩৭নং থেকে শুরু করে ৩৯নং আয়াতে এই বিবরণ বিস্তৃত। আর মানুষের মনমানসসংক্রান্ত তথ্যাবলী খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৪৯-৫১)

অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের বিবরণ থেকে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে আ'দ ও সামুদের ধ্বংসযজ্ঞ। (আয়াত ১৫-১৮)

এ সূরায় কেয়ামতেরও অনেক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ১৯-২০)

অনুরূপভাবে, দুনিয়াতে যারা প্রতারিত হয়েছিলো, তারা প্রবঞ্চনাকারীদের ওপর যে ক্রোধ প্রকাশ করবে। সে দৃশ্যও এর আওতাভুক্ত। এ দৃশ্যটা রয়েছে ২৯ নং আয়াতে।

এভাবে ইসলামী আকীদা বিষয়ক তত্ত্বগুলো অত্যন্ত আবেগোদ্দীপক ভাষায় এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এদ্বারা সমগ্র সূরার পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রভাব কেমন তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকাশ ও পৃথিবীর সুবিশাল সাম্রাজ্যে, নিজের মনোজগতের গভীর থেকে গভীরতর প্রকোষ্ঠে, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের ইতিবৃত্তে ও কেয়ামতের জগতে বিচরণ করতে থাকে এবং মনের ওপর এসবের গভীর প্রভাব পড়ে।

সূরাটা তার সমস্ত আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য উদ্দীপনাময় উপদেশসমূহ সহ দুটো পর্বে বিভক্ত, যার উভয়টা পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত।

প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছে কোরআন নাযিল হওয়া, তার প্রকৃতি ও তার প্রতি মোশরেকদের ভূমিকা দিয়ে। এর পরপরই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৃত্তান্ত, অতপর আ'দ ও সামুদের কাহিনী, তারপর আল্লাহর শত্রুদের পরকালের দৃশ্য এবং তাদের চামড়া, চোখ ও কান কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের দৃশ্য। এখান থেকে প্রসংগ পাল্টে গিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিভাবে তারা এতো বিপথগামী হলো তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে কিছু অসৎ লোককে তাদের সংগী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংগীরা তাদের সামনের ও পেছনের সব কাজকে সুন্দর ও শোভন করে দেখাতো। এর ফলে তারা পরস্পরকে বলতো যে, 'তোমরা কোরআন শুনোনা, বরং হৈ চৈ করো। তাহলে হয়তো জয় লাভ করতে পারবে।' এরপর এইসব সংগী তাদের সাথে ধোঁকাবাজী করার কারণে তারা কেয়ামতের দিন তাদের ওপর যে ক্রোধ ঝাড়বে, তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে রয়েছে তারা, যারা বলেছে! আমাদের প্রভু আল্লাহ এবং তারপর এই ঘোষণায় অবিচল থেকেছে। এদের ওপর

www.pathagar.com

কোনো খারাপ সংগী নয়, বরং ফেরেশতারা নাযিল হবে। এই ফেরেশতারা তাদেরকে আশ্বাস দেবে, সুসংবাদ দেবে এবং নিজেদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে তার সাথী বলে জানাবে। এর অব্যবহিত পরই রয়েছে দায়ী ও দাওয়াতদাতা সংক্রান্ত আলোচনা এবং এখানেই এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

এরপরই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব। এর শুরুতেই রয়েছে রাত ও দিন। সূর্য ও চন্দ্র, এবাদাতরত ও অনুগত ফেরেশতারা বিনয়াবনত পৃথিবী এবং পৃথিবীতে অজন্মার পর জীবন ও উদ্ভিদের সমারোহ সংক্রান্ত আলোচনা। তারপর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে ও তার কেতাবে বক্রতা অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ে বক্তব্য এসেছে। এই পর্যায়ে কোরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপরই উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসার কেতাব ও তা নিয়ে তার জাতির মতবিরোধের প্রসংগ। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে কেয়ামত সম্পর্কে কথা এসেছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। একমাত্র তিনিই জানেন ফলের ঝুঁড়িতে কত ফল এবং মায়ের পেটে কি সন্তান রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানাতে, তারা কোথায় গেলো। এরপরই এসেছে মানুষের নিজ সত্ত্বা সংক্রান্ত বক্তব্য। বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের এত কল্যাণকামী হয়েও তার ব্যাপারে সতর্ক হয় না, বরং কুফরি করে ও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়, যার ফলে তার জন্য আযাব ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণার মাধ্যমে যে, তিনি মানুষের নিজ সত্ত্বা ও বাইরের প্রকৃতি সংক্রান্ত নিদর্শন তথা এর তথ্য তার কাছে উন্মোচিত করবেন, যাতে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়। (শেষ আয়াত দুটো দেখুন।)

সূরা আশ শূ-রা

এই সূরাটায় অন্যান্য মক্কী সূরার মতো আকীদা ও ঈমান সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ সূরায় ওহী ও রেসালাতের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলতে গেলে এটাই এ সূরার কেন্দ্রীয় ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য বিষয় নিয়ে এখানে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা কেবল ওহী ও রেসালাতের আনুষংগিক বিষয় হিসাবেই করা হয়েছে।

এ ছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরার বিভিন্ন স্থানে কেয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে জোর দেয়া হয়েছে কেয়ামত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের ওপর এবং ঈমান আনয়নকারীদের চমকপ্রদ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সদগুণাবলীকে তুলে ধরা হয়েছে। একপর্যায়ে জীবিকা, জীবিকার স্বল্পতা ও প্রাচুর্য কিভাবে হয় এবং স্বল্পতা ও প্রাচুর্যে মানুষের মতিগতি কি ধরনের হয়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে সব কিছু সত্তেও ওহী ও রেসালাতই সূরার প্রধান

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্য যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা এই ওহী ও রেসালাতের গুরুত্ব বর্ধক হিসাবেই আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সূরায় উক্ত বিষয়টা ও তার অনুষংগ অন্যান্য বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, অধিকতর চিন্তা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যে বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব আয়াতের মাঝখানে স্রষ্টার একত্ব, জীবিকাদাতার একত্ব, মন মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রণকারীর একত্ব একত্ব বিষয়ক আয়াত রয়েছে। তাছাড়া ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আয়াতগুলোতে আনুষংগিকভাবে ওহী প্রেরণকারীর একত্ব, ওহীর একত্ব, ইসলামী আকীদার একত্ব, ইসলামী আইন ও বিধানের একত্ব এবং সর্বশেষে ইসলামী আকীদার আওতাধীন মানবজাতির নেতৃত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এভাবে সূরাটা অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে অন্তরে একত্বের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে, যদিও এই একত্বের মাঝে বিবিধ রকমের ইশারা-ইংগিত ও তাৎপর্য রয়েছে। সূরায় বহু বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। সূরার বিস্তারিত আলোচনার আগে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত উদাহরণ পেশ করছি।

প্রথমে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার প্রসংগে আসা যাক। সূরার শুরুতেই রয়েছে, হা-মীম-আইন-সীন-কাফ'। এর অব্যবহিত পরেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'এভাবেই তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে থাকেন।' এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, সকল যুগের নবীদের কাছে প্রেরিত ওহীর উৎস একটাই 'তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে,' কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এরপর মহান আল্লাহ কেমন মহাপরাক্রমশালী ও কেমন মহাবিজ্ঞানী তা বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে। 'যা কিছু আকাশে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব তাঁরই মালিকানাধীন।' (আয়াত ৪) এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় প্রাণী বা বস্তুর মালিক একজন মাত্র এবং সব কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এরপর বিশ্বজাহানের মালিকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে ও মানবজাতির একাংশের মোশরেক হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র সৃষ্টিজগত কী ভূমিকা পালন করে, তা তুলে ধরা হয়েছে ৫ ও ৬ নং আয়াতে। এখানে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত ঈমান ও শেরেকের ব্যাপারে এতোটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে যে, বিশ্ববাসীর একাংশ মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী না হওয়ায় তারা যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম। অপরদিকে মানবজাতির এই বিকারগ্রস্ত শ্রেণীটার এই জঘন্য কর্মকান্ড ক্ষমা করার জন্যে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন জানান।

এই প্রথম পর্বটা শেষ করার পর ৭ নং আয়াত থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে মূল বিষয়টা অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনা। বলা হয়েছে যে, মানবজাতির

www.pathagar.com

একটা গোষ্ঠী ওহী ও রেসালাতে বিশ্বাস করার কারণে জান্নাতে এবং অপর গোষ্ঠী বিশ্বাস না করায় জাহান্নামে যাবে। এই দুটো গোষ্ঠীর উল্লেখের পর পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তবে সমগ্র মানব জাতিকে একটা জাতিতেই পরিণত করতেন। তবে তিনি নিজের সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর পছন্দসই লোকদেরকে (অর্থাৎ ঈমানদার সৎ লোকদেরকে) তাঁর রহমতের ভেতরে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে অত্যাচারীদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। তারপর বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকলের অভিভাবক, জীবনদাতা, মৃত্যু-সংঘটনকারী ও সর্বশক্তিমান। (আয়াত-৯)

এখানে থেকে পুনরায় মূল বিষয় অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানবজাতি যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়, সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি এই কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ যে কোনো মতভেদ নিরসনের জন্যে কোরআনেরই শরণাপন্ন হতে পারে। (আয়াত-১০)

এরপর ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনিই একক স্রষ্টা, অতুলনীয় সত্ত্বা, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জীবিকা প্রশস্ত বা সংকীর্ণ করার একচেটিয়া ক্ষমতার মালিক এবং সর্ববিষয়ে সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর পুনরায় ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনা এসেছে ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে। এভাবে সমস্ত সূরা জুড়ে ওহী ও রেসালাতের বিষয়টা বারবার ঘুরে ঘুরে অন্যান্য বিষয় দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এসেছে। তাই আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত এই সব বিষয় ওহী ও রেসালাতের অনুষংগ হলেও মনে হয় যেন ওগুলোই মূল আলোচ্য বিষয়। আর আলোচ্য বিষয়ের এই ধারাবিন্যাস বিশেষভাবে সূরার প্রথম অংশে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফূট। কয়েকটা আয়াত পরপরই পাঠক কোনো না কোনোভাবে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক বক্তব্যের সাক্ষাত পায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সূরার বাদ বাকী অংশ। এ অংশের শুরুতে জীবন জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতা, আল্লাহর দয়াক্রমে বৃষ্টি বর্ষণে, প্রাণীসমূহের বিচরণে এবং সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজে ও নৌকায় আল্লাহর যে নিদর্শন রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে মোমেনদের গুণাবলী, যা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে থাকে।

এরপর কেয়ামতের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে অপরাধীরা আযাব দেখে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। (আয়াত ৪৪ ও ৪৫) সেই সাথে মোমেনদের উচ্চ মর্যাদা এবং যালেমদের শাস্তির প্রতি তাদের সমর্থনেরও উল্লেখ রয়েছে ৪৫ নং আয়াতে। আর এই দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সময় থাকতে আত্মশুদ্ধি করে আযাব থেকে আত্মরক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে ৪৭ নং আয়াতে। আবার এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় ৪৮ নং আয়াতে।

www.pathagar.com

এরপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বিষয়েই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে সূরার শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৫২-৫৩) সূরার সমগ্র অবয়ব জুড়ে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনার এই প্রাধান্য থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সূরার বিষয়বস্তুর ধারা বিন্যাস ও বর্ণনাভংগীর সাথে এই উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। এই উদ্দেশ্যটা হলো, শেষ নবী ও তাঁর অনুসারী এই শেষ উম্মাহকে মানব জাতির নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করা। কেননা এই উম্মাহ আল্লাহর সেই বিধান ও শরীয়তের অনুসারী, যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, 'এভাবেই তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী নাযিল করেন মহা প্রতাপশালী ও মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা।' (আয়াত ৩) এ উক্তি থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল নবী ও রসূলের কাছে ওহী পাঠান এবং শেষ নবীর কাছে আগত দ্বীন ও শরীয়ত নতুন কিছু নয়, বরং প্রাচীন কাল থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসা একটা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলা হয়েছে, 'এভাবেই আমি তোমার কাছে আরবী কোরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মক্কা ও তার আশপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করো।' (আয়াত-৭) এভাবে নতুন নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল কী, তা জানিয়ে দেয়া হলো।

৩ নং আয়াতে সকল রেসালাত ও নবুওতের উৎস এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করার পর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই রেসালাত ও নবুওত মূলত এক ও অভিন্ন জিনিস।

তারপর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও রেসালাত ও তার উৎস এক ও অভিন্ন এবং এ নিয়ে ভেদাভেদ করার অবকাশ নেই, তথাপি ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে লংঘন করে ভেদাভেদ করা হয়েছে। আর উক্ত মহান রসূলদের অনুসারীরা এই ভেদাভেদ জেনে ও বুঝে করেছে, হিংসা ও অহংকারের মনোভাব নিয়ে করেছে। এরপর এই ভেদাভেদকারীদের উত্তরাধিকারীদের চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এই বলে যে, 'তারা ঘোরতর সংশয়ে লিপ্ত।'

এই পর্যায়ে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানবজাতি সন্দেহ উচ্ছৃংখলতার যুগে ফিরে গিয়েছিলো এবং নির্ভুল পথে পরিচালিত কোনো নেতৃত্ব তার ছিলো না। কেননা মহান আল্লাহর প্রেরিত রসূলের নেতৃত্বের ব্যাপারে তার অনুসারীরা সংশয়ে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীরাও সংশয়ে লিপ্ত থাকে এবং কোনো সঠিক নেতৃত্ব তাদের মধ্যে ছিলো না।

এ কারণেই সর্বশেষ রসূলকে এই নেতৃত্বের ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে এই বলে, 'অতএব, তুমি দাওয়াত দাও, তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকো এবং বলো, আল্লাহ যে কেতাব নাযিল করেছেন, তাতে আমি ঈমান এনেছি। আর আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করি .....।'

www.pathagar.com

(আয়াত ১৫) আর এ কারণেই এ সূরার দ্বিতীয় অংশে মানবজাতিকে নির্ভুল ও স্থীতিশীল ওহীভিত্তিক আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রদানের স্বাভাবিক যোগ্যতাকে মুসলমানদের অন্যতম জাতীয় ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মূল সূর ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

সূরা আয যোখরুফ

এ সূরা ইসলামী আন্দোলনের এমন একটা অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে যখন তা ছিলো নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, সমস্যা-সংকট এবং প্রশ্ন ও আপত্তির বাণে জর্জরিত। সেই সাথে এটাও দেখানো হয়েছে যে, কোরআন কিভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে, আর এই সব সমস্যার সমাধান দেয়ার মাধ্যমে কিভাবে বা সে মানুষের মন মগয থেকে জাহেলী যুগের বাতিল ধ্যান ধারণাকে দূর করে সেখানে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সব জাহেলী ধ্যান ধারণা, চরিত্র ও মানসিকতা শুধু তৎকালীন আরবের গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে তা আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান থাকে, আছে ও থাকবে।

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকেরা বলতো, মানুষের অধীনস্থ এই সব জীব জন্তুতে আল্লাহর একটা অংশ রয়েছে এবং আমাদের দেব দেবীদেরও একটা অংশ রয়েছে। (সূরা আনয়ামের ১৬৬)

জাহেলী সমাজে পশুদের সম্পর্কে নানারকমের কূসংস্কার প্রচলিত ছিলো। বিকৃত আকীদা বিশ্বাস থেকে এসব কূসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছিলো। এ সব কূসংস্কার অনুসারে কিছু পশুর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং কিছু পশুর গোশ্ত খাওয়া তারা নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো। (সূরা আনয়াম-১৩৮)

আলোচ্য সূরা যোখরুফে এসব বিকৃত আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন করা হয়েছে এবং মানুষকে প্রকৃত ও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে বলা হয়েছে যে, পশুরা সব আল্লাহর সৃষ্টি। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে এগুলোর যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের অনুগত বানিয়েছেন, যাতে তারা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শোকর আদায় করে। এ জন্যে নয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানাবে এবং পশুদের ব্যাপারে এমনসব মনগড়া নিয়ম-বিধি ও প্রথা তৈরী করে নেবে, যা আল্লাহ তায়ালা তৈরী করতে বলেননি। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করলেও-এর ফলশ্রুতিতে যে দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে, তা তারা স্বীকার করে না। এ সত্যটাকে তারা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং মনগড়া ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞেস কর, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, মহা পরাক্রমশালী

www.pathagar.com

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ৯-১৪)

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকরা বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে। যদিও তারা নিজেরা পছন্দ করতো না যে, তাদের কারো মেয়ে হোক, তবুও আল্লাহর জন্যে তারা মেয়ে পছন্দ করতো! আর এই ফেরেশতাদের তারা পূজো করতো ও বলতো, আমরা তো আল্লাহর ইচ্ছামতোই ওদের পূজো করি। আল্লাহর ইচ্ছে না থাকলে আমরা তা করতাম না। অথচ এটা ছিলো নিছক তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত তাদের কূসংস্কার। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা কোথাও মোশরেকদের যুক্তি দিয়েই তাদের দাবী খন্ডন করেছেন। আবার কোথাও সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক যুক্তি দিয়ে তাদের সামাজিক কূপ্রথার অসারতা প্রমাণ করেছেন। (আয়াত ১৫-২২)।

আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা মূর্তি ও গাছ-পালার পূজো করে থাকো, তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা দোজখের কাঠ, আল্লাহ ছাড়া আর যারই উপাসনা করা হোক উপাসকও জাহান্নামের কাঠ, তখন এই সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তারা বিকৃত করে এবং এ নিয়ে তর্ক বাধায়। তারা বলে, ঈসাকেও তো তার জাতি পূজো করে থাকে। তিনিও দোযখে যাবেন নাকি? তারা আরো বলে, মূর্তিগুলো হলো ফেরেশতাদের প্রতীক। আর ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। সুতরাং আমাদের উপাসনা খৃষ্টানদের উপাসনার চেয়ে ভালো। কেননা তারা হযরত ঈসার পূজো করে। হযরত ঈসা তো মানুষ। মানবীয় প্রকৃতির অধিকারী।

এই সূরায় তাদের কূটতর্কের জবাব দেয়া হয়েছে এবং হযরত ঈসার অনুসারীরা ঈসাকে আকাশে তুলে নেয়ার পর যেসব অপকর্ম করেছে, তার দায় দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৫৭-৫৯)

জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থেকেও মোশরেকরা দাবী করতো যে, তারা হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী। এদিক দিয়ে তারা নাকি ইহুদী খৃষ্টানদের চেয়ে উত্তম ধার্মিক।

এ জন্যে এ সূরায় হযরত ইবরাহীমের ধর্মের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, ওটা তো নির্ভেজাল তাওহীদ। সে তাওহীদের বাণী এখনো বহাল রয়েছে। সেই তাওহীদের বাণী নিয়েই রসূল (স.) এসেছেন। কিন্তু তারা সেই বাণী ও রসূল (স.)-কে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, হযরত ইবরাহীমের বংশধরের পক্ষে তা মোটেই শোভনীয় হয়নি। (২৬-৩০)

কোন যুক্তিতে ও কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে রসূলরূপে মনোনীত করেছেন, তা তারা উপলব্ধি করেনি। যে অসার ও নিকৃষ্ট জড়বাদী মূল্যবোধের নিরীখে তারা মানুষের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত, সেই সব মূল্যবোধই তাদেরকে উপলব্ধি করতে দেয়নি।

এ প্রসংগেই আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের সামনে বিচার বিবেচনার আসল মানদন্ড তুলে ধরা হয়েছে এবং তারা যেসব মূল্যবোধে বিশ্বাসী তার অসারতা ব্যক্ত করা হয়েছে। ..... (আয়াত ৩১-৩৫)

www.pathagar.com

এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর একটা অংশ আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশটাতে দেখা যায়, ফেরাউন সেই সব অসার জড়বাদী মূল্যবোধ নিয়ে কেমন গর্বিত ছিলো, অথচ আল্লাহর কাছে ওগুলো ও ফেরাউন কতো তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলো। (আয়াত ৪৬-৫৬)

উল্লেখিত পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার, আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং উল্লেখিত ভ্রান্ত ও অসার মানদন্ড ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সূরাটা আবর্তিত এবং ওগুলোই সূরাটার আলোচ্য বিষয়। সূরাটা তিনটে অংশে বিভক্ত। এবার বিশদ তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

সূরা আদ দোখান

ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে প্রায় মিত্রাক্ষর শব্দসম্বলিত এই মক্কী সূরার তীব্র সূরের ঝংকার, ভয়াবহ দৃশ্য ও তাৎপর্যময় শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে প্রচন্ড ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

সমগ্র সূরা একটা অখন্ড ও এককেন্দ্রিক একক বলে মনে হয়। সেই কেন্দ্রের সাথে এর সব কটা অংশ এক সূত্রে বাঁধা, চাই সে অংশ কেসসা কাহিনী সম্বলিত হোক, কেয়ামতের দৃশ্য সম্বলিত হোক, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাহিনী সম্বলিত হোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত হোক। এগুলো সবই মানুষের হৃদয়ে চেতনা সঞ্চারে কার্যকর ও সহায়ক এবং কোরআন মানুষের অন্তরে ঈমানের যে সতেজ ও প্রাণবন্ত বীজ বপন করে, তাকে সাদরে গ্রহণের জন্যে প্রেরণাদায়ক ও উদ্বুদ্ধকারী।

সূরাটা কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে এবং তাকে সেই কল্যাণময় রজনীতে নাযিল করার বর্ণনা দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে রাতে প্রতিটা প্রজ্ঞাময় আদেশ বিতরণ করা হয় তা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়। অতপর মানুষের কাছে তাদের প্রতিপালককে পরিচিত করা হয়, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু। তারপর তার একত্ব প্রকাশ করে তাকে জীবন ও মৃত্যুর মালিক এবং অতীত ও বর্তমানের সকলের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করা হয়।

এরপর প্রসংগ পরিবর্তন করে আরবদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে,

'বরং তারা সংশয়ে পতিত হয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

আর এর অব্যবহিত পর এই সংশয় ও ছিনিমিনি খেলার জন্যে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে, (আয়াত ১০-১১)

এরপর আযাব দূর করার জন্যে তাদের দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেদিন আযাব এসে পড়বে, সেদিন তা আর দূর হবে না। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই আযাব এখনো আসেনি, এখনো এই আযাব তাদের কাছ থেকে দূরে আছে, কাজেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে তাদের এই সুযোগ কাজে লাগানো

www.pathagar.com

উচিত। কেননা আল্লাহর কাছে ফিরে গেলে আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। (আয়াত ১৬)

আযাব, প্রতিশোধ ও কঠিনতম পাকড়াও এর দৃশ্য সংক্রান্ত ভয়ংকর ঘোষণা প্রদানের পর ফেরাউন ও তার দলবলের ধ্বংসের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেদিন ফেরাউনের কাছে আল্লাহর রসূল এসেছিলো এবং বলেছিলো, আমার কাছে আল্লাহর বান্দাদেরকে সোপর্দ কর, আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, আল্লাহর সাথে বাড়াবাড়ি করো না। তারা তার কথায় কর্ণপাত করলো না। ফলে আল্লাহর রসূল হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এত হাম্বি তাম্বি ও দম্ভোক্তি করার পরও ফেরাউন ও তার দলবল চরম অসহায় অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেলো। (আয়াত ২৫-২৯)

এরপর এই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাদের আখেরাত প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত বক্তব্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই শেষ কথা। আমাদের আর পুনরুজ্জীবিত হতে হবে না। বেশ, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে এসো'। 'তুব্বা' নামক জাতির ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। কেননা আরবরা তাদের চেয়ে ভালো নয় যে, তাদের ন্যায় পরিণতি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

এরপর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও আখেরাতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। (আয়াত ৩৮-৩৯)

একটুপরেই কেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ৪০) এরপর যাক্কুম গাছ ও অন্যান্য আযাবের উপকরণ সহ ভয়াবহ আযাবের দৃশ্য তুলে ধরে চরম বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলা হয়েছে, 'নাও, স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো পরম সম্মানিত ও প্রতাপশালী, এই যে সেই জিনিস, যা নিয়ে তুমি সন্দেহ প্রকাশ করতে।'

এর পাশাপাশিই দেখানো হয়েছে জান্নাতের গভীর উপভোগ্য দৃশ্য। জাহান্নামের আযাব যতো কঠিন, জাহান্নামের নেয়ামত ততোই সুখময়। সূরার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এই তুলনামূলক বিবরণ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরার শুরুর মতো সমাপ্তিও টানা হয়েছে কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে। সেই সাথে একটা প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারীও দেয়া হয়েছে সর্বশেষ আয়াতে, 'অতএব অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষায় আছে।'

সূরাটা শুরু শেষ পর্যন্ত এর দ্রুত ও ক্রমাগত ধ্বনি দ্বারা এবং এর বিভিন্ন দৃশ্য ও রকমারি তাৎপর্যময় বক্তব্য দ্বারা থেকে মানুষের মনের ওপর ক্রমাগত ও প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকে। তাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বিভিন্ন জগত, দুনিয়া আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, অতীত ও বর্তমান, দৃশ্য ও অদৃশ্য অংগন, জীবন ও মরণ এবং সৃষ্টির বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানায়। এককথায় বলা যায়, সূরাটা অপেক্ষাকৃত ছোটো হলেও এতে রয়েছে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের এক বিরাট তথ্যভান্ডার।

www.pathagar.com

সূরা আল জাছিয়া

এই মক্কী সূরাটা ইসলামী আন্দোলনের সাথে মোশরেকদের আচরণ, ইসলামী দাওয়াতের যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর মোকাবেলায় তাদের কর্মপন্থা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা এবং প্রবৃত্তির সর্বাত্মক অনুকরণে তাদের সংকোচহীনতা ও লজ্জাহীনতার একটা দিক তুলে ধরেছে। সেই সাথে এটাও তুলে ধরেছে যে, কোরআন কিভাবে তাদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমিতে পরিপূর্ণ মনের চিকিৎসা করে। কোরআন তাদের এসব জটিল ব্যাধিকে তার গভীর প্রভাবশালী, সুতীক্ষ্ম আয়াতগুলোর সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলে, তাদেরকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদানের বিবরণ দেয় এবং তাঁর নিয়ম নীতি ও বিশ্বজগতে কার্যকর তার প্রাকৃতিক বিধান তাকে অবহিত করে।

যারা মক্কায় বসে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো এই সূরার আয়াতগুলোতে তাদের বিবরণ পড়তে গিয়ে আমরা তাদের মধ্য থেকে এমন একটা গোষ্ঠীকে দেখতে পাই, যারা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকতে বদ্ধপরিকর, যারা সত্যের বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসী ও হঠকারী মানসিকতায় আক্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীর প্রতি চরম বেয়াদব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত এবং তার মোকাবেলায় তারা এমন কর্মকান্ডের আশ্রয় নেয়, যা তাদেরকে কঠিন আযাবের হুমকির যোগ্য বানায়। ৭ থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

আরো একটা মানবগোষ্ঠীর পরিচয় পাই, যারা খুব সম্ভবত আহলে কেতাবের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধ্যান ধারণা ও কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। নির্ভেজাল ঈমানদার ও সৎ মানুষের কোনো মূল্যই তাদের কাছে নেই। তারা নিজেরা অত্যন্ত অসৎ কর্মশীল হওয়ায় তাদের সাথে সৎ কর্মশীল মোমেনদের মৌলিক পার্থক্য কী, তা তারা অনুধাবন করে না। কোরআন তাদের জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর মানদন্ডে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এ কারণে তাদের কুচিন্তা ও কুসিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে এবং সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহর মানদন্ডে ন্যায়বিচারই যে সৃষ্টির মূল ভিত্তি সে কথা জানিয়ে দিয়েছে। (আয়াত ২১-২২)

আরো একটা মানবগোষ্ঠী আমরা দেখতে পাই, যাদের একমাত্র মনিব হলো তাদের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে তারা উপাস্য মেনে বসে আছে এবং এর নির্দেশ শীরোধার্য করে চোখ বুঁজে তারা তার আনুগত্য করে। এ গোষ্ঠীটার পরিচয় দেয়া হয়েছে ২৩ নং আয়াতে। এই গোষ্ঠী আখেরাতকে অস্বীকার করে, পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশকে অবিশ্বাস করে এবং তার জন্যে এমন প্রমাণ চায় যা এই পৃথিবীতে দেয়ার কোনো উপায় নেই। কোরআন এই গোষ্ঠীকে আখেরাতের সত্যতার যেসব অখন্ডনীয় যুক্তি প্রমাণ রয়েছে, তার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানায়। অথচ তারা এ আহ্বানকে উপেক্ষা করে। (আয়াত ২৪-২৬)

www.pathagar.com

এই সব কটা গোষ্ঠীকে একই গোষ্ঠীরূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার মক্কায় যারা ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা করতো, তারা একাধিক গোষ্ঠীও হতে পারে। এদের মধ্যে একশ্রেণীর আহলে কেতাবও ছিলো, যাদের সংখ্যা মক্কায় খুবই কম ছিলো। এমনও হতে পারে যে, মক্কাবাসীর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এই গোষ্ঠীটার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তারা মক্কায় বাস করতো না এবং বাস করা জরুরীও নয়।

যাই হোক, কোরআন এই শ্রেণীর মানুষগুলোর এসব অসদগুণ ও অসৎ কর্মের কঠোর সমালোচনা করেছে, এই সূরায় তাদের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছে, প্রকৃতিতে ও তাদের সত্ত্বায় বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তাদের মোকাবেলা করেছে, কেয়ামতের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে অতীতে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে অতি সহজেই এসব সামগ্রী খুঁজে পাওয়া যায়। (আয়াত ৩ -৬)

আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (১২ ও ১৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা ও পরিণতির উল্লেখ করেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (আয়াত ২৭-৩৬)

অনুরূপভাবে ১৫ নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ইসলামের কঠোর কর্মফল নীতি ও জবাবদিহিতার নীতি। যারা অন্যায় ও অসৎ কর্মে নিমজ্জিত থেকেও মনে করে যে, তারা আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীলদের মতোই বিবেচিত হবে, তাদের জবাব দেয়া হয়েছে ২১ ও ২২ নং আয়াতে।

যদিও সমগ্র সূরা তার বিষয়বস্তুর বিচারে একটা একক ও অখন্ড সূরা, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে একে আমরা দুটো পর্বে ভাগ করেছি,

হা-মীম এই দুটো বর্ণ দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 'মহা পরাক্রমশালী মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কেতাব।' আর সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা। তার সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উল্লেখ, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে। আর এসব ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতগুলো সম্পর্কে উদাসীন, অহংকারী ও বিদ্রূপকারী তাদের মোকাবেলায়। 'অতএব আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা .....।' (আয়াত ৩৬ ও ৩৭)

সূরাটা তার বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় পেশ করে। এদিক দিয়ে এ সূরা সূরা দোখানের বিপরীত। কেননা সূরা দোখানে মানুষের হৃদয়ের ওপর হাতুড়ি পেটানো হয়েছে। হৃদয়ের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। কোরআন নাযিলকারীও আল্লাহ তায়ালা। পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে তিনি কখনো হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আঘাত করেন, কখনো মৃদু মৃদু ও কোমল পরশ বুলান। কখনো শান্ত ও বিনম্র ভাষায় কথা বলেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, গভীর তত্ত্বজ্ঞানী, মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

সূরা আল আহকাফ

হিজরতের আগে অবতীর্ণ এই সূরাটিতে সামগ্রিকভাবে ঈমান ও আকীদার বিষয় আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, এই সমগ্র সৃষ্টি জগতে যতো জীব ও জড় বিদ্যমান তাদের সকলের তিনি একমাত্র সর্বময় কর্তা, মালিক ও প্রভু প্রতিপালক, ওহী ও রেসালাত সত্য, হযরত মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল, তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়েছেন। হযরত মোহাম্মদের ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে তার পূর্ববর্তী কেতাবগুলোকে সত্য প্রতিপন্নকারী হিসাবে। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া ভালো মন্দ কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তি অনিবার্য– এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপনের আহবানই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

এই প্রাথমিক আকীদা বিশ্বাসের ওপরই ইসলাম তার সমগ্র ইমারতের ভিত্তি গড়ে তোলে। এ কারণেই কোরআন তার প্রত্যেকটা মক্কী সূরায় এ বিষয়টাকে মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। এমনকি মুসলিম জাতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মাদানী সূরাগুলোতে যখনই সে জীবন যাপনের কোনো বিধিবিধান বা নির্দেশ জারী করতে চেয়েছে, তখনও সে এই ঈমান ও আকীদা বিষয়ক মূলনীতিসমূহের ওপর নির্ভর করেছে। কেননা এই দ্বীনের প্রকৃতিই এরূপ যে, তা আল্লাহর একত্ব, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে তার যাবতীয় নিয়ম বিধি আইন কানুনের ভিত্তি ও তার সফল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস গণ্য করে। আর এই ঈমানের শাশ্বত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই ইসলামের সকল আইন কানুন, রীতিনীতি ও বিধিবিধান চিরঞ্জীব, চিরউদ্দীপ্ত ও চির উষ্ণ থাকে।

সূরা আল আহকাফ তার এই ঈমান বিষয়ক বক্তব্যকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছে এবং সর্বপ্রকারের জাগতিক, মানসিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনে তাকে তুলে ধরেছে। এমনকি এই ঈমান ও আকীদার বিষয়কে এ সূরা শুধু মানবজাতির নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবস্তু রূপে গণ্য করে। এ কারণেই সে কোরআনের সাথে জ্বিনদের সংশ্লিষ্টতার ঘটনার একটা দিকও বর্ণনা করে, যেমন বর্ণনা করে কোরআনের প্রতি বনী ইসরাঈলের কারো কারো আকৃষ্ট হওয়ার প্রসংগটিও। একইভাবে এ সূরায় সত্যের নীরব সাক্ষী প্রাকৃতিক জগতের সাক্ষ্য এবং বনী ইসরাঈলের এক (তাওরাত অভিজ্ঞ) ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে এই সূরা মানব হৃদয়কে আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল দিগন্তে ও পরকালের কেয়ামত নামক প্রান্তরে বিচরণ করায়। অনুরূপভাবে এটি তাদেরকে হুদ সম্প্রদায় এবং মক্কার চারপাশের বিধ্বস্ত জনপদগুলোর ধ্বংসলীলাও পরিদর্শন করায়। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীকে সে কোরআনের মতোই একটা সত্যভাষী গ্রন্থ রূপে উপস্থাপন করে।

www.pathagar.com

সূরাটি এমন চারটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রতিটি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পুরো সূরাটা চারটা অংশে বিভক্ত হলেও মূলত একটা একক ও একীভূত সূরা। প্রথম পর্বের সাথে সাথেই সূরার সূচনা হয়েছে। পূর্ববর্তী ছ'টা সূরার মতোই এটিও আরবী বর্ণমালার অক্ষর 'হা মীম' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আর এ দুটো অক্ষরের অব্যবহিত পরই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নাযিল হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এই কেতাব নাযিল হয়েছে মহাবিজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে।' এর পরপরই মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত। 'আমি আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের মাঝে বিরাজমান সব কিছুকে কেবল সত্যের ভিত্তিতে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং পঠিত কোরআনরূপী গ্রন্থ ও দৃশ্যমান জগতরূপী গ্রন্থ উভয়েই সত্যানুগ ও সুপরিকল্পিত হওয়ার দিক দিয়ে সমান। আল্লাহ তায়ালা এর পরই বলছেন, 'আর কাফেরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই।'

এই সর্বাত্মক ও শক্তিশালী ভূমিকা দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। শুরুতেই বলেছেন যে, তৎকালীন জাহেলী সমাজের মানুষ যে শেরেকের অনুসারী ছিলো, তা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, অপরদিকে তেমনি তার পেছনে কোন সঠিক তথ্য ও বিশ্বস্ত সনদও ছিলো না, 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যেসব জিনিসের উপাসনা করে থাকো, সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীর কী কী জিনিস সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো দেখি! না কি আকাশে তাদের কোনো অংশদারিত্ব আছে?' সেই সাথে যারা নিজেদের উপাসকদের ফরিয়াদ শুনতেই পায় না, তাদের পূজারীদের ঘোরতর নির্বুদ্ধিতারও নিন্দা করা হয়েছে। সেসব অপদার্থ উপাস্যরা কেয়ামতের সেই সেই বিপদের দিনে তাদের কৃত উপাসনাকেই প্রত্যাখ্যান করবে!

এরপর হযরত মোহাম্মদ (স.) তাদের কাছে যে সত্যের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তার সাথে তাদের অন্যায় ও অশোভন আচরণের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'তারা তাকে প্রকাশ্য জাদু তো বলেছেই উপরন্ত তাকে মোহাম্মদ (স.)-এর মনগড়া বাণী বলেও অপবাদ দিয়েছে। এই পর্যায়ে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন এর এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন, তার নবুওত, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সার্বিক আল্লাহনির্ভরতার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন এবং এসব বিদ্বান আহলে কেতাবের সাক্ষ্য দেয়ার পরও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে যেন তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেন। (আয়াত ৮, ৯, ১০)

এরপর এই অব্যাহত প্রত্যাখ্যানের পক্ষে তারা যেসব খোঁড়া ওজুহাত পেশ করে থাকে, পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তার স্বরূপ উন্মোচন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এখানে তাদের এই গোয়ার্তুমির আসল কারণ তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে পূর্ববর্তী কেতাব তাওরাতের প্রতি কোরআনের সমর্থন এবং এ কেতাবের প্রকৃত ভূমিকা ও লক্ষ্য কি

www.pathagar.com

সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে যারা ঈমান এনেছে ও ঈমানের ওপর অবিচল থেকেছে, তাদের শুভ পরিণামের বিবরণ দিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে। (আয়াত ১১, ১২, ১২ ও ১৪)

দ্বিতীয় পর্বে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির দুটো নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, একটা সুস্থ অপরটা বিকৃত। আকিদা বিষয়ক বিতর্কের ক্ষেত্রে এই দুটো নমুনাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। উভয় নমুনার বিবরণ দেয়া শুরু করা হয়েছে উভয়ের প্রথম উন্মেষকাল তথা মা বাবার কোলে অবস্থান করে তখন থেকেই। তারপর তাদের বয়োপ্রাপ্তি ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম নমুনার মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে সচেতন, মা বাবার প্রতি সদাচারী, কৃতজ্ঞ, তাওবাকারী ও আত্মসমর্পণকারী। (আয়াত ১৫)

এই শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের সর্বোত্তম কাজগুলো আমি গ্রহণ করি। (আয়াত ১৬) অপর নমুনাটা হলো মা ও বাবার অবাধ্য হওয়া। সে আল্লাহরও অবাধ্য এবং সে আখেরাতকেও অস্বীকার করে। এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি তার মা ও বাবা বিরক্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই শ্রেণীটা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, এরাই হচ্ছে সেইসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর উক্তি সত্য প্রমাণিত হয়েছে..... তারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই শ্রেণীর লোকদের ভয়াবহ পরিণতি সম্বলিত একটা ত্বরিত দৃশ্য দেখিয়ে এই পর্বটার ইতি টানা হয়েছে। সে দৃশ্যটা হলো, 'যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে হাযির করা হবে। বলা হবে, তোমরা তো তোমাদের সমস্ত উত্তম উপকরণগুলো পার্থিব জীবনেই শেষ ও উপভোগ করে এসেছো। তাই আজ তো তোমরা শুধু অপমানজনক আযাবই ভোগ করবে....। (আয়াত ২০)

তৃতীয় পর্বে আ'দ জাতির ধ্বংসলীলা দেখানো হয়েছে। তাদের সতর্ককারী নবীকে প্রত্যাখ্যান করেই তাদেরকে ধ্বংস হতে হয়েছিলো। এই কাহিনীর কেবল একটা অংশই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে পানিবিহীন বাতাস ও মেঘ ভেসে আসছিলো। তারা তা থেকে জীবন ও বৃষ্টির প্রত্যাশা করছিলো। অথচ তা তাদের কাছে নিয়ে এসেছিলো সর্বাত্মক ধ্বংস ও তাদের ঈপ্সিত আযাব। (আয়াত ২৪, ২৫)

এই ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা আরবের কাফেরদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আ'দ জাতি এদের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী ও বিত্তশালী ছিলো, তথাপি তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি। (আয়াত ২৬)

পর্বের শেষ ভাগে মক্কার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের তথাকথিত দেবদেবীর তাদের সাহায্যে অক্ষম হওয়া এবং তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এ দ্বারা আরবের বর্তমান মোশরেকরা সচেতন হবে ও হেদায়াত লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ পর্বে রয়েছে একদল জ্বিনের কোরআনের সংস্পর্শে আসার কাহিনী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোরআন শুনতে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে কোরআন শুনে এতোই অভিভূত হলো যে, কোরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকলো না। তারা বলতে বাধ্য হলো যে, 'এ কোরআন পূর্ববর্তী কেতাবকে সত্য বলে, সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে .....।' এরপর তারা স্বজাতির লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও সতর্ক করে ও ঈমানের দাওয়াত দেয়। তারা বলে, হে আমাদের জনগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার কথা শোনো ও তার প্রতি ঈমান আনো। ..... (আয়াত ৩১, ৩২)

এই জ্বিন দলটি তাদের স্বজাতির লোকদের কাছে গিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছে, তা ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ৩৩ নং আয়াতে প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা প্রথম সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টি উভয় কাজেই আল্লাহর ক্ষমতা ব্যক্ত করে। এই পর্যায়ে কাফেরদেরকে দোযখের সামনে উপস্থাপনের দৃশ্যটা দেখিয়ে মক্কার কাফেরদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তখন দোযখ সামনে দেখে তারা স্বীকার করবে যে, দোযখ সত্য। অথচ দুনিয়ায় থাকাকালে তারা তা স্বীকার করতো না, কিন্তু সেদিন স্বীকার করায় কোনো লাভ হবে না।

সূরার শেষ আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন ধৈর্যধারণ করেন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো না করেন। কারণ তাদের তো একটা ক্ষুদ্র মেয়াদ পর্যন্তই অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ মেয়াদটুকু শেষ হওয়া মাত্রই তারা আযাব ও ধ্বংসের শিকার হবে। বলা হয়েছে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও সাহসী নবীরা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছে, তুমিও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করো।' (আয়াত ৩৫)

সূরা ক্বাফ

রসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত এই সূরা দিয়ে ঈদ ও জুময়ার জামায়াতে ভাষণ দিতেন এবং তাতে শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো।

আসলে এটি একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ভীতিপ্রদ বিবরণ সম্বলিত সূরা। আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সকল সৃষ্টিকে প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং সেই পর্যবেক্ষণ যে তার ওপর তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত, তার পর থেকে কেয়ামতের ময়দানে জমায়েত হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর থেকে হিসাব গ্রহণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সে কথা এই সূরায় সুন্দর করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি একটি নিদারুণ ভীতিপ্রদ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যা মানুষ নামক এই দুর্বল সৃষ্টির ওপর পরিপূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে ও থাকবে। মানুষ এমন এক সত্তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে, যিনি তার সম্পর্কে কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন হন না এবং একটুও দূরে সরেন না। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে তিনি গুনে রাখেন। তার মনের প্রতিটি চিন্তা তার জানা। তার প্রতিটি উচ্চারণ তাঁর কাছে লিখিত এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপ ও নড়াচড়ার হিসাব তাঁর কাছে সংরক্ষিত। এই সর্বাত্মক ও ভয়ংকর

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণের আওতাধীন রয়েছে তার অন্তরের প্রতিটি ভাবনা এবং তার অংগ-প্রত্যংগের প্রতিটি তৎপরতা। প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কাজের ওপর এই সর্বাত্মক প্রহরা কার্যকর রয়েছে।

আল্লাহর এই সর্বাত্মক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সর্বজন বিদিত। কিন্তু এই সূরায় তা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা নতুন কিছু, যেন তা শরীরে রোমাঞ্চ তোলে, স্নায়ুতে শিহরণ জাগায় এবং উদাসীন মানুষকে সচকিত করে তোলে। আর এ সব কিছুই করা হয় জীবন, মৃত্যু, পরকাল ও কেয়ামতের কথা স্মৃতিতে জাগরূক করার মাধ্যমে এবং আকাশ, পৃথিবী, পানি, উদ্ভিদ, ফল ও ফসলের দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে।

এ ধরনের সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা খুবই কঠিন। তবু আমি আমার সাধ্যমতো কিছু পেশ করলাম।

সূরা আয যারিয়াত

এই সূরাটির একটি বিশেষ আবহ ও পরিবেশ রয়েছে। এর শুরুতেই আল্লাহর সৃষ্টিজগতের চারটি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে কিছুটা রহস্যময় ভাষায়। সূচনাতেই এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে কতকগুলো রহস্যময় জিনিসের সম্মুখীন। প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয়ে কসম খেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কসম ধুলিঝঞ্ঝার .... তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, আর কর্মফল প্রদানের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন হবে।'

প্রথম দফায় যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে 'যারিয়াত', 'হামেলাত', 'জারিয়াত' ও 'মোকাসসেমাত'। এ শব্দ কয়টির অর্থ তেমন সুপরিচিত নয়। ফলে এর অর্থ জানার জন্যে প্রশ্ন ও উত্তরের প্রয়োজন পড়ে। উপরন্তু এ শব্দ কয়টি মানুষের অনুভূতিতে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই বোধ হয় সূরার প্রথম উদ্দেশ্য।

এরপর দ্বিতীয় দফা কসম খাওয়া হয়েছে এভাবে, 'কসম বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের। নিশ্চয় যে বিষয়ে তোমরা নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকো।' অর্থাৎ যে সব বক্তব্যের মধ্যে কোনো সমন্বয় ও সামঞ্জস্য নেই, যা কোনো জ্ঞানভিত্তিক নয়, বরং অনুমান ভিত্তিক।

সূরা এভাবে শুরু হওয়া এবং গোটা সূরা জুড়ে একই ধরনের বক্তব্যের প্রাধান্য পাওয়া সত্ত্বেও এর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে আল্লাহ ও তাঁর অদৃশ্য জগতের সাথে যুক্ত করা, তাকে যাবতীয় পার্থিব মলিনতা থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথের সকল বাধা থেকে তাকে মুক্ত করা। এ উদ্দেশ্যের সাথে সূরার দুটি আয়াতের বক্তব্যের মিল রয়েছে। যথা, 'তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো' এবং 'আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্যে সৃষ্টি করেছি।' প্রথমটিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যেহেতু জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত থাকা ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজই আল্লাহর ইবাদতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, তাই এই সূরায় মানুষের অনুভূতিতে জীবিকার হাতে যিম্মী হওয়া থেকে মুক্ত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং মানুষের এবং এ ব্যাপারে মনকে পৃথিবী ও পার্থিব উপকরণাদির ওপর নয় বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে এই সূরায় একাধিক জায়গায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে যথা 'আকাশেই তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস রয়েছে।' 'আল্লাহই জীবিকাদাতা এবং অটুট শক্তির অধিকারী।' আবার কোথাও আভাস-ইংগিতে, যথা, 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য রয়েছে।' এবং হযরত ইবরাহীমের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার বিবরণ দানের মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মন-মগযকে জীবিকার গোলামী, বাঁধা ও বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল করা ও তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণের শিক্ষা। অন্য সকল আলোচিত বিষয় ও ঘটনাবলী এই মূল বিষয় থেকেই উদ্ভূত। এ জন্যেই সূরাটি এভাবে কসমের মাধ্যমে ও অস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং তারপর আকাশের নামে শপথ ও বারবার আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথম দিকে পরহেযগার লোকদের যে ছবি আঁকা হয়েছে, যথা–'নিশ্চয় পরহেযগার লোকেরা বাগানসমূহে ও ঝর্নাসমূহে অবস্থান করবে। .... তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।' এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা, রাত জেগে তাঁর এবাদাত, শেষ রাতে তাঁর দরবারে ধরণা দেয়া, সেই সাথে সম্পদের লালসা ও প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য দেয়াকে পরহেযগারদের বৈশিষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর এ প্রসংগেই মোমেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পৃথিবীতে ও তাদের নিজ সত্তায় আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী বিরাজ করছে তার দিকে মনোযোগ দিতে, আর সেই সাথে জীবিকা অর্জনের পার্থিব উপকরণগুলোর পরিবর্তে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্যে বহু নির্দশন রয়েছে..... তবু কি তোমরা তা দেখতে পাওনা? আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং যা যা তোমাদেরকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়।'

এই প্রসংগে আকাশকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা, পৃথিবীকে বিস্তৃত করা, পৃথিবীতে জোড়ায় জোড়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করা এবং এ সবের ওপর আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আকাশকে আমি নির্মাণ করেছি এবং আমি প্রশস্তকারী .....।' অতএব আল্লাহর কাছে আশ্রয় নাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

সর্বশেষে সূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তার উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, 'আমি আমার এবাদাত ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি।' .... নিশ্চয় আল্লাহই জীবিকাদাতা, শক্তিশালী ও চিরঞ্জীব।'

এভাবে সূরাটিতে বিভিন্ন সুরে ও বিভিন্ন ভংগিতে একটা বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে। তাহলো, মানুষ যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়।

এ সূরায় অতি সংক্ষেপে হযরত ইবরাহীম, লূত, মূসা, আদ জাতি, সামুদ জাতি ও নূহ (আ.)-এর সমকালীন মানবজাতির ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের ঘটনার প্রতি ইংগিত দিতে গিয়ে সম্পদ ব্যয় করে আতিথেয়তা, তাকে একটি জ্ঞানী পুত্র দানের সুসংবাদ প্রদান এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তান দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর বাদবাকী ঘটনাগুলোতে আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের বিবরণ দেয়া হয়েছে যা তিনি সূরার শুরুতে কসম খেয়ে দিয়েছেন। যথা 'তোমাদেরকে যা যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য।' আর সূরার শেষে মোশরেকদেরকে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাও সত্যে পরিণত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই হুমকি হলো, 'যালেমদের জন্যে তাদের সমমনাদের মতোই শাস্তি প্রাপ্য রয়েছে....' আর এর কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের বংশধরেরা যেন আবহমান কাল ধরে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে। বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রসূল এসেছে, অমনি তাকে জাদু-করে অথবা পাগল বলে অভিহিত করেছে! তবে কি তারা পরস্পরকে এ কথা বলার জন্যেই উদ্বুদ্ধ করে আসছে? আসলে তারা একটা গোমরাহ জাতি।'

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, এ সূরার কিস্সা কাহিনী তার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথেই সংযুক্ত। সেই মূল বিষয়টি হলো আল্লাহর এবাদাতের জন্যে মনকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা, তাকে ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অটুট বন্ধন দ্বারা আল্লাহর সাথে যুক্ত করা এবং সর্বশেষে সকল বাধাবিপত্তি ও ব্যস্ততাকে অতিক্রম করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া।

সূরা আত তূর

আলোচ্য সূরাটি মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং পড়ার সময় পাঠকের অন্তর থেকে যাবতীয় পেরেশানী, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নানাভাবে আগত যেসব ভুল চিন্তা ও চেতনা, যা তার অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে–দূর হয়ে যায়, আর যেসব ওযর-অজুহাত দিয়ে এই মিথ্যার মায়াজাল তাকে অভিভূত করে রেখেছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে সরিয়ে রেখেছিলো তা খান খান হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূরাটি এতো গভীরভাবে অন্তরকে প্রভাবিত করে যে, কোনো পাঠকই এ প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না, যার ফলে আল্লাহর কাছে সে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর হুকুম মানতে সে বাধ্য হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সূরাটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো এবং হৃদয়ে গেঁথে যাওয়ার মতো বিভিন্ন আলোচ্য-বিষয় রয়েছে, এ উভয়ের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে এ বশীভূত করার ক্ষমতা। উপরন্তু এতে রয়েছে অর্থ ও শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ব্যাপকতা। আরও রয়েছে এর মধ্যে ছবির মতো আঁকা বিবরণসমূহ। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে সূরাটির মধ্যে এতো সুন্দরভাবে যে, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো যেন সুরের এক মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনা পরম্পরা তাই পাঠকের হৃদয়কে দারুণভাবে অভিভূত করে। সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো যেন তীরবেগে পাঠকের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, ঘটনাবলী যেন বজ্রপাতের মতো এবং চিত্রের মতো আপতিত হয়, আঁকা কথাগুলো যেন অনুভূতির দুয়ারে এমনভাবে কষাঘাত করতে থাকে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মুহূর্তও যেন তা থামতে চায় না।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যমীন ও আসমানের বিভিন্ন পবিত্র বিষয় ও জিনিসের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করার সাথে সূরাটি শুরু করছেন। সে বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের সুপরিচিত যা খোলাখুলি বাহ্যিক চোখে দেখা যায় এবং কোনো কোনোটি থাকে চোখের আড়ালে এবং মানব সাধারণের কাছে অপরিচিত ও বুদ্ধিরও অগম্য। এরশাদ হচ্ছে,

'কসম তূর পর্বতের এবং লিপিবদ্ধ কিতাবের, যা লিখিত হয়েছে সপ্রশস্ত কিতাবে। কসম বায়তুল মা'মুর-এর সমুন্নত ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের।'

এখানে অতি ভয়ানক কিছু বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে, যা অনুভূতিকে প্রবলভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে। সূরাটির ব্যাখ্যার মধ্যে 'ভয়' কথাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর যেসব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তাতে দারুণভাবে হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার মালিকের আযাব সংঘটিত হবে, কোনো কিছুই তাকে রোধ করতে পারবে না। সে দিন আকাশ ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে এবং পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত....।'

এ ভয়ংকর দৃশ্যের মধ্যে আমরা প্রবল কম্পনের একটা দৃশ্য দেখতে পাব এবং তার ভয়ানক আওয়াযও শুনতে পাবো। চতুর্দিকে দেখা যাবে শুধু ধ্বংস-বিপর্যয়, প্রচন্ড ধাক্কা ও সব কিছু ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর দৃশ্য। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং চরম ধ্বংস নেমে আসবে সেদিন সেইসব মিথ্যারোপকারীদের জন্যে, যারা হেলায় খেলায় নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলে। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এ-ই হচ্ছে সেই অগ্নিকুন্ড, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে .....তোমাদের তো সেই সকল কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে থেকেছো।'(আয়াত, ১১-১৬)

www.pathagar.com

পাপীদের প্রতি উপর্যুপরি যে আক্রমণ হবে তার শেষ পরিণতি হবে এই দোযখ। অবশ্য অন্য আরও অনেকভাবে কঠিন পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমান থাকবে। অতি কঠিন ও ভয়ানক এ পরিণামের দিকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হবে তাদের বল্গাহারা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেপরোওয়া হয়ে যাওয়া। যখন দুনিয়াতে তারা নিরাপত্তা লাভ করেছে ও নানাপ্রকার বিলাসিতার উপকরণ লাভে ধন্য হয়েছে, তখনই কুপ্রবৃত্তির তাড়নে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কেয়ামতের সে ভয়াবহ দিনে তারা আশাভরা চাহনি নিয়ে তাকাতে থাকবে

নিরাপদ অবস্থানে থেকে নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাহদের দিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নানা বর্ণের নানা প্রকৃতির ভোগ-বিলাসের অফুরন্ত উপকরণ ও সম্মানপ্রাপ্তি দেখে, আযাবে পতিত সে হতভাগারা লালায়িত হবে, সেসব নেয়ামতের প্রাচুর্য দেখে তাদের অনুভূতি ছটফট করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহভীরু লোকেরা বাগ-বাগিচায় ভরা বেহেশতে এবং স্বয়ং আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের মধ্যে মাতোয়ারা হয়ে থাকবে .....সারিবদ্ধ খাট-পালং-এ হেলান দিয়ে তারা আরামের সাথে উপবিষ্ট থাকবে।' (আয়াত, ১৭-২০)

আল্লাহ তায়ালা আরও জানাচ্ছেন, 'আমি আয়ত-লোচনা সুন্দরী রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো। আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যে সকল সন্তান-সন্ততি তাদের অনুসরণ করেছে, তাদেরকে ওদের সাথে মিলিত করে দেবো..... বেহেশতীরা এই বলে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাবে, 'আমরা তো এর পূর্বেও এমনি করে পরস্পরের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল ছিলাম, তাই না? এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি এই দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুনের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। অবশ্যই আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছি, নিশ্চয়ই তিনি অতি মহান ও নেক কাজের প্রতিদান দেন এবং তিনি অতি মেহেরবান।' (আয়াত, ২০-২৭)

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলোচ্য সূরার মধ্যে প্রথমেই মানুষের সামনে আযাবের কষাঘাতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর আল্লাহ্ পাকের অতুলনীয় নেয়ামতের স্বাদ অবশ্যই অনুভব করে এবং তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে, মানুষ এমনই এক জীব যে সে কোনো কিছু যেন বেশীদিন স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারে না, বরং নানা প্রকার পেরেশানী ও প্ররোচনা তাকে যেন তাড়িয়ে বেড়ায়, তার মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে থাকে এবং নানাপ্রকার ভ্রান্তির বেড়াজালে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে বিবিধ হিলা-বাহানা ও ওযর-আপত্তি পেশ করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, অথচ পরিষ্কারভাবে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সত্যের বাতিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। সত্যের বাণীকে এমন উত্তম যুক্তি সহকারে পেশ করা হয়েছে যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করে সত্য থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সত্য-সঠিক পথ হচ্ছে এমন সরল ও মযবুত পথ যে তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা মারপ্যাঁচ নেই। সত্যের জোরালো যুক্তির কাছে মানুষের ঘাড় আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে এবং

www.pathagar.com

পরিশেষে মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, আর এ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই কথা বলার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি মানুষকে সঠিক উপদেশ দিতে পারেন। যদিও রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে তারা চরম বেআদবী করে আসছিলো, তবু অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তাদের হৃদয় দুয়ারে বারবার আঘাত হানার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি এ নির্দেশ ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, (হে আমার নবী) উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তোমার রব-এর মেহেরবানীতে কোনো গনক নও এবং পাগলও নও। ..... আমিও তোমাদের সাথে সে বিপজ্জনক অবস্থার জন্য অপেক্ষা করছি.....তাঁর ক্ষমতায় কেউ অংশীদারি গ্রহণ করুক এ দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (আয়াত, ২৯-৩১)

মোটকথা, এইসব উপর্যুপুরি প্রশ্নের পেছনে একথা বলা রয়েছে, নবী (স.)-কে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এই প্রশ্নবাণের মূলে কোন ইচ্ছা কাজ করছে? হাঁ, এসব কটূক্তি দ্বারা তারা চাইছে যে, যে সত্য সমাগত হয়েছে তা বাতিল শক্তির এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে ময়দান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় এবং হিংসাত্মক কাজ করার সংগ্রামে তারাই বিজয়ী হোক, মোহাম্মদ (স.)-এর পয়গাম পৌছানোর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাক এবং সত্য প্রচারের আন্দোলন থেমে যাক। এর পেছনে সত্যের নিশানবর্দারকে নিস্তেজ করে দেয়ার অসৎ ইচ্ছা ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব যে প্রকটভাবে রয়েছে তা সহজেই অনুভব করা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা কখনও আকাশের কোনো টুকরাকে পতিত হতে দেখে তখন বলে উঠে এটা তো নিছক ঘণীভূত এক খন্ড মেঘমালা'। কিন্তু 'আকাশ থেকে কোনো টুকরার স্খলিত হওয়া এবং মেঘমালার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সে সব কিছু জেনে-বুঝেও স্পষ্ট সত্যের বিরোধিতা করার অসদুদ্দেশ্যে তারা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলেছে।

এখানে তাদের প্রতি শেষ বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এ হচ্ছে প্রচন্ড এক ধমকের বাণ যখন এ ভয়ানক দৃশ্য তারা দেখবে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে আযাবের এই ধমক, আর এরই উল্লেখ হয়েছে সূরাটির শুরুতে, 'ছেড়ে দাও ওদেরকে সেই প্রলয়ংকরী চীৎকারধ্বনির আযাবের মধ্যে পতিত হওয়ার জন্য ..... সে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো কাজেই লাগবে না এবং তাদেরকে কোনো দিক থেকে সাহায্যও করা হবে না।' এইভাবে এই রকম আরও একপ্রকার শাস্তির ধমক তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, 'যারা যুলুম করেছে তাদেরকে এ আযাব ছাড়া আরও একপ্রকার আযাব দেয়া হবে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখে না।'

এরপর কিছু নমনীয় ও সন্তোষজনক কথা দ্বারা সূরাটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে, ওরা রসূল (স.)-কে যে সব কথা বলতো তার উল্লেখ করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ও তো একজন কবি, যার ওপর মৃত্যুসম কোনো বিপদ নেমে আসুক এরই অপেক্ষায় আমরা

www.pathagar.com

আছি।' ওরা নবী সম্পর্কে আরও বলতো, 'এ লোকটি একজন গনক বা জ্যোতির্বিদ অথবা পাগল।' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী (স.)-কে লক্ষ্য করে সম্ভ্রম ও সান্ত্বনার স্বরে এমন মধুর বচনে বলা হয়েছে যার কোনো নযির ইতিপূর্বে কোরআন করীমে পাওয়া যায়নি এবং কোনো নবী-রসূলকে এর আগে এই ভাবে সম্বোধন করাও হয়নি–'তোমার রব-এর পক্ষ থেকে আসা ফায়সালার অপেক্ষা করো, আমি বলছি, কিসের চিন্তা, যখনই তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তোমার রব-এর প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করবে এবং রাতের এক অংশে তাঁর নামের গুণ গাইতে থাকবে আর তখনও তাঁর প্রশংসায় ....।'

উক্ত মধুর বচন দ্বারা মেহেরবান পরওয়ারদেগার তাঁর প্রিয় নবীর ওপর দুশমনদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণের প্রলেপ দান করছেন। অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আসা এ কথাগুলো রসূল (স.)-এর জর্জরিত হৃদয়ে এমন মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলো, যার কারণে শত্রু কর্তৃক উপর্যুপরি আঘাতের ঘা সহজেই শুকিয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্ তায়ালা তূর পর্বতের কসম খেয়ে বলছেন, 'কসম তূর পর্বতের, লিখিত আকারে আসা কেতাবের, ...।' (আয়াত ১-১৬)

এই ছোট ছোট আয়াতগুলো যা বড়ই মনোরম সংগীতের মতো অবতীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মানুষদের কাছে গাওয়া হয়েছে। সূরাটির শুরুর দিক লক্ষ্যণীয়, এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে তার কসম খাওয়া হয়েছে, তারপরই দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, তারপর একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে বারোটি কথায়। এই কথাগুলোতে শক্তিশালী একটি প্রসংগ বিধৃত হয়েছে।

সূরা আন নাজম

আলোচ্য সূরাটির প্রধান অংশ মনে হয় কবিতা আকারে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি শব্দ ও ছত্রের মধ্যকার চমৎকার ছন্দ পাঠকের মনে প্রাণ মাতানো এমন এক ঝংকার তোলে, যা যে কোনো সংগীতের মূর্ছনাকে হার মানায়। সংগীতের এই ধ্বনি সূরাটির সর্বত্র যদিও এক মনোমুগ্ধকর আবেগের পরশ বুলিয়ে দেয়, তবুও সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠে, পাঠককে তা সচেতন করে তোলে। তার হৃদয়-কমলে ভাবের আবেগ সৃষ্টির জন্যে এবং আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সমার্থবোধক শব্দের সংযোজন করা হয়েছে, অথবা কখনও পংক্তির শেষে চমৎকার মিল দেখানো হয়েছে। এইভাবে কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুসারে মূল উদ্দেশ্যকে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে,

'তোমরা কি লাত ও ওযযাকে দেখোনি, দেখোনি কি মানাত নামীয় তৃতীয় আরো একজনকে?' যদি বলা হতো 'মানাতাল্ উখরা', তাহলে ছন্দ পতন ঘটতো। আবার যদি বলা হতো 'অ-মানাতাস্ সালেছাতা' তাহলেও লাইনের শেষে মিল থাকতো না। আর যেহেতু যে কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব একটি মূল্যমান রয়েছে, তাই অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেকটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের শেষে যেমন মিল রাখা হয়েছে, তেমনি ছন্দ পতন না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। এমনই পরবর্তী

www.pathagar.com

দুটি আয়াতের ছন্দের সাথে মিল রাখতে গিয়ে মাঝে আর একটি শব্দ 'ইযান' ব্যবহার করা হয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে শুধু ছন্দ ঠিক রাখার জন্যেই 'ইযান' শব্দটি বসানো জরুরী মনে করা হয়েছে, কারণ এ শব্দটি ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে কথাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে ছন্দের মিল-এর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল দেয়া হয়েছে।

এখানে এই সুরের মূর্ছনার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে এর বর্ণনাভংগি, যা পাঠকের অন্তরে ভাবের এক তরংগ সৃষ্টি করে এবং রব্বুল আলামীনের সাথে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা জানায়, বিশেষ করে সূরাটির প্রথম ও শেষ ভাগে এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগের ছন্দময় কথাগুলো পাঠকের হৃদয়কে এমন আবেগমুগ্ধ করে যে, সে যেন সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকে এবং প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তার মধ্যে এক মধুময় কম্পন সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো বান্দা ও প্রভুর মধ্যে সম্পর্কের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোকে তুলে ধরে। আর এই দুটি অধ্যায়ের মাঝের কথাগুলো আবেগ ও যুক্তির মধ্যে এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে।

সৃষ্টি রহস্যের বাস্তব চিত্র এবং অজানা-অচেনা অথচ গভীর ও আকর্ষণীয় এক মধুময় সম্পর্কের আবেগ যেন এক মায়াময় ছায়া যা পাঠকের হৃদয়পটে নূরানী আলোর এক শুভ্র সমুজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে দেয় এবং ভক্তের হৃদয়কে প্রভুর অস্তিত্ববাহী আদিগন্তব্যাপী রহস্যরাজির সাথে গভীরভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সৃষ্টির উন্মুক্ত অঙ্গনে সঞ্চরণশীল বিশ্বস্ত বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ.) সে রহস্যজাল ভেদ করে সম্মানিত রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহর বাণী বহন করে হাযির হয়েছেন তা আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সৃষ্টি রহস্যের দৃশ্য-অদৃশ্য ছবি সঞ্চরণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকারাজি, ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদি এবং আত্মিকভাবে অনুভব করার মতো বিষয়সমূহ সব কিছুই পরস্পর এক অবিচ্ছেদ্য সুতায় গাঁথা রয়েছে। আলোচ্য সূরার চমৎকার ছন্দময় আয়াতগুলোর সুরের ঝংকারে এ সত্যটি ধরা পড়ে।

তারপর দেখা যায় শ্বাস-রোধকারী এক আশ্চর্য আবেগ ছড়িয়ে রয়েছে সূরাটির সর্বত্র। এই আবেগের চিহ্নগুলো পরিস্ফূট হয়ে রয়েছে নীচে বর্ণিত অধ্যায়গুলোতে যা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে উজ্জীবিত করে তোলে তার অস্তিত্বের অণুপরমাণুগুলোর মধ্যে এক প্রকম্পন সৃষ্টি হয়, সে ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় তাই যা অন্যান্য মক্কী সূরার মধ্যে বর্তমান, অর্থাৎ ঈমান-আকীদার মূল বিষয়গুলো, ওহী, আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং আখেরাত। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় যে, ওহীর সত্যতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস জন্মানো এবং

www.pathagar.com

শেরেক ও-এর অলীক ধারণা-কল্পনার অসারতা প্রমাণের জন্যে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

সূরাটির প্রথমাংশে আলোচ্য বিষয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ওহীর প্রকৃতি ও তাৎপর্য পেশ করা এবং এ বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য বহনকারী বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে দুটি প্রমাণ হাযির করে ওহীর সত্যতা ও বাস্তবতা তুলে ধরা। এ বিষয়ে রসূল (স.) এবং জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত, তাঁকে খোলা চোখে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত আয়াতসমূহ দ্বারা তার সাক্ষ্যদানও এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে মোশরেকদের দাবী করা দেব-দেবী লাত, উযযা ও মানাত এবং ফেরেশতাকুল সম্পর্কে তাদের কাল্পনিক ধারণা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে তাদের আল্লাহর কন্যা হওয়া সম্পর্কে কল্পকাহিনীর কথা এবং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা। অথচ অনুমান সত্যপ্রাপ্তির পথে মোটেই সহায়ক নয়। পাশাপাশি এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে যে, 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (স.) বর্তমান রয়েছেন, যিনি তাদেরকে সেই জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে আহবান করে যাচ্ছেন যার দিকে তিনি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, চাক্ষুষ সাক্ষ্য ও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ পর্যন্ত ডেকে এসেছেন।'

সূরার তৃতীয় অংশে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিশেষভাবে পার্থিব সেইসব বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে চলা হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং শুধু দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং এমন সব বাধায় লাগিয়ে দেয় যার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। আখেরাত ও আখেরাতের জীবনে মানুষের অতীত কার্যকলাপের যে প্রতিদান দেয়া হবে সে সম্পর্কে তাঁকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টির দিন ও পৃথিবীতে প্রেরণের দিন থেকেই অবগত এবং তখন থেকেই সবার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন। তারা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে যেটুকু জানে তার থেকেও বেশী তিনি তাদেরকে জানেন। সুতরাং এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন ও প্রতিদান দেবেন, কোনো আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে নয়। আর এইভাবে অবশেষে তাদের কাজের যথাযথ ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

সূরার চতুর্থ ও শেষ অংশে, আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে; আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক আগমনের সূচনা থেকে নিয়ে এক এক করে তাঁর অনুসারী বৃদ্ধি পাওয়া, সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ, ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা এবং সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে তাদের সকল কাজ নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা এসেছে। এসব কিছুর সাথে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে

www.pathagar.com

প্রাচীনকালের সত্যবিরোধী ও সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে, যারা শেষ পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই বলা হচ্ছে, 'এ ব্যক্তি হচ্ছে পূববর্তী সতর্ককারীদের মতই একজন সতর্ককারী। কেয়ামত আগতপ্রায়, ... তার ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণে কাঁদছ না? বরং তোমরা কি কৌতুক করছো? (সময় থাকতেই সাবধান হও) আল্লাহর কাছে অবনত মাথায় ঝুঁকে পড়ো এবং নিরংকুশভাবে তাঁরই আনুগত্য করো।' এইভাবেই সূরাটির সূচনা ও পরিসমাপ্তির কথাগুলোর মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে তা সর্ব সাধারণের বোধগম্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

সূরা আল ক্বামার

এ সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে সেই সকল সত্য-বিরোধী হঠকারী ও নবীদের প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিদের অন্তরের মধ্যে কেয়ামতের ভীষণ ও কঠিন ভয়ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অপরদিকে সত্যপন্থী মোমেনদের জন্যে সূরাটি গভীর প্রশান্তি ও তাদের অন্তরসমূহে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করেছে। সূরাটির মধ্যে আলোচ্য কথাগুলো বৃত্তের ন্যায় একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রত্যেকটি বৃত্তে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি একটি জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। পরিসমাপ্তিতে যে কথাগুলো এসেছে তাতে পাঠকের মন ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। তখন আল্লাহর এই কথা সামনে এসে যায় 'কেমন ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?' তার অনুভূতিতে ভীষণ চাপ ও আন্দোলন সৃষ্টি করার পরই আবার তার প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে যে কথাটি এসেছে তা হচ্ছে, 'আর অবশ্যই আমি আল্লাহ তায়ালা। কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতপর একে স্মরণ করবে এমন কেউ আছে কি?'

এ সূরার শুরুতে যে সব বিষয় রয়েছে সাধারণত তার ক্ষেত্র মক্কা মোকাররামা, আর তা হচ্ছে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে যে ভয়ানক দৃশ্যটির অবতারণ হবে তার বর্ণনা এবং সূরার শেষে সে অবস্থাগুলোর মধ্য থেকে আর একটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি স্থানে নূহ (আ.)-এর কওমের নানা প্রকার অপতৎপরতা এবং আদ, সামূদ ও লূত আলাইহিমুসসালামের জাতিদের সীমলংঘনকর কার্যকলাপের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে এসব বিষয়গুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে আলোচ্য সূরায় এসব কথাকে এক বিশেষ ভংগিতে পেশ করা হয়েছে। এখানকার বর্ণনাভংগি সম্পূর্ণ নতুন।

এসব বিষয় অত্যন্ত কঠিন, ভয়ানক, দ্রুতবেগে ও নিশ্চিতভাবে আসা ভীষণ অবস্থার কথা জানাচ্ছে। এসব অবস্থার বিবরণ যখন সামনে আসে, তখন পাঠকের হৃদয় সাংঘাতিকভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে যায়, তার সর্বাংগে এর প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং ধ্বংসের ভয় ও সন্ত্রাস তার শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চায়।

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে যে, এখানে এতো দ্রুত বেগে সেই ভয়ানক কঠিন আযাবের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে যা পাঠককে ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। দুঃখে তার জিভ বের হয়ে আসতে চায়। কেয়ামতের দিন সত্যকে অস্বীকারকারীরা এসব দৃশ্য এমনভাবে দেখতে থাকবে যেন তারা নিজেরাই এই আযাবের মধ্যে পতিত রয়েছে এবং সে আযাবের বৃশ্চিক দংশনজ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তারপর এক প্রকার আযাব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর এক প্রকার আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে, যা পূর্বের আযাব থেকে আরও বেশী কঠিন হবে। এমনিভাবে পর পর সাত প্রকার আযাবের খবর দেয়া হয়েছে যা হবে চরম ধ্বংসাত্মক এবং অকল্পনীয় কঠিন।

অবশেষে মোমেনদের জন্যে যে অবস্থাটি আসবে তার উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এ হবে ভিন্ন আর একটি দৃশ্য, যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নেককার ব্যক্তিরা ছায়াঘন বাগবাগিচার মধ্যে মনোরম ঘর-বাড়ীতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করবে। আল্লাহভীরুদের জন্যেই হবে এ চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা। এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা প্রবাহমান নহর-পরিবেষ্টিত বাগবাগিচার মধ্যে আনন্দ বিহারে সময় কাটাবে করবে। তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান সম্রাটের সান্নিধ্যে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় অবস্থান করবে। সত্য বিরোধীরা নিদারুণ ভয়-ভীতি ও কঠিন আযাবে ভরা কম্পন সৃষ্টিকারী ও অপমানজনক শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে বলা হবে, গ্রহণ করো আগুনের স্বাদ।'

তারপর তারা আর যাবে কোথায়। আর কোন্ কোন্ দৃশ্য তারা দেখবে? কোন্ কোন্ শাস্তির পর্যায় তারা অতিক্রম করবে? কোন্ কোন্ শাস্তিতে তারা নিপতিত হবে? এই ঠিকানা থেকে অপর কোন্ ঠিকানায় তারা গিয়ে পড়বে? এসব বিষয়ে এ সূরায় পর্যায়ক্রমি ধারা-বিবরণী রয়েছে।

সূরা আল ওয়াক্বেয়া

আল ওয়াকেয়াহ– কেয়ামতের ঘটনা.....এটি সূরার নামও এবং এর আলোচ্য বিষয়ের আভাসদানকারী শিরোনামও। এই মক্কী সূরায় আলোচিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আখেরাতে পুনরুত্থানের ঘটনা। আখেরাতের পুনরুত্থানে সন্দেহ পোষণকারী মোশরেক ও কোরআন অবিশ্বাসীদের নিম্নোক্ত উক্তির জবাবে এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, 'আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখন কি আবার আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা পুনরুজ্জীবিত হবো?'

এ কারণেই কেয়ামতের বিবরণ দিয়ে সূরা শুরু হয়েছে। এখানে কেয়ামতের বিবরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, তা সকল সন্দেহ নিরসন করে, সকল বিবাদ দূর করে এবং এ ব্যাপারে অকাট্য ও সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে। 'যখন কেয়ামতের

www.pathagar.com

ঘটনাটা ঘটবে, যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।.....' এখানে এই দিনের ঘটনাবলী থেকে শুধু সেই ঘটনা কয়টির উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাকে অন্য সকল দিন থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দিন হিসাবে চিহ্নিত করে। এদিনে মানুষের ধ্যান ধারণা ও পৃথিবীর অবস্থা পাল্টে যাবে, ভয়ংকর আলোড়ন ও বিভীষিকার ফলে পৃথিবীর ভূমির এবং তার সম্পদ ও মূল্যবোধের বিরাট পরিকর্তন ঘটবে। ৩, ৪, ৫, ৬ ও তৎপরবর্তী আয়াতে এই পরিবর্তনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন, 'এ ঘটনা নীচু করে দেবে, উঁচু করে দেবে, যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।'

এরপর তিন শ্রেণীর মানুষের পরিণতি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে– অগ্রবর্তীরা, ডান দিকের ও বাম দিকের লোকেরা। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা যথাক্রমে যে নেয়ামত ও আযাব ভোগ করবে, তার এতো বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, ঘটনাটা একেবারে অবধারিত ও সন্দেহাতীতরূপে সত্য বলে মনে হয়। আর তার এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ চাক্ষুষ দর্শনের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। ফলে অস্বীকারকারীরা নিজেদের পরিণাম ও মোমেনদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এমনকি তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের বিবরণ দেয়ার পর ওখানেই এরূপ বলাবলি করা হবে যে, 'তারা ইতিপূর্বে সীমালংঘনকারী ছিলো, তারা বার বার প্রতিজ্ঞা ভংগ করতো.....' যেন আযাবটাই বর্তমান, আর দুনিয়ার জীবন অতীত, যার উল্লেখ কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনকে ঘৃণ্য এবং তাদের কুফরী ও অস্বীকৃতিকে বিকৃত বলে আখ্যায়িত করার জন্যে করা হচ্ছে।

এখানে সূরার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয় এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষত আখেরাত ও পুনরুত্থানের আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। কেননা, আখেরাতই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পর্বে আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় করা হয়েছে। মানুষ যে পরিবেশেই থাকুক এবং তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে স্তরেরই হোক, এ পর্বের আয়াতগুলো পড়লে তার কাছে মনে হবে আখেরাতের আলোচিত দৃশ্যগুলো তার অনুভূতি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আওতাধীন।

মানুষের প্রথম আবির্ভাবটা দেখানো হয়েছে এক ফোঁটা বীর্য থেকে, আর তাদের মৃত্যু ও তাদের পরবর্তীতে তাদের স্থলে অন্যদের আবির্ভাবকে আখেরাতের পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম জন্ম ও মৃত্যু কতো সহজ স্বাভাবিক, তা সব মানুষের জানা আছে বলেই এটিকে আখেরাতে তাদের পুনর্জন্মের প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এ পর্যায়ে দুনিয়ার কৃষি কাজ ও ফসল উৎপাদনের দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, এটাও জীবন সৃষ্টির একটা রূপ। আল্লাহর হাতেই জীবন সৃষ্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা নিহিত। তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে আদৌ কোনো জীবন সৃষ্টি করতেন না এবং কোনো ফল বা খাদ্য উৎপন্ন হতো না।

জীবনমাত্রেরই উৎপত্তি যে মিষ্টি পানির ওপর নির্ভরশীল, তারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই পানি আল্লাহর একক ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তিনি মেঘমালা

www.pathagar.com

থেকে এই পানি বর্ষাণ। ইচ্ছা করলে তিনি এই পানিকে এমন লবণাক্ত ও বিস্বাদ বানিয়ে দিতে পারতেন, যা থেকে কোনো জীবনেরই উদ্ভব হয় না এবং যা জীবনের অনুকূল ও উপযোগী নয়।

এখানে দেখানো হয়েছে আগুনের দৃশ্যও। মানুষের ব্যবহৃত এ আগুনের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। আগুনের উল্লেখ হওয়া মাত্রই মানুষের অনুভূতি সচকিত হয়ে ওঠে এবং আখেরাতের সেই আগুনকে তাদের মনে পড়ে যায়, যা নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলো।

এ সবই মানুষের নিত্যকার সুপরিচিত জিনিসের বাস্তব দৃশ্য। এগুলো তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তারা এ সবের পশ্চাতে আল্লাহর হাত রয়েছে বলে অনুভব করে। এ সব জিনিস আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই এগুলোর তদারক করেন।

এই পর্বে কোরআন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই কোরআনই তাদের কেয়ামতের ঘটনা অবহিত করে। কাফেররা কেয়ামতের সত্যতায় যখন সন্দেহ পোষণ করে, তখন সে নক্ষত্রের অবস্থান স্থলসমূহের শপথ করে। এই শপথ যে অত্যন্ত গুরুতর তাও সে জানায়। শপথ করে সে জানায় যে, কোরআন অত্যন্ত মহিমান্বিত গ্রন্থ, যাকে পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না এবং তা বিশ্ব প্রভুর নাযিল করা গ্রন্থ।

সবার শেষে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়। মানুষের আত্মা যখন কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে, মৃত্যুমুখী মানুষ যখন পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্তে পদার্পণ করে, তখন সবাই অসহায় দর্শক হয়ে তার পাশে অবস্থান করে। তারা না পারে তার কোনো সাহায্য করতে, না পারে তার ভেতরে ও বাইরে কী হচ্ছে তা জানতে। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। একমাত্র সেই দেখতে পায় তার গন্তব্যের পথ। সে যা দেখতে পায় তা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, ইংগিতও সে করতে পারে না।

অতপর ওহীর গুণের অকাট্যতা পুনরায় ঘোষণা ও মহান স্রষ্টা আল্লাহর তাসবীহের মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এভাবে সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে পূর্ণতম যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

সূরা আল মুলক

আলোচ্য পারাটির সব কয়টি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ঠিক এর বিপরীত, পূর্ববর্তী ২৮ নং পারার সব কয়টি সূরাই ছিলো মদীনায় অবতীর্ণ। এই পারার কোনো কোনো সূরার প্রথমাংশ পবিত্র কোরআনের সূচনাকালীন ওহীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা আল মোদ্দাসসের ও সূরা আল মোয্যাম্মেলের প্রথমাংশ। আবার এই পারায় এমন কিছু সূরাও রয়েছে যা সম্ভবত নবুয়ত লাভের প্রায় তিন বছর পর নাযিল হয়েছে, যেমন সূরা আল ক্বালাম, আবার কোনোটা নাযিল হয়েছে নবুয়ত লাভের প্রায় দশ বছর পর যেমন সূরা আল জ্বিন।

বর্ণিত আছে, বনু সকীফ গোত্রের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রসূল (স.) যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা জ্বিন নাযিল হয়। ঘটনার

www.pathagar.com

বিবরণ এমন যে, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে একদল জ্বিনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি কোরআন পড়ছিলেন। জ্বিনেরা তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। তায়েফের এই সফর সংঘটিত হয়েছিলো খাদিজা (রা.) ও আবু তালেবের ইন্তেকালের পর হিজরতের এক বছর বা দু'বছর আগে। অবশ্য অপর একটি রেওয়ায়েতে অনুসারী সূরা জ্বিন নবুওতের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছিলো। এই শেষোক্ত রেওয়ায়াতটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

পবিত্র কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, ওহী ও আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা এবং এই আকীদা থেকে বিশ্বজগত ও তার স্রষ্টার সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে। সেই সাথে স্রষ্টার পরিচয়ও এই সূরাগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, স্রষ্টার সম্পর্কে মানবহৃদয়ে এক জীবন্ত চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই চেতনা অত্যন্ত কার্যকর এবং আপন মনিবের অনুগত বান্দার যেরূপ মানসিকতা থাকা উচিত, সেরূপ মানসিকতারই উদ্দীপক, বান্দার মধ্যে আপন প্রভুর উপযুক্ত আদব ও ভক্তির উদ্‌গাতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাবলীর মূল্যায়ন ও মান নির্ণয়ে একজন মুসলমানের যে দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়, তারই উজ্জীবক। পূর্ববর্তী মক্কী সূরাগুলোতে আমরা এই বক্তব্যের নমুনা দেখেছি। বর্তমান পারায় আমরা তার আরো নমুনা দেখতে পাবো।

পক্ষান্তরে মাদানী সূরা ও আয়াতগুলো প্রধানত উপরোক্ত আকীদা এবং ধারণা ও মূল্যমানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর রূপদান সম্পর্কে সোচ্চার থাকে। সেই সাথে মানুষের মনকে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়তী বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাপারে মানুষকে মানসিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে প্রস্তুত করে। পূর্বোক্ত মাদানী সূরাগুলোতে যেমন আমরা এর নযীর দেখেছি, চলতি পারার সূরাগুলোতেও তেমনি দেখতে পাবো।

'সূরা তাবারাকা' বা 'সূরা আল মুল্‌ক' এ পারার প্রথম সূরা। সৃষ্টিজগত ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা এ সূরায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধারণাটা এতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে, তা সংকীর্ণ ও সীমিত পার্থিব পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে মহাকাশের বিভিন্ন জগত, আখেরাতের জীবন, পার্থিব জগতের মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি তথা জ্বিন, পাখি, আখেরাতের জাহান্নাম ও তার রক্ষীরা এবং অদৃশ্য জগতের এমন আরো বহু জিনিস পর্যন্ত বিস্তৃত, যার সাথে মানুষের মন ও আবেগ জড়িত, তাই এর আলোচ্য বিষয় শুধু দৃশ্যমান পার্থিব জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু তা মানুষের চোখের সামনে, বাস্তব জীবনে ও আপন সত্তার মধ্যে বিরাজমান বহু জিনিস সম্পর্কেই চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই সূরা মানুষের মনমানসে পুঞ্জীভূত যাবতীয় স্থবির ও পশ্চাদমুখী জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে, চেতনার স্থানে স্থানে সংযোগের জানালা খুলে দেয়। সেখান থেকে জড়তার ধুলাবালি মুছে ফেলে এবং বিবেক, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাধীন করে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির মুক্ত দিগন্তে, আপন সত্তার গভীরতম

www.pathagar.com

প্রকোষ্ঠে, মহাশূণ্যের দূর নিলীমায়, মহা সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে এবং অদৃশ্য জগতের সকল গোপন ঘাঁটিতে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণে উদ্দীপিত করে। এই বিচরণের মধ্য দিয়ে সে সর্বত্র দেখতে পায় আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নৈপুণ্যে পরিচালিত সৃষ্টিজগতের তৎপরতা, তারপর এই বিশাল সৃষ্টি জগতকে স্বীয় উপলব্ধির উর্ধে বিবেচনা করে তার পর্যবেক্ষণ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তার মন-মগয। সে বুঝতে পারে যে, এ মহাবিশ্বের পরিধি তার কল্পনার চেয়েও বিশালতর। ফলে সে পৃথিবীর প্রশস্ততাকে অতিক্রম করে চলে যায় আকাশে, দৃশ্যমান জগত থেকে তা গিয়ে উপনীত হয় প্রকৃত জগতে, স্থবিরতা থেকে সচলতায় অদৃষ্ট, জীবন ও জগতে জীবসুলভ এক চঞ্চলতায়।

জীবন ও মৃত্যু একটি সুপরিচিত ও বারংবার সংঘটিত ব্যাপার। কিন্তু এই সূরা মানুষের চিন্তাধারাকে জীবন ও মৃত্যুর অপর পারে সঞ্চালিত করে। আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার প্রজ্ঞা ও কৌশল নিয়ে ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'

আকাশ হচ্ছে অজ্ঞ মানুষের চোখের সামনে বিরাজিত স্থির নিশ্চল এক সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পশ্চাতে তার সৃজনকারী হাতকে সে দেখতে পায় না। এতে কি পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব বিদ্যমান তাও তার চোখে পড়ে না। কিন্তু আলোচ্য সূরা তার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে এর মাঝে যে অপরূপ সৌন্দর্য ও পূর্ণতা নিহিত রয়েছে তা নিয়ে ভাবতে শেখায় এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য হলো,

'যিনি সাতটি আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। আচ্ছা, দৃষ্টি ফেরাও তো। কোনো অসম্পূর্ণতা দেখতে পাও কি? পুনরায় দৃষ্টি ফেরাও। তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে.....।'

জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনই হচ্ছে জীব-জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু আলোচ্য সূরা আরেকটি জগত উদঘাটিত করেছে। নতুন করে সৃজিত সেই জগতটি শয়তানদের ও কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। সে জগত চঞ্চলতা, চমক ও প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে রেখেছি..... আর জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা .... জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডবাসীর ওপর অভিশাপ।'

জাহেলিয়াতমুখী মন-মগয জীবন যাপনের এই প্রকাশ্য পরিমন্ডলের বাইরের আর কিছুর অস্তিত্ব মানে না। অদৃশ্য জগত ও তার অন্তর্নিহিত সত্যগুলো নিয়ে চিন্তাও করে না। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত এবং দৃশ্যমান পৃথিবীর বদ্ধ খাঁচায় সে আবদ্ধ। তাই এ সূরা মানুষের মনকে ও দৃষ্টিকে অদৃশ্য জগত,

www.pathagar.com

আকাশ ও সেই সীমাহীন ক্ষমতার প্রতি নিবদ্ধ করে, যা চোখের অগোচরে থাকলেও যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। যে ইহকালীন জগত নিয়ে তারা ডুবে আছে এবং যার প্রতি তারা পরম আস্থাশীল রয়েছে, সেই ইহকালীন জগতের প্রতি তাদের আস্থা নাড়িয়ে দেয়। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা তাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় পায়, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। .... যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি যে তোমাদেরকে মাটির নিচেও পুঁতে ফেলতে পারেন.. ....'

পাখি এমন এক সৃষ্টি যাকে মানুষ প্রতিনিয়তই দেখতে পায়, অথচ তার অলৌকিকত্ব নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করে না। কিন্তু এই সূরা মানুষের চোখকে পাখির দিকে তাকাতে এবং তার মনকে পাখি নিয়ে ভাবতে শেখায়। আল্লাহর যে সীমাহীন ক্ষমতা এই বিচিত্র সৃষ্টিকে সৃজন ও তার পরিকল্পনা করেছে, সে সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'তারা কি পাখিদের দিকে তাকায় না, কিভাবে তারা মানুষের মাথার ওপর পাখা মেলে ও গুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে তো আর কেউ থামাতে পারে না....।'

মানুষ যখন নিজ বাসস্থানে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, সেই সময়ে এই সূরা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এক মানসিক উদাসীনতা থেকে মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতো, যে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী এবং চারপাশ থেকে গোটা প্রকৃতি ইতিপূর্বেই তাকে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে, অথচ এটাকে সে হিসাবেই ধরেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে, যারা রহমানের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! আসল কথা হলো, অমান্যকারীরা প্রতারণার শিকার।'

মানুষ যে জীবিকা উপার্জন করে, তা তার ধারণায় উপায় উপকরণের নাগালের কাছাকাছি এবং সহজেই তা উপার্জন করা সম্ভব। আর এই উপায়-উকরণ হচ্ছে তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদের দৃষ্টিতে অনেক দূরে আকাশের ওপরে পর্যন্ত প্রসারিত করে। তাদের ধারণা অনুসারে তাদের সুপরিচিত উপায়-উপকরণের ঊর্ধে টেনে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি আয়াতের বক্তব্য দেখুন! 'যে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে থাকে, তার জীবিকা যদি আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে ভেবে দেখতো। আসলে তারা আল্লাহদ্রোহিতা ও সত্য পরিত্যাগের ওপর জেদ ধরে রয়েছে।'

মানুষ যখন তার বিভ্রান্তিতে অনড় হয়ে বসে থাকে আর ভাবে যে, আমি সঠিক পথে আছি, তখন এই সূরা তার কাছে তার প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য পথচারীদের অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে এক চলন্ত, জীবন্ত ও উদ্বুদ্ধকারী ভংগীতে।

www.pathagar.com

'ভেবে দেখো তো, যে লোক মুখের উপর উল্টো হয়ে হাটছে, সে সঠিক সত্য পথপ্রাপ্ত, না যে লোক মাথা উঁচু করে চলে যাচ্ছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্তায় যেসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তাকে সাধারণত সে কাজে লাগায় না। তার স্নায়ু ও পঞ্চইন্দ্রিয় যা অনুভব করে তাকে অতিক্রম করে এই ইহজগতের উর্ধের কোনো কিছুতে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। এ জন্যে আলোচ্য সূরা তাকে দেয়া আল্লাহর সেই নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেগুলো দৃশ্যমান বর্তমানের বহির্ভূত অজানা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে দেয় এবং চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছার দিকনির্দেশনা দেয়!

'তুমি বলো! তিনিই সেই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।'

কাফেররা পরকালীন জীবনে পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে থাকে এবং তার নির্দিষ্ট সময়কাল জানতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা তার সামনে কেয়ামতকে একটা অবধারিত আকস্মিক ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং সে ঘটনা যখন ঘটবে তখন তা তাদের জন্যে অবশ্যই বিব্রতকর হবে।

'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলতো এই ঘটনা কবে ঘটবে? বলো, প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে আর আমি তো শুধু খোলাখুলি সতর্ককারী। পরে তারা যখন এই কেয়ামতকে একান্ত কাছে উপস্থিত দেখবে, তখন এই অস্বীকারকারীদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এই হচ্ছে সেই বিষয়, যার জন্যে তোমরা তাগাদা দিচ্ছিলে।'

কাফেররা ভাবতো যে, রসূল (স.) ও তার সংগীরা মারা গেলে খুবই ভালো হতো এবং তারা হেদায়াতের এই বিরক্তিকর আওয়ায শোনার হাত থেকে রেহাই পেতো। যে আওয়ায প্রতিনিয়ত তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সতর্ক করে এবং তাদের আয়েশী ঘুম ভেংগে দেয়, তার হাত থেকে নিস্তার পেতো। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদেরকে বলে যে, মোমেন জনগোষ্ঠীর মরা বা বাঁচাতে কিছু এসে যায় না। রসূল (স.)-কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর যে আযাব তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে আছে, তা থেকে তাদের রেহাই নেই। কাজেই সেই ভয়াবহ দিন ঘনিয়ে আসার আগে তাদের নিজ নিজ অবস্থা ও করণীয় বিবেচনা করা উত্তম।

'তুমি বলো! আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের ওপর দয়া করেন, তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফেরদেকে কে রক্ষা করবে? তুমি বলো, তিনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর নির্ভরশীল আছি। প্রকৃত গোমরাহ কে, তা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।'

সর্বশেষে এই সূরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংগ পানি যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে এ আশংকা ব্যক্ত করে সাবধান করেছে। সে বলছে যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালাই এই পানি সরবরাহ করেন। অথচ তাকেই তারা অগ্রাহ্য করছে, 'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দেবে?'

এ সব বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটি আগাগোড়াই একটি আন্দোলন, অনুভূতিতে একটি শিহরণ এবং চিন্তায় ও চেতনায় একটি অভ্যুত্থান, আর গোটা সূরার মূল ও প্রধান বক্তব্য হলো তার সূচনা বাক্য,

'পরম কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সাম্রাজ্য এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'

আর এই সাম্রাজ্য ও তাতে সর্বশক্তিমান হওয়ার তত্ত্ব থেকেই এই সূরায় নিবেদিত সকল দৃশ্য এবং সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার উৎপত্তি।

সূরা আল ক্বালাম

সূরাটির নাযিল হওয়ার সঠিক সময় নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। সূরার প্রথমাংশেরও নয়, পুরো সূরারও নয়। সূরার প্রথমাংশটিই যে প্রথমে এবং শেষ অংশ যে শেষে নাযিল হয়েছে, এটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনকি এই শেষোক্ত ধারণা অগ্রগণ্য কিনা তাও নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেননা সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশের আলোচ্য বিষয় একই রকম।

বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের ওপর কাফেরদের আক্রমণাত্মক ও মারমুখো হয়ে ওঠা এবং তাঁকে পাগল বা ভূতে ধরা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে থাকা। বেশ কিছু বর্ণনায় এটিকে সূরা 'আলাক'-এর পর নাযিল হওয়া দ্বিতীয় সূরা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সংকলনে যে এই সূরাটি দ্বিতীয় সূরা হিসাবে সংকলিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সূরার পূর্বাপর বক্তব্য, আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগী আমাদেরকে এই মত পোষণে বাধ্য করে যে, এটি সূরা 'আলাক্বের' অব্যবহিত পরে নাযিল হওয়া সূরা তো নয়ই; বরং খুব সম্ভবত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে এটি নাযিল হয়েছিলো।

ইসলামের এই সার্বিক দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের দাওয়াত চালু হওয়ার প্রায় তিন বছর পর। এই সূরা নাযিল হওয়ার সময়ে কোরায়শরা ইসলামী দাওয়াতকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছিলো। এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সেই জঘন্য উক্তিও করতে পেরেছিলো যে, 'তুমি একটা পাগল' (নাউযুবিল্লাহ!) আর কোরআনও এ উক্তি খন্ডন ও তার প্রতিবাদ করা এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে হুমকিও দিতে শুরু করেছিলো। এই সূরায় সেই হুমকি বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ ধারণাও প্রচলিত আছে যে, সূরাটির প্রথমাংশ হয়তো সূরা 'আলাক্বের' প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছিলো এবং এ সূরার শুরুতে যে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও'– তা হয়তো রসূল (স.)-এর নিজের ভীতি দূর করার জন্যেই বলা হয়েছে। কেননা ওহীর প্রথম দিকে তিনি নিজের সম্পর্কেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মাথায় কোনো গোলমাল হয়ে গেলো কিনা এবং ওহী তারই কোনো উপসর্গ কিনা। কিন্তু এই ধারণাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা রসূল (স.)-এতদূর ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বা এতখানি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, এর সপক্ষে কোনো প্রামাণ্য বর্ণনা নেই।

তাছাড়া সূরার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সাক্ষ্য দেয় যে, 'তুমি পাগল নও' এ উক্তিটি সূরার শেষাংশের এই উক্তির সাথে মিল রয়েছে, 'কাফেররা কোরআন শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে চায় এবং বলে যে, সে তো পাগল।'

বস্তুত এ অপবাদটিকে সূরার শুরুতেই খন্ডন করা হয়েছে। আগাগোড়া সুসমন্বিত বক্তব্য সম্মিলিত এ সূরাটি পড়লে মনে প্রাথমিকভাবে এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সূরায় কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে। এই মতানুসারে ১৭শ আয়াত থেকে ৩৩তম আয়াত এবং ৪২তম আয়াত থেকে ৫০তম আয়াতগুলো মাদানী। প্রথমাংশ বাগানের মালিকদের ও তাদের ওপর আপতিত দুর্যোগ সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়াংশ মাছের পেটে প্রবিষ্ট হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা সম্বলিত। আমাদের ধারনার এ মতটিও সঠিক নয়। আমাদের মতে গোটা সূরাই মক্কী। কেননা উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্যে মক্কী ভাবধারার সুগভীর ছাপ বিদ্যমান। সূরাটির আগাগোড়া বক্তব্য যেহেতু মক্কী, তাই আয়াতগুলোকে সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচিত সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করাই অধিকতর সমীচীন।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি যে, সূরাটি নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সূরা নয় বরং এটি নবুওত লাভের বেশ কিছুকাল পর সাধারণ দাওয়াতের সূচনা হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। কারণ প্রথমত এর আগেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করো।'

দ্বিতীয়ত, অতীত জাতিসমূহের কাহিনীসমূহ বর্ণিত হয়েছে এমন বেশ কিছু সূরা ও আয়াত এর আগেই নাযিল হয়েছিলো। আর সে জন্যে কাফেরদের কেউ কেউ ওগুলোকে 'প্রাচীনকালের উপাখ্যান' বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

তৃতীয়ত, কোরায়শকে গোষ্ঠীগতভাবে ও সার্বিকভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান ইতিপূর্বেই জানানো হয়েছিলো। আর কোরায়শ এ দাওয়াতকে মিথ্যা অপবাদ ও সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ দ্বারা রুখতে চেয়েছিলো। এর প্রতিক্রিয়ায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যে তীব্র নিন্দাবাদ ও সমালোচনা এই সূরায় ধ্বনিত হয়েছে এবং সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে প্রচন্ড হুমকি উচ্চারিত হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে নয়; বরং কঠিন প্রতিরোধ ও চরম শত্রুতার যুগে

www.pathagar.com

নাযিল হয়েছিলো। চতুর্থত, এ সূরার সর্বশেষ দৃশ্যও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। শেষের দিকের এ আয়াতটি লক্ষণীয়,

'কাফেররা স্মরণিকা (কোরআন) শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে উদ্যত হয় এবং বলে যে, সে তো একটা আস্ত পাগল।'

এই আয়াতটি এমন একটি পরিস্থিতির দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, যখন বড় বড় জনসমাবেশে ব্যাপকভাবে আগে থেকেই দাওয়াত দেয়া চালু হয়ে গিয়েছিলো। মক্কার কাফেররা প্রকাশ্য সমাবেশে কোরআন শুনতো, তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে চোখ পাকাতো এবং রসূল (স.)-কে পাগল বলতো। দাওয়াতের সূচনা কালে এ পরিস্থিতি ছিলো না। তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচার চলতো, ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে গোপনে দাওয়াত দেয়া হতো। কাফেরদের প্রকাশ্য সমাবেশে দাওয়াত দেয়া হতো না। এ ধরনের দাওয়াতের কাজ বিশ্বস্ত সূত্র মতে দাওয়াতের সূচনার তিন বছর পর চালু হয়।

পঞ্চমত, এই সূরায় এমন কিছু আভাস ইংগিতও রয়েছে, যা দ্বারা মনে হয় যে, তখন মোশরেকরা রসূল (স.)-কে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কিছু আপোস রফার প্রস্তাব দিয়েছিলো, যেন তিনি মাঝপথে স্বীয় কাজে বিরতি দেন। সূরার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

'তারা চায় তুমি কিছু নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হয়।'

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত চলাকালে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য, কেননা তখন তাতে তাদের কোনো ক্ষতির আশংকা ছিলো না। প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পরই মোশরেকদের এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিলো।

এ সব যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকালে নয় তারও বেশ কিছুদিন পরে নাযিল হয়ে থাকবে। মনে হয় দাওয়াতের সূচনা এবং এই সূরা নাযিলের মাঝখানে তিন বছরের কম তো নয়ই বরং বেশী সময়ও কেটে যেয়ে থাকতে পারে। আর এ কথাও বোধগম্য মনে হয় না যে, তিন বছরে কোরআনের মোটেই কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল হয়নি। বরং এ সময়ে বহুসংখ্যক সূরা এবং বহু সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়ে থাকতে পারে, যাতে হয়তো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই সূরার মতো কোনো আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়নি, কেবল সাদামাটাভাবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই প্রচারিত হয়েছে।

তাই বলে এসব যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই সূরা এবং সূরা মোয্যাম্মেল ও সূরা মোদ্দাসসের দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের সূরাই নয়, যদিও তা একেবারে প্রাথমিক ওহী নয়। প্রাথমিক ওহী না হওয়ার কারণগুলো আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। সে কারণগুলো সূরা আল মোয্যাম্মেল ও মোদ্দাসসেরের বেলায়ও প্রযোজ্য।

এখানে প্রসংগত এ কথাটাও উল্লেখ করা দরকার যে, আরব ভূমিতে যখন ইসলামের চারাগাছটি প্রথম লাগানো হয় তখন শুধু আরব উপদ্বীপে নয়; বরং সমগ্র

www.pathagar.com

পৃথিবীতে বিরাজমান জাহেলিয়াতের কাছে তা একেবারেই অচেনা মনে হয়েছিলো। এরূপ মনে হওয়ার কিছু কারণও ছিলো। আরবে জাহেলিয়াত নিজেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হবার দাবী করতো। এটা ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শের সুস্পষ্ট বিকৃতি। কোরায়শী পৌত্তলিকরা তাদের এই ধর্মীয় ভন্ডামীকে রকমারি মিথ্যার আড়ালে লুকিয়ে রাখতো। তাদের সমাজে বহু সংখ্যক হাস্যকর আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়ায ও পূজা উপাসনা চালু ছিলো।

রসূল (স.) তাদের কাছে যে ধর্ম পেশ করলেন, তা মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শের দিক দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের সাথে শুধু যে সামঞ্জস্যশীল ছিলো তাই নয়, বরং তা এতো নিখুঁত, নির্ভেজাল, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সহজ, সরল এবং এতো পূর্ণাংগ ছিলো যে, বিশ্ব মানবতার সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিধান হবার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ইবরাহীমী (আ.) দ্বীনের নামে পৌত্তলিক কোরায়শদের ভন্ডামীর সাথে এই সত্যিকার ইসলামী ও ইবরাহীমী আদর্শের ব্যবধান এতো বেশী ছিলো যে, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ ছিলো এক বিরাট ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের শামিল। কোরায়শরা এটা মেনে নিতে ও বরদাশত করতে রাজী ছিলো না।

কোরায়শ পৌত্তলিকরা এক আল্লাহর পরিবর্তে শত শত উপাস্য মানতো। ফেরেশতা, জ্বিন ও তাদের আত্মার প্রতিমূর্তির পূজা করতো। কোরআন তাদের সামনে পেশ করলো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সত্তাকে এবং সকল সৃষ্টির সাথে তার ইচ্ছাকে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করলো। পৌত্তলিকদের উক্ত আচরণটির সাথে কোরআনের এই দাওয়াতের ব্যবধান এতো দুস্তর ছিলো যে, প্রথমটি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা তাদের কাছে ছিলো কল্পনারও অতীত।

একদিকে ছিলো আরব উপদ্বীপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায়, কা'বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অভিজাত গোত্রীয় সরদাররা এবং তাদের চেয়ে নিচু জাত বলে বিবেচিত সাধারণ আরববাসী। আর অপরদিকে ছিলো কোরআন প্রবর্তিত সরলতা, আল্লাহর চোখে সকল মানুষের সমতা এবং কোনো পুরোহিত ইত্যাদি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের তত্ত্ব। এই দু'য়ের মাঝেও ছিলো দুস্তর ব্যবধান, যা অতিক্রম করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না।

তৎকালে জাহেলী সমাজে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচলিত ছিলো, তার সাথেও কোরআন বর্ণিত ও রসূল (স.)-এর পেশ করা নৈতিকতার সাথে দুস্তর ব্যবধান ছিলো। শুধুমাত্র এই ব্যবধান নতুন মতাদর্শের সাথে কোরায়শ, তাদের চিন্তাধারা ও চরিত্রের সংঘাত বেধে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। অথচ সেখানে শুধুমাত্র এই ব্যবধানই ছিলো না বরং এর পাশাপাশি আরো অনেক বিষয় ছিলো, যা কোরায়শ নেতাদের কাছে হয়তো তাদের ধর্মের চেয়েও অনেক বড় ছিলো।

সামাজিক উঁচু নিচু ও আভিজাত্যবোধ তথা কৌলিন্য প্রথা এতো প্রবল ছিলো যে, কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর প্রভাবে একজন বলে বসেছিলো, 'এই কোরআন দুই

www.pathagar.com

শহরের কোনো প্রধান ব্যক্তির কাছে নাযিল হলো না কেন?' দুই শহর বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কা ও তায়েফকে। রসূল (স.)-এর উচ্চ বংশীয় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও নবুওতের পূর্বে তিনি তেমন কোনো সমাজপতি বা গোত্রপতি ছিলেন না। মক্কার কোরায়শ বংশ ও তায়েফের সাফীদ বংশে গোত্রপতির মর্যাদা ছিলো সব কিছুর উর্ধে। তাই সেসব সরদার ও মোড়লদের পক্ষে মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য মেনে নেয়া সহজ ছিলো না।

গোত্রীয় বা পারিবারিক আভিজাত্যবোধও এমন এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যা আবু জেহেলের মতো ব্যক্তিকে সত্য বাণীকে শুধুমাত্র এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করেছিলো যে, নবী (স.) বনু আব্‌দে মানাফ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব জাহেলী গোষ্ঠী বিদ্বেষ ও উগ্র জাত্যাভিমান ছাড়াও আরো কিছু বিচার বিবেচনা আরব সমাজে এমনও ছিলো, যার কারণে কোরায়শরা ইসলামের নব উদগত চারা গাছটিকে উপড়ে ফেলতে চাইছিলো। এই সব বিচার বিবেচনার কোনো নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধের সাথে নয় বরং শুধু জাহেলী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা গোত্রীয় স্বার্থপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। ইসলামের চারা গাছটির শেকড় মজবুত হওয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তারের আগেই তারা তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো, কেননা পরে হয়তো এ কাজ করা দুরূহ হয়ে যাবে।

বিশেষত যখন ইসলাম ব্যক্তিগত দাওয়াতের যুগ পেরিয়ে সামষ্টিক দাওয়াতের যুগে প্রবেশ করেছে। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে (স.) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে দাওয়াতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। কোরআন জাহেলিয়াতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছে এবং শেরেকী আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে, তখন হয়তো পরে আর কখনো এ সুযোগ আসবেই না।

রসূল (স.) যদিও একজন নবী ছিলেন, স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে ওহী লাভ করতেন এবং আল্লাহর ঊর্ধতন ও ঘনিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি তো মানুষই ছিলেন। মানবীয় আবেগ উত্তেজনা তাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো। মোশরেকরা তার বিরুদ্ধে যে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, তা তাকে ও তার মুষ্টিমেয় মোমেন সাহাবাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো। মোশরেকরা রসূল (স.)-কে যে সব আজেবাজে কথা বলে কটাক্ষ করতো, 'পাগল' বলাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর এ ছাড়াও আরো অনেক বিদ্রুপের বানে স্বয়ং রসূল (স.)-কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বিদ্ধ করতো–এ সবই তাদেরকে শুনতে হতো। এ সব বিদ্রুপ ও মশকরা কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবীদের অনেকে নিজের ঘনিষ্টজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-কটাক্ষ প্রত্যেক মানুষকেই যতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত করে, ততখানি আর কোনটাই করে না। এমনকি তার শিকার যদি খোদ রসূলও হন, তবে তিনিও এর ব্যতিক্রম নন।

www.pathagar.com

এ কারণেই আমরা আমপারার সূরাগুলো সহ সকল মক্কী সূরায় দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাদের প্রশংসা করছেন। ইসলামী দাওয়াতে ও রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বে ইসলামের যে চারিত্রিক মহত্ব ফুটে উঠেছে তা প্রকাশ করছেন। মোশরেকরা তাদের বিরুদ্ধে যেসব মনগড়া কথা বলে, তা খন্ডন করছেন এবং এই বলে দুর্বল মুসলিমদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, 'তোমাদের শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। তোমাদের পক্ষে আমিই তাদের সাথে লড়বো।'

সূরা আল-কালামের শুরু থেকেই আমরা রসূল (স.) সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা উচ্চারিত হতে দেখি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কলমের শপথ এবং লোকেরা যা লেখে তার শপথ, তুমি স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। নিসন্দেহে তোমার জন্যে চিরস্থায়ী প্রতিদান রয়েছে। নিসন্দেহে তুমি এক সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছো।'

দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহভীরুদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগিচা রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়েছে? এ কি ধরনের সিদ্ধান্তে তোমরা উপনীত হচ্ছো?'

অপর এক জায়গায় রসূল (স.)-এর জনৈক কট্টর দুশমন প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'সেই ব্যক্তির অনুসারী হয়ো না, যে ব্যক্তি কথায় কথায় শপথ করে, অত্যধিক পরনিন্দুক ও চোগলখোর। সৎ কাজে বাধা দানে অতীব তৎপর, অত্যাচারী ও পাপিষ্ট, অতি মাত্রায় অহংকারী ও জারজ, প্রচুর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হওয়ার কারণে যার এতো স্পর্ধা, যার সামনে কোরআন পাঠ করা হলেই বলে ওঠে, 'সব তো সেকেলে কিচ্ছা কাহিনী। অচিরেই আমি তার শুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।'

অতপর যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সুতরাং আমাকে এবং এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এমনভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেবো যে তারা টেরই পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দেবো। আমার কৌশল খুবই সুক্ষ্ম।'

এই কৌশল আখেরাতের সেই আযাবের অতিরিক্ত, যা অহংকারীদের অহংকারকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে। যে দিন অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং তাদেরকে সাজদা করার আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তখন তারা ঘোরতর লাঞ্ছনার শিকার হবে। অথচ ইতিপূর্বে তাদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সাজদার জন্যে ডাকা হতো।

www.pathagar.com

অহংকারের পরিণাম প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা একটা বাগানের মালিকদের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী কুচক্রী কোরায়শ নেতাদের শাসানো ও ভয় দেখানো। সূরার শেষে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে তাই অটুট ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করো এবং মাছের পেটের অধিবাসীর মতো হয়ো না।'

এই সান্ত্বনা সহানুভূতি প্রশংসা ও প্রবোধসূচক বক্তব্য এবং ইসলামী দাওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর আক্রমণাত্মক ও হুমকিসূচক বক্তব্য উচ্চারণের পর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের কঠোর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার মুসলমানদের কিছু বৈশিষ্টের সন্ধান পাই। সেটা ছিলো মুসলমানদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার যুগ, তাদের জন্যে এক দুর্বিষহ কঠিন সময়। সেটা ছিলো সেই শত্রু ভূখন্ডে দ্বীনের সেই মহতী চারাগাছটিকে রোপনের জন্যে মোমেনদের দুঃসাহসী চেষ্টার এক পবিত্র মুহূর্ত। অনুরূপভাবে সূরার বাচনভংগী ও বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার ইসলামী আন্দোলন কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো তাও জানতে পারি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তৎকালীন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, আবেগ অনুভূতি, চেতনা এবং সমস্যা সব কিছুতেই একটি আদিমতার ছাপ পরিস্ফুট ছিলো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধে তারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলো, তাতেই আমরা এই আদিমতার সাক্ষাৎ পাই। তারা রসূল (স.) কে 'পাগল' বলেছিলো। এই অপবাদটি আরোপে বিন্দুমাত্রও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করা হয়নি। কোনরূপ যুক্তি ও ভূমিকা ছাড়াই নবীর প্রতি অশ্রাব্য গালি ছুঁড়ে মারা ছাড়া তারা দ্বিমত প্রকাশের আর কোনো ভাষাই খুঁজে পায় না, সভ্যতার সেই আদিম স্তরের লোকদের রীতিই এটা।

আদিম স্তরের মানুষের উপযোগী এই ভাষার সরলতা আমরা দেখতে পাই তাদের মিথ্যা অপবাদ খন্ডনে আল্লাহ তায়ালা যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতেও। তিনি বলেন,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান। তুমি প্রতিষ্ঠিত আজ এক সুমহান চরিত্রের ওপর।'

অনুরূপভাবে এটা দেখতে পাই সূরার এ আয়াতে ঝংকৃত প্রকাশ্য রোষ কষায়িত হুংকারে,

'আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখ্যানকারীকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে (অধপতনের শেষ স্তরে) এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।' ভাষার এই সরলতা কাফেরদের এক ব্যক্তির ওপর পাল্টা গালাগাল বর্ষণের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করো না যে ঘন ঘন শপথ করে, যে অত্যন্ত নীচ, যে অতিশয় নিন্দুক ও চোগলখোর, সৎ কাজে বাধা দানকারী, সীমাতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ, ধিকৃত ও জারজ। ....'

www.pathagar.com

ভাষার উক্ত সরলতা আমরা বাগানের মালিকদের সংক্রান্ত সেই ঘটনাতেও দেখতে পাই, যা আল্লাহ তায়ালা এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। এটি ছিলো এমন একটি দলের ঘটনা, যারা আপন চিন্তাধারায়, ধ্যান ধারণায়, অহংকারে, কথাবার্তায় ও চালচলনে অসভ্য ও নির্বোধ মানুষের মতই সরল ছিলো। সূরার এক জায়গায় তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'তারা অতি সংগোপনে এরূপ শলাপরামর্শ করতে করতে রওনা হলো যে, আজ বাগানের ভেতরে কোনো মিসকীনই যেন ঢুকতে না পারে।....'

সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাতেও একই ধরনের সরল ও সহজবোধ্য বাচনভংগী দেখতে পাই,

'তোমাদের কাছে কোনো কেতাব আছে নাকি, যা তোমরা পড়ো? তাতে কি তোমাদের অতি পছন্দনীয় কথাবার্তা আছে? ..... হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, এ সব বিষয়ে জবাব দেয়ার দায়িত্ব কে নেবে?'

এ সব প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় মোশরেকরা কি ধরনের চিন্তাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলো। সেই সাথে কোরআনের বিশিষ্ট বাচনভংগীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবনের ঘটনাবলী জানা যায়, জানা যায় ইসলামী দাওয়াত কি কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলো, কোরআন সেই পরিবেশকে এবং ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সেই দলটিকে রসূল (স.)-এর জীবনের শেষভাগে কতখানি উন্নীত করেছিলো এবং তাকে সেই প্রাক ইসলামী জাহেলী চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, চেতনা, মূল্যবোধ ও নির্বোধ সুলভ সরলতার স্তর থেকে কত উচ্চে উত্তোলন করেছিলো।

কোরআনের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের পর তাদের জীবনে, আকীদা বিশ্বাসে, ধ্যান-ধারণায়, মূলবোধে, আবেগ-অনুভূতিতে ও বাস্তবতায় মাত্র বিশ বছরের মধ্যে কি আমূল পরিবর্তন এসেছিলো। বিশ বছর যদিও কোনো জাতির জীবনে নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য একটি সময়, তবুও সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের জীবনে যে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, সমগ্র মানবেতিহাসে তার তুলনা নেই।

সেই বিপ্লবের বদৌলতে তারা গোটা মানবজাতির নেতৃত্ব হস্তগত করেছিলো এবং তাদের চিন্তাধারা ও স্বভাবচরিত্রের এতো উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, যা ইতিহাসে আর কখনো সাধিত হয়নি। সেই নযীরবিহীন বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো আকীদা বিশ্বাসের ধরনে ও গুণমানে, মানুষের পার্থিব জীবনে সেই আকীদা বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নে, সমগ্র মানবজাতিকে উদারতা ও সহমর্মিতার এক অখন্ড ও বিশালকার বৃত্তে সমবেতকরণ ও একীভূতকরণে, সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় চেতনাগত, চিন্তাগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রয়োজন পূরণে। তাদের জীবনে সংঘটিত এই সর্বাত্মক বিপ্লব ছিলো আসলেই একটা অলৌকিক ঘটনা।

এ সর্বাত্মক বিপ্লব নিছক একটি সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা এবং একটি দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে শক্তিমানে পরিণত করার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক ব্যাপার। কেননা ব্যক্তি মানুষের মনমানস ও স্বভাব চরিত্র গঠন গোষ্ঠী ও সমাজ মানস গঠনের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

www.pathagar.com

সূরা হাক্কাহ

এটি একটি ভয়ংকর আতংক সৃষ্টিকারী সূরা। এটি শোনামাত্রই স্নায়ুতে একটা তীব্র ঝাকুনি অনুভূত হয়। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেতনায় ক্রমাগত করাঘাত করতে থাকে। এটি যেই পড়ে এক অবর্ণনীয় ভীতি তার গোটা সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো একের পর এক তার সামনে আসতে থাকে এবং তা তার স্নায়ূতন্ত্রীকে ঝাকুনি দিয়ে চলে যায়। কখনো ভীতি ও শংকা, কখনো ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবার কখনো শান্তির অনুভূতি জাগে। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় এক অতন্দ্র ও সদা জাগ্রত সত্তার দৃপ্ত তৎপরতা।

সূরাটি সামগ্রিকভাবে শ্রোতার চেতনায় সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তা হচ্ছে এই যে, দ্বীন ও ঈমানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়। এতে কোনো তামাশার অবকাশই নেই। এটি দুনিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ, আখেরাতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর দাড়িপাল্লায় ও হিসাব-নিকাশেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। তাই এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। যে কেউ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার চেষ্টা করবে, সে আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গযবের কবলে পড়বে। রসূল (স.) যদি একে উপেক্ষা বা অবহেলা করতেন, তাহলে তাঁরও রেহাই ছিলো না। কেননা দ্বীন ও ঈমান গোটা মানব জাতির চেয়েও মূল্যবান, দুনিয়া জাহানের সবকিছুর চাইতেও বেশী গুরুত্বপুর্ণ, মহীয়ান ও গরিয়ান।

বস্তুত আল্লাহর এ দ্বীনই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়মূলক, অকাট্য মহা সত্য– যাতে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্রও নেই। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ দ্বীন তাই সৃষ্টি জগতের সব কিছুর উর্ধে।

উপরোক্ত নিগুঢ় তত্ত্ব এই সূরার নাম থেকেই প্রতিভাত হয়। সূরাটিতে কেয়ামতেরও একটি নাম মনোনীত করা হয়েছে। নামটি হচ্ছে 'আল-হাক্কাহ'। এ শব্দটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয় ভাবেই মানবীয় স্নায়ূতে সত্য প্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যের জন্যে দৃঢ়তার ভাবধারা বদ্ধমূল করে দেয়। শব্দটির ধ্বনিতাত্বিক ও উচ্চারণগত ভারত্বের বিশ্লেষণ করলেও মনে হয়, এটি শ্রোতার ওপর এমন ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয় যে সত্যের অবস্থানে সে একেবারেই স্থির হয়ে যায়।

এই দ্বীন, এই আকীদা এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েও এই তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। সেই পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সূরার শুরু থেকেই। সে বিবরণে দেখানো হয়েছে কি সাংঘাতিক ও বীভৎস পরিণতি ইসলামের দুশমনদের কপালে জুটেছিলো। বলা হয়েছে, 'সামূদ ও আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিলো সেই অতর্কিতে নেমে আসা ভয়ংকর ঘটনাকে। সামুদ তো এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড় দিয়ে।'

www.pathagar.com

'.....যেন কোনো সংরক্ষক তার স্মৃতিকে সংরক্ষণ করে রাখে।'

এভাবে যে বা যারাই এই সত্যকে অগ্রাহ্য করেছে, তাকে বা তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। সে পরিণতি ছিলো ততটাই ভয়াবহ ও মারাত্মক, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব এই মহাসত্য। এতে আদৌ কোনো তামাশা বা অবজ্ঞা অবহেলার অবকাশ ছিলো না।

কেয়ামতের যে ত্রাস-সঞ্চারী দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতেও সত্যের উল্লেখিত তাৎপর্য প্রতিফলিত। সে সময়ে সৃষ্টি জগতের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং মহান আল্লাহর জ্যোতির বিস্ফোরণ ঘটবে। বলা হয়েছে, 'যখন শিংগায় একটি ফুঁক দেয়া হবে..... তোমার প্রভুর সিংহাসন সেদিন মাথার ওপর বহন করবে আটজন।'

পূর্বেকার আতংকজনক বিবরণ আর এখানকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগ্রতকারী বিবরণ এ দুয়ে মিলে হিসাব নিকাশের দৃশ্যের ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং উল্লিখিত নিগুঢ় তাৎপর্যকে চেতনায় আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে। এরপর মুক্তিলাভকারী ও শাস্তি ভোগকারীদের বাক্যালাপের উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে। যথা,

'যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমার এই হিসাব-নিকাশ হওয়ার এই দিনটির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো।'

এই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেছে। তবু স্পষ্ট করে নিজের মুক্তির কথা ব্যক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা না দিলেই ভালো হতো। আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম এবং আমার মৃত্যুই যদি আমাকে নিশ্চিত করে দিতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো। আমার সহায় সম্পদ (আজ) কোনো কাজে লাগলো না। ....।' এভাবেই অপরাধীর শোচনীয় পরিণতি মানবীয় অনুভূতিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এরপর সেই ভয়াবহ দিনের বিভীষিকাময় দৃশ্যে আরো একটা ব্যাপার সংযোজিত হয়। সেটা হলো সে দিনের সর্বময় কর্তার এই ঘোষণা, 'ওকে গ্রেপ্তার করো এবং ওর ঘাড়ে শেকল পরাও। তারপর ওকে জাহান্নামে ছুড়ে মারো। তারপর সত্তর হাত লম্বা শেকলে ওকে বাঁধো।' এ আয়াত কয়টির প্রতিটি আয়াত যেন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর সমান ভারী হাতুড়ি হয়ে আমাদের বুকে অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানে।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই ভয়াবহ পরিণতির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সে (আসলে) মহান আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, দরিদ্রকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। আজ তাই এখানে তার কোনো অন্তরংগ বন্ধু নেই। ক্ষতস্থানের নোংরা নির্যাস ছাড়া তার আর কোনো খাদ্য নেই, যা কেবল পাপিষ্ঠ লোকদের খাদ্য।'

তারপর সেই তাৎপর্য এই শপথ বাক্যেও প্রতিফলিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন, 'তোমরা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাওনা তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মহান দূতের বাণী। এটা কোনো কবির কথা নয়.... বিশ্ব প্রভুর প্রত্যাদেশ।' সর্বশেষে

www.pathagar.com

এই মর্মে চূড়ান্ত হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে যে, এই দ্বীনকে নিয়ে কেউ যদি ছিনিমিনি খেলে বা বিকৃত করে, তা সে যেই হোক না কেন, এমনকি খোদ রসূলও যদি হয়, তবু তার রেহাই নেই,

'যদি মোহাম্মদ (স.)ও নিজের কোনো মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিঁড়ে ফেলতাম। আর সে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে না।' বস্তুত এ দ্বীন এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে কোনো আপোষ, দরকষাকষি বা উদাসীনতার অবকাশ নেই।

সূরার শেষে কোরআন ও তার উপস্থাপিত দ্বীন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

'নিশ্চয়ই এই কোরআন আল্লাহভীরুদের জন্যে স্মরণিকা। .....অতএব তোমার মহান প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো।' সূরার শেষে এ হচ্ছে কোরআন সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য।

এই সূরার বর্ণনাভংগী এমন দৃশ্য তুলে ধরে যে, পাঠক তার সামনে একেবারে সত্য ঘটনা চলন্ত ও জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে বলে অনুভব করে। এ দৃশ্য সমূহ অত্যন্ত নাটকীয়, প্রভাবশালী, সংক্ষিপ্ত ও ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন। যেন সামূদ, আদ, ফেরাউন ও লুত (আ.)-এর জাতির বিধ্বস্ত জনপদগুলোর দৃশ্য একের পর এক আমাদের সামনে দিয়ে জীবন্ত হয়ে অতিক্রান্ত হয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর আমলের মহাপ্লাবনের ঘটনা, কিছু সংখ্যক মানুষের নৌকায় আরোহন ও বাদবাকীদের ধ্বংসের দৃশ্য এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যকে মাত্র কয়েকটি শব্দে ব্যক্ত করে দিচ্ছে। আদ জাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য এবং তাদের সম্পর্কে এই শব্দগুলো এরূপ উপমা দেয় যে, তারা খেজুরের পুরানো পতিত ডালের মতো বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিলো। সাত রাত ও আট দিন ধরে এক নাগাড়ে ঝড় চলতে থাকা এবং আদ জাতিকে সমূলে উৎখাত করার বিবরণ এমন চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় দেয়া হয়েছে যে, তার তুলনা বিরল। কোরআন যে আসলেই ভাষার মোজেযা, এ সূরা অধ্যয়ন করলে সে সম্পর্কে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

কেয়ামতের ভয়াবহ বিস্ফোরণের কথা এমন ভাষায় বলা হয়েছে যে, মনে হয় এ বিস্ফোরণ এক্ষুণি আমাদের সামনেই সংঘটিত হবে। আকাশ ও পৃথিবীকে এক সাথে উত্তোলন করা ও তারপর এক সাথে আছাড় দেয়া। তারপর আকাশ ফেটে যাওয়া এবং সেদিন আকাশের খুবই দুর্বল হওয়া এবং ফেরেশতাদের আকাশের প্রান্তে অবস্থান এ সব আল্লাহর দোর্দন্ড প্রতাপের এমন ভয়াল দৃশ্য যেন তা এক্ষুণি সংঘটিত হচ্ছে। তা ছাড়া আটজন ফেরেশতার আল্লাহর আরশকে ঘাড়ে তোলা, মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম সহ আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া এবং তাদের কোনো কাজ বা কথাই গোপন না থাকা এ সব বিবরণ পড়ে সত্যি যেন কেয়ামতের মাঠ ও আল্লাহর আদালতের ছবি চোখের সামনে প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

এরপর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তার ডান হাতে তার আমলনামা। তার এতো আনন্দ যেন সমগ্র পৃথিবী তার সে আনন্দে মাতোয়ারা। উল্লসিত হয়ে সে সবাইকে তার আমলনামা পড়ে দেখার জন্যে ডেকে। বলছে, 'এই যে আমার আমলনামা তোমরা পড়ো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, একদিন হিসাব নিকাশের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে।' অপরদিকে ব্যর্থকাম মানুষের দৃশ্য। তার বাম হাতে তার আমলনামা। আর তার প্রতিটি বাক্য থেকে অনুতাপ, দুঃখ ও হতাশা প্রতিফলিত। 'হায় আফসোস! আমাকে আমার আমলমানা না দেয়া হলেই ভালো হতো.....আমার সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন 'ওকে গ্রেফতার করো অতপর শেকল পরাও.....' একথা শুনে কম্পিত হবে না এমন কে আছে? সেদিন আল্লাহর এ আদেশ কেমন ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিপালিত হবে তা সবাই দেখতে পাবে। সেদিন যারা ব্যর্থ হবে তাদের অবস্থা হবে বড়ই করুণ। বলা হয়েছে, সেদিন সেখানে তার কোনো বন্ধু থাকবে না .....' এ সব সত্যিই খুব ভয়াবহ দৃশ্য।

সবার শেষে যে হুমকি আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তা শুনে আতংক অনুভব করে না এমন মানুষ অত্যন্ত কম।

এই সুরায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের ধ্বনাত্মক বৈশিষ্ট খুবই লক্ষণীয়। বাক্যের ভেতরে যে দৃশ্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব দৃশের অনুপাতে শব্দের স্বরগত তারতম্য রয়েছে। উদারহণ স্বরূপ সূরার শুরুতে 'আল-হাক্কা, উচ্চারণে দীর্ঘ টান, দ্বিত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রথম আয়াত দুটিতে থামলেও যেমন শ্রোতার মনে তা বিশেষ প্রভাব পড়ে, না থামলেও তেমনি। এ শব্দগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে আনন্দ ও বেদনা, আশা ও নিরাশার যে দৃশ্য রয়েছে, তাও যেন সংশ্লিষ্ট শব্দ সমূহ উচ্চারণের সাথে সাথেই জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এই শব্দগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রণালীর সাথে সে দৃশ্য সমূহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর যেই অপরাধীর শাস্তির বিবরণ শুরু হয় অমনি শব্দের সূর ও ধ্বনি পাল্টে যায়।

'ওকে ধরো, শেকল পরাও, অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো' এর প্রতিটি শব্দের সূর বক্তব্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতপর সহসাই সূর পাল্টে যায় যখন আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, তোমার মহান প্রভুর তাসবীহ করো।'

এখানে শব্দগুলোর সুর ও ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়েছে। কেননা এখানে কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ কয়টা জিনিস আমি উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করলাম। নচেৎ সমগ্র সূরা আসলে এরূপ। বস্তুত এ সূরার শব্দ কাঠামোই এমন যে, যে-ই তা শুনবে, সে প্রকম্পিত না হয়ে পারবে না এবং তা যে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অলংকার বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

www.pathagar.com

সূরা আল মায়ারেজ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সে সকল সূরার অন্যতম যা মানুষের অন্তরকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আমরা যদি একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রাচীনকালের জাহেলিয়াত এবং আধুনিক কালের জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধুই বাহ্যিক, মৌলিকভাবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, তাই আধুনিককালের যে কোনো জাহেলিয়াতের মোকাবেলায়ও এ সূরাটি সমভাবে ক্রিয়াশীল।

অন্যকথায় বলতে গেলে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব মনে যতো প্রকার সংকট ও সমস্যা এসে তাকে কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে এবং সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জিভূত যে সকল কুসংস্কার মানুষকে সরল সত্য পথ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে সে সময় মুসলমানদেরকে এই সব ধরনের জটীলতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যে অবধারিত সত্যটি এ সূরার আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে–

আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে, বিশেষ করে কাফেরদেরকে অবশ্যই আযাব পেতে হবে।

কোরআনে করীমের বহু স্থানে এই আযাবের বিশদ বর্ণনা এসেছে। ঈমানের পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবনকে গড়ার জন্যে যে মযবুত ইচ্ছার প্রয়োজন তাকে এক রকম পাগলামীর সাথেই তুলনা করা যায়, কারণ জীবনলক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে পাগলপ্রায় না হলে সে লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ কাজে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা ও অনেক রকমের ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়।

এ বাস্তব সত্যটি ঈমানে পরিপূর্ণ দিল এবং ঈমানশূন্য অন্তর উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও লক্ষ্য তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নমূখী, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে দেওয়ানা না হয়ে সে লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। চিন্তার ক্ষেত্রে, চলার পথে ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্খায়, সর্বত্র তার এই একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর পথকে পরিহার করে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বড় হয়ে থাকার জন্যে তার সকল কাজ ও ব্যবহারকে পরিচালনা করবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হীনতা, অপমান এবং ঘৃণা নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মূল্যের পার্থক্য আল্লাহর কথা থেকে যেমন জানা যায় তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের কথা থেকেও। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তাদের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

জাহেলিয়াতের সে জটীল গ্রন্থীগুলো খোলা এবং মানুষের মন-মানসিকতার দুর্ভেদ্য সংকট দূর করার জন্যে এ সূরাটির অবতারণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনে কারীম যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং

www.pathagar.com

গোটা সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোই তার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন এনে সমাজের মধ্যে তাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে কোরআনে কারীম আপন বক্তব্য তুলে ধরেছে। একারণেই মোমেনের হাতে তরবারি তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে এমন সব মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে যার ফলে ইসলামের দুশমনদেরকে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে।

কোরআনে পাককে যারা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তাদের কাছে নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্র এমনভাবে মুর্ত হয়ে ওঠে যে, তা এদের মন মেজাযের ওপর এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সে শক্তিশালী প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে আর সম্ভব হয় না। রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই অদ্ভুত ও আশ্চর্য আকর্ষণ অবশেষে তাদেরকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। মক্কার জনগণ এভাবেই তাঁকে শেষপর্যন্ত তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

তাঁর এই সর্বগ্রাসী চারিত্রিক প্রভাবকে কখনও এক ভীষণ তুফানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার আওতা থেকে কিছুই রেহাই পায় না। আবার কখনও সে যাঁতাকলের সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে কিছু পড়লে তা গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় অথবা এমন চাবুকের সাথে তুলনা করা যায় যার ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক কষাঘাত থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায় না তেমনি তা সহ্যও করা যায় না। এর অগ্নিবর্ষি আয়াতে হৃদয় মন বিকল হয়ে যেতে চায়, আবার সে আকুল আবেদনের সাথে কখনও তুলনা করা যেতে পারে যা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। অথবা তুলনা করা যায় সে মনোরম সফরের সাথে যা যে কোনো যাত্রীর হৃদয় মনকে মুগ্ধ-আবেগে এমনভাবে বিমোহিত করে যেন তার সেখানে নিজস্ব চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

কখনও আবার তার ভীষণ প্রভাবকে এক নিদারুণ ভীতি ও ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনির সাথে তুলনা করা যায়, যার কারণে মানুষ ভীত বিহবল চিত্ত ও বিস্ফোরিত নয়নে তার দিকে চেয়েই থাকে, কখনও এই প্রভাব বলয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণে তার কাছে সত্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই তার থাকে না।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সুন্দর এক সম্পিল আশায় মোমেনের মনপ্রাণ ভরপুর হয়ে যায়, পার্থিব যে সংকটাবর্তে ইতিপূর্বে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো তা থেকে স্বানন্দে বেরিয়ে আসে। অনাগত দিনের আগমন কামনায় তাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

আবার কখনও একে তুলনা করা যায় সে অবস্থার সাথে যে, সত্যের সংস্পর্শে এসে বিরোধীদের ভ্রুকুটিতে মন যখন বিচলিত হয়ে পড়তে চায়, তখন মনে হয় বন্ধুর গিরিসংকট অতিক্রম করার পর্যায়ে এসে ক্লান্ত পথিকের সামনে সেই হতাশ মুহূর্তে তা যেন অকস্মাৎ আশার এক আলোক রেখা। যেন সংকটাবর্তের গভীরে নিজ চোখে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

এগুলোর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি লজ্জিত করে তোলে, সত্যের এই প্রসারকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, সত্য থেকে গাফেল এই গোষ্ঠি তখন নানা প্রকার প্রতিহিংসায় ফেটে পড়তে চায়। এই বিরোধিতায় যারা সত্যের বিজয়কে গভীর উৎসাহের সাথে অবলোকন করতে থাকে, তাদের সামনে যখন কোরআনের পাঠক তার দিগবিজয়ী দাওয়াতকে তুলে ধরে এবং 'একজন দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) সকল কিছুর বিনিময়ে সত্যের এই সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় সফলতা লাভ করে–যখন সত্যের মুঠো মুঠো আলোতে সে নিজে অবগাহন করতে তাকে তখন সমাজ জীবনের ব্যাধিসমূহ এমনিই ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। এ সময় এই সত্য সন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখতে পায় কেমন করে কোরআনে পাক সেই বিদ্রোহী ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে চলেছে।

সত্যের এই উদাত্ত আহ্বান পেশ করে জাহেলিয়াতের পর্দা উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে সূরাটি আখেরাতের বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। এই আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন গ্রহণ করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও কঠিন পথ পরিক্রমের প্রয়োজন।

আখেরাতের বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যে বিরোধীদের কাছে সূরা 'আল হাক্কা'তে প্রচুর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে আলোচনা এসেছে কিছুটা ভিন্নভাবে, সেখানে সম্পূর্ণ এক নতুন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সূরা 'আল-হাক্কা'-তে আখেরাতের ভয়াল ও বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে, কিন্তু এ সূরার আলোচনা এসেছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে নতুন এক দৃষ্টিকোণ পেশ করা হয়েছে, নতুন চিত্র ও মর্মস্পর্শী কিছু নতুন অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, 'যখন একটিবার মাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতও যখন একটিবার ভীষণভাবে দুলে উঠবে সেই দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং তখন সে আকাশ ফেটে পড়বে। সেদিন সেই ভয়ানক অবস্থা সকল কিছুকে শক্তিহীন করে দেবে।'

'ফেরেশতারা সেদিন নিজ নিজ স্থানে স্থবির হয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষমান থাকবে এবং তোমার মালিকের আরশ-কে সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তাদের মাথার ওপরে ধরে রাখবে।' সে অবস্থার বর্ণনা মানুষের চেতনাসমূহকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত ও অভীভূত করে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তোমাদের সবাইকে হাযির করা হবে, কোনো আত্মগোপনকারীই সেদিন নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না।' এভাবে সেই দিনের আযাবের দৃশ্যসমূহ মানুষের মনে এমন ভয় ভীতির সঞ্চার করবে যে এতে তাদের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে। হুকুম হবে, 'পাকড়াও করো ওকে, কষে বেঁধে ফেলো তাকে, তারপর ওকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। অতপর সত্তর গজ দীর্ঘ শেকলে আবদ্ধ করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।'

এ বর্ণনায় শাস্তিপ্রাপ্ত এ ব্যক্তিদের চীৎকার হা-হুতাশ ও হাহাকারের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলবে, 'হায় আফসোস, আমাকে যদি আমার আমলনামা নাই দেয়া হতো, যদি আমি আমার ভাগ্য-লিখন মোটেই না জানতাম! হায়, আমি যদি (আজ) মৃত হতাম!'

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে কেয়ামতের বিভীষিকার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে সেখানে তাদের চেহারার কি ভয়ানক রূপ হবে তা দেখানো হয়েছে, কেমন সন্ত্রস্তভাবে তারা হাঁটবে এবং তাদের চলার পথ কতো ভয়ংকর হবে। এ অবস্থা পৃথিবীর যে কোনো ভয়ংকর অবস্থা থেকে অনেক বেশী গুণে কঠিন হবে। আসলে সে ভয়ংকর অবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, অর্থাৎ যতো প্রকার ভীতিজনক অবস্থা মানুষ চিন্তা করতে পারে এটা তার থেকেও অনেক কঠিন।

আগুন এর শাস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পায়ের গিরা স্পর্শ করলে তার তাপে মাথার মগয পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআনে পাক বলছে– 'সেদিন আকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো সব হয়ে যাবে ধুনা তুলার মতো।'

সে সময় অন্তরংগ বন্ধু তার পরম বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। অপরাধী ব্যক্তি সেই কঠিন দিনে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে চাইবে। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন-সংগিনী, ভাই, নিজের এমন আত্মীয় যার কাছে সে (প্রয়োজনের সময়) আশ্রয় নিয়েছে এবং পৃথিবীর যতো মানুষ ও সম্পদ আছে সকলের বিনিময়ে হলেও নিজেকে সে শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে।

জাহান্নামের যে ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয় তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক গতিশক্তি এবং এক অনুভূতি থাকবে। এ জাহান্নাম জীবন্ত কিছুর মতো জীবন্ত প্রাণীকে ভীতি প্রদর্শনে সক্ষম হবে। এরশাদ হচ্ছে–

'জাহান্নামের সে ডগডগে আগুন গোটা দেহকে ঝলসে দেয়ার পর শরীরের চামড়া ও মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে। সে ওই ব্যক্তিকে তার দিকে ডাকতে থাকবে যে সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো! যে ধন সম্পদ পু ীভূত করে রাখতো এবং তাই নিয়েই সর্বদা মাথা ঘামাতো ও তাতেই মেতে থাকতো।'

আর যে আযাবের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা অপরাধীদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং অকল্পনীয়ভাবে একের পর এক তার ওপর বিপদসমূহ আসতে থাকবে। বলা হচ্ছে–

'সেদিন তারা কবর থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসবে যেন কোনো এক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্যে তারা সবাই ছুটে চলেছে। তাদের চোখগুলো থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত এবং হীনতা-দীনতা ও বে-ইযযতির গ্লানিতে তাদের গোটা সত্বা ঢাকা থাকবে.....।'

এ দিনের দৃশ্য, বাস্তব ছবি ও প্রতিবিম্বের যেসব কথা এই সূরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তা সূরা 'আল হাক্কা'–এর বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সূরা দুটিতে বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও বিষয়বস্তু মূলত একই। সুখে দুঃখে, সংকটে সচ্ছলতায় এবং ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার অবস্থা দেখা দিতে পারে সূরায়ে 'মায়ারেজ'-এ তার বিশদ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে যে অভ্যাসটি একই রকম দেখা যায় তা হচ্ছে,

www.pathagar.com

'নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যস্ত চরিত্রের সৃষ্টি রূপে, যখন কোনো দুঃখ কষ্ট বা অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে পেরেশান হয়ে যায়, আবার যখন কল্যাণ ও শুভদিনের মুখ দেখে তখন কাউকে দান করার ব্যাপারে সে সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে ওঠে, তবে সেই সকল নামাযী, যারা সদা সর্বদা নামাযে যত্নবান তাদের কথা আলাদা।'

তারপর বর্ণনার ধারা সাবলিল গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মোমেনদের গুণাবলী, মন মানসিকতা ও তাদের চলার প্রকাশ্য ও গোপন পথ সম্পর্কে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ, আল্লাহর অনুগত ও না-ফরমান উভয় প্রকার লোকই বর্তমান থাকে। আল্লাহর অনুগত যারা, সকল যামানায় তাদের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেসব গুণ থাকতে পারে এখানে তা তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'তবে সে সকল মুসল্লী যারা নামাযে যত্নবান, তাদের সম্পদের মধ্যে সে সব লোকের হক্ব রয়েছে যারা হাত পেতে কিছু চায় এবং যারা প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুসমূহ থেকে বঞ্চিত।'

সূরা 'আল হাক্কা'-তে যে মূল বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, মূলত এর ভিত্তিতেই মানুষের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। তারপর অন্য যে সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আখেরাত অন্যতম। এ সূরায় আলোচ্য আরো কিছু বিষয় হচ্ছে সত্য অস্বীকারকারী এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এরা আখেরাতে ধরা পড়ে যাবে এবং তাদের রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।

অপরদিকে সূরা 'মায়ারেজ'-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাতের বাস্তবতা তুলে ধরা এবং সেখানে যে প্রতিফল ভোগ করতে হবে সে বিষয়ের প্রামাণ্য চিত্র অংকন করা। আসলে সূরাটির মূল বক্তব্যই হলো আখেরাত যে সংঘটিত হবেই সকল প্রকার সম্ভাব্য যুক্তির মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা।

অন্যান্য যতো কথাই এ সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আখেরাতের সাথে অর্থাৎ আখেরাতকে কেন্দ্র করেই অপর সকল বিষয়ের অবতারণা। আলোচনার মধ্যে আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আল্লাহর পাকড়াও এবং মানুষের তরফ থেকে তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তির বর্ণনাও পেশ করা হয়েছে। অতপর এরশাদ হচ্ছে– 'তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং রূহ উঠে যায় এমন এক দিনে যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান; অতএব সুন্দরভাবে সবর করো, যে (বিষয়)-কে তারা সুদূর পরাহত মনে করে আমি তো তা দেখছি খুবই কাছে.....।'

একথাগুলো আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঈমানদার ও বে-ঈমান লোকদের দুঃখ ও সুখের জীবন যাপনের মধ্যে এই ধরনেরই পার্থক্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় প্রকার লোকদেরকেই শেষ বিচারের দিনে নিজ নিজ কাজের বদলা পেতে হবে।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও আলোচ্য বিষয় যে, কাফেররা চরম ধোকার মধ্যে রয়েছে, তারা এটা মনে করে খুবই আশান্বিত হয় যে, তারা সবাই জান্নাতে যাবে, যতোই তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলুক বা

www.pathagar.com

পরকাল সম্পর্কে যতোই উদাসীন থাকুক না কেন। সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে কাফেরদের এই মিথ্যা আশার কথা পেশ করা এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই সূরা আখেরাতের অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া থেকে বিরত থেকেছে, অথচ সে বিষয়ের অন্যান্য তথ্য জানার জন্যে পাঠকের হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আর একটি বিষয়ও এ সূরার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে দেখা যায় তা নতুন এক ভংগিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অন্য সূরাগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূরায়ে 'আল হাক্কা' এবং এ সূরার বর্ণনাভংগির মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও আলোচ্য বিষয় একই। সূরা 'মায়ারেজ'-এর এ বর্ণনায় বৈচিত্র রয়েছে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, শুধু বাক্যের ছন্দের মিলই নয় বরং প্রতিটি শব্দও অত্যন্ত সামঞ্জস্য রয়েছে।

এখানে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয় তা অন্য যে কোনো সূরার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। সূরাটির প্রথমার্ধে আরো কিছু বর্ণনা বৈচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমার্ধের শুরুর তিনটি বাক্যের দিকে তাকালে সূরাটির বর্ণনা বৈচিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বুঝা সহজ হবে। এখানে দেখা যায়, বাক্যের মধ্যে আলোচিত কথাগুলো তার সমাপনী কথার দৈর্ঘের সাথে ও নিম্ন বর্ণিত কিছু বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এরশাদ হচ্ছে,

'জিজ্ঞাসা করলো এক ব্যক্তি সে আযাব সম্পর্কে যা কাফেরদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে এবং যাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই।' (আয়াত ১-২)

পঞ্চম আয়াতের শেষে সবর-এর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘ টান দেয়ার মতো 'আলিফ' ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওরা তো দেখছে সে দিনটি অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে অত্যন্ত কাছে।' এখানেও দ্বিতীয় বারের মতো দীর্ঘ 'আলিফ' ব্যবহার হয়েছে। 'সে দিন আকাশ হসে বিগলিত (তরল) তামার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে ধুনা তুলার মতো এবং সে দিন কোনো অন্তরংগ বন্ধুই তার বন্ধু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না–কেউ কারো খোঁজ খবরও নেবে না।'এখানেও তৃতীয়বারের মত দীর্ঘ 'আলিফ' দ্বারা বাক্য শেষ করা হয়েছে, আয়াতের অভ্যন্তরে কিন্তু একই ধরনের শব্দ বা বর্ণনাভংগী ব্যবহার করা হয়নি। আযাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে আযাবের দৃশ্যগুলো যখন তাদেরকে দেখানো হবে তখন অপরাধী সেই কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিজের ছেলেকে মুক্তিপন হিসেবে সোপর্দ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখানেও দেখা যায় প্রথম বারের মতো দীর্ঘায়িত 'আলিফ' দ্বারা বাক্যটি শেষ করা হয়েছে।

'সে ভয়ানক আগুন ঝলসিয়ে দিয়ে শরীরের চামড়া ও রক্ত মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে, ডাকতে থাকবে সে ব্যক্তিকে যে (সত্যকে) পেছন (ফেলে) চলে গিয়েছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।' (আয়াত ১৫-১৭)

www.pathagar.com

এ সূরার মধ্যে যে পাঁচ জায়গায় দীর্ঘায়িত 'আলিফ' রয়েছে সেখানকার দুটি সমাপনী 'আলিফ-এর' উচ্চারণ প্রথম তিনটি আয়াতের উচ্চারণ থেকে আবার একটু ভিন্ন।

এরপর সূরার অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে দেখা যায় 'মীম' এবং 'নূন' দিয়ে শেষ করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রায় সবগুলোর পূর্বেই 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' এসেছে।

আর একটি বৈশিষ্ট এ সূরার শুরুতে রয়েছে যা সূরাটিকে অত্যন্ত গোছালো এবং এর বর্ণনা পরস্পরাকে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে এবং তা হচ্ছে, যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে ঘটনা সংঘটিত হবেই। যে কোনো শ্রোতার মনে একথাটি দৃঢ় প্রত্যয় জাগায়। তৎকালীন আরব পরিবেশে যে ধর্ম-বিশ্বাস বিরাজ করছিলো তাতে পরকালের আযাবের কথা বলা যেমন কোনো পরিচিত বিষয় ছিলো না, তেমনি আরববাসীদের কানগুলোও এমন কোনো কথা শুনতে এবং তার প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেই অভ্যস্থ ছিলো না। এ অবস্থায় আখেরাতের আযাব সম্পর্কে কোরআন অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষকে এমন কিছু কথা জানিয়েছে যা তৎকালীন আরববাসীরা সাধারণভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছে, যদিও তারা যেভাবে জীবন যাপন করছিলো তাতে এ দাওয়াত তাদের কাছে ছিলো নতুন এবং অপরিচিত।[১]

সূরা আন নূহ

আলোচ্য সূরার সবটুকুর মধ্যেই নূহ আলাইহিস সালামের কেসসা ও তাঁর জাতির করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কতো ধরনের অভিজ্ঞতা একজন মানুষের হতে পারে তার বাস্তব ছবি এ সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশেষ একটি সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরে স্থায়ীভাবে জাহেলিয়াতরূপী কঠিন রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কেও এখানে জানানো হয়েছে। এ বর্ণনার মধ্যে একথাটাও জানানো হয়েছে যে, ভালো ও মন্দের মধ্যে সংঘর্ষ এক চিরন্তন ব্যাপার।

নূহ (আ.)-এর ঘটনা জানার পর মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার মধ্যে একটি বড়ো অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, প্রতিহিংসাপরায়ন, বিপথগামী, অহংকারী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বরাবরই সত্যবিমুখ থাকে। হেদায়াতের যুক্তিপ্রমাণ তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যেসব বিস্ময়কর জিনিস তারা অনুভব করে এবং আদিগন্ত বলয়ে মনোমুগ্ধকর যা কিছু আছে তা থেকে ওরা মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য এ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের নিদর্শন রয়েছে যা মানব মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেই নেয়ামতগুলোর দিকে একটু ভালোভাবে

১. উৎসাহীদের এ ব্যাপারে 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' পুস্তকের 'আত তানাসুকুল ফান্নী ফিল কিতাব' অধ্যায় দেখার জন্য অনুরোধ করছি।–সম্পাদক

www.pathagar.com

দৃষ্টিপাত করলে সেগুলোর আলোকে সঠিক পথপ্রাপ্তি মোটেই কঠিন হয় না। আল্লাহর সেই বিধানসমূহ হিংস্র, বিপথগামী, অসৎ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবক্তাদের মনেও রসূল (স.)-এর আগমনের যথার্থতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। এইসব প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে সাথে রয়েছে নবী রসূলদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ইসলামের ভুবন মোহিনী দাওয়াতকে মানব সাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাঁদের পূর্ণাংগ আত্মনিবেদন, এ কাজের জন্যে বাঞ্ছনীয় নানা প্রতিকুলতার মোকাবেলায় পর্বত-সম তাঁদের অবিচলতা এবং নিরন্তর অধ্যবসায়, যা ভুলপথে পরিচালিত বিরোধী মনোভাবাপন্ন, পাপপ্রবণ ও উচ্ছৃংখল মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিখুঁত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু আফসোস, ওদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ওরা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছে না, ওদের কাছে সত্যপথের পথিক যারা হেদায়াতের পথে চলছে, তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই, তারা ঈমানী যিন্দেগীর মধ্যে উপস্থিত কোনো লাভ দেখতে পায় না! তারা তো মনে করে স্কুল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কাজ করলে, পড়াশুনা করলে বা পড়ালে যেমন মজুরী বা নানা প্রকারের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, ইসলাম গ্রহণ করলেও সে ধরনের কিছু না কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদেরকে যখন এরা কোনো বৈষয়িক সুবিধা পেতে দেখে না, তখন তারা পরবর্তীকালে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের খবরের প্রতি কোনোভাবেই আস্থা আনতে পারে না।

এমনি ধরনের এক পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে নূহ (আ.)-কে। দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর নিরন্তর চেষ্টা করার পর তিনি তাঁর হতভাগা জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে নালিশ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বিরোধীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে দিবারাত্র চেষ্টা করেছেন, এর জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা চালানোর সময়ে বিরোধীদের সকল বাধা-বিপত্তি, উপহাস, বিদ্রূপ, অবহেলা ও অবজ্ঞা-নীরবে সহ্য করেছেন। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার বিরোধীদেরকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর আহ্বান করার পর তিনি তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর দরবারে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি এই বলে দোয়া করেন,

'হে আমার রব, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার সেই আহবানের ফল তাদের জন্যে পালানো ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করেনি; আর যতবারই আমি তাদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ডেকেছি ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়ে থেকেছে ...।'

এরপর বলেছি, ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে. .... নূহ (আ.) পুনরায় দোয়া করতে গিয়ে বলছেন, 'হে আমার রব, ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে এবং সেই ব্যক্তির আনুগত্য করেছে যার ধনসম্পদ এবং সন্তান শুধু তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে ....।'

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে তৎকালীন সমাজের অবস্থা, আর পাশাপাশি আল্লাহর প্রেরিত নবীর দায়িত্ব পালন প্রণিধানযোগ্য। তিনি রেসালাতের হক আদায় করতে একটুও কসুর করেননি।

অনুরূপভাবেই সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সমগ্র পৃথিবীর বুকে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের দায়িত্ব ছিলো শেষ যামানার নবীর প্রতি মহাপবিত্র এক আমানত। রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটাই ছিলো সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকালে তাকে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পূর্বসূরী তারই এক ভাই নূহ (আ.) পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে কতো কঠিন দায়িত্ব কতো দীর্ঘকাল ধরে পালন করেছেন।

তাঁকে আরও জানানো হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সময়ে তাঁকে অতীতে কতো সাংঘাতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখানো হয়েছে সত্য-সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় বাতিলপন্থী নেতারা কতো কঠিন ও হিংস্র। আরও এটাও দেখানো হয়েছে যে, এতসব বাধা বিঘ্ন ও অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন-কানুন চালু করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলদের প্রেরণের এক অবিরত ধারা, যার একটি পর্যায় নূহ আলাইহিস সালামের ওপর এসে শেষ হয়েছে।

বিশেষভাবে মক্কার মুসলমানদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের সামনে নূহ (আ.)-এর যামানার সেই মহা সংকট ও সেই চরম বিদ্রোহী জাতির শাস্তির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে এই মুসলিম জাতিই নবী (স.)-এর ওয়ারেস বা উত্তরাধিকার হিসেবে কাজ করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে মানুষকে এগিয়ে আনার জন্যে দাওয়াত দানের কাজ তারা করবে, সেই জনপদকে সত্যের দিকে আহবান জানানোর জন্যে কাজ করবে, যারা শেরক বেদ্য়াতে ভরা পরিপূর্ণ জাহেলিয়াতের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে বরাবর হাবুডুবু খেয়েছে তারা হচ্ছে সেই সকল জাহেল যারা সবরকম অন্যায় ও অপকর্মের মধ্যে মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা করেছে এবং সেই সময়কার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছে। সংখ্যায় তারা যদিও ছিলো অতি নগণ্য।

কোরায়শদের সামনে নূহ (আ.)-এর সময়কার সেই দীর্ঘ কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে তারা হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাদের পূর্বসূরী সত্যবিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের পরিণতিকে দেখতে পায়, তাদের কাছে প্রেরিত রসূলের মায়াভরা ব্যবহার যেন দেখতে পায়।

এ অবস্থায় নিশ্চিত তারা অনুভব করবে যে, রসূল (স.) তাদেরকে কোনো ধ্বংসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন না, বরং তারা তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নির্ধারিত দয়ার এক প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখবে–সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঢিল দেয়া বা অবকাশ দেয়ার অবস্থাকেও তারা দেখতে পাবে। যেহেতু সত্যকে বুঝার জন্যে

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ ও উদাহরণ তাদের সামনে চূড়ান্তভাবে এসে গেছে, এ জন্যে নূহ (আ.)-এর যামানার মতো এতো দীর্ঘ সময়ের জন্যে দাওয়াত পেশ করার এখন আর প্রয়োজন হবে না। নূহ (আ.)-এর প্রার্থনার ফলে যে কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো সেই কঠিন পরিস্থিতিও এখন আর কোনোদিন আসবে না।

কিন্তু আফসোস সেই কোরায়শদের জন্যে, এ সকল যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথা তাদের গোমরাহী বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাজই করলো না। এরশাদ হচ্ছে,

'নূহ দোয়া করতে গিয়ে বললো, হে আমার রব, পৃথিবীতে কাফেরদের একটি ঘরও ধ্বংস না করে তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি (ধ্বংস না করে) তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে, আর অপরাধপ্রবন ও অস্বীকারকারী কাফের ব্যতীত তারা অন্য কোনো সন্তানই জন্ম দেবে না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দিকে মানুষকে বরাবর যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই একই দাওয়াত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, (স.) তাঁর দেশবাসীর কাছে পেশ করেছেন, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র মালিক ও একক শক্তি এই চরম ও পরম সত্য গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানানো, এ কথাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, নিজে মেনে নেয়া এবং এর মূলনীতিসমূহকে দৃঢ়ভাবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধীদের জন্যে এটা কোনো নতুন ও অস্বাভাবিক জিনিস ছিলো না। তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল সৃষ্টিকুলের সব কিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক একটা অবিচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সব কিছু একই শক্তির ইচ্ছার অধীনে নিরন্তর গতিশীল কাজ করে যাচ্ছে। সৃষ্টিজগতের সব কিছু আবহমানকাল ধরে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচী মোতাবেক কাজ করে চলেছে। সৃষ্টিকুলের এ রহস্যসমূহের সবকিছুকেই নূহ (আ.) তাঁর জাতির সামনে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তুলে ধরেছিলেন।

কেমন করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তা লক্ষণীয়,

সে (নূহ) বললো, হে আমার জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী, আমি তোমাদের এ কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানাচ্ছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁকেই ভয় করো, আর আনুগত্য করো একমাত্র আমারই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (অতীতের) সকল অপরাধ মাফ করে দেবেন ....। অবশ্যই সব কিছুর জন্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এক মেয়াদ, সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ যখন এসে যাবে তখন আর কাউকে একটুও সময় দেয়া হবে না। হায়, এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সঠিক কোনো জ্ঞান থাকতো এবং সে জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাতে! তাহলে তোমরা, এইভাবে তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনতে না!

অর্থাৎ, কি ব্যাপার, আল্লাহর কোনো মর্যাদা আছে বলেও কি তোমরা মনে করো না, অথচ তিনি তোমাদেরকে একটার পর এক পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি

www.pathagar.com

দেখছো না কেমন করে তিনি সাতটি আসমানকে সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি করেছেন? তার মধ্যে চাঁদকে স্নিগ্ধ বাতি বানিয়ে দিয়েছেন এবং সূর্যকে মহা সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ বানিয়েছেন? আবার তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গাছপালার মতো করে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এক সময় আসবে যখন এই যমীনের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এবং এরপর একদিন তোমাদেরকে এই যমীন থেকে বের করে নেবেন। এটা তো এক বাস্তব সত্য যা তোমরা দেখছো। আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানাস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তার গিরিসংকটের মধ্য থেকে পথ বের করে নিতে পারো।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদের সামনে নূহ (আ.)-এর কাহিনীকে এখানে পেশ করা হয়েছে। কোরায়শ জনগণের মধ্যে শুরু থেকে যে গভীর গোত্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিলো, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একাত্মতা, দলীয় সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠেছে সেই সৌহার্দকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এই দাওয়াতী কাজের প্রসার প্রয়োজন। মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থা দান করা হয়েছে তার ওপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এটাই আল্লাহর প্রাচীনতম ও মজবুত পথ, যার ওপর মানুষ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর রসূলরা যখনই পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহন করে এনেছেন, তখনই মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কখনও তাদেরকে অজানা এক ভয় ভীতি পেয়ে বসেছে যে, তারা বাপ-দাদার আমল থেকে যে দেব-দেবীর পূজা করে আসছিলো তাদেরকে পরিত্যাগ করলে তারা রুষ্ট হবে, অকল্যাণ ডেকে আনবে–এমনকি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ছারখার করে দেবে। এই বিরোধী লোকেরা একের পর এক রসূলদের সম্পর্কে নানা ভুল চিন্তা-ভাবনা করতো।

মানুষের মনে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে, নূহ (আ.) এতো ত্যাগ স্বীকার করে দীর্ঘকাল ধরে যে দাওয়াতী কাজ করলেন এবং মহা প্লাবনের পর আরও দীর্ঘ বছর ধরে যে মোমেন গোষ্ঠী গড়ে তুললেন তারা মোহাম্মদ (স.) এর যামানা আসতে আসতে কেন গোমরাহ হয়ে গেলো?

এই সূরা ও কোরআনে বর্ণিত আরও কয়েকটি সূরায় নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতীক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় ধরে আর কেউ ত্যাগ তিতীক্ষার কষ্ট করেছেন বলে কোনো নযীর নেই। এতদসত্তেও কেন তার জাতির বিরোধিতা শেষ হলো না? বরং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-উপেক্ষা অবিরাম গতিতে চলতে থাকল। এসত্তেও নূহ (আ.) এসব কিছু পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, উত্তম ব্যবহার, অতি সুন্দর ও বিনয় আচরণ এবং স্নিগ্ধ ও মনোরম বাচনভংগীতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

www.pathagar.com

তাঁর প্রাঞ্জল ও মনমোহিনী ভাষায় দাওয়াত দানের সূচনা থেকেই সেই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতা শুরু হয়ে যায় এবং মহাপ্লাবন না আসা পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও তাঁর কাজ বন্ধ থাকেনি। আরও বহু রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, যাঁদের মধ্যে কাউকে উপহাস বিদ্রূপ করা হয়েছে, কাউকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, কাউকে পরিবার ও বাড়ী ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মহান বার্তার আগমন দিবস সমাগত হলো। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রাম সাধনা শুরু হলো। এ সংগ্রাম সমকালীন সবাই দেখেছে। রসূল (স.) নিজেও যেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর সাথে তেমনি স্বীকার করেছেন তাঁর সাহাবারাও। তারপর থেকে দেশে যখনই এই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে বিরোধীদের মোকাবেলায় যারাই এই সংগ্রাম করেছে তার অব্যাহত ধারা সমান গতিতে চলেছে।

কিন্তু সকল যামানার সকল সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারকে একত্রিত করলেও কি নূহ (আ.)-এর সাথে তার জাতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সমান হবে? আবার তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও মনোবল, দুর্ব্যবহার সহ্য করার জন্যে দান করা হয়েছিলো, তাও কি অন্যান্য সবার সম্মিলিত ধৈর্য থেকে কোনো অংশে কম হবে? নিসন্দেহে এখানে নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতিক্ষা হবে সব কিছুর ওপরে।

একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। এই সহিষ্ণুতা, অবিচলতা, এই দুঃখ-কষ্ট ছিলো সকল যামানার রসূল ও তাঁদের সংগীসাথীদের পক্ষ থেকে এক মহান ত্যাগ।

সম্ভবত পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অন্যান্য সকল চেষ্টা করা থেকে অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ; বরং সত্য বলতে কি, আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস গোটা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত সকল জিনিস থেকে বড়, তোমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টিতে যেগুলো ধরা পড়তে পারে সে সব কিছু থেকেও ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা হয়েছিলো তিনি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন একটি জীবের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় পাঠাবেন, তাই এই গুণাবলী দেয়া হয়েছে তার বুঝ-শক্তির মধ্যে। তার জীবন-পদ্ধতিতে ঠিক সে পরিমাণ দেয়া হয়েছে যা সে আল্লাহর সাহায্য ও নিজ নিজ তৌফিক অনুসারে চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ সব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করে কেন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করলেন এটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

তবে বুঝে সুঝে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করার জন্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঈমানকে তার নিজের চিন্তা চেতনার মধ্যে এবং জীবনে চলার পথে বাস্তবে যেন সে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যে কোনো চাপ প্রয়োগ না করে তার সুবিবেচনার ওপর এই ভার দেয়া হয়েছে। ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্য প্রদর্শনে ফেরেশতাদের মতো তাদেরকে মযবুর করা হয়নি। আবার অন্যায় ও অপরাধজনক

www.pathagar.com

কাজ করার জন্যেও তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, শয়তানের মতো সর্বদা অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজই সে করে যাবে।

এর রহস্য আমাদের বোধগম্য নয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাদেরকে পয়দা করেছেন।

সুতরাং ঈমানদার মানুষের কর্তব্য গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে ঈমানের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব দিয়েই তিনি নবী রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরাবরই কবুল করেছেন। পৃথিবীর বুকে সত্য প্রতিষ্ঠায় তারা হচ্ছে নিবেদিতপ্রাণ। যারা জান মালকে নিঃশেষে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রভুত্বকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় তাদের সার্বিক ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

অন্তরের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা সেই অন্তরে আল্লাহর নূরের ঝলক পয়দা করে দেয়। এই কারণেই তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির বহু রহস্য সম্পর্কে অবগত হন। আর এই কারণেই সৃষ্টির মধ্যে যেসব রহস্য বর্তমান রয়েছে সেগুলোর বহুলাংশকে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে অবহিত করান। এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা, এটা কোনো ভাষাভাষা ছবি বা কোনো অলীক অভিব্যক্তি নয়। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য, যা মানুষের মধ্যে, যমীন ও আসমানের মধ্যে এবং সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এমনি করে কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানের অস্তিত্ব থাকার অর্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের সমন্বয় সাধন এবং তার জীবনকে এতটা উন্নীত করা যেন উভয় জীবনের মধ্যে তা সংযোগ স্থাপন করার যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষয়িষ্ণু জীবন ও স্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। পরিপূর্ণ জীবনের সাথে আংশিক জীবনের যোগাযোগ সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বহু চেষ্টা-সাধনা করেই পাওয়া যায়। এর জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যদি কেউ উভয় জীবনের সমন্বয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায় তাহলে অবশ্যই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার তাকে করতেই হবে। এই কষ্ট-পরিশ্রম ও ত্যাগই তার জন্যে জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় এক উজ্জ্বল আলোক হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহর ওপর মযবুত ঈমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জীবনে কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই গুণের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতীতে দীর্ঘকাল যাবত এসব মানুষের সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। যাদের অধীনে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে। আসলে এটাই হচ্ছে সেই অনুপম বিশ্বাস যা মানুষের জীবনকে ঈমানের ধারা সঞ্জীবিত করে।

www.pathagar.com

মানুষের চিন্তা প্রসূত কোনো কাজ, তার রচিত কোনো জীবন-দর্শন, তার গবেষণালব্ধ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আবিষ্কার, অথবা পৃথিবীতে বিরাজমান কোনো ধর্ম অথবা জীবন পদ্ধতি মানুষকে সেই ভাবে কখনো পথ দেখাতে পারেনি, যেমন করে আল্লাহর ওপরে ঈমানের দৃঢ়তা মানুষের জীবনকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে পেরেছে এবং তাদের জীবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করতে পেরেছে–এমনটি দ্বিতীয় নেই। এই সঠিক বিষয় থেকেই পূর্ণাংগ-জীবনের জন্যে সঠিক পথপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। ঈমানের সেই উৎস থেকে উৎসারিত জীবন পথের এ দিশা অতীতের নবীদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কেতাবে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সত্য সঠিক জীবন লাভের বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

এই আকীদা হচ্ছে এমন এক অকাট্য বিষয়, যা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এ হচ্ছে সেই সত্য, যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ঈমানী যিন্দেগী যাপন করে মানুষ যা লাভ করছে তা মানুষের তৈরী কোনো তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা অর্জিত হয়নি। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোন দর্শন, কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, কোন মানবরচিত জীবন ব্যবস্থা–কোনটিই ঈমানী যিন্দেগীর মতো অবদান রাখতে পারেনি। একারণে পৃথিবীতে যখনই প্রকৃত মোমেনদের নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তখন তাদের স্থান অন্য কেউ কোনোভাবেই পূরণ করতে পারেনি। বরং তাদের জীবনের মূল্যমান এর ফলে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, মানবতার মর্যাদা এতে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এইভাবে তারা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতি, চিন্তার নৈরাজ্য এবং দলীয় সংকীর্ণতাসহ নানাপ্রকার ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়েছে; যদিও বস্তুগত কিছু কিছু ময়দানে তারা অগ্রসর হয়েছে এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের জিনিস ও আমোদ-প্রমোদের বিষয়াদিতে তারা যদিও বহু উন্নতি করেছে বলে মনে হয়েছে।

ঈমানের শান্তি ছায়ায় যেমন করে মানুষের জীবনের উন্নতি হয়েছে তেমন উন্নতি আর কোনো অবস্থায় কোনোদিনই হয়নি। ঈমানী জীবন যাপন কালে মানুষ যেমন করে তাদের বিশ্বাসের ফল লাভে সমর্থ হয়েছে, তেমনি করে অন্য কোনো জিনিসের বিনিময়ে লাভ করতে পারেনা। এটা একথার এক অকাট্য দলীল যে, এই দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত সেই মহাসত্য, যার ছোঁয়া পেয়ে মানবজাতির উন্নতিতে এক যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান তার জীবনকে এমন মহীয়ান করেছে যা মানবরচিত কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে কখনও অর্জিত হয়নি।

ঈমানের ছায়াতলে এসে জীবন সম্পর্কে তার চিন্তাধারার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাও ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এই আকীদা বিশ্বাসের কারণে সৃষ্টিজগতের সাথে তার যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে কখনও গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এই ঈমানের বদৌলতে মানুষের মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে তা কখনও অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব হয়নি। এইভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে ধ্যান-ধারণা পাই তা হচ্ছে এই যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

www.pathagar.com

সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আল্লাহর আলোর পরশ পাওয়ার জন্যে যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা এবং যে ত্যাগ কোরবানী স্বীকার করা হয় তার মধ্য দিয়েই বাস্তব জীবনের জন্যে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ বেরিয়ে আসে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র উন্নত হয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানুষের কাজ ও ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নতি হয়। মানব জীবনের ইতিহাস বরাবর একথার সাক্ষ্য বহন করে এসেছে যে, একমাত্র আল্লাহর ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তার ভয়ভীতিকে অন্তরে পোষণ করে জীবন যাপন করেছে তারাই মানবজীবনের দীর্ঘস্থায়ী শান্তি সমৃদ্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অতীতের ঘটনাপঞ্জীর নিরীখে আমরা একথা নিসংকোচে বলতে পারি যে, শীঘ্রই মানব জাতি সেসব ঘটনা ও তার পাশাপাশি মানুষের সে কঠিন ব্যবহার প্রত্যক্ষ করবে, যা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাদের সংগী সাথীদের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিলো। অচিরেই সে দিন আসবে যখন ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পতিত এক গোমরাহ নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসতে থাকবে, এরা অন্যায় ও গোমরাহীর কাজে পরস্পর সহায়তা করবে। সত্যের দিকে আহ্বানকারীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করবে এবং বিভিন্নভাবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবে।

এভাবেই একদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তারা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো, আবার কাউকে তারা করাত দিয়ে চিরে ফেলেছিলো। আরো কিছু লোক নবী-রসূলদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস উপেক্ষা করে যে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, ইতিহাস আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দিকে আহ্বান করার এই কাজ নিজ গতিতে চলতে থাকবে। যেহেতু এ সকল কাজের দাবীই হচ্ছে চূড়ান্ত সংগ্রাম এবং মহান কোরবানী, এজন্যে যত ক্ষুদ্র আকারেই একাজ করা হোক না কেন এ কাজ যখনই সঠিকভাবে শুরু করা হবে–বাতিলপন্থীদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসবেই, আর সেই প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করতে গিয়ে আল্লাহর নূর এবং তাঁর মেহেরবানীর পরশ প্রত্যেক দায়ী ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তি তার অন্তরের গভীরে অনুভব করবে।

'দায়ী ইলাল্লাহর' এই জনগোষ্ঠী নূহ (আ.)-এর সময় থেকে মোহাম্মদ (স.) -এর যামানা পর্যন্ত যারাই রসূল হয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ঈমান-এর তাৎপর্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। তাদের এই দাওয়াতের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া সর্বকালে একইরকম থেকেছে। এ ক্ষেত্রে সব থেকে কম যে কাজটি 'দায়ী ইলাল্লাহ্' করতে পারেন তা হচ্ছে যদি অন্য কেউই তাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে তারা তাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে আমরণ ঈমানের এই আমানতকে নিজেরা সংরক্ষণ করে যাবে। মৃত্যু যদি আসে সেক্ষেত্রেও সত্যের এই আহ্বানকারীরা এ দায়িত্ব থেকে পিছপা হবেন না।

www.pathagar.com

নবী রসূলদের এই বৈশিষ্টের কারণে তাঁদের মর্যাদা হামেশাই দুনিয়ার অন্য সবার ওপরে। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদেরকে কর্তব্যচ্যুৎ করতে পারেনা। তাদের সেরা মানুষ হওয়ার জন্যে তাদের এই গুণটিই যথেষ্ট। এটাই তাদের চূড়ান্ত সফলতার প্রতীক। নবীদের মতো এটা দাওয়াত দানকারীদেরও এক অমূল্য উপার্জন, যারা এ গুণটি অর্জন করতে পারে তারাও দুনিয়ার মান ইযযত লাভ করা ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে এই গুণটিকে এক মহান সম্পদ রূপে মনে করতে পারে। এই গুণটির কারণেই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তারা সেজদা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, যদিও এই মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানো ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ-বিসম্বাদ করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিলো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান জানানোর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, এজন্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম করে, এর জন্যে সবরকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় এবং দুর্বল ও অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এই সকল কাজের বিনিময়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার কাছেই সে সাহায্য-প্রার্থী। সেই হচ্ছে সফল ব্যক্তি, কেননা তারা চায় আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল্লাহর যমীনে কায়েম হোক।

এই উদ্দেশ্যেই সে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষদের দাওয়াত দেয়, সে মনে প্রাণে চায় আল্লাহর দ্বীনের সংস্পর্শে এসে মানুষের জীবন উদ্ভাসিত হোক। এতে সে সবরকম কষ্ট, দুঃখ এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণা অথবা এর থেকেও কষ্টকর কিছুকে হযম করতে প্রস্তুত। বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণেই এই দুঃখ-কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে, যেহেতু তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এর বিনিময়ে সে আখেরাতে মুক্তি পাবে। এ কারণেই সে কর্তব্য সচেতন হয়, আর যে ব্যক্তি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মানুষের অন্তরের মধ্যে আখেরাতের মুক্তির প্রেরণা যখন একবার স্থান লাভ করে তখন তার কাছে দুনিয়ার সকল কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, কষ্টের অনুভূতি কমে যায় এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করা তার জন্যে তখন মোটেই আর কঠিন থাকে না। এগুলো তার আমলনামায় যোগ হয়ে তার সৎকর্মের পাল্লাকে ভারী করে দেয়, এটাই হয় তার সব পাওয়ার বড় পাওয়া।

সূরা আল জ্বিন

এই সূরাটির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার আগেই পাঠকের অনুভূতিতে এর ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আকস্মিক অথচ স্বতস্ফূর্তভাবে রেখাপাত করে। সে বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এ সূরাটি পড়া শুরু করতেই মানুষের মনে সর্বাগ্রে মন মাতানো একটি ধ্বনির মূর্ছনা ও জোরালো শব্দের একটি ঝংকার বেঝে উঠে। সেই সাথে এর ছন্দায়িত শব্দে রয়েছে কিছুটা বেদনার ছাপ, এর সূরে বুলানো রয়েছে সহানুভূতির বিভিন্ন পরশ। রয়েছে এর প্রতিধ্বনিতে কিছুটা আবেগময় সূর।

www.pathagar.com

সূরার ভাষায় যে দৃশ্য ও ছবি অংকিত হয়েছে এবং উদ্দীপনার যে প্রাণশক্তি এতে নিহিত রয়েছে, বিশেষত সূরার শেষাংশে জ্বিনদের বক্তব্যের যে উদ্বৃতি রয়েছে তা এর আংগিক বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করে এবং তা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরার শেষাংশে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা এই সূরার প্রতিটি পাঠকের মনকে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও তাকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। আর খোদ্ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন দুটো বিষয় জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, প্রথমত, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে তার ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, যতোক্ষণ তিনি এই প্রচারের কাজে লিপ্ত থাকবেন ততোক্ষণ তার ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও তত্ত্বাবধান সক্রিয় থাকবে। সূরার দ্বিতীয় রুকুটি পড়লে এ কথার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

'হে নবী! তুমি বলো, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না .....এবং তিনি সকল জিনিসকে গুনে গুনে রেখেছেন।'

এর পাশাপাশি রয়েছে জ্বিনদের বক্তব্যের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং এর মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে তার বিবরণ। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে গ্রহণ করে নিলে তা মানুষের মনমানস ও চেতনায় এক গভীর চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়। মনমগযে এই চিন্তাভাবনার জন্ম সূরার সুরেলা ছন্দ, আবেগময় ধ্বনি ও বেদনা বিধুর করুণ সূরের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সূরাটিকে একটু ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়লে তা মানুষের চিন্তা চেতনায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলোকে আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে।

সূরা আল মোযযাম্মেল

এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার কোরায়শ নেতারা তাদের 'দারুণ নাদওয়াহ' নামে পরিচিত পরামর্শ গৃহে সমবেত হয়ে রসূল (স.) ও তাঁর দাওয়াতী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এ খবর জানতে পেরে রসূল (স.) অত্যাধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাপড় চোপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় শুয়ে পড়েন। এই সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এই সূরার প্রথম রুকু নিয়ে এলেন।

এর দ্বিতীয় রুকু দীর্ঘ এক বছর পর নাযিল হয়। রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের একটি দল তখন রাতের বেলায় এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। এ জন্যে বারো মাস পর তাদেরকে আরো কম নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এই সূরার দ্বিতীয় রুকু নাযিল হয়।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনাটি সূরা আল মোযযাম্মেল প্রসংগেও বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল মোদ্দাসসের নাযিলের কারণ প্রসংগে তা যথাস্থানে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার এই যে, রসূল (স.) নবুওত লাভের তিন বছর পূর্ব থেকে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাস করতেন। অর্থাৎ পাক পবিত্র অবস্থায় একাকী এবাদাত করতেন। প্রতি বছর তিনি এক মাস এভাবে নির্জনে কাটাতেন। এটি থাকতো রমযান মাস। মক্কা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী হেরা গুহায় এই নির্জন বাস কালে তাঁর পরিবার তাঁর কাছাকাছিই থাকতো। পুরো এক মাস তিনি এখানে কাটাতেন। এ সময়ে তাঁর কাছে কোনো গরীব দুঃখী এলে তাকে খাবার দিতেন এবং এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিলো তার চারপাশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং তার অন্তরালে অবস্থানরত মহা শক্তিধর স্রষ্টা। তাঁর দেশবাসী যে অসার পৌত্তলিক আকীদা-বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিলো, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমন কোনো সুস্পষ্ট বিকল্প পথ, কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং কোনো ভারসাম্যপূর্ণ নীতি তাঁর জানা ছিলো না যা তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন।

রসূল (স.)-এর এই নির্জন বাসের কর্মসূচী তাঁর জন্যে আল্লাহর গৃহীত সুপরিকল্পিত কৌশলের একটি অংশ ছিলো। আগামী দিনে যে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিলো, তার জন্যে তাঁকে তৈরী করাই ছিলো এই কৌশলের উদ্দেশ্য। এই সময় তিনি একান্তভাবে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন ও আপন মনে চিন্তাভাবনায় মশগুল থাকতেন। সংসারে যাবতীয় ঝামেলা ও খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিভৃতে বসে নিঝুম প্রকৃতির অস্ফুট ভাষা ও আকুতি বুঝতে চেষ্টা করতেন। জানতে চেষ্টা করতেন কিভাবে এই নির্বাক মহাবিশ্ব নিজেই তার নিপুন স্রষ্টার অস্তিত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। পর্বতগুহার সেই মর্মবিদারী নিস্তব্ধতায় থেকে থেকে তাঁর আত্মা গোটা সৃষ্টি জগতের আত্মার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে স্রষ্টার গুণগানে সোচ্চার হয়ে উঠতো। সৃষ্টির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও নিষ্কলূষ পবিত্রতাকে তাঁর সত্ত্বা সানন্দে আলিংগন করতো এবং তিনি আপন মনে পরম সত্যকে গড়ে তুলতেন।

যে ব্যক্তিকে মানবজাতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তার আমূল পরিবর্তন সাধন ও নিভৃতে অবস্থান এবং পৃথিবীর নিত্যকার ব্যস্ততা, হৈ, চৈ, সংসারের শোরগোল ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে কিছু সময় কাটানো একান্ত প্রয়োজন।

বিশাল মহাবিশ্ব ও তার অগণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, তার ব্যাপারে নীতি ও দৃষ্টি ভংগী নির্ণয়ের জন্যে কিছুটা আলাদা সময় অপরিহার্য। কেননা কর্মচঞ্চল সাংসারিক জীবনের সাথে সর্বাত্মক, সার্বক্ষণিক ও নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতে করতে মানুষের মন-মেযাজ তার সাথে এতো অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে যায় যে, তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্যে আর কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ক্ষণিকের জন্যে এই সব ব্যস্ততা এবং সংসার জীবনের বন্দীদশা থেকে অব্যহতি পেয়ে সাময়িকভাবে হলেও পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন মানুষের আত্মা ও বিবেককে প্রশস্ততা ও তীক্ষ্ণতা দান করে। তাকে

www.pathagar.com

পৃথিবীর চেয়ে বৃহত্তর জিনিস দেখার ও বুঝার যোগ্য বানায় এবং মানুষের সমাজ ও সামাজিক রীতি প্রথার মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন সত্তার পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য গ্রহণ এবং স্বনির্ভর হতে অভ্যস্ত বানায়।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ (স.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন, পৃথিবীর জীবন ধারাকে ও চেহরাকে আমূল পাল্টে দেয়া এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে এ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। নবুওতের তিন বছর আগে তাকে এই নির্জন বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই নির্জনবাস বিরতিহীনভাবে একমাস স্থায়ী হতো। এ সময় একমাত্র মুক্ত প্রকৃতিই হতো তাঁর সাথী। প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য জগতের সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত এই নির্জনবাসের কর্মসূচী অব্যাহত থাকলো।

অবশেষে যখন আল্লাহর মর্জি হলো এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্ববাসীর ওপর তার এই করুণাধারা বর্ষণ অর্থাৎ ওহী নাযিল করবেন, তখন জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-এর কাছে এলেন। তিনি তখনো হেরার গুহায় অবস্থান করছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক রসূল (স.) তাঁর এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

'আমি তখন নিদ্রিত। সেই অবস্থায় জিবরাঈল এলেন রেশমী রুমাল নিয়ে। তাতে কি একটা কথা লেখা ছিলো। জিবরাঈল আমাকে সেই লেখাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ুন তো!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

জিবরাঈল আমাকে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ছেড়ে দিলেন।

তারপর পুনরায় বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

তারপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এমন চাপ দিলেন যে, মনে হলো আমার মৃত্যু এসে গেছে। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, কী পড়বো? এ কথাটা আমি শুধু এই আলিংগনের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বলেছিলাম।

জিবরাঈল বললেন, 'পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার মহান প্রভু, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

রসূল (স.) বলেন, আমি এগুলো পড়লাম। অতপর পড়ার পালা শেষ হলো এবং তিনি চলে গেলেন। আমি ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন মনে হলো, আমার মানসপটে কথাগুলো লিখে নিয়েছি।

এরপর আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এসে শুনলাম, আকাশ থেকে আওয়ায আসছে, 'হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

www.pathagar.com

আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরাঈল একজন বিশালকায় মানুষের বেশে দাঁড়িয়ে। আকাশের এক প্রান্তে তার এক পা।

তিনি বলছেন, ' হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। আগে পিছে একটুও না সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অথচ আকাশের যে প্রান্তেই তাকাই দেখি তিনি সেখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে পিছে এক চুলও সরছি না।

এমতাবস্থায় খাদিজা আমার সন্ধানে লোকজন পাঠালো। তারা মক্কার উচ্চতম প্রান্তে গিয়ে ঘুরে ফিরে আবার খাদিজার কাছে ফিরে গেলো। আমি তখনো আমার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এরপর এক সময় জিবরাঈল চলে গেলেন। আমিও আমার পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম। গিয়ে খাদিজার একবারে কোলের কাছে ঘনিষ্ট হয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, 'ওহে কাসেমের বাবা! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

অতপর আমি তাঁকে যা যা দেখেছি বললাম।

খাদিজা বললো, 'হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি এটিকে শুভ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। খাদিজার প্রাণ যার হাতে, তার শপথ করে আমি বলছি যে, আমি মনে করি আপনি এ যুগের মানব জাতির নবী।'

এরপর রসূল (স.) পুনরায় পাহাড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওহী স্থগিত থাকলো। যেদিন পুনরায় সেখানে গেলেন, চোখ মেলে তাকাতেই জিবরাঈলকে দেখলেন। দেখে এবার তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ভয়ে তিনি সংকুচিত হয়ে মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়লেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'

সবাই তাঁকে ঢেকে দিলো। তবু তাঁর কাঁপুনি বন্ধ হলো না। এই সময় জিবরাঈল তাকে ডেকে বললেন, 'ইয়া আইয়ুহাল মোদ্দাসসের' (হে কম্বল মুড়ি দেয়া ব্যক্তি) কেউ কেউ বলেন, জিবরাঈল বললেন, ইয়া আইয়ুহাল মোয্যাম্মেল' (হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি) প্রকৃত পক্ষে এ সময় কোন সূরা নাযিল হয়েছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন। চাই পূর্ববর্তী বর্ণনাই সঠিক হোক, কিংবা শেষোক্ত বর্ণনাই সঠিক হোক, এ কথা সত্য যে, রসূল (স.) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর ঘুম পাড়ার অবকাশ নেই, তাঁর ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। তাঁর সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। জিবরাঈল-এর সেই ডাক শোনার পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে শুধুই জাগরণ, কাঠোর প্রশ্রিম ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

রসূল (স.)-কে বলা হলো, 'ওঠো, তিনি উঠলেন। তারপর বিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি উত্থিতই রইলেন।' অর্থাৎ কোনো বিশ্রাম নিতে পারলেন না, স্থির হতে

www.pathagar.com

পারলেন না। নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারে জন্যে এক মুহূর্ত শান্তভাবে জীবন উপভোগ করতে পারলেন না।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে তিনি সেই যে উঠলেন– আর বসলেন না, আর থামলেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভারী দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুললেন। সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব, গোটা দ্বীনের দায়িত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দায়িত্ব ঘাড়ে তুললেন।

তাঁর এ সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মতবাদ ও ধ্যান ধারণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ লালসার ভারে ভারাক্রান্ত ও তার প্রলোভনে আকৃষ্ট এবং প্রবৃত্তির গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ মানবীয় বিবেককে মুক্ত করার সংগ্রাম। যখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীর বিবেককে এই জাহেলিয়াতের আবর্জনার ভারমুক্ত এবং ইহলৌকিক জীবনের কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন আরেক রণাংগনে শুরু করলেন অপর এক যুদ্ধ।

এটি যুদ্ধ তো নয়, বরং বলতে গেলে যুদ্ধের এক অন্তহীন ধারা। ইসলামী আন্দোলনের যেসব দুশমন আন্দোলন ও আন্দোলনের সহযোগী মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, ইসলামের এই সদ্য গজানো নিষ্পাপ চারা গাছটিকে অংকুরেই যারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলো, এবং মাটিতে তার শেকড় ও আকাশে ডালপালা বিস্তার করার আগেই তাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো, সেই ভয়ংকর আগ্রাসী দুশমনদের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর এ যুদ্ধ, আর আরব উপদ্বীপের ভেতরকার যুদ্ধগুলো শেষ করতে না করতেই রোম সাম্রাজ্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো এই নতুন জাতিকে তার উত্তর সীমান্ত দিয়ে আঘাত হানতে।

এই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালেও প্রথমোক্ত বিবেকের যুদ্ধ থামেনি। কারণ, ওটা এক শাশ্বত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের হোতা হচ্ছে শয়তান। মানুষের বিবেকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে আপন তাৎপরতা চালানো থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না।

পক্ষান্তরে রসূল (স.)ও আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ একইভাবে অব্যাহত রাখলেন। দাওয়াতের পাশাপাশি চালিয়ে গেলেন বহুমুখী সংগ্রাম। দুনিয়ার যাবতীয় সুখ সম্ভোগের সুযোগ তার জন্যে অবারিত ছিলো, তথাপি তিনি কষ্টকর জীবন যাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন, মোমেনরা তাঁর চারপাশে থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। তারা সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত করতেন। রাত জেগে তারা নামায পড়তেন, আল্লাহর বন্দেগী করতেন, ধীরে ধীরে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করতেন। আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম দশ আয়াতে তাকে এভাবেই জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো, রাত্রি জাগরণ কর, তবে অল্প কিছু অংশ বাদে ....।'

এভাবে রসূল (স.) ২০টি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের ভেতরে কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। ওহীর প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর এই অক্লান্ত সাধনা অব্যাহত রাখেন।

www.pathagar.com

সূরার প্রথম রুকু একটি বিশেষ ধরনের ছন্দবদ্ধ গদ্যের সমাহার। এটি অত্যন্ত কোমল অথচ ভাবগম্ভীর ছন্দ। যে গুরুগম্ভীর দায়িত্ব ও কড়া নির্দেশাবলী এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, তার সাথে এ ছন্দ বেশ মানানসই। যে দুর্বহ বক্তব্য নাযিল করার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, তার ভয়াবহতা এবং 'আমাকে ও রসূলের আহবান প্রত্যাখ্যানকারী বিত্তশালীদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও, আমার কাছে শাস্তি ও দোযখ রয়েছে এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' এ উক্তির ভয়াবহাতার সাথে এই গুরুগম্ভীর ছন্দবদ্ধ গদ্য যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যে এবং হৃদয়ের গভীরে যে ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলী প্রতিফলিত হয়েছে, তার সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা, 'যেদিন পাহাড় ও পৃথিবী কাঁপতে থাকবে.... যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে, যেদিন আকাশ ফেটে যাবে। ....'

দ্বিতীয় রুকু যে দীর্ঘ আয়াতটি নিয়ে গঠিত, তা নাযিল হয়েছে রাত জেগে নামায পড়তে পড়তে রসূল (স.) ও তাঁর সহচরদের পা ফুলে যাওয়ার ঘটনার এক বছর পর। যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যও ছিলো তাই।

এ আয়াতে তাদের রাত্রি জাগরণের সময় কমানো হয়েছে। সেই সাথে এ আশ্বাসও দেয়া হয়েছে যে, সময় কমানোর এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁদের পরবর্তী কালের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আয়াতটির ছন্দ ও ভাষাগত কাঠামো প্রথম রুকু থেকে ভিন্ন ধরনের। এটি দীর্ঘ আয়াত এবং এতে স্থীতি ও প্রশান্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরাটি তার উভয় অংশের সম্মিলিত রূপ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এর শুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক স্নেহময় সম্বোধন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে। তারপর রাত জেগে নামায পড়া. কোরআন তেলাওয়াত করা, একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করা, একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়নের ওপর ধৈর্য অবলম্বন, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে একা ছেড়ে দেয়া, যাতে তিনি তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন এই সব বিষয় সূরায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অবশেষে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল' এই প্রশান্ত ও করুণাসিক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

এ সূরার উভয় রুকুতে রসূল (স.)-এর প্রিয় ও আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ মোমেনদের দলটির মহৎ গুনাবলী চেষ্টা সাধনার ও প্রশংসা করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্থিব স্বার্থের মোহমুক্ত থাকা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীতে তারা ভূষিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সূরা আল মোদ্দাসসের

এই সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ ও সময় প্রসংগে পূর্ববর্তী সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এই সূরাটির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সেখানে এই মর্মে একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এটি সূরা 'আল আলাক'-এর পরে নাযিল হওয়া প্রথম ওহী। অপর একটি বর্ণনা এই মর্মেও উদ্বৃত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার এবং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের নির্যাতন শুরু হওয়ার পর এটা নাযিল হয়েছে।

ইমাম বোখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে কাসীর বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া অংশ কোনটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেন, সূরা আল 'মোদ্দাসসের'।

আমি বললাম, লোকেরা তো বলে সূরা 'আল আলাক্ব।'

আবু সালমা বললেন, আমিও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আজ আমাকে যা বললে, সে কথা আমিও তাকে বলেছিলাম।

কিন্তু জাবের আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তা খোদ রসূল (স.) আমাকে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি হেরায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলাম। সেই অবস্থান শেষ হওয়ার পর নেমে আসতেই শুনলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি ডান দিকে তাকালাম। কিছুই দেখলাম না। অবশেষে ওপরের দিকে তাকাতেই একটা কিছু দেখে সংগে সংগেই আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালো। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালা হলো। এরপরই সূরা 'মোদ্দাসসের' নাযিল হলো।'

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বলেন, 'আমি চলার সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন সেই ফেরেশতা, যিনি হেরার গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি হাঁটু গেড়ে প্রায় মাটির সাথে মিশে বসে পড়লাম। তারপর আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দেয়া হলো। এই সময় সূরা 'আল মোদ্দাসসের' নাযিল হলো। এরপর ক্রমাগত ওহী আসতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, বোখারীতেও এ হাদীসটি অবিকল একই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিবরণটিই মনে হয় সংরক্ষিত। আর এ বিবরণ থেকে মনে হয়, এর আগেও ওহী নাযিল হয়েছিলো। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, 'দেখলাম যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় এসেছিলেন তিনিই ....।'

www.pathagar.com

আসলে তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল। তিনি ইতিপূর্বে সূরা 'আল আলাক্ব' নিয়ে এসেছিলেন। এরপর ওহীর বিরতি ঘটে। তারপর পুনরায় ফেরেশতা নাযিল হয়। সুতরাং দুই বর্ণনার সমন্বয়ের উপায় এই যে, এই সূরা (সূরা মোদ্দাসসের) একেবারে প্রথম নাযিল হওয়া সূরা নয়, বরং বিরতির পর নাযিল হওয়া প্রথম সূরা।

তাবরানীতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন ওলীদ ইবনে মুগীরা কোরায়শ বংশের লোকদেরকে দাওয়াত করে বললো, এই লোকটি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

তখন কেউ বললো, জাদুকর। কেউ বললো, না, জাদুকর নয়। আবার কেউ বললো, জ্যোতিষী। কেউ বললো, না, জ্যোতিষী নয়। কেউ বললো, কবি। আবার কেউ বললো, না কবি নয়। কেউ বললো, বরঞ্চ প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে চলে আসা এটা একটা জাদুমন্ত্র।

অতপর সবাই একমত হলো যে, মোহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রচারিত বাণী বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটা জাদুমন্ত্র।

কাফেরদের এই সমাবেশ ও তাদের অভিব্যক্তি এই মতামতের কথা জানতে পেরে রসূল (স.) ভীষণ মর্মাহত হলেন এবং বিমর্ষ অবস্থায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় সূরার এই প্রাথমিক আয়াত কয়টি নাযিল হলো!

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো। সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। অপবিত্রতাকে বর্জন করো। অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। নিজের প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।'

সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অবিকল সেটা আলোচ্য সূরা সংক্রান্ত বর্ণনাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, এই দুই সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি কোন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত কয়টির উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-কে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতপর প্রকাশ্যভাবে ও পরিপূর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে কোরায়শদের মোকাবেলা করা। এ কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাকে নানা রকম নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হবে, আর তার সম্মুখীন হতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। উভয় সূরার এই প্রথম আয়াত কয়টির পরবর্তী অংশ সম্ভবত কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে, যখন কোরায়শরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একগুঁয়েমী প্রদর্শন করেছে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যা অপবাদ ও হীন চক্রান্ত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। তবে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনার যেটিই বাস্তব হোক–এটা মোটেই বিচিত্র নয় যে, উভয় সূরার প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশ এক সাথে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা উভয়াংশের একটা অভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

মোট কথা হচ্ছে, রসূল (স.)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং কোরায়শ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জন্যে রসূল (স.)-এর প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হওয়া। এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে উভয় সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সূরা 'আল কলাম'-এর মতো হবে। সেই প্রেক্ষাপট আমরা সূরা 'আল কলাম'-এর শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরার নাযিল হওয়ার প্রকৃত কারণ ও উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর প্রথমেই যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীদের সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর ঘুম, ভীরুতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে জেহাদ, সংগ্রাম ও কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম দুটি আয়াতেই এই সম্বোধন ও নির্দেশনা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। যথা,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো, সতর্ক করো।'

তারপর পরবর্তী ৫টি আয়াতে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তি আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা,

'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো, অপবিত্রতাকে বর্জন করো, অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। আর তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।' সূরা মোযযাম্মেলের মতো এখানেও সূরার প্রথমাংশের নির্দেশাবলীর শেষে স্থান পেয়েছে ধৈর্যের আদেশ। এরপরই সূরায় অংগীভূত হয়েছে আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুমকি, হুঁশিয়ারী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা। এ ক্ষেত্রেও সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এর সাথে এ সূরার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। ..... অচিরেই আমি তাকে দুরূহ জায়গায় আরোহন করাবো।' (আয়াত ৮-১৭)

সূরা আল কলাম-এর মতো সূরা মোদ্দাসসেরও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের মধ্য থেকে একজনকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছে এবং তার অসংখ্য দুরভিসন্ধির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটির দৃশ্য অংকিত করেছে। সম্ভবত উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অনেকের মতে এই ব্যক্তিটি হচ্ছে ওলীদ ইবনে মুগীরা। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আগামীতে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হবে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে–কি কি কারণে আল্লাহ তায়ালা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

'সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে। পুনরায় আল্লাহর অভিশাপ হোক তার ওপর! ..... শেষ পর্যন্ত সে বললো, এতো আর কিছু নয়, আগে থেকে চলে আসা জাদুমন্ত্র মাত্র। এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (আয়াত ১৮-২৫)

www.pathagar.com

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'দোযখে নিক্ষেপ করবো। আর তুমি কি জানো, সে দোযখটা কেমন? তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, কাউকে ছাড়েও না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। তার ওপর উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত।'

অতপর দোযখের দৃশ্য, দোযখের দায়িত্বশীল উনিশ জন ফেরেশতার উল্লেখ এবং এই উনিশ সংখ্যাটির কথা শুনে মোশরেক ও দুর্বল মোমেনদের মধ্যে হৈ চৈ, সন্দেহ সংশয় বিভ্রান্তি, কুটিল প্রশ্ন ও বিদ্রুপের যে হিড়িক চলেছিলো, সেই প্রসংগে এই সূরার পরবর্তী আয়াতে এই সংখ্যা উল্লেখের পেছনে আল্লাহর কি গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানের খানিকটা অজানা রহস্য উন্মোচন করে প্রসংগত এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। উন্মোচিত এই অজানা রহস্য গায়েবের প্রতি ঈমানের একটি জরুরী তথ্যের ওপর আলোকপাত করে। আয়াতটির বক্তব্য,

'আমি কিছু সংখ্যক ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে দোযখের দায়িত্বশীল বানাইনি, আর তাদের সংখ্যা শুধু এ জন্যে উল্লেখ করেছি যেন কাফেররা বিভ্রাটে পড়ে। ..... আর তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা কতো, তা কেবল তিনিই জানেন.....।' (আয়াত ৩১)

অতপর আখেরাত, দোযখ এবং দোযখের দায়িত্বশীলদের বিষয়টির সাথে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মনে চেতনা ও সতর্কতা সৃষ্টির জন্যে উক্ত উভয় প্রকারের নিদর্শনের সাহায্য নেয়া হবে। বলা হয়েছে, 'কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরনরত রাতের শপথ এবং বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয় দোযখ বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে যায় অথবা যে ব্যক্তি পিছিয়ে থাকতে চায় তার জন্যে ভীতিপ্রদ।'

অতপর অপরাধীদের ও সৎকর্মশীলদের অবস্থানস্থল বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, অপরাধীরা দীর্ঘ যবানবন্দীতে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেবে এবং যে যে কারণে তারা কেয়ামতের দিন আটকাবস্থায় ও যিম্মী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তা খুলে বলবে। তারপর তাদের ব্যাপারে কারো সুপারিশেও যে কাজ হবে না, সে কথাও লক্ষণীয়,

'প্রত্যেক প্রাণী স্বীয় কৃতকর্মের যিম্মী হবে। কেবল দক্ষিণ বাহু ওয়ালারা (অর্থাৎ সৎকর্মশীলরা) বাদে। এরা বেহেশতে অবস্থান করে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, কি কি কারণে তোমরা দোযখে গিয়েছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়াতাম না, আর সত্যের বিরুদ্ধে বাজে কথা রটনাকারীদের সাথে যোগ দিয়ে আমরাও তা রটনা করতাম, আর কর্মফল দেয়ার দিনটিকে অস্বীকার করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই অকাট্য সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম....।'

www.pathagar.com

কেয়ামতের এই অবমাননাকর দৃশ্য ও অপমানজনক স্বীকারোক্তির প্রেক্ষাপটে কোরআন তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের বর্তমান অভিমত কি জানতে চাইছে। সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়ার ও সময় থাকতে সদুপদেশ গ্রহণের এই আহবান সম্পর্কে তাদের বিবেচনা কি তা জানতে চাইছে। আর সেই সাথে এই দাওয়াত থেকে তাদের বন্য পশুর মতো ছুটে পালানোর একটা হাস্যকর ও বিদ্রুপাত্মক দৃশ্য তুলে ধরেছে। যথা, 'ওদের কি হলো যে, এই স্মরণিকাকে উপেক্ষা করছে, যেন ওরা বাঘ থেকে ছুটে পালানো বন্য গাধা।'

অতপর তাদের সেই মতিভ্রমের রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে, যা তাদেরকে ঘেরাও করে রাখছে এবং পরম হিতাকাংখী উপদেশদাতার দাওয়াত কবুল করতে বাধা দিচ্ছে,

'আসলে তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা যেন তাকে প্রকাশ্য গ্রন্থসমূহ দেয়া হয়।'

বস্তুত এরূপ ইচ্ছার পেছনে রয়েছে রসূল (স.)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। প্রত্যেকের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল করা হোক এই তাদের বাসনা। আর অপর সুপ্ত কারণ হলো তাদের ভীতির অভাব, 'কখনো নয়, আসল কথা হলো, তারা আখেরাতকে ভয় পায় না।'

উপসংহারে এক আপোষহীন ঘোষণার মাধ্যমে সব কিছুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে 'কখনো নয়; নিশ্চয়ই এ এক স্মরণিকা। যার ইচ্ছা, সে এসে স্মরণ করুক। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ স্মরণ করবে না। তিনিই তাকওয়ার উপযুক্ত এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক।'

এভাবে এ সূরা কোরআনের সেই জেহাদের একটি অংশ রূপে বিবেচ্য, যা কোরায়শদের অন্তরে বদ্ধমূল জাহেলিয়াত ও জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কোরআন পেশ করেছে। অনুরূপভাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রতি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যে উপেক্ষা প্রদর্শন ও প্রচন্ড শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেছিলো এবং নানা চক্রান্ত এসেছিলো, কোরআন তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে।

এদিক দিয়ে সূরা মোযযাম্মেল, মোদ্দাসসের ও কলাম-এর বিষয়বর গভীর সাদৃশ্য দেখলে মনে হয়, এই তিনটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিলো। অবশ্য সূরা মোযযাম্মেল-এর শেষাংশ এর ব্যাতিক্রম। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, এ অংশটি রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের একটি গোষ্ঠির বিশেষ রুহানী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো।

শব্দগত ও ধ্বনিগত কাঠামো ও আংগিক সৌষ্ঠবের দিক থেকে সূরাটির বিন্যাস চমকপ্রদ। একটি মাত্র আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা ছোট ছোট আয়াতে বিন্যস্ত। অত্যন্ত দ্রুত পড়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেক আয়াতের শেষের শব্দগুলো মিত্রাক্ষর। আয়াতগুলো কখনো গুরু কখনো লঘু ছন্দে ছন্দায়িত। বিশেষত, এই কট্টর কাফেরটির চিন্তা পরিকল্পনা, কপাল সংকুচিত করা ও মুখ বাঁকা করার দৃশ্য যেখানে অংকন করা হয়েছে, আর দোযখের দৃশ্য যেখানে এই বলে অংকন করা হয়েছে যে, তা কোনো কিছুই

www.pathagar.com

অবশিষ্ট রাখে না ও কাউকে ছাড়ে না। যেখানে তাদের পালানোর চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন বাঘ দেখে পালানো কতিপয় বন্য গাধা।

এভাবে মর্মগত ও বিষয়গত বিভিন্নতার সাথে সাথে আয়াতের আংগিক বিন্যাস তথা ছন্দগত ও মিত্রাক্ষরজনিত বিভিন্নতা সূরায় সামগ্রিকভাবে একটা বিশেষ ধরনের স্বাদ সৃষ্টি করে। তাছাড়া স্থান বিশেষে এই বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। কোথাও তার উদ্দেশ্য নানা প্রশ্ন ও ধিক্কার তুলে ধরা, কোথাও কাফেরদের দৃষ্কর্মের প্রতি বিদ্রুপ ও উপহাস করা।

সূরা ক্বেয়ামাহ

এই ক্ষুদ্র সূরাটি মানুষের হৃদয়ে এত বিপুল পরিমাণ উচুঁ মানের তত্ত্ব ও তথ্য, ইশারা ও ইংগিত, দৃশ্য ও চিত্র এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির সমাবেশ ঘটায়, যাকে সে প্রতিরোধও করতে পারে না আবার উপেক্ষাও করতে পারে না। অত্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় ও বিশেষ কোরআনিক বাচনভংগীর আশ্রয় নেয় যা তার ভাষাগত কাঠামোতে এবং শৈল্পিক সূরে ও ধ্বনিতে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাষাগত ও ধ্বনিগত উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এতে এক শক্তিশালী প্রভাবের সৃষ্টি হয়, যার মোকাবেলাও করা যায় না, আবার তাকে উপেক্ষাও করা যায় না।

প্রথম দুটি আয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত বচন ও মন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। তারপর মন ও কেয়ামত সংক্রান্ত বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয় পাশাপাশি চলেছে। এ হিসাবে প্রথম দুই আয়াতের বক্তব্যকে সূরার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা এমন একটি জরুরী বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়, যা সূরার বহুসংখ্যক বাক্যে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ ভংগীতে।

মানুষের মনের সামনে এই সূরা যে বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তার চারপাশে দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু সংক্রান্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সত্যটি। এটি এমন নির্মম বাস্তবতা, প্রত্যেক প্রাণীই যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, অথচ সে নিজে অথবা তার আশপাশের কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে অগণিত প্রাণী মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি সবল, কি দুর্বল, সকলেই এর শিকার হচ্ছে অথচ সকলে তার সামনে একই রকম অসহায়। কোনো কলাকৌশল বা ফন্দি-ফিকির, কোনো উপায়-উপকরণ, কোনো জোর-জবরদস্তি, কোনো সুপারিশ, কোনো প্রতিরোধ কিংবা কোনো বিলম্বিত করণের কৌশল প্রয়োগ করে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই তার সামনে আসে এবং মানুষ তা ঠেকানোর কোনো উপায়ই জানে না। মৃত্যুর কাছে এবং যে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তা পাঠায় তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকে না। সূরার ২৬-৩০ আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরার উপস্থাপিত বিষয়সমূহের আর একটি অন্যতম বিষয় হলো মানুষের ইহকালীন জন্ম। এই জন্ম দ্বারা তার মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জন্ম এবং মানব সৃষ্টির মূলে নিহিত পরিকল্পনার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার সূক্ষ্মতা, নিপুণতা এবং অব্যাহত পুনরাবৃত্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। যারা আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তারাও কখনো একথা দাবী করে না যে, পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজ একজন স্রষ্টাই করে থাকেন। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা এই মর্মেও সাক্ষ্য দেয় যে, পরকালীন পুনরুজ্জীবন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজই শুধু নয়, বরং অপরিহার্য। কেননা প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তার জীবন ও কর্মকে মূল্যায়ন না করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এই বক্তব্য নিয়েই এই সূরা মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে। সূরার সূচনাতেই সে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না? আবার শেষের দিকে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?

সূরার উপস্থাপিত অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দৃশ্য হচ্ছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামতে সংঘটিত প্রাকৃতিক জগতের ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার দৃশ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় এবং সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়া সর্বাত্মক ভীতি ও ত্রাস। মানুষের প্রশ্নের জবাবে কেয়ামতের এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দেয়া হবে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে। যথা..... সে জিজ্ঞাসা করে, কবে হবে কেয়ামত। সেটি হবে সেই দিন যেদিন দৃষ্টিশক্তি যাবে....'

সেদিনের দৃশ্যসমূহের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হবে মোমেনদের দৃশ্য। তারা সেদিন পরম আনন্দে ও শান্তিতে থাকবে। সেই ভয়াবহ দিনে তারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশায় আশান্বিত থাকবে। অপর দৃশ্যটি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত, আপন পাপ ও কুফরীর শাস্তির আশংকায় তটস্থ অবাধ্য লোকদের দৃশ্য। এ দৃশ্যটি এত শক্তিশালী ও জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়, যেন তা কোরআন পাঠের সময় পাঠকের সামনেই উপস্থিত। এতে মানুষের ইহকাল প্রীতি ও আখেরাতকে অবহেলার সমালোচনা করা হয়েছে। 'কখনো নয়, তোমরা বরঞ্চ দুনিয়ার জীবনকেই ভালোবাস আর আখেরাতকে ছেড়ে দাও।'

এইসব দৃশ্য বর্ণনার মাঝখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর ব্যাকুলতা সম্পর্কে দেয়া বিশেষ নির্দেশ সম্বলিত চারটি আয়াত। মনে হয় খোদ সূরার ভেতরেই এই শিক্ষার প্রসংগ বিদ্যমান রয়েছে। রসূল (স.) আশংকা করতেন যে, কোরআনের কোনো অংশ হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই ভুলে যাওয়ার ভয়ে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় এর এক একটি করে বাক্য বারবার মুখে আউড়িয়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। এই প্রসংগেই নাযিল হয়, 'তাড়াহুড়া করে মুখস্থ করার জন্যে কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করে নিজের জিহবা নাড়িও না। একে একত্রিত করা ও পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব। যখন আমি পড়বো, তখন তা অনুসরণ

www.pathagar.com

করে পড়ো। তারপর তার ব্যাখ্যা করাও আমার দায়িত্ব।' তাঁর কাছে এ নির্দেশিকা আসার কারণ এই যে, কোরআনের সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দায়িত্ব–এটা যেন তিনি বোঝেন ও নিশ্চিন্ত থাকেন।

তাঁর ভূমিকা শুধু কোরআন নিজে আহরণ করা ও অন্যদের কাছে পৌছানো। যথাসময়ে তিনি পুরো কোরআন তার অন্তরে রক্ষিত দেখতে পাবেন। আসলে হয়েছিলোও তাই। এই নির্দেশ কোরআন নাযিল হওয়ার সময়েই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। যেহেতু এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহরই উক্তি, তাই আল্লাহর এই উক্তি অকাট্য ও অক্ষয় প্রমাণিত হয়েছিলো। খোদ্ কোরআনের মতোই এ কথাগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয়েছে। এ থেকে একটি অক্ষরও হারায়নি বা খোয়া যায়নি। বস্তুত এ কথাগুলোও ছিলো অকাট্য সত্য।

এই সূরাটি পড়ার সময় প্রত্যেক পাঠকের মন উপলব্ধি করে যে, সে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছে তার পালানোর অবকাশ নেই। তার কর্মফলের সাথেই তার ভাগ্য আবদ্ধ। এ থেকে তার নিস্তার নেই। এ থেকে তার কোথাও আশ্রয় নেই। কেউ তার রক্ষক নেই।

স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা দ্বারা তার জন্ম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত। দুনিয়াতে ও আখেরাতে একইভাবে নিয়ন্ত্রিত–চাই সে যতই খেলাধুলা, তামাশা ও অহংকার করে কাটাক না কেন। এ কথাই পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে,

'কিন্তু সে–না সত্য মেনে নিলো, না সে নামায পড়লো। বরং সত্যকে মনে করলো ও ফিরে গেলো। পরে অহমিকা সহকারে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে রওনা হয়ে গেলো।'

আর সেই বিপুলসংখ্যক তত্ত্ব, তথ্য ও আবেগ অনুভূতির সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশিই পরোক্ষ হুমকির বাণী শোনানো হয়েছে এভাবে, 'এরূপ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়। হাঁ, এই আচরণ ..... তোমাতেই শোভা পায়।'

এ ভাবেই সূরাটি মানুষের মনের একগুয়েমী, গোয়ার্তুমী, হঠকারিতা, অবহেলা, ও খেল তামাশা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করে। কেননা এ কোরআন মহান প্রভু আল্লাহর কালাম। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তাঁর কালামে মুখরিত, প্রকৃতির নিরাপদ রেজিষ্টারে তা সুরক্ষিত এবং এই পবিত্র গ্রন্থেও তা সংরক্ষিত।

ইতিপূর্বে আমি নিছক বর্ণনার খাতিরে সূরার বক্তব্য বিষয় ও দৃশ্যসমূহ তুলে ধরেছি। কিন্তু মূল সূরায় সে বিষয়গুলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেননা উক্ত বিষয়গুলো ক্রমাগতভাবে বর্ণনা করা, কোথাও একাধিক বিষয়ের একত্র সমাবেশ, আবার কোথাও সত্যের একটি বিশেষ দিকের বর্ণনা এবং পুনরায় তার অপরাংশের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন–এ সবই মানব হৃদয়কে সম্বোধনের কোরআনের বিশেষ বাচনভংগী। অন্য কোনো বাচনভংগী এর ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

www.pathagar.com

সূরা আদ দাহর

কোনো কোনো বর্ণনায় যদিও এই সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে একটি মক্কী সূরা। বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও যাবতীয় লক্ষণের দিক দিয়ে এর মক্কী হওয়াটাই স্পষ্ট। এ জন্যে আমরা এর মক্কী হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাকেই অগ্রগণ্য মনে করেছি। এর বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এতে আখেরাতের জীবনে দৈহিক উপভোগ্য নেয়ামতসমূহের পাশাপাশি কঠিন ও ভয়ংকর আযাবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে রসূল (স.)-কে স্বীয় প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা এবং পাপিষ্ঠ ও অবাধ্য মোশরেকদের কারো আনুগত্য না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সময়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছিলো। একদিকে মোশরেকদেরকে আরো একটু সময় দেয়া এবং অপরদিকে রসূল (স.)-কে তাঁর কাছে নাযিল করা ওহীর ওপর অবিচল থাকা, বাতিলপন্থীদের চাপ ও প্রলোভনের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল ক্বালাম, সূরা আল মোযযামমেল ও সূরা আল মোদদাসসের-এর বক্তব্যও অনেকটা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই আমাদের দৃষ্টিতে এই সূরার মাদানী হওয়ার সম্ভাবনা এতো কম যে, তা বিবেচনা না করলেও চলে।

সামগ্রিকভাবে সূরার বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহর অনুগত হওয়া, তাঁর কাছে একাগ্রমনে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার সন্তোষ কামনা করা, তাঁর নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা, তাঁর অনুগ্রহকে অনুভব করা, তাঁর আযাব থেকে সতর্ক হওয়া, তাছাড়া তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাঁর সৃষ্টি, নেয়ামত বিতরণ পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করার পেছনে যে মহত্তর সুক্ষ্ম, গভীর জ্ঞান ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করার উদাত্ত, বিনম্র ও মৃদু আহবানও এতে রয়েছে।

সূরার শুরুতেই এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করে মানুষের হৃদয়ে একটি হালকা অনুভূতির পরশ বুলাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষ তার জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলো? কে তাকে অস্তিত্বে আনলো? এক সময়ে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই মানুষ একদিন এই সৃষ্টিজগতে কিভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো। বলা হয়েছে, 'মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিলো না!'

এরপর তার জন্মের উৎস ও রহস্য উদ্ঘাটন করে তার সৃষ্টির পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে, অতপর তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আরেকটি হালকা পরশ বুলানো হয়েছে। 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে, যাতে করে আমি তার পরীক্ষা নিতে পারি, অতপর আমি তাকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন বানিয়েছি।'

www.pathagar.com

এরপর তৃতীয় আরেকটি পরশ বুলানো হয়েছে এই মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সত্য ও সঠিক পথে চলতে তাকে সাহায্য করেছেন, অতপর নিজের গন্তব্যস্থল নিজেই বেছে নেয়ার জন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, 'আমি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, এখন চাই সে কৃতজ্ঞ হোক কিংবা অকৃতজ্ঞ হোক।'

ওহীর মাধ্যমে এই তিনটি পরশ বুলানো এবং এগুলোর ফলে মানুষের মনে সৃষ্ট গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, আগে পিছে ভাবতে বলা হয়েছে, অতপর নির্দিষ্ট পথটি মনোনীত করার প্রাক্কালে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সূরাটি মানুষকে জাহান্নামের পথ প্রত্যাখ্যান করারও আহ্বান জানিয়েছে এবং তার দ্বিধাদ্বন্দের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উৎসাহ দানের যতো পথ ও পন্থা থাকতে পারে তাও দেখানো হয়েছে। আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যতো আকর্ষণীয় ভাষা থাকতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা, 'আমি কাফেরদের জন্যে হাতকড়া, জিঞ্জির ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। সৎ লোকেরা এমন পেয়ালায় পান করবে, যার সাথে কর্পুরের সুগন্ধি মিশ্রিত থাকবে। তা হবে এমন একটি প্রবহমান ঝর্ণা, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী তারা তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।'

আখেরাতের সেই অঢেল সুখ সমৃদ্ধির উপকরণগুলো বর্ণনা করার আগে এই সৎ লোকদের গুণ বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার জন্যে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আগাগোড়াই সহানুভূতি, ঔদার্য, সৌন্দর্য ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি রয়েছে, আর এই সবই হচ্ছে সৎ লোকদের জন্যে নির্ধারিত সেই আনন্দদায়ক তৃপ্তিকর ও মনোমুগ্ধকর নেয়ামতসমূহের সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা,

'তারা মান্নত পূরণ করে এবং সেই দিনটিকে ভয় করে যার বিপদ সবত্র বিস্তৃত হবে, খাবারের প্রতি নিজেদের থাকা সত্তেও তারা মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার খাওয়ায়....।'

তারপর এই সব সৎ বান্দাদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনমনীয় ও সংকল্পবদ্ধ ছিলো, যারা আখেরাতের কঠিন দিনকে ভয় করতো, যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দরিদ্রদেরকে খাওয়াতো এবং এ জন্যে কারো কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করতো না, শুধুমাত্র কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়েই তারা খাবার খাওয়াতো।

এভাবে যারা নিছক আখেরাতের ভয়ে দরিদ্রদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাওয়াতো, তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে পরবর্তী আয়াতে এবার তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, 'তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের মুসিবত ও আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। তাদের ধৈর্যের কারণে ..... প্রতিদান হিসেব বেহেশত ও রেশমী বস্ত্র দেবেন...।'

www.pathagar.com

এভাবে প্রথম রুকুর শেষপর্যন্ত এই প্রতিদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই তৃপ্তিকর নেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরার পর স্বয়ং রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁকে সকল অবজ্ঞা অবহেলা ও অস্বীকৃতির মুখে দাওয়াতের কাজে অবিচল থাকা ও ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ও পথ যতোই দীর্ঘ হোক তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশও তাকে দেয়া হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম চারটি আয়াত হচ্ছে এই আদেশ সম্বলিত। অতপর সূরার শেষ আয়াতগুলোতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা এই দিনটির যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও নেককার লোকেরা তাকে ভয় করে, সাবধানতা অবলম্বন করে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই অবিশ্বাসীদেরকে খতম করে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেহ ও মনে বিদ্যমান যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার যোগান দিয়েছেন। এখানে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর পরীক্ষার কি পরিণতি হয়ে থাকে তাও তিনি এ সূরায় ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাকে যে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, তা জানানোর মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে, আর সূরাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে সে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কেননা শুরু থেকেই এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সূরাটির উল্লেখিত সূচনা ও উপসংহার জীবনের বাইরের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। এটাকে বুঝবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাকে পরীক্ষার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর উপরোক্ত সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করাটাও এই পরীক্ষার আওতাভুক্ত। বুঝবার ক্ষমতাটুকু তাকে এ জন্যে দেয়া হয়েছে যেন সে পরীক্ষায় কামিয়াব করতে পারে।

সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে আখেরাতের নেয়ামতসমূহের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা কোরআনের দীর্ঘতম বিবরণ। অথবা বলা যেতে পারে যে, সূরা 'আল ওয়াকেয়া'-য় যে বিবরণ এসেছে তার তুলনায় এটা দীর্ঘ। সামগ্রিকভাবে এ নেয়ামত দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য ও উপভোগ্য। সেই সাথে রয়েছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানের বাড়তি পুরস্কার।

এই উভয় ধরনের পুরস্কার বা প্রতিদানের বিবরণ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা মক্কাবাসীরাই ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ট। দৈহিকভাবে উপভোগ্য সামগ্রীর প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো তীব্র। এ ধরনের ভোগ্য সামগ্রী সমাজের বহু শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। প্রতিদান হিসাবেও এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রী অনেকের কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাদের কি অভিরুচি, কাদের কাছে কি বেশী প্রিয়, কার মন-মানসিকতার সাথে কোন দ্রব্য সামগ্রী বেশী উপযোগী ও মানানসই, তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে আবার অনেকে এমনও আছে, যাদের কাছে স্থূল ভোগ্য সামগ্রীর চেয়ে উন্নতমানের প্রতিদান বেশী আকর্ষণীয়। যেমন সূরা 'আল কেয়ামা'য় আছে, 'কিছু মুখমন্ডল সেদিন প্রফুল্ল থাকবে এবং তারা আপন প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

সূরা আল মোরসালাত

প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেকগুলো দৃশ্য ও সুতীব্র প্রভাব বিস্তারকারী বহু বক্তব্যে এ সূরাটি পরিপূর্ণ। মনে হয় এর প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি জলন্ত আগুনের কাঠি। এগুলো যেন শ্রোতার বিবেকের ওপর অত্যন্ত ভয়ংকর আঘাত করে। তার বিবেকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও হুমকির কিছু বান যেন ছুড়ে মারে।

সূরাটি দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্য, মানব সত্ত্বা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং কেয়ামত ও আযাবের বহু চিত্র তুলে ধরে। আর প্রত্যেকটি দৃশ্য তুলে ধরার পর অপরাধীর মনের ওপর যেন এই বলে একটা একটা ধারালো আগুনের শূল নিক্ষেপ করে।

'সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য।'

পুরো সূরাটিতে দশবার এই ছন্দায়িত মন্তব্যটি পেশ করা হয়েছে। এটি এই সূরার একটি বিশিষ্ট বাকধারায় পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষুরধার ইংগিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্যসমূহ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী উপস্থাপনা ভংগির সাথে এই মন্তব্যগুলো একান্ত সংগতিপূর্ণ।

সূরা 'আর রহমান'-এ আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার পর বারবার উচ্চারিত হয়েছে, 'অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতটি অস্বীকার করবে?'

অনুরূপভাবে সূরা 'আল কামার'-এ প্রতিটি আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর বারবার এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে, 'অতপর দেখলে তো আমার আযাব ও হুঁশিয়ারী কেমন ছিলো?'

আলোচ্য সূরায় এই বারবার উচ্চারিত তাৎপর্যবহ বাক্যটি আগের সূরা দুটোর সে বাক্য দুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে এটির বারবার উচ্চারণ সূরাটিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ও মহিমায় মন্ডিত করেছে এবং তাকে বহুলাংশে ধারালো ও তেজস্বী করে তুলেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার আয়াতগুলো ছোট ছোট, গতিশীল ও প্রচন্ড প্রভাবময়ী। অধিকাংশই বিচিত্র মিত্রাক্ষর শব্দে সমাপ্ত আয়াতের সমষ্টি। আয়াতের শেষে কখনো কখনো একই মিত্রাক্ষর শব্দ পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এসব মিত্রাক্ষর শব্দগুলো ছোট ও গতিশীল। এর বাক্যগুলো শ্রোতার স্নায়ুতে তীব্র এক দাহ ও প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করে। এসব অনুভূতি তাদের মনে একের পর এক অবিরত ধারায় সৃষ্টি হতে থাকে। একটির রেশ না মিলাতেই আর একটির উদ্ভব হয়।

www.pathagar.com

সূরার শুরু থেকেই এই ধারা শুরু হয়েছে। তীব্র ঘূর্ণিবায়ু অথবা ফেরেশতার উল্লেখ দ্বারা সূরার পরিবেশকে ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ করা হয়েছে। এপর্যায়ে প্রথম ৭টি আয়াত লক্ষণীয়। এই উদ্বোধনী বক্তব্যগুলো সূরার সার্বিক পরিমন্ডল ও তার প্রভাব বলয়ের সাথে পুরোপুরিভাবেই সংগতিশীল।

এসব ক্ষেত্রে কোরআন একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করে থাকে। কোথাও সূরা 'আদ্ দোহা'র ন্যায় স্নেহপ্রীতি ও দরদ মাখা দৃশ্য অংকন করে। আবার কোথাও অনুসরণ করে সূরা 'আ'দিয়াত' এর ন্যায় ঊষাকালীন দ্রুতগামী অশ্বের ধুলা উড়ানো এবং কবর খুলে কবরবাসীর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দৃশ্য। এভাবে বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয়ে থাকে।

এই উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সূরার যে দশটি প্যারা সম্বলিত ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বলতে গেলে শ্রোতাকে এক একটি স্বতন্ত্র জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেক জগতে পরিভ্রমণের সময় সূরাটি নিজেই যেন চিন্তা গবেষণা, আবেগ, উদ্দীপনা মানসিক প্রতিক্রিয়া ও সাড়ার এক একটি বিশাল অংগনে রূপান্তরিত হয়। ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের তুলনায় সেই বাস্তব অংগনগুলো অনেক প্রশস্ত ও সুপরিসর। শব্দগুলো যেন এক একটি সাংকেতিক তীর, যা বিভিন্ন জগতের দিকে ইংগিত করে যায়।

এর মধ্যে প্রথম বাক্যগুচ্ছটি (৮-১৫তম আয়াত) কেয়ামতের দিনের দৃশ্য বর্ণনা সম্বলিত। এতে আকাশ ও পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন সূচিত হবে তার একটা সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে। এই চিত্র সে সময়কার, যখন রসূলরা সবাই মানব জাতির সাথে এক হয়ে হিসাব চুকিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় প্যারাটি হচ্ছে অতীত যমানার আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের কাহিনী সম্বলিত। আল্লাহর বিধান ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি নীতি অবলম্বন করে থাকেন এখানে তার প্রতি ইশারা ইংগিত রয়েছে। এ প্যারাটি ১৬ থেকে ১৯ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় প্যারাটি মানুষের ইহকালীন জীবনের সূচনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং এটি ২০-২৪ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত।

চতুর্থ প্যারাটি ২৫-২৮ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এতে পৃথিবী, তার জীবিত ও মৃত অধিবাসীদের বাসস্থানের বর্ণনা, তার স্থীতি ও তাতে জীবন দানকারী পানির প্রাচূর্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম প্যারাটি রয়েছে ২১-৩৪ আয়াতসমূহে। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের কেয়ামতের দিন যে আযাবে ভুগতে হবে এতে তার বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ (৩৫-৩৭) ও সপ্তম প্যারায় (৩৮-৪০) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির আরো কিছু বিবরণ এসেছে।

www.pathagar.com

পার্থিব জীবনের সব কিছুই এই আখেরাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিশুদ্ধিও এর ওপর নির্ভরশীল। তাই এই আকীদাকে মনে বদ্ধমূল করার জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন ছিলো।

সূরা আন-নাবা

আলোচ্য সূরাটি আমপারায় বর্ণিত বিষয়গুলোর এক চমৎকার উদাহরণ। এ পারাতে উপস্থাপিত হয়েছে উদাহরণ, প্রাকৃতিক বর্ণনা, ঘটনাপঞ্জি, বিভিন্ন জিনিসের প্রতিচ্ছবি, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিষয়সমূহ। প্রাণীজগত ও জড়জগতের সুরঝংকার, দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা, অনুভূতি ও বিবেককে আকর্ষণকারী শব্দ ও বাচনভংগিও এখানে রয়েছে। জগত ও জীবন সম্পর্কে বর্ণিত এসব কথা এ সূরাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরাটি শুরু করা হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রশ্নে মধ্য দিয়ে। কোরায়শরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলো তার গুরুত্ব এতে আরো অনেক বেড়ে গেলো। অর্থাৎ প্রশ্নের বিষয়টি পাঠকের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হলো যে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার আর কোনো সুযোগই রইলো না। তবু কি তারা মতভেদ করছে? এ প্রসংগে তাদের সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে– যেদিন সবকিছু ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে।

'কোন্ বিষয়ে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?সেই মহা খবর সম্পর্কে কি, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত? না– যা তারা ভাবছে তা কিছুতেই হবার নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অবশ্যই তারা জানতে পারবে।' তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এই মহাসংবাদ সম্পর্কিত আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে বলা হয়েছে, আমাদের সামনে ও আশেপাশে যে অবস্থা বিরাজ করছে, আমাদের অন্তরে যা আমরা অনুভব করছি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান অবস্থা সেই ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা পরবর্তীকালে আসবে–

আমি কি পৃথিবীকে বিছানা, পাহাড়গুলোকে পেরেক (-এর মতো করে) পয়দা করিনি? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি। বানিয়েছি তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু, রাতকে (আচ্ছাদনকারী) পোশাক এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়। এরপর (তোমাদের মাথার ওপর) সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি। তারপর কম্পমান আলোকমালা দ্বারা এগুলোকে সজ্জিত করেছি। খাদ্যশস্য, শাকসবজি এবং ঘন সন্নিবেশিত বাগবাগিচা তৈরী করার জন্য মেঘমালা থেকে পানি বর্ষণ করেছি।

বাস্তব জীবনের এ সকল উদাহরণ দ্বারা সূরাটির মধ্যে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যে সম্পর্কে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিলো। যখন তারা সেদিনকে প্রত্যক্ষভাবে জানবে, তখন সেদিনটি তাদের সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেন বলতে চান, কি সে জিনিস এবং কোন সে জিনিস (তোমরা কি বলতে পারো)? অবশ্যই ফয়সালার দিনটি নির্দিষ্ট রয়েছে, সেদিন শিঙ্গায়

www.pathagar.com

ফুঁক দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে এগিয়ে আসবে। সে সময় আকাশ খুলে দেয়া হবে, আর তা বহু দরজায় পরিণত হয়ে যাবে, পাহাড়গুলোকে সঞ্চালিত করা হবে, যা ধুলাবালির স্তূপে পরিণত হয়ে যাবে।

এরপর ভয়ংকর এক আযাবের দৃশ্যের কথা পেশ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে। যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকবে। ঠান্ডা অথবা পানীয় বস্তুর স্বাদ তারা সেখানে পাবে না। শুধু গরম পানি ও যখমের ধোয়ানী (বা পুঁজ, রক্ত) ছাড়া। এটাই হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান। বলা হবে, (এগুলোর স্বাদ) তোমরা ভোগ করো, আমি (আজ) শাস্তি ছাড়া তোমাদের অন্য কিছুই বাড়াবো না।

অনুরূপভাবে তাঁর নেয়ামতের বিবরণও দেয়া হয়েছে, ছন্দের তালে তালে যার আলোচনা এগিয়ে আসছে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে চূড়ান্ত সাফল্য আসবে, হাযির হবে সোহাগিনী সমবয়সী তরুণীরা কানায় কানায় ভরা পানপাত্র নিয়ে। যার মধ্যে থাকবে না কোনো বাজে কিছু। তোমার রবের পক্ষ থেকে দেয়া হবে এ প্রতিদান।

সূরাটির সমাপ্তি টানতে গিয়ে ওই মহাদিবসের চমৎকার এক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই দিবসটি আগমনের পূর্বেই তার দৃশ্যের অবতারণার মধ্যে ফুটে উঠেছে সতর্কীকরণ ও সুসংবাদদানের এক চমৎকার উপস্থাপনা। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। এ দুইয়ের মধ্যে আর যা কিছু আছে সে সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি রহমান, দয়াময় প্রভু। আর সেদিন কেউ তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না। সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। দয়াময় আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সেদিন কোনো কথা বলবে না, আর (অনুমতি পেলেও) সত্য সঠিক কথাই বলবে। ওই সঠিক দিনটি নিশ্চিতভাবে আসবে।

এখন যে তার পরয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় পেতে চায় সে আশ্রয় নিক। আমি তোমাদের আসন্ন এক আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি। সে দিন এবং এ দিনকে অস্বীকারকারী প্রতিটি ব্যক্তি বলতে থাকবে 'হায়, আফসোস! (মানুষ না হয়ে) যদি আমি আজ মাটি হয়ে যেতাম!

সূরা আন নাযেয়াত

আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে ৩০ পারার অন্যান্য সূরার মধ্যে যেসব উদাহরণ দেয়া হয়েছে এ সূরাটিতেও অনুরূপ কিছু উদাহরণ রয়েছে। আখেরাতের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, তা কতো ভয়ানক, তার দৃশ্যসমূহ কতো কঠিন এবং এই পৃথিবীর পরিণতির জন্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব কতো বেশী, এই সূরার ছত্রে ছত্রে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে মহান স্রষ্টার সুনিপুণ তৈরী পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের প্রতিটি জিনিসের পরিণতির আভাস। তারপর এর বাসিন্দাদের যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তার বহু যুক্তিও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে

www.pathagar.com

মানব মনে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশে প্রথমেই এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যে এই ভীতিজনক, বিস্ময়কর ও কঠিন অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে কতো দ্রুতগতিতে কেয়ামত সংঘটিত হবে সে বিষয়ে পাঠককে সচকিত করা হয়েছে।

ওই ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করতে গিয়ে প্রথমেই যে বর্ণনা এসেছে তা একজন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ বর্ণনা মানুষের মনকে ভীষণ ভয়ে বিহ্বল করে দেয়। তার হৃদয়ে এমন কাঁপুনি সৃষ্টি করে যে, তার হৃদয়ের তারগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। তার গোটা সত্তা অবশ্যম্ভাবী ওই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে থাকে এবং গভীর পেরেশানীতে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়।

'গভীরভাবে ডুব দেয়া ও সজোরে বিচ্ছিন্নকারী ফেরেশতাদের কসম, আবার কসম ওই ফেরেশতাদের, যারা ধীর গতিতে সহজভাবে জানগুলো কবয করে নেয়। কসম তাদের যারা রূহগুলো নিয়ে (উন্মুক্ত আকাশের পরিমন্ডলে) সাঁতার কেটে চলে যায়। তাদেরও কসম, যারা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যায় এবং পর পর আল্লাহর সকল হুকুম পালন করে চলে।'

মানুষের কল্পনার চোখে এসব ঘটনা তুলে ধরে সে দিনের ভীষণ দৃশ্যগুলোর প্রথম অবস্থাটি তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে অন্যান্য অবস্থাগুলো পর পর এমনভাবে আসতে থাকবে যেন এগুলোর আগমন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে এবং অতি সংগোপনে একটি ঘটনার পরিণতিতে অপরটি আসা অবধারিত হয়ে আছে। কোরআনের বর্ণনাধারা দেখুন– সেদিন আসবে ভীষণ কম্পন সৃষ্টিকারী প্রচন্ড এক ধাক্কা, যার পরে আসবে আবারও ....(আয়াত–৬-১৪)

পরবর্তী অবস্থাগুলোও একের পর এক আসতে থাকবে। মহাশূন্য ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে স্থির হয়ে যাবে। এভাবে সবকিছু এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মূসা ও ফেরাউনের সময়কার যে সব বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ব্যক্তি আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছিলো তাদের মতো অন্যান্য সবাই এ ধ্বংসাত্মক অবস্থায় পতিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে তাদের সম্পর্কে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবে। এরশাদ হচ্ছে– 'এসেছে কি তোমার কাছে মূসার কাহিনী? স্মরণ করে দেখো সে সময়ের কথা, যখন তার রব তাকে তুয়া নামক উপত্যকায় ডেকে বললেন, যাও ফেরাউনের কাছে, ...পাকড়াও করলেন। এর মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে সেসব ব্যক্তির জন্যে যে (তাঁকে) ভয় করে।' (আয়াত-১৪-২৬)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ওই মহাসত্য জানানোর জন্যে এখানে একটি ভূমিকা পেশ করছেন। ভূমিকার বর্ণনা শেষে তিনি প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে সর্বশক্তিমান মহান সত্তার অস্তিত্বের বহু চিহ্ন ফুঠে রয়েছে। এটা সেই মহান সত্তার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার কথা জানায়, জানায় দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, তাঁর তদারকির কথা! সেই মহাশক্তিই যে অতি সংগোপনে সবকিছু পরিচালনা করছে এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমেই যে সবকিছু চলছে, এ সূরার শুরুতে তারই আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'তোমাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? এই মহাকাশ তিনি তৈরী করলেন, এর ছাদ সমুন্নত করলেন এরপর সুসমন্বিত করলেন এর গঠন প্রণালীকে। এরপর রাতকে ঢেকে দিলেন (অন্ধকারের চাদর দিয়ে), আর বের করলেন তার থেকে উদীয়মান দিনের উজ্জ্বল আলো। তারপর বিছিয়ে দিলেন যমীনকে, তার থেকে পানি ও তার চারণভূমি বের করলেন, আর তার মধ্যে পর্বতমালাকে গেড়ে দিলেন, যে পানি তোমাদের জন্যে জীবন সামগ্রী এবং তোমাদের গবাদিপশুর জন্যেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে।' (আয়াত-২৭-৩৩)

এ হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা বর্ণনা করে প্রাণসঞ্চারী অনুভূতি জাগানোর পর মহাপ্রলয়ের দৃশ্য এবং দুনিয়ার জীবনে সম্পাদিত যাবতীয় কাজের পরিণতির বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে প্রতিদান (নেককার লোকদের) দেয়া হবে তার কিছু দৃষ্টান্ত এমনভাবে প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে, যা দেখে পাপাচারীদের সর্বনাশা পরিণতি বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর হেদায়াতের বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্যে মানুষ যা কিছু চেষ্টা সাধনা বা ষড়যন্ত্র করেছিলো, সেদিন তা খুব ভালোভাবেই সে স্মরণ করবে এবং (সেদিন) জাহান্নামকে এগিয়ে আনা হবে সে ব্যক্তির জন্যে– যে তা নিজের চোখে দেখতে পাবে, অর্থাৎ সে-ই সেদিন তার উপযুক্ত হবে। অতএব যে সীমালংঘন করেছিলো এবং দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখেছিলো, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা এবং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিলো এবং তার মনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে থামিয়ে রেখেছিলো, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

সেই মহাপ্রলয়ের বিভীষিকাময় দৃশ্যের বর্ণনা শুনে যখন আমাদের অন্তর অভিভূত হয়ে পড়ছে সেই মুহূর্তেই বলা হচ্ছে– 'দোযখকে তার ভয়ংকর চেহারাসহ তাদের সামনে এগিয়ে দেয়া হবে, যারা নিজ চোখে দেখতে পাবে ওই উন্মুক্ত দোযখকে। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের তুলনায় বড়ো করে দেখেছে, আর যারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে– এ চিন্তায় মনকে তার লাগামছাড়া চাহিদা পূরণ করা থেকে দমন করবে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তাদের ঠিকানা।' এ পর্যায়ে এসে সূরার মোড় ফিরে যাচ্ছে ওই ভয়ানক কেয়ামতের অস্বীকারকারীদের দিকে, যারা রসূল (স.)-এর কাছে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ওদের প্রশ্ন প্রসংগে কেয়ামতের ভয়াল চিত্র তুলে ধরায় তাদের অন্তরের ভয় আরও বেড়ে গেলো। কেয়ামতের সর্বগ্রাসী চেহারার হৃদয়বিদারক বর্ণনা অপরাধীদের মনকে ভয়ে বিহ্বল করে দিলো। দেখুন সে বর্ণনা– 'ওরা জিজ্ঞাসা করছে কেয়ামত সম্পর্কে .....তাদের কাছে মনে হবে (দুনিয়ার সুখের জীবন) একটি মাত্র রাত অথবা একটি মাত্র উজ্জ্বল প্রভাত তারা কাটিয়েছে। 'মাদ্' চিহ্ন বিশিষ্ট 'হা' দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী কেয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে, যার ভয়ানক অবস্থা ও বিশালত্বও মনকে কাঁপিয়ে দেয়। (আয়াত-৪২-৪৬)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

করে রেখেছে। অধিকন্তু এ সমাজ যেমনিভাবে পুরুষ জাতিকে সম্পদের উত্তরাধিকার করেছে তেমনিভাবে নারীকে উত্তরাধিকার করেনি। যখন মহিলাদের স্বামী মারা যেতো, তখন তার কাছে আসতো এবং তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভালো করেই জানতো যে সে (মহিলা) নিশ্চিতভাবে তারই জন্যে গচ্ছিতা ও রক্ষিতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারে অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারে কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখবে যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যাবে না, আবার তালাকপ্রাপ্তাও বুঝা যাবে না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে।

আমরা এমন একটি সমাজ এখানে দেখতে পাই, যেখানে নারী জাতির মর্যাদার অধপতনের কারণে পরিবারের বন্ধন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং তার নিয়ম-নীতিতে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো বহুতরো বিশৃংখলা। অধিকন্তু দত্তক ও অভিভাবকত্বের আইন-কানুনে বিশৃংখলা এবং আত্মীয়তা ও বংশ তালিকা বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতির সাথে তার সংঘর্ষও পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। সর্বোপরি সে সমাজে যৌন ও পারিবারিক সম্পর্কে ছিলো সীমাহীন নৈরাজ্য ও হাজারো অনিয়ম। এমনকি সবার সামনে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অশ্লীল বাক্য বিনিময় ও অবাধ যৌন মিলনও সেখানে বিদ্যমান ছিলো।

আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে পাই, যেখানে সুদভিত্তিক লেনদেন, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হতো, মানুষের অধিকার হরণ করা হতো, আমানতের খেয়ানত করা হতো, মানুষের জান ও মালের ওপর আক্রমণ হতো। ন্যায়-ইনসাফ সে সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিলো। সে সমাজে লোক দেখানো মান মর্যাদা ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া ধন সম্পদ ব্যয় করা হতো না। আর এ দানের সম্পদ ধনী ও শক্তিশালীরা যতোটুকু পেতো, অসহায়, গরীব ও দুস্থদের ভাগ্যে সে পরিমাণ জুটতো না।

এগুলো ছিলো জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। সুন্দর করে এ সূরাটি তা বর্ণনা করেছে। এ ছাড়া তদানীন্তন আরব ও আশেপাশের অন্যান্য জাতির মধ্যে জাহেলিয়াতের যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছিলো তার বর্ণনা অন্যান্য সূরার মধ্যেও বিস্তারিত রয়েছে।

আবার জাহেলী সমাজ একেবারে মর্যাদা ও গুণাবলীবিহীন কোনো সমাজও ছিলো না-বরং তারও ছিলো অসংখ্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই সে সমাজের এক বিরাট অংশ রসূল (স.)-এর রেসালাতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলো। জাহেলী সমাজের মহৎ গুণাবলীকে জাহেলিয়াতের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তারা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেছিলো। যদি দ্বীন ইসলামের আগমন না ঘটতো, তাহলে জাহেলিয়াতের মহৎ গুণাবলীসমূহ পাপ ও অপকর্মের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে একদিন এমনিই নিঃশেষ হয়ে যেতো। এ নতুন বিধানের আগমন না ঘটলে আরব জাতি বিশ্বমানবতার সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই উপস্থাপন করতে সক্ষম হতো না। এ

www.pathagar.com

বিধান জাহেলিয়াতের বিকৃত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলে তার ওপর ইসলামের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে লাগলো এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত আরব জাতির মহৎ গুণাবলীকে একে একে উদ্ধার করতে লাগলো।

যে জাহেলিয়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্য থেকেই ইসলাম কিছুসংখ্যক লোককে বেছে নিলো। তাদের ভাগ্যে মহান রব্বুল আলামীন কল্যাণ রেখেছেন এবং তাদেরকে মানবজাতির নেতৃত্বের জন্যে তিনি নির্বাচন করেছেন। অতপর ইসলাম তার থেকে একটি ইসলামী দল বের করে আনে, তারপর তাকে দিয়ে একটি ইসলামী সমাজ গঠন করে। সে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অন্য কোনো জাতি ইতিপূর্বে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। আজও যদি মুসলিম জাতির মধ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তারাও পূর্বের ন্যায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হবে।

এই সূরার মাঝে আমরা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা ইসলামী বিধানকে জাহেলিয়াতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে। এ বিধান ও পরিবেশ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের হেফাযত করে এবং তাকে বর্তমান সমাজে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর।

আমরা এ সূরার শুরুতে যে সমস্ত জিনিসের বর্ণনা পাচ্ছি তা হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব ও তার তাওহীদের তাৎপর্য, মানুষের পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য, তদুপরি এ সমস্ত বন্ধনকে মানব চিন্তায় বদ্ধমূল করার দীর্ঘ বর্ণনা এখানে রয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে এর বুনিয়াদ স্থাপন করা, যার ওপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজ পরিচালনা করা যায়, এক কর্তার অধীনে এক পরিবারের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংহতির মাধ্যমে দুর্বলদের হেফাযত করাও অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজকে ব্যভিচার, অত্যাচার এবং ফেতনা থেকে বাঁচানো এবং আল্লাহর প্রভুত্ব এবং মানবতার ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলিম পরিবার, মুসলিম সমাজ এবং মানব সমাজকে পরিচালনা করার বিবরণও এতে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (আয়াত ১)

সূরা আন নেসার প্রথম আয়াতে তাৎপর্যকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামী চিন্তাচেতনার মূল ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর ওপরই মানুষের সামষ্টিক জীবন প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী সমাজ পরিচালনার এই স্তম্ভটির ওপর ভিত্তি করে ইসলামী দলের সংহতি ও সহাবস্থান সম্পর্কিত বাস্তব ও ব্যবহারিক কিছু বিধি বিধানও আমরা এই সূরায় দেখতে পাচ্ছি।

এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা উক্ত সূরায় অনুপ্রেরণাদানকারী কিছু নির্দেশিকা, ভীতিপ্রদ সতর্কতা ও নির্ধারিত নীতিমালাসম্বলিত বিধিবিধানও দেখতে পাচ্ছি। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও .... নিশ্চয় এটা গুরুতর অপরাধ।' (আয়াত ২)

'এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখো, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে .... অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।' (আয়াত ৬)

এরশাদ হচ্ছে, 'তাদের ভয় করা উচিত। যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে আশংকা করে .....আগুনে প্রবেশ করবে।' (আয়াত ৯-১০)

বিশেষ করে নারী, শিশু, এতীম বালিকা এবং দুর্বল মহিলাদের হেফাযত, মীরাসে তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং জাহেলী রীতি-নীতির বর্বরতা থেকে উদ্ধার করার জন্যে আমরা উক্ত সূরায় অসংখ্য বিধিবিধান ও দৃষ্টান্তসমূহ দেখতে পাই। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমরা আশংকা করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও .... তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারো।' (আয়াত ৩-৪)

'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে ... এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'হে ঈমানদাররা, বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়..... এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অংগীকার গ্রহণ করেছে। (আয়াত ১৯-২১)

'লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন ..... আল্লাহ তায়ালা জানেন।' (আয়াত ১২৭)

এখানে এসে নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনামূলক আয়াতসমূহ নাযিল হয়। পরিবারকে গঠন ও সুবিন্যস্ত করা এবং সামাজিক ও বৈবাহিক (দাম্পত্য) জীবনে সাময়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব থেকে পরিবারের হেফাযতের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। এখানে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ও এতীম বালিকাদের আলোচনা প্রসংগে আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে তা আলাদা কথা... তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (আয়াত ২২-২৪)

'পুরুষ নারীদের পরিচালক এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদা দান করেছেন ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমুন্নত মহীয়ান।' (আয়াত ৩৪-৩৫)

www.pathagar.com

'যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামীর.....আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১২৮-১৩০)

দত্তক প্রথা বাতিল করার লক্ষ্যে বংশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোনো মনিব কিংবা ক্রীতদাস এবং উত্তরাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কের শৃংখলাবিধান করার জন্যে এ আয়াতগুলো নাযিল করা হয়, তাছাড়া সুদূরপ্রসারী সামাজিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বলিত নির্ধারিত বিধিবিধান নিয়েও এই আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়।

এরশাদ হচ্ছে, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।' (আয়াত ৭)

'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান .....।' (আয়াত ১১-১২)

'মানুষ তোমার কাছে জানতে চায়, অতপর তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাস সংক্রান্ত নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন .....।' (আয়াত ১৭৬)

'পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান সে সবের জন্যেই আমি অভিভাবক নির্ধারণ করে দিয়েছি ..... আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (আয়াত ৩৩)

নারী জাতিকে পাপ পংকিলতা থেকে পবিত্র রাখা এবং সমাজকে ব্যভিচার মুক্ত রাখার মানসে আমরা সেখানে শৃংখলার ব্যবস্থা দেখতে পাই। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা কূকর্মে লিপ্ত হবে, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারণ পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো .....।' (আয়াত ১৫-১৬)

'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসদেরকে বিয়ে করবে।

সীমিত করণের উদ্দেশ্যে নয় বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এ থেকে কিছু এখানে কিছু কথা বর্ণনা করবো। সূরার পূর্বাপর প্রসংগে সকল নির্দেশনা ও বিধি বিধান স্ব স্ব স্থানে বর্ণিত হবে।

এরশাদ হচ্ছে, 'যে সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না, বরং তা থেকে খাওয়াও, পরাও এবং .....।' (আয়াত-৫)

'সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়স্বজন, এতীম ও মেসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিন্তু সদালাপ করো।' (আয়াত ৮)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস (ভক্ষণ) করো না .... এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।' (আয়াত ২৯-৩০)

www.pathagar.com

তোমরা আকাংখা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ... নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।' (আয়াত ৩২)

'তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, মেসকীন, প্রতিবেশী.... তার ভাগ্যে খুব খারাপ সংগী জুটেছে। (আয়াত ৩৬-৩৮)

'হে মুসলমানরা! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকদের কাছে সোপর্দ করে দাও .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনেন।' (আয়াত ৫৮)

'যে লোক সৎ কাজের জন্যে কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে .... অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।' (আয়াত ১৪৮-১৪৯)

পারস্পরিক নিরাপত্তা, করুণা, উপদেশ, মহানুভবতা, আমানত, ইনসাফ, ভালোবাসা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে সুবিন্যস্ত করা, উক্ত সমাজ থেকে জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট জঞ্জালকে মুছে ফেলা এবং ইসলামী বিধানের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মতো বিরাট একটা লক্ষ্য অর্জন করার পাশাপাশি আমরা এখানে অন্য একটি লক্ষ্যও দেখতে পাই। মুসলিম সমাজ জীবনে যার প্রভাব ও গভীরতা উপরোক্ত লক্ষ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই বিষয়টি হচ্ছে দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত অনুধাবন করা, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এমন সকল নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের নির্ধারিত অর্থ বুঝা এবং ঈমান ও ইসলামের নির্ধারিত সংজ্ঞার সাথে তার সংযোগ স্থাপন করা।

দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মূলত সে জীবনবিধানের নাম যাকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবতার জন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং দ্বীন হচ্ছে সে আদর্শের নাম যার ওপর গোটা জীবনের সকল কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়, আর এই বিধান রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের নাম, কেননা একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে আনুগত্য পাওয়ার এবং একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই জীবন বিধান গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং মুসলিম সমাজের যেমন বিশেষ চিন্তাভাবনা ও আকীদাবিশ্বাস রয়েছে তেমন তার রয়েছে বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব, আর সে নেতৃত্ব হচ্ছে রসূল (স.)-এর আদর্শ এবং আল্লাহর শরীয়ত এই সমাজের উল্লেখিত নেতৃত্বের অধীনতা ও নির্ভরশীলতাই মানুষকে ইসলাম তথা আত্মসমর্পণের গুণ দান করেছে এবং তা থেকেই মুসলিম সমাজের গোড়া পত্তন করেছে। এই বিধানের কাছে নিরংকুশ আত্মসমর্পণ ছাড়া কখনো কেউ পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। এই অধীনতার শর্ত হচ্ছে, কোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে একমাত্র আল্লাহর রসূল (স.)-এর ফয়সালায় তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এই ফয়সালাকে মেনে নিয়ে তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই সূরার বক্তব্য চূড়ান্তভাবে বিবৃত হয়েছে। এতে কোনো বিতর্ক, কোনো সন্দেহ, অথবা কোনোরূপ জটিলতা ও সংমিশ্রণের

www.pathagar.com

অবকাশ নেই। কারণ এই বক্তব্য এতোই সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত যে, এতে কোনো বিতর্কের অবকাশই থাকে না।

এই মূলনীতির প্রতিষ্ঠা এই সূরার আরো অসংখ্য বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার বিস্তারিত পর্যালোচনা স্ব-স্ব স্থানে বিবৃত হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

এই সূরার প্রথম আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে এই মূলনীতি সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে, 'হে মানব সমাজ ... আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (আয়াত ১)

'তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। (আয়াত ৩৬)

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শেরকের পাপ ক্ষমা করেন না....., আর যে লোক আল্লাহর সাথে শেরক করলো, সে বড়ো অপবাদই আরোপ করলো।' (আয়াত ৪৮)

উল্লেখিত মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে ও সুনির্ধারিত রূপে নিম্নের আয়াতগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং সেইসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন ... ।' (আয়াত ৫৯-৬১)

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয়।' (আয়াত ৬৪)

'অতএব, তোমার মালিকের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না মানবে..... এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' (আয়াত ৬৫)

'যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে (মূলত) আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো .... তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। .....।' (আয়াত ১১৫)

এভাবেই দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলামের শর্ত, মুসলিম সমাজের নিয়মপদ্ধতি এবং তার জীবনবিধান নির্ধারণ করা হয়। ঈমান শুধু আবেগ ও চিন্তাচেতনার নাম নয়, তদ্রূপ ইসলাম নিছক দোয়া কালাম এবং রোযা নামাযের নামও নয়, বরং এগুলোর পাশাপাশি এবং সর্বাগ্রে হচ্ছে, এমন এক জীবনবিধান যা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, এমন এক আদর্শ যা মানবজাতিকে সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ করে, এমন এক নেতৃত্ব যার আনুগত্য করা হয়। উল্লেখিত সব কিছু বাদ দিয়ে ঈমান, ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাংগ হতে পারে না।

এই মূলনীতির স্বীকৃতির ওপর এ সূরায় অসংখ্য নির্দেশনামা বেরিয়ে আসে, আর এর সবগুলো এই মৌলিক মূলনীতিরই শাখা প্রশাখা।

www.pathagar.com

১. সমাজের যাবতীয় সামাজিক নিয়ম-নীতি এই বড়ো মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল এবং তা দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের শর্তের প্রতিও মুখাপেক্ষী। একথাগুলো ইতিপূর্বের উদাহরণগুলোতে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে সামাজিক এই নিয়ম নীতিগুলো শুধু নিয়ম-নীতি ও বিধি বিধানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলো হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী, অধিকন্তু আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিধি বিধানের আলোচনা করেছি তাকেও আমরা এই মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল দেখতে পাই এবং এই সত্যটির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে।

এই সূরার প্রথম আয়াত যা মানব ঐক্যের কথা বর্ণনা করে, মানবজাতিকে আত্মীয়তার বন্ধনের হেফাযতের আহ্বান করে এবং যাকে এই সূরার পরবর্তী সকল বিধিবিধানের জন্যে ভূমিকাস্বরূপ গণ্য করা হয়। তার সূচনা হয়েছে মানবসমাজকে আল্লাহ ভীতির দিকে আহ্বানের মাধ্যমে। যিনি তাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

'হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (আয়াত ১)

তদ্রূপ তার সমাপ্তিও হয়েছে আল্লাহভীতির প্রতি আহ্বান এবং মানবসমাজকে তাঁর পাহারাদারীর থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন।'

যে সমস্ত আয়াত এতীমদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করে এবং তাদের সম্পদের ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করে তার সমাপ্তি ঘটেছে হিসাব নিকাশের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, 'অবশ্য আল্লাহ তায়ালা হিসেব নেয়ার জন্যে নিজেই যথেষ্ট।'

পরিবারে উত্তরাধিকারের অংশ বন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশাকারে এসেছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ করেন। এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।'

উত্তরাধিকারের বিধি বিধানের সমাপ্তি নিম্নোক্ত পর্যালোচনা ও মন্তব্যের মাধ্যমেই হয়েছে।

'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ মতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন.... সে সেখানে চিরদিন থাকবে, তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (আয়াত ১৩)

এর যাবতীয় পারিবারিক বিধিবিধান ও নিয়মনীতি সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে এ কথাগুলো নাযিল হয়। যেমন 'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করো যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (আয়াত ১৯)

'এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ..... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ২৪)

www.pathagar.com

'যদি তাতে তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, ... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'

'তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।'

পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম মেসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মোসাফের ও নিজের দাস দাসীর প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহারের নির্দেশের পূর্বে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

আর এভাবে সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁরই বিধান থেকে উৎসারিত হয় যার অনুসরণ ও অনুকরণ ও আনুগত্য পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

২. মোমেনদের তাদের এবং তাদের মোমেন দলের আনুগত্য করা উচিত। সুতরাং তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাবে না, যে মোমেন নয়। মোমেনদের বিধি-বিধান ও আদর্শ ও লক্ষ্যের যে অনুসরণ করে না এবং তাদের নেতৃত্ব থেকে যে নির্দেশাবলী গ্রহণ করে..... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১১৫-১১৬)

'হে নবী। সে সব, মোনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে .... যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে।' (১৩৮-১৩৯)

'হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না .... শীঘ্রই ঈমানদারদেরকে মহাপুণ্যদান করবেন।' (আয়াত ১৪৪-১৪৬)

৩. 'দারুল হরব' থেকে মুসলমানদের হিজরত করা ওয়াজেব, অতপর তারা মুসলিম দলের সাথে সে ভূখন্ডে গিয়ে মিলিত হবে যেখানে মুসলমানরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা মুসলিম নেতৃত্বের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, কুফুরীর পতাকাতলে নয়, অন্যথায় এটাকে মোনাফেকী অথবা কুফুরী নামে আখ্যায়িত করা হবে- যারা নিজের অনিষ্ট করে ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে .... নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার মানসে বের হয়, অতপর ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজেব হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অতীব অনুগ্রহশীল।' (আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯৭ ও ১০০)

৪. মুসলমানরা তাদের দুর্বল মুসলিম ভাইদেরকে উদ্ধারের জন্যে জেহাদ করবে। যারা কুফুরের' ঝান্ডা থেকে মুক্ত হয়ে 'দারুল ইসলাম' এ গিয়ে ইসলামী দলের .... নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭৫)

এই বিষয়টির পরক্ষণেই আসছে জান-মাল দ্বারা জেহাদে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করা, জেহাদে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক লোকদের নিন্দা জ্ঞাপন সংক্রান্ত এক বিরাট বর্ণনা। এই বর্ণনাটি বক্ষমান সূরায় এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং যেখান থেকে এর

www.pathagar.com

সূচনা হয়েছে সেখান থেকে সূরার কোমল কণ্ঠ আস্তে আস্তে দৃঢ় হচ্ছে, তার সুর ধীরে ধীরে উচ্চমার্গে উঠে যাচ্ছে এবং নির্দেশ ও নিন্দার ভাষা আরো কঠোর হয়ে উঠছে।

ধারাবাহিকতার সাথে সূরাব্যাপী উল্লেখিত অভিযানের আলোচনা পর্যালোচনা করতে আমি সক্ষম হইনি। ধারাবাহিকতার বিশেষ গুরুত্ব ও নির্ধারিত কিছু মূল্য রয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করবো মাত্র। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা! (শত্রুর) মোকাবেলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থেকো। অতপর সুযোগ ও প্রয়োজন .....আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (আয়াত ৭১-৭৬)

'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকো, তুমি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো ... দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।' (আয়াত ৮৪)

'ঘরে বসে থাকা মুসলমান যাদের কোনা ওযর নেই এবং সে মুসলমান যারা জান ও মাল ... আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' (আয়াত ৯৫-৯৬)

'তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে .... আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।' (আয়াত ১০৪)

জেহাদের প্রতি উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি মুসলিম শিবির ও অন্যান্য শিবিরের মধ্যে লেনদেন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত কিছু আচরণবিধিও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

মোনাফেকদের মধ্যে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত কাজ এবং মদীনাবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করতো এবং কাজ শেষ করে তারা যখন মদীনা থেকে বের হতো তখন শত্রু শিবিরের বন্ধু হয়েই ফিরে আসতো। মোনাফেকদের ব্যাপারে মুসলমানদের দু'দল ও দু'মতে বিভক্ত হওয়ার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের তোমরাও তেমন কাফের হয়ে যাও। অতএব, তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না.....।' (আয়াত ৮৯-৯১)

'হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।' (আয়াত ১০১-১০৩)

এই আয়াতসমূহ ইসলামী বিধানে নামাযের গুরুত্ব ও মহত্বেরই পরিচায়ক। আর এ জন্যেই ভয়ের অবস্থায়ও নামায পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ অবস্থায় নামায পড়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে এই আয়াতসমূহ মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ইসলামী বিধান পূর্ণাংগ হওয়ারও পরিচায়ক।

জেহাদের আলোচনার পরক্ষণেই আসছে মোনাফেক ও মদীনার ইহুদীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের বিষয়টি যেখানে তারা আল্লাহর দ্বীন, মুসলিম দল ও মুসলিম নেতৃত্বের সাথে ভয়াবহ প্রতারণা করে, মুসলিম দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে, ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধানের সাথে ইহুদী মূল্যবোধ ও নিয়ম পদ্ধতির সংমিশ্রণের বিরাট অভিযান

www.pathagar.com

চালায়। জেহাদ প্রসংগে যে সমস্ত আয়াত আমি উল্লেখ করেছি, তার মাঝে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে অভিযানেরও কিছু দিক রয়েছে। এখানে আমি এমন কিছু আয়াতের অবতারণা করবো যেগুলো মোনাফেকদের অবস্থা ও গুণাবলী চিত্রায়িত করে এবং তাদের স্বভাব ও প্রচার মাধ্যমের কথাও বর্ণনা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা মুখে মুখে বলে, আমরা তোমার অনুগত, ফরমাবরদার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে যখন... সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো।' (আয়াত ৮১-৮৩)

'যারা একবার মুসলমান হবার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে ... আর তোমরা তাদের জন্যে কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (আয়াত ১৩৭-১৪৫)

এই সূরার জেহাদের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের দিকে যদি তাকাই তাহলে এখানে অঘোষিত একটা যুদ্ধ আমরা দেখতে পাই। আর আহলে কেতাব (বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়) ও তাদের মিত্রসমূহের পক্ষ থেকে মুসলিম দল, ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী নেতৃত্বকে আক্রমণের মাধ্যমে সেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানেও উল্লেখিত যুদ্ধ ও সংঘাতের আলোচনা দেখেছি। সে সাথে আমরা যদি আল্লাহর বিধানের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এ বিধান ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝেও মুসলিম জাতিকে হাতে হাত ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে। ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে তাদেরকে সতর্ক করছে এবং তাদের শত্রুদের স্বভাব, শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধের ধরন এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এই বিধান মুসলমানদেরকে অবহিত করছে।

কোরআনে করীমের অলৌকিক বাচনভংগী এবং পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষার নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটি যে, উল্লেখিত বক্তব্যসমূহ যদিও একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু আজও তা একইভাবে বিশ্বের সর্বস্থানের মুসলমান এবং তাদের চিরাচরিত শত্রুদের মাঝে স্থায়ী যুদ্ধের প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করছে। আদিকালের মুসলিম শত্রু এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের শত্রুদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বের শত্রুতার কারণসমূহ এবং বর্তমানকালের কারণসমূহের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। উপায় উপকরণ এবং মাধ্যমের পরিবর্তন ছাড়া সত্যিকার অর্থে তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের মধ্যে কোনোপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, মুসলিম দলে ফাটল সৃষ্টি করা আজও উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয়ে আছে। এর মাধ্যমে তারা চাচ্ছে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করে মুসলমানদের ভাগ্যে পরিবর্তন সাধন করতে। তাদের ভূমি, ফসল, প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থকে পুরোপুরি দখল করে নিতে। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করার মাধ্যমে মর্যাদার আসনে আসীন করার পূর্বে ইহুদীরা এই উভয় গোত্রকে এভাবেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলো।

www.pathagar.com

যেরূপভাবে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানে মোশরেক ও মোনাফেকদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে সেভাবে এই সূরায়ও উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। স্ব স্ব স্থানে উক্ত বক্তব্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে। তবু আমি এখানে এ প্রচন্ড অভিযানের শুধু একটি দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী! তুমি কি ওদের দেখোনি, যারা কেতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে ... দোযখের জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট।' (আয়াত ৪৪-৫৫)

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য করে এবং যারা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী .... তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।' (আয়াত ১৫১-১৫২)

'তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান .... জন্যে তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।' (আয়াত ১৫৩-১৬১)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কিছু দিক ফুটে উঠেছে। কোরআনে কারীম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তার নিন্দা করেছে, এর সাথে এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার অসারতাও প্রমাণ করেছে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযান, সেখানে তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যা দান এবং তাদেরকে ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মুসলিম দল এ সময় ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের চরম শিকার হয়েছিলো। এর সাথে কোরআন তার পেছনে লুকায়িত ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যাসের দরুণ দীর্ঘ ইতিহাসে তারা কখনো হেদায়াত তথা সৎ পথের সামনে যে আত্মসমর্পণ করেনি সে কথা বর্ণনা করেছে।

মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওত ও রেসালাতের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছিলো ইহুদীদের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য, আর তা সম্ভবপর হয়েছে মুসলমানদেরকে তাদের নিরাপত্তা, নেতৃত্ব তথা শক্তিশালী আকীদা থেকে দূরে সরানোর মাধ্যমে। দুশমনদের ষরযন্ত্রের বিরুদ্ধে শীসাঢালা প্রাচীরের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ইহুদীসহ মুসলিম দলের শত্রুদের অস্থির করে রাখে, অতপর তাদের চিন্তাচেতনা ও চেষ্টাসাধনা নিয়োজিত হয় প্রথম তাদের বন্ধন ছিন্ন করার কাজে, যাতে মুসলমানদের নেতৃত্ব নতুন করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে।

অধিকন্তু আমরা এই সূরায় নবী করীম (স.)-এর রেসালাতের তাৎপর্যের বর্ণনাও দেখতে পাই। এ রেসালাত তখনকার আরববাসী বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের কাছে অপরিচিত, নতুন ও আশ্চর্যজনক কিছু ছিলো না, বরং তা ছিলো দলীল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এভাবে আগের রসূলদের কাছেও তিনি ওহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের নবীদেরকে যেমনিভাবে নবুওত এবং রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা দান করেছিলেন তেমনিভাবে তা

www.pathagar.com

নবী মোহাম্মদ (স.)-কেও দান করেছেন। সুতরাং তাঁর রেসালাত, ক্ষমতা এবং শাসন করার ব্যাপারে অভিনবত্ব কিছু নেই। রেসালাতের ব্যাপারে এসব কিছু অতি পরিচিত ব্যাপার। এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের সকল কথাই মিথ্যা ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ ভ্রান্ত ও অমূলক। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তারা একই আচরণ করেছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোনো মুসলমানের গুরুত্বারোপ করা ঠিক নয়।

কোরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত তাৎপর্য বর্ণনা করেছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আয়াতের অবতারণা করছি। স্ব স্ব স্থানে তার বিস্তারিত আলোচনা করবো। যেমন,

'হে মোহাম্মদ, আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি .... আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ১৬৩-১৬৮)

'তোমার কাছে আহলে কেতাবরা আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের ওপর আসমান থেকে লিখিত .... বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিলো।' (আয়াত ১৫৩-১৫৭)

'নাকি যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্যে তারা মানুষকে হিংসা করে.... অতপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে।' (আয়াত ৫৪-৫৫)

এই সূরায় মুসলিম সমাজের গঠন এবং তাকে জাহেলিয়াতের আবর্জনা থেকে মুক্ত করা, দ্বীনের অর্থ, ঈমানের সংজ্ঞা এবং ইসলামের কতিপয় শর্তের বর্ণনা করা হয়েছে। বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা এই সূরা নিরসন করেছে, ঈসা (আ.) ও তার নেক মাতা সংক্রান্ত ইহুদীদের বক্তব্য নিরসনের পর এই সূরা আহলে কেতাব খৃষ্টানদের আকীদার বাড়াবাড়ির কথা বর্ণনা করেছে। একই সাথে এ সূরা আল্লাহর একত্ব, এবাদাতের তাৎপর্য, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, মানুষের আয়ুর তাৎপর্য, তাকদীরের সাথে তাঁর সম্পর্ক, আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন তার পরিধি, তাওবার গন্ডি ও তার তাৎপর্য, কাজের নিয়ম-পদ্ধতি ও তার বিনিময় ও প্রতিফল এ জাতীয় বিশ্বাসগত উপাদানের বর্ণনাও এখানেও এসেছে। উল্লেখিত উপাদানগুলোর বর্ণনা এসেছে নিম্নের আয়াতগুলোর মধ্যে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'জেনে রেখো, আল্লাহর কাছে তাওবা গৃহীত হওয়ার অধিকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (আয়াত ১৭-১৮)

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান...।' (আয়াত ২৬-২৮)

'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে... সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।' (আয়াত ৩১) 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও বিনষ্ট করেন না, আরও যদি তা.... নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।' (আয়াত ৪১) 'তুমি কি সে সব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা.... সব বিষয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।' (আয়াত ৭৭-৭৯) 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না.... সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে গেলো। (আয়াত

www.pathagar.com

১১৬) 'শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার..... তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।' (আয়াত ১২৩-১২৪) 'তোমাদের আযাব দিয়ে.... সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।' (আয়াত ১৪৭) 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী রসূলদের অমান্য..... বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আয়াত ১৫০-১৫২) 'হে আহলে কেতাবরা! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি.... আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।' (আয়াত ১৭১-১৭৩)

যে নৈতিকতার ওপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো থেকে কিছু কথা এখানে বর্ণনা করবো। এগুলোর দিকে ইতিপূর্বেও ইংগিত করা হয়েছে। আসলে নৈতিক উপাদানই হচ্ছে ইসলামী চিন্তা-চেতনা এবং মুসলিম সমাজ গঠনের মূল বিষয়। এর থেকে জীবনের কোনো দিকই মুক্ত নয়। আমি এখানে জীবনের মূল উপাদান থেকে অনুসৃত কিছু মৌলিক বিষয়ের দিকে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সাথে সূরার বিষয়বস্তুর দিকে আলোকপাত করবো।

ইসলামী সমাজ মূলত এমন একটি সমাজ যা একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেখানে আল্লাহর দাসরা অন্য সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। ইসলামী বিধান ছাড়া বিশ্বের অন্য সকল বিধান নেই এই দাসত্ব কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামী বিধানে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, তাতে কোনোপ্রকার অংশীদারিত্ব নেই। যেখানে মানুষ তাঁর কোনো বান্দার গোলামী করে না। এই স্বাধীনতা থেকে মানুষের যাবতীয় মহৎ গুণাবলী এবং নীতি-নৈতিকতার যাত্রা শুরু হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহৎ গুণাবলীর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। সুতরাং এ চরিত্র সব সময় মোনাফেকী, লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটা হচ্ছে ইসলামের নীতি নৈতিকতা এবং মুসলিম সমাজের গুণাবলীর প্রধান ভিত্তি।

এ সূরায় প্রধান কয়েকটি ভিত্তির বর্ণনার পাশাপাশি নৈতিক উপাদানের কিছু দিকও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেগুলোর ওপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যথা আমানত, ইনসাফ, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ না করা, সৎ কাজ, কানাঘুষা ও ষড়যন্ত্র না করা, খারাপ কথা না বলা, উত্তম সালাম দেয়া, ব্যাভিচার বন্ধ করা, নির্লজ্জতা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করা, দাম্ভিকতা, অহংকার, লোক দেখানো কাজ, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না করা। ইসলামী সমাজ আরো কিছু গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যথা-যিম্মাদারী, সহযোগিতা, সৎ উপদেশ, ক্ষমা, মহানুভবতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবতার সাহায্য ও বীরত্ব এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের আনুগত্য করা ইত্যাদি।

অধিকাংশ বক্তব্যই ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা আয়াতের স্ব স্ব স্থানে পেশ করা হবে। আমি এখানে এর সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকেই শুধু আলোকপাত করবো। এ বিষয়টির দিকেই দীর্ঘদিন থেকে মানবতা অধীর আগ্রহে

www.pathagar.com

তাকিয়ে আছে, কিন্তু সেখান পর্যন্ত সে কোনোক্রমেই পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে না, সেই সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছানো তুলনাহীন এই জীবন বিধানের ছায়াতলেই সম্ভব।

যে মুহূর্তে ইহুদী জাতি ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে কোরআনে কারীম মুসলিম জাতিকে আল্লাহর নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। সে জাতি তার আলোকে সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে উন্নীত হতে থাকে। কোরআন এক ইহুদীর ঘটনার অবতারণা করে, মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের কথা বলে জাতি ও দেশ নির্বিশেষে তাদের মাঝে নিরংকুশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নিরংকুশ আমানতদারী কায়েমের জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তায়লা এরশাদ করেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও... কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।' (আয়াত ৫৮, ১৩৫)

ঘটনাবলী ছিলো এমন যে আনসারদের কোনো এক ব্যক্তির একটি বর্ম চুরি হয়েছিলো, কিন্তু তারা গোত্রীয় ও রক্তের কারণে নিজেদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে একজন ইহুদীর ওপর বর্ম চুরির অপবাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিয়েছিলো। তারপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, রসূল তাদের সাক্ষ্যের আলোকে ইহুদীর ওপর চুরির শাস্তির বিধান জারি করতে এবং প্রকৃত চোরকে মুক্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়, যাতে সেই মদীনাবাসীদের প্রতি তীব্র তিরস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে, আল্লাহর রসূলকে আশ্রয় দিয়েছিলো এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করেছিলো। এই ক্ষোভ ও তিরস্কারের মাধ্যমে অবিচার থেকে ইহুদী ব্যক্তিকে মুক্ত করে তার ওপর ইনসাফ কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এরা রসূলকে ভীষণভাবে কষ্ট দিতো, তারা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, রসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতো। এখানে সে ব্যক্তিকেও ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে ভুল ও অপরাধ করে নির্দোষ লোককে তাতে জড়াতে চেষ্টা করে। সর্বোপরি এখানে নৈতিকতার এক উচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেদিকে আরোহনকারী সিঁড়ির দিকে ইংগিতের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতগুলো ইহুদী ব্যক্তির কথিত চুরির ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য কেতাব অবতীর্ণ করেছি.... যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' (আয়াত ১০৫-১১৬)

সুতরাং ইসলামী বিধান সম্পর্কে এ ছাড়া আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না যে, এ হচ্ছে সত্যি অতুলনীয় ও নযীরবিহীন এক বিধান। এটি বিশ্ব মানবতাকে অল্প সময়ের মধ্যে জাহেলিয়াতের গহ্বর থেকে উঠিয়ে উঁচু এবং সর্বোচ্চ শৃংগে আরোহন করাতে সক্ষম।

এই সূরার ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগির উল্লেখ আমি এখানেই শেষ করছি।

www.pathagar.com

সূরা আল-মায়েদা

এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন রসূল (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো এ দ্বারা তিনি একটি জাতিগঠন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সমাজনির্মাণ ও মানুষের চরিত্র সংশোধন করবেন। উক্ত সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, উক্ত রাষ্ট্র ও জাতির সাথে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জাতির সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারণ এবং এই সব কিছুকে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র, কেন্দ্র ও উৎস তথা ইসলামের সাথে সংযুক্ত করবেন। ইসলামের এই প্রকৃত স্বরূপটি আল্লাহর কাছে সুপরিচিত ছিলো এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ 'মুসলমান' ছিলো, তখন তাদের কাছেও তা সুপরিচিত ছিলো।

এ কারণেই পূর্ববর্তী তিনটি দীর্ঘ সূরার মতো এ সূরাতেও আমরা নানা রকমের আলোচ্য বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাই। এই সব কয়টি বিষয়ের মূল উদ্দেশ হলো, এমন একটি বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠন করা, যার মূল কথা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌম ও একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন ইলাহ ও রব। তিনিই মানুষের জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইন, বিধান, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের একক ও অদ্বিতীয় উৎস।

এতে আমরা আরো যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাসকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার ও আহলে কেতাবের বিভ্রান্তি থেকে পবিত্রকরণের চেষ্টা। সেই সাথে মুসলিম জাতিকে তাদের প্রকৃত পরিচয়, তাদের যথোচিত ভূমিকা, এই কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি এবং এই পথে বিদ্যমান বাধা বিপত্তি বিপদাপদ এবং শত্রুদের পাতা ষড়যন্ত্র জালের বিবরণ। এর পাশাপাশি এতে বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন এবাদতের বিধান, যা মোমেনের আত্মাকে পবিত্র করে এবং তাকে তার প্রতিপালকের সাথে যুক্ত করে। এতে আরো আছে সামষ্টিক জীবনের সেই সব আইন কানুন, যা তার সামাজিক সম্পর্ককে সুশৃংখল হতে সাহায্য করে, রয়েছে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান, যা অন্যদের সাথে তার সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে, রয়েছে সেই সব আইন কানুন, যা কয়েক প্রকারের খাদ্য পানীয়কে ও বিবাহকে এবং কিছু কাজকর্মকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করে। এই সব কিছু একই সূরায় এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে, তা আল্লাহর দ্বীনকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন এবং মুসলমানরা যখন যথার্থ মুসলমান ছিলো তখন তারা যেভাবে তাকে বুঝেছে, ঠিক সেইভাবে তুলে ধরে।

এছাড়া কোরআন এই সূরায় যেভাবে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ইতিপূর্বে সূরা 'আলে ইমরান' ও 'আন নেসাতে'ও যেভাবে আলোচনা করেছে, তা দ্বারা নিছক আনুষংগিকভাবেই যে এটা বুঝা যায় তা নয়; বরং এই দুটি সূরায় এবং কোরআনের অন্যান্য সূরায় এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে কোরআন প্রত্যক্ষভাবে ও জোর দিয়েই একথা ব্যক্ত করে যে, এই সব বিধান মিলিয়েই আল্লাহর 'দ্বীন', এই সব বিধানকে মেনে নেয়ার নামই হচ্ছে 'ঈমান' এবং এই সব

www.pathagar.com

বিধানের আলোকে ফয়সালা করার নামই হচ্ছে 'ইসলাম'। আর যারা এই সমস্ত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তারা কাফের, তারা যালেম--- এবং তারা ফাসেক।

এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটাই এই সূরার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, আর এর পাশাপাশি যে চিন্তাধারার ওপর এই মূলনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকেও পরিশুদ্ধ করা হয়েছে।

এই সূরার আয়াতগুলোতে কিভাবে উল্লেখিত মূলনীতি দুটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এবং কিভাবে একটির ওপর স্বাভাবিকভাবে ও যুক্তিসম্মতভাবে অপরটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা একটু সবিস্তারে আলোচনা করা সংগত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কোরআনের আলোচনা যে মূল বক্তব্যটির ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছে তা হলো, আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার-ফয়সালা ও কাজ করার নামই 'ইসলাম' এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কিছু জিনিস হালাল ও কিছু জিনিস হারাম ঘোষণা করে যে বিধান দিয়েছেন তারই নাম 'আদ্-দ্বীন'। আর আল্লাহই একমাত্র 'ইলাহ' অর্থাৎ মাবুদ ও আইনদাতা ও শাসক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই, তিনি একমাত্র স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মে তাঁর সাথে আর কেউ অংশীদার নেই এবং তিনিই সারা বিশ্বের একমাত্র মালিক ও অধিপতি, তার মালিকানায় ও আধিপত্যে আর কেউ অংশীদার নেই। তাই এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও অকাট্যভাবে সত্য যে, আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ও বিচার ফয়সালা করা যাবে না। কেননা যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক, একমাত্র তিনিই স্বীয় মালিকানাধীন সৃষ্টির জন্যে এমন বিধান দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার রাখেন যা তাঁর পছন্দনীয় ও মনোপূত।

আপন মালিকানাধীন পরিমন্ডলে আইন জারী করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। একমাত্র তাঁরই আইন চালু হবে এবং একমাত্র তাঁরই হুকুম সর্বত্র বাস্তবায়িত হতে হবে এবং অন্য কারো আনুগত্য না-ফরমানী ও কুফরীতে পরিগণিত হবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বা মোমেন তাদেরকেই বলা যাবে, যারা তাঁর নির্ধারিত আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর মনোপূত জীবনপদ্ধতি মেনে চলে ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে এবং তাঁরই আইন অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত করে, আনুষ্ঠানিকতা ও আইনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ ও বৈষম্য করে না। কেননা এই দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যে আল্লাহর রাজত্বে ও তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যে ও কর্তৃত্বে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। আর এভাবে আল্লাহকে মানার নামই হলো 'আদ-দ্বীন' তথা ইসলাম। এই ইসলামই ছিলো সকল নবীর দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। এটাই আল্লাহর দ্বীন। এ ছাড়া আর কোনো দ্বীন তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ জন্যেই সূরাটির মধ্যে মাঝে মাঝেই আল্লাহর একত্বকে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সব রকমের শেরেক, ত্রিত্ববাদ এবং আল্লাহর গুণাবলীতে অন্য কারো

www.pathagar.com

অংশ থাকার ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৫ নং আয়াত থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত এবং ৭২ নং আয়াত থেকে ৭৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষণীয়। .....

আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন মাবুদ ও মনিব, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনিই একমাত্র মালিক, সুতরাং তিনিই আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা ও এখতিয়ারসম্পন্ন, হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। অনুরূপভাবে তাঁর বান্দারা যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবাদত উপাসনা একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করবে। এ সব কিছুর ব্যাপারে তিনি নিজের বান্দাদের অংগীকার গ্রহণ করেছেন। তাই বান্দাদের কাছে তিনি দাবী জানান যে, তাঁর সাথে করা এ সকল অংগীকার যেন তারা পূর্ণ করে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই অংগীকার ভংগ করার পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেন, যেমন পরিণতি বনী ইসরাইলের হয়েছিলো,

'হে মোমেনরা! তোমরা অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর'..... (আয়াত ১)

'হে মোমেনরা ! তোমরা অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনের ...' (আয়াত ২)

'স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন, তার কথা..... (আয়াত ৭ ও ৮)

'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন....(আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

সূরাটিতে শরীয়তের বেশ কয়েক প্রকারের আহকাম তথা বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যবাই ও শিকার করা জীবজন্তু, এহরামের অবস্থায় ও মাসজিদুল হারামে অবস্থান কালীন সময়ের কার্যকলাপ এবং বিয়েশাদীর মধ্যে কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম, পবিত্রতা অর্জন ও নামায, ন্যায় বিচার, চুরি ডাকাতির শাস্তি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মদ, জুয়া, ভাগ্য গণনা, লটারী, এহরাম অবস্থায় শিকার করার কাফফারা এবং শপথ ভংগ করার কাফফারা, মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় ওসীয়ত করা, রকমারি গবাদি পশু ও কেসাস সংক্রান্ত বিধান। এভাবে সূরাটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল করা শরীয়তের বিধান শেষ নবীর ওপর নাযিলকৃত বিধানের সাথে কোনো বাধা ও বিরোধ ছাড়া অবলীলাক্রমে মিলিত হয়েছে।

শরীয়তের এই সকল রকমারি বিধি বিধানের পাশাপাশি মৌলিক নির্দেশ এসেছে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানের আনুগত্য করার, আর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে মনগড়াভাবে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করার বিরুদ্ধে। অতপর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটাই আল্লাহর সেই দ্বীন, যাকে তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। যেমন,

'হে মোমেনরা, আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা করো না.....।'

www.pathagar.com

'হে মোমেনরা, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করেছেন তা হারাম করো না এবং সীমা অতিক্রম করো না.....'

'আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো ও সাবধান থাকো.....'

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, ... আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম....'

সূরাটি আনুগত্য করা ও হালাল হারামের বিধান মেনে চলার কেবল নীতিগত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান মান্য করতেই হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। এর অন্যথা করা হলে সেটা হবে কুফরী, সেটা হবে যুলুম এবং সেটা হবে ফাসেকী কাজ। এখানে এক নাগাড়ে কঠোর আদেশমালা জারী হয়েছে। সূরার ৪১ নং আয়াত থেকে ৫০ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখুন।.....

এখানে সূরার মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, স্রষ্টা যখন একজন তখন বিধানদাতা, আইনদাতা ও শাসনকর্তাও সেই একই সত্ত্বা। স্বভাবতই আল্লাহর আইনই একমাত্র আইন, তাঁর বিধানই একমাত্র বিধান, তাঁর শরীয়তই একমাত্র শরীয়ত। একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধানেরই আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র তাঁর নাযিল করা ওহীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী এবং এটাই ইসলাম। এই হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীনের মূলকথা, যার ওপর তিনি তার সর্বকালের সকল বান্দার অংগীকার গ্রহণ করেছেন। এই দ্বীন নিয়েই আল্লাহর সকল রসূল এসেছেন এবং মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত ও পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতদের জন্যে এই একই দ্বীন নির্ধারিত।

'আল্লাহর দ্বীন' যে শুধুমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা-শাসন ও নির্দেশ জারী করার নাম, সে ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মতের অবকাশ মাত্র নেই। কেননা এই দ্বীনই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রতীক।

সুতরাং 'আল্লাহর দ্বীন' এবং 'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা, শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ জারী করা' একেবারেই অভিন্ন জিনিস এবং একটি অপরটির অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর একটি কারণ এই যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান যে কোনো মানবরচিত বিধান, আইন, বা বিধি ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। তবে এটি তার একমাত্র কারণ নয় এবং প্রধান কারণও নয়। একমাত্র কারণ ও প্রধান কারণ এই যে, গোটা জীবান একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইলাহ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থে এটাই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের আভিধানিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর নিরংকুশ ও শর্তহীন আনুগত্য, তাঁর সাথে অন্য কারো ইলাহত্বের দাবী নাকচ ও বাতিল করা, ইলাহহীয়াতের সর্ব

www.pathagar.com

প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য কারো হতে পারে না– তা ঘোষণা করা এবং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানতে বাধ্য করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে একথা অস্বীকার করা।

এই উভয় অর্থে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য এটা যথেষ্ট নয় যে, মানবজাতি নিজেদের জন্যে আল্লাহর আইনের অনুরূপ আইন রচনা করে নেবে, এমনকি হুবহু আল্লাহর আইন জারী করাও যথেষ্ট নয়, যদি তাতে নিজেদের প্রতীক যুক্ত করে, যদি তাকে আল্লাহর আইন বলে ঘোষণা না দেয় এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাঁরই নামে তা জারী না করে। কেননা একমাত্র এভাবেই বান্দার শাসন ও সার্বভৌমত্বের দাবী অস্বীকার করার শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করা দোষণীয় নয় বরং তা ঈমানের অপরিহার্য্য দাবী।

বস্তুত, আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসনের এই অভিন্নতা, অনিবার্যতা ও অবিচ্ছেদ্যতাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সূরার এই উক্তিগুলোতে, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করে না, তারা কাফের .....তারা যালেম..... তারা ফাসেক।' কারণ যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা ও শাসন করে না, তারা মুখে না করলেও নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারাই জানিয়ে দেয় যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মানে না। আর বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা যে কথা প্রকাশ পায়, তা মুখের কথার চেয়েও শক্তিশালী। এ জন্যেই কোরআন তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা তারা যখন আল্লাহর আইন মানতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ অনুমোদন করেননি এমন সব আইন প্রবর্তন করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে অমান্য করে এবং তার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইলাহ বলে ঘোষণা করে।

সমগ্র সূরায় এই অর্থেই ইসলামকে আল্লাহর দ্বীন হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বত্র এই অর্থের ওপর ভিত্তি করেই বক্তব্য রাখা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিতদের ও কেতাবধারীদের বিকৃত ধারণা ও বিশ্বাসের বিবরণ, 'আদ-দ্বীনের' প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ হালাল ও হারাম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ জানা, তা মান্য করা, ও কোনো রূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়া হুবহু আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাসনের নামই যে 'আদ দ্বীন' বা 'আল ইসলাম', তার বিবরণ এ সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ ছাড়াও এর আরো কয়েকটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে, মুসলিম জাতির মর্যাদা, পৃথিবীতে তার প্রকৃত ভূমিকা, তার শত্রুদের সাথে তার নীতি ও আচরণ, তার শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন, তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তির বর্ণনা এবং মুসলিম

www.pathagar.com

জাতির বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা ও চক্রান্ত, যার বিরুদ্ধে স্বয়ং কোরআন মুসলিম জাতির পক্ষে সংগ্রামরত এবং যার বিবরণে ইতিপূর্বেকার তিনটে বড় বড় সূরা সোচ্চার।

মুসলিম জাতির কাছে যে আসমানী কেতাব রয়েছে, তা মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব। মূল আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের দিক দিয়ে তা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবের সমর্থক হলেও সর্বশেষ কেতাব হিসাবে পূর্ববর্তী কেতাবের চেয়ে অগ্রগণ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত যে শরীয়াত মনোনীত করেছেন, তার চূড়ান্ত দলীল এই আল কোরান। এতে পূর্ববর্তী কেতাবধারীদের শরীয়াতের যে সব বিধি বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো এই উম্মতের জন্যে আল্লাহর শরীয়াতের বিধি হিসাবে কার্যকর থাকবে। আর যে সব বিধি বাতিল করা হয়েছে, তা বাতিল, অচল ও অকার্যকর থাকবে, যদিও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া একটি কেতাবে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।'

'তোমার ওপর আমি কেতাবকে সত্যের বাহন হিসাবে তার পূর্ববর্তী কেতাবের সমর্থক হিসাবে এবং তার চেয়ে অগ্রগণ্য হিসাবে নাযিল করেছি।'

এ জন্যে মুসলিম জাতির অবস্থান ও ভূমিকা হলো, তারা মানবজাতির পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। পৃথিবীতে কোনোরূপ বিদ্বেষ, বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া এবং জনগণের সর্বাত্মক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই তার দায়িত্ব। দায়িত্বশীল মাত্রেরই স্বভাবসুলভ দায়িত্ব হলো। অন্যেরা যতোই বিপথগামী ও প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর হাতে বন্দী হোক না কেন, এদেরকে তা দ্বারা বিন্দু মাত্রও প্রভাবিত হওয়া চলবে না, জনগনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিংবা কারো মনস্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর বিধান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়া চলবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক তোমাদেরকে মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়ার দরুন তাদের প্রতি বিদ্বেষবশত অন্যায় আচরণ করো না। কল্যাণ ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো। যুলুম ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা করো না.....।'

'হে মোমেনরা! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় বিধানের সাক্ষী ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যাও' ..... 'তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা করে দাও .....।'

আর যেহেতু এই উম্মাত সকল নবী ও রসূলের দায়িত্বের উত্তরাধিকারী, বিশেষভাবে শেষ নবীর কাজ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত এবং আল্লাহর এই সর্বশেষ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানবজাতির অভিভাবক হিসাবে কাজ করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই যারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান ও তার প্রতি কুফরী করে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে, তাদের সাথে তার কখনো বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত না। তার বন্ধুত্ব হবে শুধু আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে। কেননা মুসলিম উম্মাহ

www.pathagar.com

একটি আদর্শবাদী জাতিবর্ণ, বংশ, ভূমি ও জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকারী ভিত্তিক জাতি নয়। সে আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীন, আকীদা ও আদর্শের অনুসারী জাতি। এই আদর্শই তার ঐক্য ও সংহতির একমাত্র ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ কাফেররা হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে নয়, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করে দিলাম ..... ।'

'হে মোমেনরা! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না' .....

'তোমাদের বন্ধু তো শুধু আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা..... ।'

'যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না.... ।'

'হে মোমেনরা! তোমরা নিজেদেরকে সংরক্ষণ করো। তোমরা যদি সুপথগামী হও, তবে বিপথগামীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা ইসলামেরও শত্রু, আল্লাহর বিধানের শত্রু। তারা সত্যকে দেখতে চায় না এবং সত্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাকে তারা ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক নয়। মুসলিম উম্মাহর উচিত তাদেরকে সঠিকভাবে চেনা, শেষ নবী ও আল্লাহর অন্যান্য রসূলদের সাথে ও খোদ ইসলামের সাথে তাদের কী আচরণ ছিলো, তা ভালো করে জানা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন , 'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন ..... । (আয়াত ১২ থেকে ১৪)

স্মরণ করো, যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো ..... (আয়াত ২০ থেকে ২৫)

'এই কারণই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজের কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো..... ।' (আয়াত ৩২) 'হে রসূল, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, তারা যেন তোমার দুঃখের কারণ না হয় ..... ।' (আয়াত ৪১ থেকে ৪২) 'বলো, হে আহলে কেতাব, তোমরা ..... ।' (আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪) 'বলো, হে আহলে কেতাব ..... । (আয়াত ৬৮ থেকে ৭১) 'বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিলো, তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো..... । (আয়াত ৭৮ থেকে ৮২)

মুসলিম জাতির শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনকারী এই বিবরণ, বিশেষত মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা এবং মাঝে মাঝে মোনাফেক ও খৃষ্টানদেরও উল্লেখ থেকে আমরা এই সূরায় আলোচিত আরো একটি বিষয়ের আভাস পাই। সে বিষয়টি হচ্ছে, তৎকালীন মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিম দলটি এবং মুসলিম জাতি তার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তার বিভিন্ন শত্রুশিবিরের প্রতি কিরূপ নীতি অবলম্বন করেছে।

www.pathagar.com

এবার সূরাটি মদীনায় মুসলমানদের জীবনের কোন্ সময়টিতে নাযিল হয়েছিলো সে সময়টির কথা আলোচনা করা যাক।

বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই সূরা সূরা আল ফাতহের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা আল ফাত্হ সম্পর্কে এ কথা সুবিদিত যে, তা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াতে নাযিল হয়েছিলো। এ সব রেওয়ায়াতের কোনো কোনোটাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সূরার তৃতীয় আয়াত ব্যতীত সমগ্র সূরা এক সাথেই নাযিল হয়েছে। 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম.....' উক্তি সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিলো।

কিন্তু রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাস ও তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে সূরাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, সমগ্র সূরা, সূরাটি আল-ফাত্হ তথা হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়েছে বলে কথিত বর্ণনাটি তো সঠিক নয়ই, উপরন্তু বদরের যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, এই সূরার বনী ইসরাইল ও হযরত মূসা সংক্রান্ত আয়াতগুলো ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের আগে মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিলো। এক বর্ণনা মতে হযরত সা'দ বিন মায়ায এবং অপর বর্ণনা মতে হযরত মিকদাদ বিন আমর রসূল (স.)-কে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল। আমরা কোনো অবস্থাতেই আপনাকে সেই কথা বলবো না, যা মূসা (আ.)-এর সংগীরা মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, হে মূসা, আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম।.....

সূরার বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন থেকে এও জানা যায় যে, এই সূরার ইহুদীদের সম্পর্কে মন্তব্যসম্বলিত আয়াত ক'টি যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায়, এমনকি মুসলমানদের ওপরও ইহুদীদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো, আর একারণেই তাদের মুখোশ খুলে দেয়া ও ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে এই বিবরণ নাযিল হওয়া আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের পর বনু কুরায়যা অবরোধের ঘটনার ফলশ্রুতিতে সেই প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়। তিনটি শক্তিশালী ইহুদী গোত্র বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকার অস্তিত্ব থেকে মদীনা মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং হোদায়বিয়ার পর এমন কিছু ঘটেনি, যাতে তাদের প্রতি এতো গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মুসলিমবিরোধী চক্রান্ত ও কোরায়শদের সাথে যোগসাজশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তাদের সাথে মুসলমানদের সমঝোতা ও আপোসের আর কোনো অবকাশ ছিলো না। কাজেই রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর এই উক্তিটি, 'মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত, তাদের দিক থেকে তুমি অনবরতই একটা না একটা চক্রান্তের খবর পেতে থাকবে।' অবশ্যই হোদায়বিয়ার পূর্ববর্তী কোনো সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে যে আয়াতে ইহুদীদের আনীত বিবাদের মীমাংসা করে দেয়া অথবা তা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্য থেকে যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে আয়াতও ওই সময়ের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা।

www.pathagar.com

এ সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এই মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয় যে, সূরা মায়েদার প্রথম দিককার অংশটি এবং তার পরবর্তী কিছু কিছু অংশ সূরা আল ফাতহের পর নাযিল হয়েছে, আর কিছু কিছু অংশ নাযিল হয়েছে তারও আগে। পক্ষান্তরে 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই ঘোষণা সম্বলিত তৃতীয় আয়াতটি যে এর অনেক পরে দশম হিজরীতে নাযিল হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি এ আয়াতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। মোদ্দা কথা এই যে, সমগ্র সূরা মায়েদা এক সাথে নাযিল হয়নি এবং যে বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন নেসার ভূমিকায় আমি যেমন বলেছি, তেমনি এখানেও বলছি যে, কোরআন মুসলমানদের পক্ষে তাদের ও তাদের আদর্শের শত্রুদের, বিশেষত ইহুদী ও মোশরেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চালিয়েছে, সেই সাথে মোমেনদের মনমগযে ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনা বদ্ধমূল করেছে এবং আইন প্রণয়ন ও নির্দেশাবলী জারী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করেছে।

এ সূরায় ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলো সংহত করার ব্যাপারে যে কাজ করা হয়েছে তা এই যে, তাওহীদবিশ্বাসকে সর্ব প্রকারের কলুষ ও আবিলতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে, 'আদদ্বীন' এর মর্ম ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আদদ্বীন অর্থ হলো জীবন যাপনের পথ, পদ্ধতি ও প্রণালী। একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবনপদ্ধতি অনুসারে বিচার ফয়সালা করা, শাসন করা ও জীবনের সকল ব্যাপারে শুধু আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করাই হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। এ ছাড়া আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের দাবী পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে পারে না। বস্তুত, তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ বা মাবুদ বা উপাস্য মেনে নেয়া। আর ইলাহের অন্যতম গুণ বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌমত্ব, মানুষের জন্যে জীবনবিধান রচনা করার ব্যাপারে একক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া। আমি আগেই বলেছি যে, আলোচ্য সূরা এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

আমার উপরোক্ত আলোচনায় পূর্ববর্তী বড় সূরাত্রয়ের সাথে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরার অনেকটা মিল পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকটি সূরার আলোচনার ধারা, বর্ণনাভংগি, প্রেক্ষাপট ও আবহ স্বতন্ত্র। ফলে প্রতিটি সূরার এক একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

এ সূরার বর্ণনাভংগির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এতে সব কিছু কঠোর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আকারে ঘোষিত হয়েছে, চাই তা শরীয়তের হুকুম ও বিধিসমূহের বেলায়ই হোক কিংবা নির্দেশাবলী ও তাত্ত্বিক বক্তব্যের বেলায়ই হোক। আইন ও বিধির ক্ষেত্রে তো এ ধরনের কঠোর ভাষা প্রয়োগই স্বাভাবিক। কিন্তু নির্দেশ ও তত্ত্বের আলোচনায় অন্যান্য সূরায় উদার ভাষা ব্যবহৃত হলেও এ সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে কড়া ভাষা। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

সূরার এই সার্বিক ভূমিকা শেষ করার আগে এর তৃতীয় আয়াতের বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা না করে পারছি না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্যে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসাবে সানন্দে মনোনীত করলাম।'

এ উক্তি একদিকে যেমন মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে এবং তাদের সকল সম্পর্ক-বন্ধন ও স্বার্থের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত চূড়ান্ত বিধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বাসগত, এবাদতগত ও আইনগত সকল খুঁটিনাটি বিষয়সহ সমগ্র ইসলামের চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এতে আর কখনো কোনো পরিবর্তন বা রদবদলের অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ভেতরে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। এর ভেতরে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনের অর্থ দাঁড়ায় গোটা ইসলামকে অস্বীকার করা। কেননা এ দ্বারা আল্লাহর ঘোষিত ইসলামের পরিপূর্ণতা অস্বীকৃত হয়। আর এই অস্বীকৃতি যে সুস্পষ্ট কুফরী, তাতে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

এ আয়াতটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম সর্বকালের চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম। এটি সর্বকালের জন্যে আল্লাহর মনোনীত আইন, বিধান বা শরীয়ত। এক এক যুগের জন্যে এক এক ধর্ম এবং এক এক শরীয়ত নয়, বরং সর্বকালের জন্যে এটাই একমাত্র শরীয়ত। এটা সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগ বিধান। এতে যদি কেউ পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে চায়, তবে তার উচিত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করা। কেননা ইসলাম অপরিবর্তনীয়। আর যদি সে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে তা কখনো গ্রাহ্য হবে না।' আকীদা বিশ্বাস, এবাদত উপাসনা ও যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিস্তারিত বিধানসম্বলিত এই খোদায়ী জীবনব্যবস্থা জীবনের সকল তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং জীবনের উন্নতি অগ্রগতিকে তরান্বিত করবে।

এই খোদায়ী বিধানের আওতায় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার অর্থ এটা নয় যে, এর কোনো মূলনীতি বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধি থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন থাকবে। এর অর্থ এই যে, এই বিধান স্বভাবতই জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত রাখে এবং তার কোনো মূলনীতি বা বিধি লংঘন না করেই উন্নতির পথ সুগম করে। এ বিধান রচনা করার সময় এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেই তা রচনা করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন এটিকে তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রূপ দিয়ে রচনা করেন এবং তাকে পূর্ণতা দান ও মানবজাতির দ্বীন হিসাবে মনোনীত করার ঘোষণা দেন, তখন তাঁর অজানা ছিলো না যে, ভবিষ্যতে মানুষের কত নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই সব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী কত বেশী ও রকমারি হবে এবং দুনিয়ার কত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে। এ সব যখন আল্লাহর অজানা ছিলো

www.pathagar.com

না, তখন তাঁর রচিত বিধানে এ সমস্ত প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা থাকা স্বভাবতই অবধারিত। যে ব্যক্তি মনে করে যে, ইসলামে পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগিতর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এবং পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী পূরণের নিশ্চয়তা নেই, সে আসলে স্বয়ং আল্লাহরই ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।

সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানেই শেষ করছি।

সূরা আল আনফাল

দু'টি মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফের পর এবার আমরা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর দিকে ফিরে আসছি। ইতিপূর্বে আমরা আল বাকারা, আলে ইমরান, আন নেসা ও আল মায়েদা এই ক'টি মাদানী সূরার তাফসীর করে এসেছি। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে আমরা কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এসেছি– কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। কেননা নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবাহিকতার ব্যাপারে এখন আমাদের পক্ষে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এক একটি অংশকে দেখিয়ে সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে, এটুকু মক্কী এবং এটুকু মাদানী। এতে সামান্য কিছু মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক আয়াত, আয়াত সমষ্টি বা সূরার অবতারণের সময় চিহ্নিত করে, নিশ্চিতভাবে কালগত ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। আমরা এ ক্ষেত্রে আজও কোনো অকাট্য তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। তবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা কিছু কিছু আয়াত সম্পর্কে জানা যায় যে, সেটা মক্কী যুগের আয়াত, না মাদানী যুগের। যদিও কোরআনের আয়াত ও সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবহিকতা জানবার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে করে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা, স্তরসমূহ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভেও সহায়তা পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধারাবাহিকতার ব্যাপারে নিশ্চয়তার অভাব থাকায় এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্যে আমি এই তাফসীরে কোরআনের সূরাগুলোকে ওসমানী কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজানোই ভালো মনে করেছি, সেই সাথে মোটামুটিভাবে ও অধিকতর বিশ্বস্ত সূত্রের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এভাবে আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তত্ত্ব ও তথ্য সংক্ষেপে ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে বিবৃত করেছি।

অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে আলোচ্য সূরা আনফাল সূরা বাকারার পরে বৃহত্তর বদর যুদ্ধের সময় অর্থাৎ হিজরতের উনিশ মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে নাযিল হয়। তবে সূরা বাকারার পরেই যে এটি নাযিল হয়েছে এটা কোনো চূড়ান্ত তথ্য নয়। কেননা সূরা বাকারা এক সাথে নাযিল হয়নি। এর কিছু অংশ মাদানী যুগের প্রথম ভাগে এবং কিছু অংশ শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। এই শেষ ভাগ ও প্রথম ভাগের মাঝে প্রায় নয়টি বছর রয়েছে। সূরা আনফাল যে এই সময়ের ভেতরেই নাযিল

www.pathagar.com

হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সূরা বাকারা এই সূরার আগে ও পরে কিছু কিছু করে নাযিল হয়েছে। তাই সূরা আনফাল বাকারার পরে নাযিল হওয়ার অর্থ এই যে, বাকারার প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়াত অনুসারে সূরা আনফালের ৩০ নং থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত অংশটি মক্কী যুগের। এগুলো হচ্ছে,

'যখন কাফের তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় তোমাকে বন্দী করা, হত্যা করা অথবা বের করে দেয়ার জন্যে..... (আয়াত ৩০-৩৬)

যারা এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলেছেন, তারা সম্ভবত এ আয়াতগুলোতে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখেই তা বলেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা বহু মাদানী যুগের আয়াতে হিজরতের পূর্বে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এমনকি এই সূরার ২৬ নং আয়াতে স্পষ্টতই মক্কী যুগের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,

'স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল ছিলে .....'

অনুরূপভাবে ৩৬ নং আয়াতে বদর যুদ্ধের পরে মোশরেক কর্তৃক ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

'নিশ্চয় কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর জন্যে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে.....'

যে সকল বর্ণনায় এসব আয়াতকে মক্কী আয়াত বলা হয়েছে, সে সব বর্ণনায় এসব আয়াতের শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসাবে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা আপত্তিকর। বলা হয়েছে যে, আবু তালেব রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার জাতি তোমার ব্যাপারে কি সলাপরামর্শ করছে?' রসূল (স.) বললেন, 'ওরা আমাকে জাদু করতে, হত্যা করতে অথবা বের করে দিতে চায়।' আবু তালেব বললেন, 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে? রসূল (স.) বললেন, 'আমার প্রতিপালক'। আবু তালেব বললেন, হাঁ, ওই প্রতিপালক তো তোমারই প্রতিপালক। তাঁর কাছে তুমি সদুপদেশ চাও। রসূল (স.) বললেন, 'আমি তাঁর কাছে সদুপদেশ চাইবো কেন? বরং তিনিই আমাকে সদুপদেশ দেবেন।' এই সময় নাযিল হয় 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো আটক রাখা, হত্যা করা অথবা বহিষ্কার করার জন্যে....' (আয়াত ৩০)

ইবনে কাসীর এই বর্ণনার উল্লেখ করেছেন এবং এর ওপর আপত্তি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে আবু তালেবের উল্লেখ শুধু বিস্ময়করই নয়, বরং অগ্রহণযোগ্যও। কেননা এ আয়াত মাদানী যুগের। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা, কোরায়শদের এই ষড়যন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং রসূল (স.)-কে গ্রেফতার, হত্যা কিংবা বহিষ্কারের সলাপরামর্শ হয়েছিলো শুধু হিজরতের রাতে। আর এটা হয়েছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পর। যে আবু তালেব তাঁকে সাহায্য সংরক্ষণ এবং তাঁর যাবতীয় দায়ভার বহন করছিলেন, তার মৃত্যুর পরই কোরায়শদের এতোটা ক্ষমতা ও ধৃষ্টতা জন্মেছিলো– তার আগে নয়।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক কোরায়শদের সারা রাত জেগে এই ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের শেষে তিনি বলেন, 'এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতপর তিনি মদীনায় পৌঁছার পর আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করেন। এতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দেয়া তাঁর নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে, 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমাকে আটক, হত্যা বা বহিষ্কার করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছিলো। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এটিই এই আয়াতের পূর্বাপর সেই সকল আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে ও মোমেনদেরকে ইতিপূর্বে কৃত সকল অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করা, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া এবং যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে না পালিয়ে অবিচল থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে সূরার অন্য সকল আলোচিত বিষয়ের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সমগ্র সূরার মতো এই আয়াতগুলো মাদানী আয়াত– এই বক্তব্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

যা হোক, সূরা আনফালের নাযিল হওয়া সংক্রান্ত রেওয়াতগুলোতে এই সব সমস্যা থাকার কারণে আমরা এই তাফসীরে হযরত ওসমানের সংকলিত কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করাই অগ্রগণ্য মনে করেছি– কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। এই সাথে নাযিল হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছি।

এই সূরাটা নাযিল হয়েছে বৃহত্তর বদর যুদ্ধ প্রসংগে। আর এই যুদ্ধের কারণ এবং ইসলামী আন্দোলন ও মানবজাতির ইতিহাসে তার যে প্রভাব দেখা দিয়েছে, তার নিরিখে বলা যায়, বদর যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন ও মানবেতিহাসের পথের একটা বিরাট মাইলফলক।

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের দিনকে 'হক ও বাতিলের বিভক্তি ও দুই পক্ষের সংঘর্ষের দিন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শুধু ইহকালে নয় এবং শুধু ইহকালীন জীবনেই নয়, বরং আখেরাতেও এটা হকপন্থী ও বাতিলপন্থী– এ দুই গোষ্ঠীকে পৃথক করে দিয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধ উপলক্ষে নাযিল হওয়া সূরা আল হজ্জের ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এই দুই বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। যারা কুফরী করেছে, তাদের (পরানোর) জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে কিছু কাপড় কাটা হবে .....।'

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মোমেন ও কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর শুধু তাদের যুদ্ধ সম্পর্কেই নয় এবং তাদের পার্থিব জীবনে বিভক্ত হয়ে থাকা সম্পর্কেই নয়, বরং তাদের অনন্তকালের জীবন সম্পর্কেও এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। ওই দিনটির দৃশ্য তুলে ধরা ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে

www.pathagar.com

আল্লাহর এ ঘোষণাই যথেষ্ট। পরবর্তীতে এই ঘটনা এবং তার কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি এই ঘটনার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করবো।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশালত্ব যতোই হোক, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফলের মূল্যায়ন ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতোক্ষণ আমরা এ যুদ্ধের সত্যিকার প্রকৃতি ও পরিচয় না জানবো। যতোক্ষণ এ যুদ্ধকে 'ইসলামী জেহাদের' একটা ঘটনা হিসাবে না দেখবো এবং এই জেহাদের প্রেরণার উৎসসমূহ ও তার উদ্দেশ্যসমূহ না বুঝবো। আবার এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বুঝতে হলে আমাদেরকে সর্বাগ্রে জানতে হবে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়।

ইমাম ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মা'য়াদ' এ ইসলামের জেহাদ শীর্ষক বিষয়টির সার সংক্ষেপ একটি অধ্যায় তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন, 'রসূল (স.)-এর নবুওত লাভ থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত কাফের ও মোনাফেকদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি।' এই অধ্যায়ে তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করেন তা ছিলো এই যে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ করেন। এটি ছিলো তাঁর নবুওতের সূচনা। এ সময় তিনি শুধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে তা বা প্রচারের কোনো আদেশ দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়, 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো।' সুতরাং 'ইকরা' বা পাঠ করো বলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী বানালেন, 'আর হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো' বলে তাঁকে রসূল পদে উন্নীত করলেন। অতপর পর্যায়ক্রমে তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরকে, তাঁর গোত্রকে, প্রতিবেশী আরবদেরকে, সমগ্র আরব জাতিকে, অতপর সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন। এভাবে তাঁর নবুওতের পর তিনি দশ বছরেরও অধিক সময় কোনো লড়াই বা জিযিয়া কর আরোপ ছাড়াই শুধু দাওয়াতের কাজ করে কাটালেন। এই সময়ে তাঁকে কোনো অস্ত্র ধারণ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। আর হিজরত করার পর প্রথমে তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো শুধু যারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাঁর ওপর আক্রমণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অতপর তাঁকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলো। যাতে সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আইন ও হুকুম মান্য করা না হয়।

অতপর জেহাদের নির্দেশ দেয়ার পর তাঁর কাছে কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, ১. যাদের সাথে আপোষ ও সন্ধির নীতি অবলম্বন করা হবে। ২. যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং ৩. যাদেরকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রথম শ্রেণীটার সাথে করা সন্ধি চুক্তি তাঁকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরও তা মেনে চলতে

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘণের আশংকা দেখা দেবে, তখন মুসলমানরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু চুক্তি লংঘরণর সুনির্দিষ্ট তথ্য না জানা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা তাওবা নাযিল করার মাধ্যমে এই তিন প্রকারের কাফেরদের সকলের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শত্রু, তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া কর প্রদান না করলে মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জেহাদ করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কাফেরদের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথমত, যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘনও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণও চালায়নি, তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো এবং তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়নি। এই শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই চার মাস অতিবাহিত হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) চুক্তি লংঘনকারীদেরকে হত্যা করলেন। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিলো না, তাদেরকে চার মাস সময় দিলেন। আর চুক্তি মান্যকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অবিচল থাকলো না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকার অংগীকারে আবদ্ধ অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করলেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর কাছে তিন শ্রেণীর কাফের অবশিষ্ট রইলো ১. যুদ্ধরত, ২. চুক্তিবদ্ধ এবং ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত। অতপর চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের ভাগ্য মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত হলো। ইসলামের আওতায় এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত ও বিদ্রোহী। যারা বিদ্রোহী, তারা রসূল (স.)-কে ভয় পেতো। এভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তিন রকমের দাঁড়ালো- মুসলমান, নিরাপদ আপোষকামী অমুসলিম এবং ভীরু বিদ্রোহী। মোনাফেকদের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিলো এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে যেমন দেখা যায়, তেমনিই বিবেচনা করা, তাদের মনের অবস্থা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ও কঠোর নীতি অবলম্বন, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা তাদের মন জয় করা, তাদের জানাযা না পড়া এবং তাদের কবর যেয়ারত না করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও জানিয়েছিলেন যে, কোনো মোনাফেকের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না। এই ছিলো দুশমন কাফের ও মোনাফেকদের প্রতি রসূল (স.)-এর নীতি।'

ইসলামে জেহাদের বিভিন্ন স্তরের বিধানসম্বলিত দীর্ঘ আলোচনার এই চমৎকার সারসংক্ষেপ থেকে ইসলামের আন্দোলন পদ্ধতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা গেলো, যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমি এ তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো!

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জীবনপদ্ধতির বাস্তবমুখিতাই ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য। এটা মানবসমাজের বিদ্যমান একটা বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার জন্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে। ইসলাম জাহেলী মতবাদ ও আদর্শের মোকাবেলা করে। এই জাহেলী মতাদর্শের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে সমর্থন ও সাহায্য করে। এ জন্যে ইসলাম এই গোটা বাস্তব অবস্থাটারই মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। একদিকে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে এবং অপরদিকে জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদকল্পে জেহাদের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করে। কেননা এই রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগনকে বলপ্রয়োগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য প্রভুদের গোলামে পরিণত করে। বস্তুগত শক্তির মোকাবেলায় কেবল প্রচার ও দাওয়াতের মধ্যে এ আন্দোলনের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে না। অনুরূপভাবে তা মানুষের বিবেকের ওপর কোনো বস্তুগত বলও প্রয়োগ করে না। ইসলামের জীবনপদ্ধতিতে ওই দুটো জিনিসই সমান গুরুত্বসম্পন্ন।

ইসলামের জীবনপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবমুখিতা। এ হচ্ছে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটা আন্দোলন। এর প্রত্যেকটি ধাপের দাবী ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদি এর হাতে রয়েছে। প্রতিটি ধাপ এমন যে, তা স্বয়ংক্রিয়াভাবে পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে না। অনুরূপভাবে তা প্রেক্ষাপটহীন যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে না। বরং তা পর্যায়ক্রমিকভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে। যারা কোরআনের ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর এই পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে ধরে না এবং ইসলাম যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় ও এর প্রতিটি ধাপের সাথে যে কোরআনের আয়াতসমূহের সম্পর্ক রয়েছে তা উপলব্ধি করে না, তারা

www.pathagar.com

মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় এবং আয়াতগুলোর ভুল অর্থ করে তা থেকে জেহাদের নামে এমন সব পদ্ধিতি বের করে, যা আদৌ ওই আয়াতগুলোর বক্তব্য নয়। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, তারা কোরআনের প্রতিটি উক্তিকে অন্যান্য উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একমাত্র ও সর্বশেষ উক্তি মনে করে। তাদের ধারণা যে, ওই আয়াতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নীতিমালা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আর একটি শ্রেণী রয়েছে যারা বিরাজমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত হয়ে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে বলে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে জেহাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে সকল আল্লাহাবিমুখ শাসনের অবসান ঘটানো এবং সকল মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মহান দায়িত্ব থেকে ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের একটা 'উপকার' সাধন করলেন বলে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম কাউকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কিন্তু মানুষ যাতে তার আকীদা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যে যমীনে বিদ্যমান স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়। এই শাসন ব্যবস্থাকে জিযিয়া দিতে ও ইসলামের অধীনতা বরণ করতে সে বাধ্য করে, যাতে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ইসলামকে গ্রহনের ফয়সালা করতে পারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের চিরস্থায়ী আন্দোলন ও তার নিত্য নতুন উপায় উপকরণ ইসলামকে কখনো তার স্থায়ী ও শাশ্বত নীতিমালা ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন শুধু কোরায়শদেরকে নয় এবং শুধু আরবদেরকে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতিকে। এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করতে এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই মূলনীতির ব্যাপারে তার কোনো আপোষ নেই।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের সাথে সকল অমুসলমানের সম্পর্ক আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে 'যাদুল মায়াদ' থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকার আলোকে। সেই নির্দেশিকা এই যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা অন্ততপক্ষে নমনীয় হওয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যে কাউকে কোনোভাবে বাধা না দেয়া এবং সবাইকে ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য। কোনো মানুষ নিজে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সে যদি অন্য কাউকে বাধা দেয়, তবে ইসলাম তা বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা বাধা দান থেকে বিরত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে।

যে সব লেখক পাশ্চাত্যের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত বিধায় 'ইসলামের জেহাদ' শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমিত এই বলে ইসলামকে 'দোষমুক্ত' করার চেষ্টায় নিয়োজিত, তারা বিশ্বাসের ব্যাপারে বল প্রয়োগ না করা এবং

www.pathagar.com

মানুষের ইসলাম গ্রহণে বাধা দানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করা– ইসলামের এই দুটো নীতির পার্থক্য বুঝতে পারেনি, বরং এই দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। যে শক্তি মানুষকে জোরপূর্বক মানুষের গোলামী করতে বাধ্য করে এবং মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়, সেই শক্তিকে উৎখাত করা ও মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ না করা– এই উভয়টির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এবং তালগোল পাকানোর কোনো অবকাশ নেই। আসলে এ দুটো নীতির মোদ্দা কথা হলো, ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দানকে নিশ্চিত করতে চায়। সে নিজেও তার ওপর বলপ্রয়োগ করে না, অন্যকেও বল প্রয়োগ করতে দিতে চায় না। এভাবে তালগোল পাকানোর কারণেই তারা ইসলামের জেহাদকে 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের' মধ্যে সীমিত করে ফেলে। অথচ ইসলামের জেহাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ যুগের মানুষদের মধ্যে যে সব উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যে সব উপকরণ এসব যুদ্ধ বিগ্রহকে উস্কে দেয়, তার সাথে ইসলামের জেহাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলামী জেহাদের কারণ খোদ ইসলামের অভ্যন্তরেই খুঁজে দেখতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে ইসলাম পৃথিবীতে কী ভূমিকা পালন করতে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ইসলামকে ও রসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন।

সমগ্র বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম শাসক, আইনদাতা, প্রভু ও প্রতিপালক– এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের এবং নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আল্লাহকে সর্ব জগতের প্রতিপালক ঘোষণা করার অর্থ হলো মানুষের সার্বভৌমত্বকে খতম করা এবং সকল মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা কর। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম মানুষের খোদায়ীর অবসান ঘটাতে চায়। আর যেখানে শাসনের সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতা মানুষের হাতে এবং মানুষই তার সকল ক্ষমতার উৎস, সেখানে মানুষই মানুষের খোদা হয়ে বসে আছে বলে ইসলাম মনে করে। কেননা সেখানে মানুষ মানুষের ওপর সর্বময় প্রভুত্ব চালানোর কারণে সে আল্লাহর বিকল্প প্রভু ও খোদা হয়ে বসে। ইসলামের পক্ষ থেকে 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই' এই ঘোষণা দানের অর্থ হলো অবৈধভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া প্রভুত্ব আল্লাহকেই ফেরত দেয়া। যারা এটিকে অবৈধভাবে হস্তগত করে মানুষের ইলাহ হয়ে বসে নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা মানুষকে শাসন করে, তারা কার্যত মানুষের ইলাহের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং জনগণ তাদের গোলামে পরিণত হয়। ইসলাম এই অন্যায় প্রভুত্ব ও অবৈধ গোলামী খতম করতে চায়। সে চায় পৃথিবীতে মানুষের রচিত আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে। কোরআনের ভাষায়,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশেও ইলাহ এবং পৃথিবীতেও ইলাহ। 'শাসন ও বিচার ফয়সালার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো গোলামী করো না। এটাই সঠিক দ্বীন।'

www.pathagar.com

'বলো, হে আহলে কেতাব, এসো, আমরা এমন এক কথার ওপর একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো যেন এবাদাত ও গোলামী না করি, তার সাথে অন্যকে শরীক না করি এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করি .....।'

পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, কতিপয় নিদিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি কোনো দেশের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলো, যেমনটি খৃষ্টীয় গীর্জা শাসিত রাষ্ট্রে হতো, অথবা থিওক্রাসি বা পবিত্র খোদায়ী শাসনের নামে এমন লোকদের শাসন কায়েম করা হলো, যারা দেবতাদের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। বরঞ্চ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই, যখন আল্লাহর আইনের নিরংকুশ শাসন কায়েম হয় এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়।

আর পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, অনৈসলামী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ, আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও মানবরচিত আইন বাতিল করা– এসব কাজ কেবল বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা বান্দাদের ওপর জোরপূর্বক নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া ও আল্লাহর ক্ষমতাকে জবরদখলকারী লোকেরা শুধু বক্তৃতা শুনে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে না। তা যদি হতো, তবে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে নবীদের কাছে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু ছিলো না। কিন্তু নবীদের ইতিহাস এবং আল্লাহর এই দ্বীনের ইতিহাস যুগ যুগ কাল ধরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে, তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহকে সারাবিশ্ব জগতের একমাত্র সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনিব ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানুষকে অন্য সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার এই সার্বজনীন ঘোষণা কোনো তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নেতিবাচক ঘোষণা ছিলো না। এটা ছিলো বাস্তব, ইতিবাচক ও আন্দোলনগত ঘোষণা। তাই প্রচার ও বক্তৃতার পাশাপাশি এর একটা আন্দোলন ও সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করাও জরুরী। এতে করে তা মানব জাতির বাস্তব অবস্থার সকল দিকের সাথে উপযুক্ত উপায় উপকরণ নিয়ে মিলিত ও সমন্বিত হতে পারবে।

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তকারী আদর্শ হিসাবে ইসলাম যখন মানবসমাজের মুখোমুখি হয়, তখন তা একদিকে যেমন তাত্ত্বিক ও আদর্শিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি সম্মুখীন হয় বস্তুগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণীগত ও প্রজাতিগত বাধা বিপত্তিরও। উপরন্তু বিকৃত আকীদা বিশ্বাসও তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সব বাধা বিপত্তি মিলিত হয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা যেখানে বাতিল আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মোকাবেলা করা হয়, সেখানে আন্দোলন ও সংগ্রাম দ্বারা সেই বস্তুগত বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করা হয় যা জাহেলী উপাদানসমূহের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকারে বিদ্যমান। এই প্রচার ও আন্দোলন একত্রে গোটা সমাজব্যবস্থার আমুল ও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আর সমগ্র পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এতে করে পুনরায় সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের সামনে ভেসে উঠবে, যা কোরআন নাযিল হবার সময়ে তৎকালীন মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করেছিলো।

একদিন রসূল (স.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাথে অন্যান্য মুসলমানরা কেউবা চুল কামিয়ে কেউবা চুল ছেটে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করছেন। অথচ হিজরতের পর থেকেই মোশরেকরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। এমনকি যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে জাহেলী যুগের আরবরাও সম্মান করতো, যে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তারা অস্ত্র সংবরণ করতো এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে কাউকে বাধা দেয়া ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতো, সেই নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিত না। অথচ তারা এই মাসগুলোকে এতোই সম্মান করতো যে, নিজ বংশের কোনো নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও তারা বিরত থাকতো। এমনকি এই মাসগুলোতে কেউ তার পিতা বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও তার ওপর তরবারী তুলতোনা। অথচ মুসলমানদের ব্যাপারে তারা তাদের এই অটুট ঐতিহ্যকেও লংঘন করলো এবং হিজরতের পরবর্তী পুরো দু'টা বছর রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করতে দিলো না। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করার পর রসূল (স.) এই স্বপ্নটা দেখলেন। যখন তিনি মুসলমানদেরকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন তখন তারা একে একটা শুভ লক্ষণ মনে করে খুশী হলো।

হোদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইবনে হিশামের বর্ণনা সবচেয়ে পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। সার্বিক বিচারে ইমাম বোখারী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে হাযমের 'জাওয়ামিউস্ সীরাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'অতপর রসূল (স.) রমযান ও শওয়াল মাস মদীনায় অবস্থান করলেন। (বনু মুসতালিকের যুদ্ধ ও তারপর হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাসংক্রান্ত ঘটনার পর) যিলকদ মাসে তিনি ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিলো না। তিনি মদীনার আশপাশের আরব ও মরুচারী বেদুইনদেরকেও তাঁর সাথে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কারণ তিনি আশংকা করছিলেন যে, কোরায়শ তার সাথে পূর্বেকার মতোই আচরণ করবে, তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে অথবা তাকে কাবা শরীফে প্রবেশে বাধা দেবে। বেদুইনদের অনেকেই তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলো না। অগত্যা রসূল (স.) তাঁর সাথী মোহাজের, আনসার ও তাঁর সাথে যোগদানকারী আরবদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সাথে কোরবানীর জন্তুও হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন ও ওমরার এহরাম বাঁধলেন, যাতে মক্কাবাসী তাঁর যুদ্ধের ইচ্ছা নেই ভেবে আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করে এবং নিশ্চিত হয় যে, তিনি শুধু কা'বা শরীফের যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এসেছেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশো।

যুহরী বলেন, রসূল (স.) যাত্রা করে যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সাথে বিশর বিন সুফিয়ান আল কাবী সাক্ষাত করলো। সে বললো,

www.pathagar.com

হে রসূল! কোরায়শ আপনার যাত্রার খবর পেয়ে গেছে। খবর পেয়ে তারা সদলবলে বেরিয়েছে। এমনকি তাদের সাথে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীনী মহিলারাও বেরিয়ে এসেছে। সবাই বাঘের চামড়া পরেছে এবং যী তুবাতে যাত্রা বিরতি করেছে। তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনাদেরকে কখনো মক্কায় ঢুকতে দেবে না। খালেদ বিন ওলীদ তাদের অধিনায়ক হয়ে আসছে। তারা কুরাউল গামীমে পৌছে গেছে। (উসফান থেকে আট মাইল সামনে অবস্থিত জায়গার নাম) রসূল (স.) এ কথা শুনে বললেন, ধিক কোরায়শকে! যুদ্ধ তাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। আমাকে সমগ্র আরব জাতির সাথে একটা বুঝাপড়া করতে দিলে তাদের অসুবিধা কোথায়? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, তাহলে তো তারা যা চায় সেটাই হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে তারা দলে দলে ইসলামে যোগদান করবে। আর তা না হলে তারা আমার সাথে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে। তাহলে কোরায়শের ভাবনাটা কি? আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েই যাবো–যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আমার এই গর্দান থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন, এখানে এমন কে আছে, যে আমাদেরকে এমন পথে মক্কায় নিয়ে যেতে পারে মক্কাবাসীরা যেপথ দিয়ে আসছে তার থেকে ভিন্ন?

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু আসলাম গোত্রের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি পারবো আপনাদেরকে সে রকম একটা পথ দিয়ে নিয়ে যেতে। অতপর সে মুসলমানদেরকে একটা দুর্গম প্রস্তরময় পাবর্ত্য পথ ধরে নিয়ে চললো। এ পথ ধরে চলা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। এক সময়ে তারা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সমভূমিতে উপনীত হলো। রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। তারা তৎক্ষণাত তা বললো। তখন রসূল (স.) বললেন, বনী ইসলাঈলকেও এই কথার সমার্থক 'হিততাতুন' বলতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইবনে শিহাব আয যুহরী বলেন, এরপর রসূল (স.) জনগণকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হিম্‌যের ভেতর দিয়ে মিরারের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চলের হোদায়বিয়ার সমভূমি অভিমুখে এগিয়ে যাও। (মক্কার অদূরে একটা গ্রামের নাম হোদায়বিয়া) এরপর মুসলমানরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চললো। কোরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের পথের উড়ন্ত ধুলো দেখতে পেয়ে বুঝলো যে, তারা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা তা থেকে ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ত্বরিতগতিতে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। এদিকে রসূল (স.) তার দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারা মিরারের পাহাড়ের কাছে যেতেই রসূল (স.)–এর উটনীটা শুয়ে পড়লো, তা দেখে মুসলমানদের অনেকেই বলে উঠলো, উটনীটা গোয়ার্তুমি শুরু করেছে। রসূল (স.) বললেন, গোয়ার্তুমি করছে না এবং এটা তার স্বভাবও নয়। আসলে আবরাহার হস্তি বাহিনী মক্কায় প্রবেশে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো, এ

www.pathagar.com

উটনীটা সেই একই বাধার সম্মুখীন। আজ কোরায়শ আমাকে রক্তসম্পর্ক বজায় রাখার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাবই দেবে, আমি তা মেনে নেবো। (বোখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বললেন, যে আল্লাহ তায়ালার হাতে আমার জীবন তার শপথ, আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাপেক্ষে কোরায়শ আমার কাছে যে দাবীই জানাবে আমি তা মেনে নেব।) তারপর রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা এখানে যাত্রাবিরতি করো। তাঁকে বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ! এই প্রান্তরে পানি নেই। রসূল (স.) নিজের একটি তীর বের করে জনৈক সাহাবীকে দিলেন। সে সাহাবী তৎক্ষণাত সামান্য বৃষ্টির পানি ধারণকারী একটা নীচু জায়গায় তীরটা গেড়ে দিতেই তা পানিতে ভরে উঠলো।

এভাবে রসূল (স.) নিশ্চিন্ত হলে, তখন তার কাছে বুদাইল বিন ওয়ারকা খাযায়ীর নেতৃত্বে বনু খাযায়া গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল এসে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? রসূল (স.) তাদেরকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি, কেবল কা'বা শরীফ যেয়ারত করতে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন। তারপর তিনি বিশর বিন সুফিয়ান আল কা'বীকে যা বলেছিলেন, একইরকম কথা তাদেরকেও বললেন। তারপর এই প্রতিনিধি দল কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ, তোমরা মোহাম্মদের ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। আসলে মোহাম্মদ যুদ্ধ করতে আসেনি। সে এসেছে কা'বা যেয়ারত করতে। কিন্তু কোরায়শ তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা বরং খাযায়ীদেরকেই পক্ষপাতিত্বের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে নাও এসে থাকে, তবুও সে আমাদের শহরে জোর করে ঢুকতে পারবে না এবং আরবরা আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারুক তা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না।

খাযায়া গোত্রের কাফের ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাই রসূল (স.)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাংখী ছিলো। মক্কায় যা কিছুই ঘটতো, তা তারা রসূল (স.)-এর কাছে গোপন করতো না। খাযায়ী প্রতিনিধি দলের পর কোরায়শ বনু আমের বিন লুয়াই গোত্রের মুকারেয বিন হাফসাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) দূর থেকেই বললেন, এক বিশ্বাসঘাতক আসছে। তখন তিনি বুদাইল ও তার সাথীদেরকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। সে কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে রসূল (স.) যা জানিয়েছেন তা জানালো। এরপর কোরায়শ হুলায়স বিন আলকামাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। সে আহাবিশ নামক মরু অঞ্চলীয় গোত্রের সরদার ছিলো। এই গোত্রটি বনু হারেস গোত্রের একটা শাখা। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) বললেন, এই লোকটি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। ওকে তোমরা আমাদের কোরবানীর জন্য নিয়ে আসা পশুগুলোকে দেখিয়ে দাও। সে যখন কোরবানীর পশুগুলোকে মাঠে চরে বেড়াতে দেখলো এবং এও দেখলো যে, দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে পশুগুলোর দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে পশম ঝরে গেছে, তখন সে

www.pathagar.com

রসূল (স.)-এর কাছে না এসেই কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। কেননা যে দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে সে বুঝেছে যে, যথার্থই তিনি কা'বার যেয়ারত করতে এসেছেন। সে যখন কোরায়শকে এ কথা বললো, তখন কোরায়শ বললো, 'তুমি একজন বেদুঈণ। এ বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।'

ইবনে ইসহাক বলেন, কোরায়শ নেতাদের মুখ থেকে এ কথা শুনে হুলায়স রেগে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ জনতা, তোমাদের সাথে আমাদের যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছিলো, তার ভেতরে এ বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিলো না যে, ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ঘরের প্রতি সম্মান জানাতে আসে, তাকে কি তা থেকে প্রতিহত করা হবে? হুলায়সের জন্ম মৃত্যু যার হাতে, সেই আল্লাহ তায়ালার কসম, তোমরা যদি মোহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে, তা তাকে করতে না দাও, তাহলে আমি সমস্ত আহাবিশীদেরকে নিয়ে চলে যাবো। একথা শুনে কোরায়শ নেতারা বললো, 'হে হুলায়স, আমরা যা পছন্দ করি, তা করতে আমাদেরকে বাধা দিও না।'

যুহরী বলেন, এরপর কোরায়শ রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো বনু সাকীফ গোত্রের নেতা ওরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীকে। সে বললো, শোনো কোরায়শ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যাকেই মোহাম্মাদের কাছে পাঠাচ্ছ, সে ফিরে এলে তাকে তোমরা অনেক ভর্ৎসনা করছো ও কটু কথা বলছো। তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের সন্তান এবং তোমরা আমার বাবা। (তার মা কোরায়শের শাখা বনু আব্দুশ শামসের মেয়ে ছিলো) তোমাদের ওপর কী বিপদ এসেছে, তা আমি শুনেছি। সে জন্যে আমার গোত্রের যারা আমার অনুগত তাদেরকে সমবেত করেছি এবং তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।' কোরায়শ বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা তোমার ওপর কোনো দোষারোপ করিনি। তারপর সে রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সামনেই বসলো। তারপর বললো, হে মোহাম্মাদ, তুমি তো বিরাট একদল মানুষ জমায়েত করে তোমারই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছো, তাই না? তবে শুনে রাখো, কোরায়শ তোমাকে যুদ্ধে হারাতে তাদের সন্তানসম্ভবা নারী ও দুধ খাওয়ানো মায়েদেরকে পর্যন্ত সাথে নিয়ে বাঘের চামড়া পরে বেরিয়ে এসেছে। তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে কোনো ক্রমেই বলপ্রয়োগে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। আল্লাহ তায়ালার কসম, হয়তো আগামীকাল আমিও তাদের সাথে থাকবো এবং তোমার কাছে তাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে। একথা বলার সময় হযরত আবু বকর (রা.), রসূল (স.)-এর পেছনে বসেছিলেন। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আমরা কি রসূল (স.)-কে পর্যুদস্থ হতে দেবো? ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মাদ এ লোকটি কে? তিনি বললেন, এ হচ্ছে ইবনে আবি কোহাফা। সে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমার যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন না হতো, তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নিতাম। সেই প্রয়োজনের কারণে এটা সহ্য করলাম। এরপর সে রসূল (স.)-এর দাঁড়ি বিলি দিতে দিতে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলো। ওদিকে হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)তখন লৌহ শিরস্ত্রান পরে রসূল (স.)-এর মাথার

www.pathagar.com

কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে যখনই তাঁর দাঁড়ি বিলি দিচ্ছিলো, তখনই তিনি তার হাতে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, রসূল (স.)–এর মুখ থেকে তোমার হাত সরাও। নচেত এই অস্ত্র দিয়ে ওটা সরানো হবে।' ওরওয়া বললো, ধিক তোমাকে। তুমি কতো কর্কশভাষী! রসূল (স.) মুচকি হাসলেন, তখন ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মদ, এ ব্যক্তি কে? রসূল (স.) বললেন, এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শোবা। সে বললো, ওহে বিশ্বাসঘাতক! মাত্র সেদিনও তো আমি তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করেছি।'

ইবনে হিশাম বলেন, ওরওয়া তার এই কথা দ্বারা যা বুঝাচ্ছিলো তা হলো, কোনো এক বিরোধ নিয়ে মুগীরা ইসলাম গ্রহণের আগে বনু মালেক বিন সাকীফের ১৩ জনকে হত্যা করেছিলেন। এতো বনু মালেক ও মুগীরার পক্ষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওরওয়া দশটা দিয়ত (রক্তপণ) দিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমিত করেছিলো ও বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন, রসূল (স.) পূর্ববর্তীদেরকে যা যা বলেছিলেন, ওরওয়াকেও অবিকল তাই বললেন। তাকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। এরপর সে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। সে দেখে গিয়েছিলো যে রসূল (স.) ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি এবং তিনি থুথু ফেললে তাঁর থুথু নেয়ার জন্য তার শিষ্যরা কিভাবে পাল্লা দেয়। তার চুল পড়লেও তা নেয়ার জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। সে কোরায়শকে গিয়ে বললো, ওহে কোরায়শ! আমি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যার রাজ্যে পারস্য, আবিসিনিয়া ও রোমের সম্রাটের মতো দোর্দন্ড ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী। আল্লাহ তায়ালার কসম, মোহাম্মাদের সাথীরা তার যেমন আনুগত্য করে, তেমন কোনো রাজাকেও তার প্রজাদের আনুগত্য পেতে দেখিনি। আমি নিশ্চত যে, মোহাম্মাদের সাথীরা কোনো অবস্থাতেই তাকে কারো হাতে সমর্পণ করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো কী করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) তাঁর উদ্দেশ্য জানানোর জন্যে খাররাশ বিন উমাহইয়া খাযায়ীকে নিজের উটে চড়িয়ে মক্কায় কোরায়শের কাছে পাঠালেন, কিন্তু রসূলের সেই উটটাকে তারা হত্যা করলো। তারা খাররাশকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আহাবিশীয়রা তা করতে দেয়নি, বরং তাকে রসূল (স.) কাছে ফিরে আসতে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, কোরায়শ চল্লিশ বা পঞ্চাশ জনের একটা দলকে রসূল (স.)–এর বাহিনীর পাশ দিয়ে চক্কর দিতে ও সাহাবীদের কোনো একজনকে ধরে নিতে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তারা সবাই গ্রেফতার হয়ে রসূল (স.)–এর কাছে নীত হয়। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও ছেড়ে দেন। অথচ তারা রসূল (স.)–এর বাহিনীকে লক্ষ করে পাথর ও তীর ছুঁড়েছিলো।

এরপর তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে ডাকলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে কোরায়শ নেতৃবৃন্দকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

www.pathagar.com

ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি কোরায়শদের পক্ষ থেকে আমার জীবনাশংকা বোধ করছি। আমার গোত্র বনু আদির এমন কোনো লোক মক্কায় নেই যারা আমার পক্ষ নেবে। তাছাড়া কোরায়শের বিরুদ্ধে আমি যে কট্টর শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি, তা তারা জানে। তবে আমার চেয়েও কোরায়শদের ওপর বেশী প্রভাবশালী একজনের সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। অগত্যা রসূল (স.) হযরত ওসমানকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কোরায়শ নেতার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পবিত্র কা'বার যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে এসেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর হযরত ওসমান (রা.) মক্কা চলে গেলেন। সেখানে আব্বান বিন সাঈদ ইবনুল আস তার সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে আশ্রয় দিলো। হযরত ওসমান (রা.) তার কাছে রসূল (স.)-এর বার্তা পৌছালেন। বার্তা পৌছানোর পর তারা হযরত ওসমানকে বললো, তুমি যদি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে চাও, তাওয়াফ করো। তিনি বললেন, রসূল (স.) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি করবো না। অতপর কোরায়শ হযরত ওসমানকে আটক করলো। ওদিকে রসূল (স.)-এর কাছে খবর পৌছলো যে, হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বাইয়াতুর রেদোয়ান ও হোদায়বিয়ার সন্ধি

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ওসমান নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রসূল (স.) বললেন, 'মোশরেকদের সাথে লড়াই না করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।' অতপর রসূল (স.) সকল মুসলমানকে বাইয়াত (অংগীকার) করার আহবান জানালেন। এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত 'বাইয়াতুর রেদওয়ান' বা 'আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত।' এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত করিয়েছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাইয়াত করিয়েছেন। এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালমা গোত্রের সদস্য জাদ্দ বিন কায়েস ছাড়া আর কেউ রসূল (স.)-কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেলো। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে এসে জানালো যে, হযরত ওসমানের ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যে।

ইবনে হিশাম বলেন, রসূল (স.) হযরত ওসমানের জন্য হাতের ওপর হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক যুহরীর বরাত দিয়ে বলেন, এরপর কোরায়শ বনু আমের গোত্রের সোহায়েল বিন আমরকে পাঠালো। তাকে তারা বললো, তুমি মোহাম্মাদের কাছে গিয়ে

www.pathagar.com

সন্ধি চুক্তি করো। এই সন্ধিতে একথা থাকা চাই যে, মোহাম্মদ এ বছর অবশ্যই হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা থাকতে মোহাম্মাদ জোরপূর্বক মক্কায় ঢুকেছে একথা আরবরা বলাবলি করবে সেটা আমরা কখনো হতে দেব না। অতপর সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এলো। রসূল (স.) তাকে দেখেই বললেন, কোরায়শ যখন এই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন সন্ধীর উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছে। সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এসে দীর্ঘ আলোচনা চালালো। অতপর উভয়ের মধ্যে চুক্তির সিদ্ধান্ত হলো।

যখন সন্ধির প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো এবং চুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ভীষণ লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

ওমরঃ হে আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রসূল নন?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

আব বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ তাহলে কিসের জন্যে আজ আমরা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

আবু বকরঃ হে ওমর, রসূলের আদেশ মেনে চলো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

ওমরঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

তারপর তিনি রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রসূল নন?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ তাহলে আমরা কিসের জন্যে আজ দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রসূল। আমি কোনোক্রমেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ লংঘন করতে পারবো না। তিনি আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক বলেন, পরবর্তী জীবনে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আমি সদকা দেয়া, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দাস মুক্ত করা অব্যাহত রেখেছি, যাতে আমার সে দিনের আচরণের পাপ মোচন হয় এবং ভালো হবে মনে করে যে কথা বলেছি তার গুনাহ যেন মাফ হয়।

এরপর রসূল (স.) হযরত আলী ইবনে তালেব (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' কিন্তু সোহায়েল বললো, এটা আমি মানি না। লেখো, বিসমিকা আল্লাহুম্মা। (অর্থাৎ তোমার নামে হে আল্লাহ) রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহুম্মা লেখো। হযরত আলী (রা.) তাই লিখলেন। পুনরায় তিনি বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে আল্লাহ তায়ালার রসূল মোহাম্মাদের সম্পাদিত চুক্তি।' সোহায়েল বললো, আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকারই করতাম, তাহলে তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। শুধু তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লেখো। অগত্যা রসূল (স.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি। তারা উভয়ে জনগণকে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা দানের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই সময়ে জনগণ নিরাপদে থাকবে। একে অপরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। কোরায়শ থেকে যে কেউ মোহাম্মদের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর মোহাম্মদের কাছ থেকে যে কেউ কোরায়শের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শ মোহাম্মদের কাছে ফেরত দেবে না। আমাদের ভেতরে একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। একপক্ষ অপরপক্ষের ওপর আক্রমণও করবে না, কেউ কারো সম্পদ অপহরণও করবে না এবং কেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করবেনা। যে ব্যক্তি মোহাম্মদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কোরায়শের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। এক পর্যায়ে বনু খাযায়া গোত্রটি মোহাম্মদ (স.)-এর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। এবার তুমি মোহাম্মদ (স.) আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে, 'মক্কায় প্রবেশ করবে না। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো এবং তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে প্রবেশ করবে, মক্কায় তিন দিন থাকবে, তোমাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। তরবারী ছাড়া প্রবেশ করবে না।'

রসূল (স.) ও সোহায়েলের সামনে এই চুক্তি লেখা চলছে এমতাবস্থায় সোহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল শেকলবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হলো। সে রসূল (স.)-এর কাছে পালিয়ে এসেছিলো। এ সময়ে রসূলের সাহাবীদের মানসিক অবস্থা ছিলো খুবই নাযুক। রসূলের স্বপ্নের কারণে তারা মক্কা বিজয় নিশ্চিত জেনেই মদীনা থেকে বেরিয়েছিলো। পরে যখন তারা সন্ধি হওয়া ও ওমরা না করেই ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও বুঝতে পারলো । আরো কয়েকটা অসহনীয় ব্যাপার রসূল (স.)-কে সহ্য করতে দেখলো, তখন মুসলমানদের মন এতো খারাপ হয়ে গেলো যে, সে অবস্থাটা

www.pathagar.com

তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য মনে হচ্ছিলো। সোহায়েল আবু জান্দালকে দেখা মাত্রই তার দিকে ছুটে গিয়ে তার কলার টেনে ধরে চপেটাঘাত করলো তারপর সে বললো, হে মোহাম্মদ, সে আসার আগেই তোমার ও আমার মাঝে বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। রসূল (স.) বললেন, তোমার কথা সত্য। তারপর সোহায়েল আবু জান্দালকে কলার ধরে সজোরে টেনে মক্কায় নিয়ে যেতে লাগলো। আবু জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'ওহে মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে কি মোশরেকদের কাছে ফেরত পাঠানো হচ্ছে? ওরা তো আমাকে নির্যাতন করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মনের দুঃখ ও যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলো। রসূল (স.) বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো ও ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখো। মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ও তোমার দুর্বল সাথীদের জন্যে অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আমরা মোশরেকদের সাথে একটা আপোস রফা করেছি এবং সে ব্যাপারে আমরা পরস্পরের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাদের সাথে ওয়াদাখেলাপী করতে পারি না।' ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এগিয়ে গিয়ে আবু জান্দালের সাথে সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ওমর নিজের তরবারীর মুঠো আবু জান্দালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো। ওরা মোশরেক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান।' ওমর (রা.) বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম যে, সে তরবারী তুলে নিয়ে তার বাবাকে আঘাত করবে।' কিন্তু লোকটা তার বাবার প্রতি দুর্বলতা দেখালো এবং চুক্তিটা কার্যকরী হয়ে গেলো।

চুক্তিটা লেখা সম্পন্ন হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ও অমুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে সাক্ষী করা হলো। এই সাক্ষীরা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ইবনুল খাত্তাব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, আব্দুল্লাহ বিন সোহায়েল বিন আমর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ বিন মাসলামা, মুকাররায বিন হাফস (তিনি তখনো মোশরেক ছিলেন) ইবনে আবি তালেব। হযরত আলী (রা.) ছিলেন চুক্তিপত্রের লেখক।

যুহরী বলেন, চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা এখন ওঠো, কোরবানী করে মাথার চুল কামাও।' যুহরী বলেন, রসূল (স.)-এর আদেশে সাড়া দিয়ে কেউ উঠল না। ফলে রসূল (স.) তাঁর আদেশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরও কেউ উদ্যোগী হলো না দেখে রসূল (স.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে গেলেন। সাহাবীদের পক্ষ থেকে তিনি যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাকে জানালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি চান সবাই কোরবানী করুক? যদি চান– তাহলে তাদের কারো সাথে আর একটা কথাও না বলে নিজের উট কোরবানী করে ফেলুন এবং আপনার চুল কামানেওয়ালাকে ডেকে আনুন, সে আপনার চুল কামিয়ে দিক।' রসূল (স.) তৎক্ষণাত বেরিয়ে গেলেন, কাউকে কিছু না বলে কোরবানীর কাজটা নিজ হাতেই সমাধা করলেন এবং চুল কামানেওয়ালাকে ডাকলেন। সে তাঁর চুল কামিয়ে দিলো। সাহাবীরা যখন এটা

www.pathagar.com

দেখলেন, তখন তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, কোরবানী করলেন এবং তারা একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। তাদের মানসিক অবস্থা তখনো এমন ছিলো যে, তারা মনের দুঃখে ও ক্ষোভে (একে অপরের চুল কামাতে গিয়ে) একে অপরকে হত্যা করে বসতে পারেন, এমন আশাংকা দেখা দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির দিনে কিছু মুসলমান চুল কামায় এবং মুসলমান চুল ছোট করে ছাঁটেন। এরপর রসূল (স.) বললেন, 'যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন।' সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.) যারা চুল ছেটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। সাহাবীরা আবারো বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (স.), যারা চুল ছেঁটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর রহমত করুন। তৃতীয়বার যখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, যারা চুল কামিয়েছে? তিনি বললেন, যারা চুল ছেঁটেছে তাদের ওপরও আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। তারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.), আপনি যারা চুল কামিয়েছে, তাদের জন্যে যারা চুল ছেটেছে তাদের চেয়ে বেশী রহমত কামনা করলেন কেন? রসূল (স.) বললেন, তারা সন্দেহ করেনি। (অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির যথার্থতা সম্পর্কে তারা সন্দেহ করেনি)

সূরা ফাতাহর নাযিল শুরু

যুহরী বললেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছুলে সূরা 'আল ফাতাহ'নাযিল হলো।

ইমাম আহমদ মুজাম্মা বিন হারিসা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুজাম্মা) বলেছেন, আমরা হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। যখন সেখান থেকে যাত্রা করলাম, লোকেরা তাদের উটগুলোকে জোরে জোরে হাকাতে শুরু করলো। তা দেখে অন্যরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ব্যাপার কি? ওরা এ রকম করছে কেন? বলা হলো, রসূল (স.)-এর কাছে ওহী এসেছে। একথা শুনে আমরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ছুটলাম। দেখলাম, কারাউল গামীমে রসূল (স.) তাঁর বাহন জন্তুটির ওপর বসে আছেন। মুসলমানরা তার চারপাশে সমবেত হলো। তিনি তাদের সামনে পাঠ করলেন, 'ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা .... ('আমি তোমাকে একটা সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি।' এ সময় জনৈক সাহাবী বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, ওটা কি বিজয়?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আল্লাহর কসম, ওটা বিজয়।'

ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, আমরা একটা সফরে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে একটা কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ওহে খাত্তাবের ছেলে, তোর মরণ হোক, তুই রসূলুল্লাহ (স.)-কে তিনবার জিজ্ঞেস করলি তিনি একবারও জবাব দিলেন না! তারপর আমি আমার উটের পিঠে চড়ে বসলাম, উটকে তাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হয় কিনা। হঠাৎ দেখলাম,

www.pathagar.com

একজন আম'কে ডাকছে। আমি ভাবলাম, হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি ফিরে এলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, গতকাল আমার ওপর এমন একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় ধন সম্পদের চেয়ে প্রিয়। তা হচ্ছে সূরা আল ফাতাহ। রসূল (স.) সূরার প্রথম দু'টি আয়াত পড়লেন। (বোখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

এই হলো সেই পটভূমি, যার মধ্যে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ পটভূমিতে রসূল (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সিদ্ধান্তকে নিশ্চিন্ত মনে ও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি শুধু এই ওহীভীত্তিক ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছায় ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হননি। অন্য সকল ইচ্ছা ও আকাংখাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে ও প্রতিটি উদ্যোগে তিনি এই ঐশী সিদ্ধান্ত দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তা থেকে কারো প্ররোচনা তাকে ফেরাতে পারেনি, তাই সে প্ররোরচনা মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসুক অথবা তার সেসব সাহাবীর পক্ষ থেকে আসুক, যাদের মন মোশরেকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী দাওয়া মেনে নেয়ায়, সন্তুষ্টি হতে পারেনি। পরে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দিয়েছেন। আর এর ফলে তারা সন্তোষ, প্রত্যয় ও আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্যের পথে ফিরে এসে তাদের সেই ভাইদের সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন, যারা প্রথম থেকেই একনিষ্ঠ আনুগত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যার আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও রসূল (স.)–এর আত্মার সাথে প্রত্যক্ষ ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ হারায়নি। এ জন্যই তাঁর মন মগয সব সময়ই স্থির ও শান্ত ছিলো এবং কখনো তা শান্তি ও স্থিরতা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এ কারণে সূরার শুরুতে রসূল (স.)–এর জন্যে এমন সুসংবাদ এসেছে, যা পেয়ে তার হৃদয় সুগভীর তৃপ্তি ও আনন্দে বিভোর হয়েছে, বলা হয়েছে, 'আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি। যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমার আগের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করেন।' (আয়াত-১- ৩)

অনুরূপভাবে, সূরার প্রথম ভাগেই মোমেনদেরকে শান্তি ও স্থিরতা প্রদান করে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমান আনয়নে তাদের অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে ক্ষমা ও সওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৪, ৫) সেই সাথে মোশরেক ও মোনাফেকদের জন্যে নির্ধারিত আযাব ও গযবের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। (আয়াত ৬)

এরপর রসূল (স.)–এর বাইয়াত গ্রহণের উল্লেখ এবং সেই বায়াতকে স্বয়ং আল্লাহর বাইয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে মোমেনদের মনকে সরাসরি সেই আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। (আয়াত ৭- ৮-৯-১০)

আবার হোদায়বিয়ায় মোমেনদের অবস্থা প্রসংগে আলোচনা সম্পূর্ণ করার আগেই বাইয়াত ও তা লংঘন প্রসংগে বেদুইনদের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। তারা যেসব

www.pathagar.com

ওযর বাহানা করে বাড়ী থেকে বের হয়নি। সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে খারাপ ধারণা ছিলো, তা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তারা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের জন্যে যে খারাপ পরিণতির প্রত্যাশা করতো, তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রসূল (স.)-কে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে কি ধরনের নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এসব নির্দেশ এমনভাবে দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা মোমেনদের দৃঢ়তা ও যারা অভিযানে বের হয়নি, তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এও প্রকাশ পায় যে, যারা ঈমানের দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে থাকে ও অভিযানে রসূল (স.)-এর সাথে আসেনি, তারা গনিমত ও বিজয়ের লোভে লালায়িত। (আয়াত ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃত)

এই প্রসংগে যারা অভিযানে বের হয়নি এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে অব্যাহতি দানের স্বপক্ষে একটিমাত্র গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত ওযরের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হলো,

'অন্ধের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, খঞ্জের ওপর কোনো বাধ্যকতা নেই এবং রোগীর ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' (আয়াত-১৭)

এই দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্যের পর পুনরায় মোমেনদের ও তাদের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ আলোচনার সবটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি, স্বচ্ছতা ও সম্মান প্রদর্শন মূলক। এতে একনিষ্ঠ ও দৃঢ় ঈমানধারী ও আত্মোৎসর্গিত মোমেনদেরকে যাবতীয় আশ্বাস বানী শোনানো হয়েছে। এ আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে নানা রকমের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা যখন গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। তখন তিনি তাদের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের মনের কথা জানেন, তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাদের জন্যে সাহায্য বিজয় ও গনিমত বরাদ্দ করেছেন এবং এর সব কিছুকেই তিনি সৃষ্টি জগতের শাশ্বত নিয়ম ও বিধির সাথে সমন্বিত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের অবস্থান এই বিধানেরই পক্ষে। সমগ্র সৃষ্টি এর পক্ষে সাক্ষ দিচ্ছে এবং এর পরতে পরতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে সেই বিরাট ও বিরল ঘটনা। (আয়াত ১৮ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃতি)

সূরার শেষাংশে আল্লাহর প্রিয় সেই মহান মানবগোষ্ঠীর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর সবার শেষে তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে। (আয়াত ২৯ দ্রষ্টব্য)

এভাবে সূরার সমগ্র ভাষা খুবই স্পষ্ট প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু তার অবতরণের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ। কোরআনের সুনির্দিষ্ট শৈল্পিক ভংগীতে এই পটভূমিকে সবচেয়ে জোরদারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন কোনো ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে না। তবে

www.pathagar.com

তা থেকে যথার্থ শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ এবং একটা একক ঘটনাকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মূলনীতির আওতায় প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরে। বিশেষ ঘটনাকে সংযুক্ত করে সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সাথে, আর এক অসাধারণ পন্থা ও পদ্ধতিতে মানুষের মনকে সম্বোধন করে।

পূর্বের সূরার সাথে এই সূরার মিল

সূরার মূল পাঠ তার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ এবং কোরআনের সংকলনী ধারাবাহিকতায় এ সূরাটিকে পূর্বেকার সূরা মোহাম্মদের সাথে তুলনা করলে বুঝা যায়, এ দুই সূরার নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী তিন বছরে মুসলমানদের স্বভাব চরিত্রে, আচরণে, অবস্থানে এবং আদর্শিক ও নৈতিক মানে কতো গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনই দুই সূরার নাযিল হওয়ার সময়ের পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ দু'টি সূরার তুলনা করলে এও জানা যায় যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও রসূল (স.)-এর নির্ভুল ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ মহানবী ও কোরআনের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠো এই সৌভাগ্যশালী মানব গোষ্ঠীটির নৈতিক মানের কতো উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং এর ফলে সুদীর্ঘ কালের মানবেতিহাসে কতো অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আসলে সূরা 'আল ফাতাহ'-এর নাযিল হওয়ার পটভূমি ও শিক্ষা থেকে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা দলের ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে, যাদের মন মগযে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের উপলব্ধি যথাযথ পরিপক্কতা লাভ করেছে। যাদের ঈমানী মান প্রায় উচু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যাদের মন ও বিবেক ইসলামের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণে পরিপূর্ণ সন্তোষ ও ব্যকুলতা সহকারে সম্মত হয়েছে। জান ও মালের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাদেরকে আর কোনো প্রেরণা ও উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ যাদের আবেগ উদ্দীপনা ও জযবাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তেজস্বীতা ও দুঃসাহসিকতাকে সীমার ভেতরে সামাল দিয়ে রাখা, কখনো কখনো শান্তি ও আপোসের স্বার্থে লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজন পড়ে।

এ সূরা যখন নাযিল হয়, তখন মুসলমানরা এতোটা অনগ্রসর ছিলো না যে, তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথা বলার দরকার হবে, 'তোমরা যখন শান্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছ, তোমরাই যখন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদেরই সাথে রয়েছেন, তখন দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের নেক কাজগুলোকে বাতিল করবেন না। তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথাও বলার আবশ্যকতা ছিলো না যে, 'তোমরাই তো সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়, অতপর তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করে ... আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।'

এ সময়ে মুসলমানদেরকে শহীদদের দৃষ্টান্ত ও আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে উচ্চ মর্যাদা বরাদ্দ করে রেখেছেন, তার উল্লেখ করে জেহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত

www.pathagar.com

করারও প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো না সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকর দিকগুলো বর্ণনা করার, যেমনি সূরা মোহাম্মদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লড়াইয়ের এ নির্দেশ রইলো। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তোমাদের পক্ষ হতে নিজেই প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তোমাদের কতককে দিয়ে কতককে পরীক্ষা করার জন্যেই এ নির্দেশ দিয়েছেন .....।'

এ সূরায় বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে যে স্বস্তি ও স্থিরতা নাযিল করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের আবেগ উত্তেজনাকে প্রশমিত করা এবং তাদের মনকে আল্লাহর হুকুম মানানো, আপোস মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর রসূলের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রস্তুত করা। এর পাশাপাশি সূরার শেষভাগে গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণকারীদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিরও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরার শেষ ভাগে রসূল (স.) ও তার সাথীদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে !

অবশ্য এ সূরার একটা আয়াতে বাইয়াতের শর্তাবলী পূরণ ও তার লংঘনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা তোমার কাছে বাইয়াত করে, তারা আল্লাহর কাছেই বায়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত। আর যে ব্যক্তি তা লংঘন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই লংঘন করে। ...' তবে লক্ষণীয় যে, এখানে বাইয়াত গ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বায়াতের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিতই অপেক্ষাকৃত প্রবল। বাইয়াতের লংঘন বিষয়ক কথাবার্তা বেদুইনদের পশ্চাদপসারণের প্রসংগেই এসেছে। অনুরূপভাবে মোনাফেক নারী পুরুষদের ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হয়েছে, যা এই গোষ্ঠীর ঈমানী দুর্বলতার বিপরিতে মদীনার মুসলমানদের ঈমানী পরিপক্কতার প্রমাণ বহন করো। মোটকথা, এটা এতো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা সূরা মোহাম্মদের মোনাফেক সংক্রান্ত আলোচনার ন্যায় গুরুত্ব লাভ করেনি। সেখানে মোনাফেকদের ও তাদের মিত্র গোষ্ঠী ইহুদীদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, এটা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যে মানসিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা বহির্মুখী অগ্রগতি।

এ সূরার আয়াত ও পটূমিতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে মুসলমানদের শক্তি ও প্রতিপত্তি মোশরেকদের সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে সকল ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। এসব কিছু থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ দুই সূরার নাযিল হবার মধ্যবর্তী মেয়াদে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

মধ্যবর্তী এই সময়টাতে মুসলমানদের মনোবলে, সামষ্টিক অবস্থায় এবং পারিপার্শিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে নবীজীবনের যে ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করলে এ অগ্রগতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ অগ্রগতি অত্যন্ত মূল্যবান। এর দ্বারা মুসলিম জাতি

www.pathagar.com

কোরআনের শিক্ষা ও নবীর প্রশিক্ষণ দ্বারা কতো লাভবান হয়েছিলো এবং তা তাদের জীবনে কতোবড় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার ও পরিবর্তন সাধন করেছিলো তা বুঝা যায়। এই অগ্রগতি থেকে বুঝা যায়, যারা মানবীয় সংগঠনে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে, তারা কিভাবে অটুট মনোবল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সংগঠনে কিছু লোকেরা দুর্বলতা, অপরিপক্কতা, অতীতের জড়তা ও পশ্চাদপদতা, পার্থিব স্বার্থের মোহ এবং রক্ত মাংসের সৃষ্ট দুর্বলতা দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না এবং তাদের মনোবল ভেংগে যায় না। সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব উপসর্গ খুবই শক্তিশালী ও প্রবল থাকে। কিন্তু অব্যাহত চেষ্টা সাধনা, বিচক্ষণতা এবং ধৈর্যের সাথে প্রতিকার ও নিরাময়ের চেষ্টা চালালে অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। ক্রমাগত দুর্ভোগ পোহানো এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে আরো নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করে। এতে করে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং যাবতীয় দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। মন উচ্চতর মার্গে উন্নীত হতে থাকে এবং আলোকিত পরিবেশে আল্লাহর নূরের সাক্ষাৎ পায়। কেননা আমাদের জন্যে আল্লাহর নবীর জীবনে রয়েছে সুন্দর আদর্শ এবং কোরআনের বিধানে রয়েছে নির্ভুল ও সোজা সরল পথ।

সূরা আল হুজুরাত

মাত্র আঠারোটি আয়াতে সমাপ্ত এই সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আইনগত বিধি-বিধানের বেশ কিছু প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বিশ্বজগত এবং মানুষ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। সেই তথ্যগুলো মানুষের মনমগযে এক সুদূরপ্রসারী দিগন্ত তুলে ধরে, মানুষের হৃদয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকে উচ্চকিত করে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার নিয়ম-বিধি, বিকাশ ও পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর আইন ও বিধানের বহু মূলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে। এ সব মূল্যবান বিষয় আলোচনার ফলে সূরাটির আকৃতি তার আয়াত সংখ্যার তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূরাটি আমাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা গবেষণার আহবান জানায়।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি এই সূরা অধ্যয়নের সময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এই যে, এটি একটি পূর্ণাংগ মহৎ, উদার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল সমাজের বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করে। যে স্বতন্ত্র বিধি-বিধান, নীতিমালা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই সমাজটি গড়ে ওঠে, যে বিধিমালা এ সমাজের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, সেই বিধিমালা ও নীতিমালা এই সূরায় আলোচিত হয়েছে। এ সমাজ শুধু সমাজ নয়, একটি স্বতন্ত্র জগত বা একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। এ বিশ্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আল্লাহর উদ্যোগেই আবির্ভূত এবং আল্লাহরই অনুগত। এ জগত ও এ সমাজের অধিবাসীদের হৃদয় নির্মল, আবেগ-অনুভূতি পরিচ্ছন্ন এবং ভাষা ও ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও সংযত। এ সমাজের মানুষ আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রসূল (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন, অন্যের সম্মান ও মর্যাদার রক্ষক এবং নিজের চিন্তায় ও চালচলনে

www.pathagar.com

নিয়মানুবর্তী। সেই সাথে এ সমাজ স্বীয় শৃংখলা রক্ষায় ও স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণে নিজস্ব আইন-কানুনের অনুসারী যা উপরোক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি থেকেই উদ্ভূত। ফলে এ সমাজের ভেতর ও বাইর পরস্পরে সুসমন্বিত, এর আইন-কানুন ও আবেগ-অনুভূতি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এর বিধিসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ এবং এর চেতনা-অনুভূতি ও বাস্তব পদক্ষেপ পরস্পরে একাত্ম। এরূপ পরিপূর্ণ সমন্বয় ও একাত্মতা সহকারে এ সমাজ আল্লাহর প্রতি অনুরাগী ও আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান। এ সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র বিবেকের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা-আবেগ-অনুভূতির পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভরশীল নয়। অনুরূপ তা শুধুমাত্র আইন, শাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপরও নির্ভরশীল নয়। বরং উভয়টির সুষ্ঠু সমন্বয়ের ওপরই নির্ভরশীল। এ সমাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চেতনা ও সাধনা অথবা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ম-বিধি ও পদক্ষেপসমূহের ভিত্তিতে গঠিত হয় না ও টিকে থাকে না। বরং এ সমাজে রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ই পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

এ সমাজ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর বাণীর বাহক রসূল (স.)-এর সামনে বান্দার তৎপরতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত এ সূরার প্রথম আয়াতেই লক্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করো না। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সাবধান হও। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন।' অর্থাৎ কোনো আদেশ বা নিষেধ জারী করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সীমা অতিক্রম করা কোনো মোমেন বান্দার পক্ষে সংগত নয়। কোনো রায় দান বা ফয়সালা ঘোষণার বেলায়ও তাঁর সামনে অনাহূতভাবে স্ব-উদ্যোগে কোনো প্রস্তাব পেশ করা বৈধ নয়। তিনি যা আদেশ করেন বা যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা লংঘন করাও বৈধ নয়। আল্লাহর মোকাবেলায় নিজের কোনো মত বা ইচ্ছা পোষণ করাও জায়েয নেই। আল্লাহর ভয়, লজ্জা ও আদব তথা সম্মানের তাগিদেই এই অগ্রণী হওয়ার মনোভাব তাকে ত্যাগ করতে হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, রসূল (স.)-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও বিশেষ আদব মেনে চলতে হবে। যেমন দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিও না।..... পাছে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎ কাজগুলো বাতিল হয়ে না যায়। .... আল্লাহ তায়ালা দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।'

এ সমাজের আরো একটা বৈশিষ্ট এই যে, এ সমাজের কারো কথা ও কাজ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। আর এই নীতিও আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত। এ ছাড়া আল্লাহর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কোনো কাজ না করা এবং কোনো অনাহূত প্রস্তাব না দেয়ার বাধ্যবাধকতা তো রয়েছেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার তদন্ত করো ও নিশ্চিত হও.....।'

www.pathagar.com

এই সমাজে যে সব কলহ, কোন্দল সংঘটিত হয় এবং যার মীমাংসা না করলে সমাজে বিভেদ-বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান। যে পদক্ষেপ দ্বারা এই সব কলহ-কোন্দলের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা হয়, তার ভিত্তি হলো মোমেনদের মধ্যকার সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও মীমাংসার নীতি এবং আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সন্তোষ কামনা করার নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মোমেনদের দুই দল যদি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের বিবাদ মিটিয়ে দাও ..... ।'

এ সমাজে পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে কিছু মনস্তাত্ত্বিক রীতিনীতি রয়েছে। পরস্পরের সাথে আচরণেরও কিছু নীতিমালা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! কোনো গোষ্ঠীর উচিত নয় অপর কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রূপ করা ..... ।'

এ সমাজ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিচ্ছন্ন মনোভাব পোষণকারী। এখানে প্রত্যেকের সম্মান নিরাপদ। কেউ কারো অসাক্ষাতে নিন্দা করে না, কেউ নিছক ধারণার বশে কাউকে অভিযুক্ত করে না, কারো নিরাপত্তা, সম্মান ও ব্যক্তি স্বাধীনতা একেবারেই ক্ষুণ্ন হয় না। এরশাদ হচ্ছে, 'হে মোমেনরা, তোমরা বেশী ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো ..... ।'

এ সমাজে মানব জাতির ঐক্যের পূর্ণাংগ ও পরিপক্ব ধারণা বিদ্যমান এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নিখুঁত ও নির্মল মানদন্ড নির্দিষ্ট রয়েছে, যা দিয়ে সে সকল মানুষের মূল্যায়ন করে এবং বহু জাতিক মানব সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করে। এরশাদ হয়েছে, 'হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি..... আল্লাহর চোখে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'

উল্লেখিত নির্মল, নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ও মহৎ সমাজের বড় বড় বৈশিষ্টের উল্লেখ করার পর সূরাটি এবার ঈমানের আলামতসমূহ নির্দেশ করছে। আর এই ঈমানের নামেই মোমেনদেরকে উল্লিখিত সমাজ গঠনের ডাক দেয়া হয়েছে। এজন্যে কয়েকবারই 'হে মোমেনরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধন প্রত্যেক মোমেনের কাছে এতো প্রিয় যে, এর কারণে তার কাছে ইসলামের জন্যে যে কোনো কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হযে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বেদুইনরা বলেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি .....আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে জ্ঞানী।'

সবার শেষে সূরায় যে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে, তা এই যে, ঈমান আল্লাহর একটা বিরাট বড় অনুগ্রহ, যারা এর যোগ্য, তিনি তাদেরকেই এই অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, বলে কৃতিত্বের দাবী করে। তুমি বলে দাও, ... বরং আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন সে জন্যে তিনিই কৃতিত্বের দাবীদার ..... ।'

www.pathagar.com

সূরায় দ্বিতীয় যে বৈশিষ্টটি সূরাটি অধ্যয়ন ও এর আনুষংগিক ঘটনাবলী পর্যালোচনাকালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে, কোরআনের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে এবং রসূল (স.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মহৎ সমাজ গঠনের জন্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও অপ্রতিহতভাবে অত্যন্ত জোরদার ও আপোসহীন চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভূত হয়েছিলো এবং চালু ছিলো। সুতরাং ইসলামের কাংখিত এই সমাজ ও এই বিশ্ব কোনো অবাস্তব আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

ইতিহাসের কোনো এক যুগে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ সমাজটি আকস্মিকভাবে ও রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন একটি গাছের বীজ সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করার পর বিরাট গাছে পরিণত হয়। এ জন্যে গাছের পেছনে অনেক দীর্ঘ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতেও বহু দিনের ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই সমাজকে তার আমানত বহনের জন্যে মনোনীত করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন। সেই যুগের সেই প্রজন্মের মধ্যে এ কাজের যোগ্যতা নিহিত ছিলো এবং সেই সময়কার পরিস্থিতি ও পরিবেশে এ কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন। এ সব উপাদানের সম্মিলন ঘটার কারণেই সেই অতুলনীয় সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো।

সূরা আর রাহমান

এই মক্কী সূরার একটা বিশেষ বাচনভংগি লক্ষ্য করা যায়।[১] মহাবিশ্বের মুক্ত অংগনে এটি একটি সার্বজনীন ঘোষণা এবং আল্লাহর অতুলনীয় নেয়ামতরাজির একটি পরিচিতি বিশেষ। আল্লাহর এই নেয়ামতরাজি যে জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁর চমকপ্রদ ও অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি নৈপুণ্য, তাঁর নতুন নতুন ও অভিনব সৃষ্টি বৈচিত্র্য, তাঁর অব্যাহত ও অফুরন্ত অবদানসমূহ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের তাঁর প্রতি সবিনয় আনুগত্য ও অভিনিবেশ। এই সূরায় গোটা বিশ্বজগতকে জ্বিন ও মানুষ এই দুই জাতির ওপর সাক্ষী রাখা হয়েছে, এই দুই জাতিকে সমভাবে এই সূরায় সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সম্মুখে প্রকাশ্যে বার বার প্রতিটি নেয়ামত বা অবদানের বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানুষ উভয়কে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামতগুলো অস্বীকার করার স্পর্ধা তাদের আছে কিনা। আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহ চ্যালেঞ্জের আওতায় শুধু যে গোটা সৃষ্টিজগত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়; বরং আখেরাতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১. কেউ কেউ একে মদীনায় অবতীর্ণ এবং কেউ কেউ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা মনে করেন। আমি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার মতটিকে অগ্রগণ্য করে করি। কারণ সূরাটির বাচনভংগি ও ভাষাগত বিন্যাসে মক্কী সূরার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে এর শাব্দিক বিন্যাস সূরা আর রাদের মতো।

www.pathagar.com

সূরার গোটা কাঠামোতে, এর তাৎপর্যময় বিরতিতে এবং উচ্চতর ও সুদূরপ্রসারী ধনাত্মক বিস্তৃতিতে উক্ত ঘোষণার সুর ঝংকৃত। ঘোষণা ও পরিচিতি দানের সুর মূর্তমান হয়ে ওঠেছে সূরাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূচনাতেও। একটি মাত্র শব্দ 'আর রাহমান' দিয়ে এমন ভংগিতে সূরাটির সূচনা করা হয়েছে যে, শ্রোতা এর পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্যে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। 'আর রাহমান' একটি মাত্র শব্দ, যার অর্থের মধ্যে রয়েছে দয়া, কৃপা ও করুণা, আর যার ধ্বনিতে রয়েছে ঘোষণার সুর। এই সূচনার পরেই সমগ্র সূরা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর দয়া ও কৃপার বিবরণ এবং দয়াময়ের নেয়ামত ও অবদানসমূহের উপস্থাপনা।

আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের বিবরণ শুরু হয়েছে কোরআন শিক্ষাদানের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। এভাবে কোরআন শিক্ষাদানকে মানব জাতির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এটিকে স্বয়ং মানুষের সৃষ্টি এবং তাকে বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানেরও আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনের শিক্ষাদানজনিত অবদানের পরই উল্লেখ করা হয়েছে মানব সৃষ্টি ও মানুষকে সবচেয়ে বড় মানবীয় গুণ বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানের বিষয়টি। এরপর একে একে এসেছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তরুলতা, সুউচ্চ আকাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত দাঁড়িপাল্লা, পৃথিবী ও তার পৃষ্ঠে উৎপন্ন ফল, ফুল, খেজুর ও ফসলাদি, জ্বিন, মানুষ, দুই উদয়াচল, দুই অস্তাচল, দুই সমুদ্র, যার মাঝখানে অলংঘনীয় ব্যবধান রয়েছে, সমুদ্রের মধ্য থেকে নির্গত মূল্যবান রত্নরাজি এবং তার ওপর দিয়ে চলাচলকারী নৌযানসমূহের বিবরণ।

এ সব প্রধান প্রধান নিদর্শনের উল্লেখের পর উপস্থাপিত হয়েছে এই গোটা সৃষ্টির সার্বিক ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। আর গোটা সৃষ্টির ধ্বংসের পর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান স্রষ্টা আল্লাহর অম্লান অক্ষয় সত্ত্বাকে দেখানো হয়েছে। তাঁরই স্বাধীন সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে গোটা সৃষ্টি বিনয়াবনত ও আত্মসমর্পিত।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের চূড়ান্ত ধ্বংস ও স্রষ্টার চিরঞ্জীব চির অক্ষয় থাকার বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানব জাতিকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছে ভীতিপ্রদ হুমকি ও মহাজাগতিক চ্যালেঞ্জ।

'ওহে দুই জাতি (জ্বিন ও মানব), অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে যাবো, ... হে জ্বিন ও মানব জাতি, তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমারেখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে থাকো, তবে অতিক্রম করো। বিশেষ ক্ষমতা ব্যতীত কখনো অতিক্রম করতে পারবে না।'

এরপর থেকে দেখানো হয়েছে সৃষ্টিজগতের ধ্বংস তথা কেয়ামতের দৃশ্য। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের আকারে তা দেখানো হয়েছে। আকাশের দৃশ্যকে একটি লাল তরল পদার্থের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে অপরাধীদের আযাবের দৃশ্য এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহভীরুদের উত্তম প্রতিদানের। অবশেষে এই বলে নেয়ামতের বিবরণের উপসংহার টানা হয়েছে, 'তোমার মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুর নাম কল্যাণময় হোক।'

www.pathagar.com

গোটা সূরাই যে বিশাল সৃষ্টির উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বিবরণ ও ঘোষণা স্বরূপ, তা আগেই বলেছি। মহান আল্লাহর সুউচ্চ দরবার থেকেই এ ঘোষণা এসেছে। এ ঘোষণায় গোটা সৃষ্টিজগত প্রতিধ্বনিত হয় এবং সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণী ও বস্তু তা প্রত্যক্ষ করে থাকে।

সূরা আল হাদীদ

এই সূরাটি সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে আহবান জানায় যে, যে ইসলামের প্রতি সে ঈমান এনেছে, তা যেন তার নিজ জীবনে পরিপূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করে। মহান আল্লাহর আহবানে যে মহাসত্যের প্রতি সে একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছে, তার পথে সে যেন আর কোনো কার্পণ্য না করে এবং কোনো বাধাবিপত্তি না মানে। জান হোক বা মাল হোক, অন্তর্দ্বন্দ্ব হোক বা মনের কোণে লুকানো কোনো চিন্তা ভাবনা হোক, কোনো কিছুই যেন তার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। আল্লাহর এই দ্বীন হচ্ছে সেই মহাসত্য, যা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করে। আল্লাহর মানদন্ডই তার মানদন্ড হয়ে যায় এবং যে মূল্যবোধ দ্বারা সে গৌরব বোধ করে এবং যে মূল্যবোধ অর্জন করার জন্যে সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তা হয় আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধই তার দাঁড়িপাল্লায় সর্ব সময় ভারী হয়ে থাকে। এই মহাসত্যই মানুষের মন মগযে আল্লাহর অস্তিত্ব উৎকীর্ণ করে দেয়। ফলে তার মন আল্লাহর স্মরণে বিগলিত ও প্রকম্পিত হয় এবং তা আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের পথে সকল বাধা ডিংগাতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এ সূরা মুসলিম জাতিকে আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার আহবান জানায়। যথা, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন তা ব্যয় করো। ..... তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।'

অনুরূপভাবে এই সত্যের আলোকেই মুসলিম জাতিকে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবার এবং আল্লাহ তায়ালা যে সত্য নাযিল করেছেন তার প্রতি অনুগত হবার আহবান জানায়। যাতে ঈমানের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিনয় ও আনুগত্য তাকে আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'মোমেনদের কাছে সেই সময়টি কি আসেনি, যখন আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত ও বিনয়ী হবে .....?'

অনুরূপভাবে এ সূরায় সত্যের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে দুনিয়ার মূল্যবোধ, অপরদিকে আখেরাতের মূল্যবোধকে রেখে কোন্‌টি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য তা বেছে নেয়ার জন্যে এবং যেটি চিরস্থায়ী তা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা, সাজসজ্জা, পারস্পরিক দম্ভ, ধনজনের

www.pathagar.com

আধিক্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয় ... আল্লাহ তায়ালা বিপুল অনুগ্রহের অধিকারী।'

সূরার বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যদিও এতে ইসলামের চিরন্তন ও সাধারণ দাওয়াতই প্রতিফলিত হয়েছে, তথাপি এর পাশাপাশি এতে এই সূরার অবতরণকালীন সময়কার মদীনার মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী ৪র্থ বছর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় পর্যন্তকার অবস্থা এই আলোচনার আওতাধীন।

এই সমাজে একদিকে ছিলো আনসার এবং মোহাজেরদের ন্যায় তেজোদ্দীপ্ত মুসলমানদের দল, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সকল লোভ লালসা ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সর্বাত্মক আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে জান ও মাল আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়ে মানবেতিহাসের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অপরদিকে এই অতুলনীয় মানবগোষ্ঠীর পাশাপাশি এমন একটি গোষ্ঠীও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ছিলো, যাদের ঈমান অতোটা উন্নত, উৎকৃষ্ট ও একনিষ্ঠ পর্যায়ের ছিলো না। বিশেষত মক্কা বিজয়ের পর যখন ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, তখন মুসলিম সমাজে এমন একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিলো, যারা ঈমানের মহাসত্যকে ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেনি এবং সেভাবে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করেনি যেমন করেছিলো বিজয় পূর্বকালে ঈমান আনয়নকারী একনিষ্ঠ মুসলমানরা।

বিজয়োত্তর কালের এই মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর পথে জান ও মালের ত্যাগ স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন ছিলো এবং পার্থিব জীবনের রূপসৌন্দর্যের মোহ তাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো। ফলে তারা দুনিয়ার আকর্ষণ ও প্রলোভনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারতো না।

সূরা হাদীদ এই গোষ্ঠীটিকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রেরণা যোগায়। ঈমানের এই পর্যায়ে উন্নীত হলে দুনিয়ার মোহ কাউকে আপন বেড়াজালে আটকে রাখতে পারে না এবং কোনো বাধাই তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

এই উভয় গোষ্ঠী থেকে পৃথক আরো একটা গোষ্ঠী ছিলো মদীনায়। তারা হচ্ছে মোনাফেক গোষ্ঠী। এরা চিহ্নিত ছিলো না। মুসলমানদের সাথে মিলে-মিশে থাকতো। বিশেষত ইসলামের বিজয় লাভের পর তারা গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো। অথচ তাদের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। যথারীতি তাদের মন ছিলো দোমুখো। তারা ছিলো সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী আর মুসলমানদের দুর্যোগ দুর্বিপাক প্রত্যাশী। কেয়ামতের দিন যখন এরা চিহ্নিত ও পৃথক হতে বাধ্য হবে এবং গা ঢাকা দেয়ার আর কোনো সুযোগ পাবে না, তখন তাদের কী পরিণতি হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে পর পর তিনটি আয়াতে, 'যেদিন তুমি মোমেন পুরুষ ও নারীদের দেখবে তাদের জ্যোতি তাদের সামনে দিয়ে ও ডান দিক দিয়ে ছুটতে থাকবে .....।'

www.pathagar.com

এ ছাড়া যে ইহুদী ও খৃষ্টান জনগোষ্ঠী তখনো আরব উপদ্বীপে অবশিষ্ট ছিলো, তাদের প্রতিও এই সূরায় ইংগিত করা হয়েছে। তাদের তৎকালীন ভূমিকা, আচরণ ও হালচালের কথা এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের তাদের মতো না হওয়ার জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ইংগিত খুব সম্ভবত ইহুদীদের প্রতি। সূরার শেষের দিকে একটি আয়াতে খৃষ্টানদের কথাও আলোচিত হয়েছে এবং বৈরাগ্যবাদসহ তাদের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু সূরার সর্বপ্রধান কেন্দ্রীয় বক্তব্য হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঈমান থেকে উদ্ভূত বিনয়, আল্লাহভীতি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ সংক্রান্ত, তাই সে সময়ে মুসলিম সমাজে বিরাজমান অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ব মোমেনদের মনে ঈমান মযবুত করার লক্ষ্যে সূরায় ক্রমাগত আলোচনা চালানো হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের লোকেরা শুধু যে মদীনার মুসলমানদের মধ্যেই ছিলো তা নয়; বরং সকল যুগের মুসলিম সমাজেই থাকে। এ আলোচনা এমন ও কার্যকর বাচনভংগিতে করা হয়েছে, যা মক্কী সূরার বাচনভংগির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যা মন মগযকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

বিশেষভাবে সূরার সূচনাই করা হয়েছে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগিতে। এতে আল্লাহর কতিপয় গুণ মানব হৃদয়ের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ সব গুণ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর একক অস্তিত্ব ও সমগ্র বিশ্বচরাচরে তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌম এবং কর্তৃত্বের পরিচয় দিয়ে মানুষকে তার প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর মানুষের মনের অভ্যন্তরে লুকানো গুপ্তভেদও যে আল্লাহ তায়ালা জানেন, সে কথা ব্যক্ত করে তার প্রতি সকল প্রাণী ও জড় বস্তুর আনুগত্য এবং তার একাদাত উপাসনা করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে একাদিক্রমে ছয়টি আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর এই পরিচিতি ও গুণাবলীর বর্ণনা। যথা, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই গুণগান করে চলেছে আল্লাহর এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত মহা কুশলী। .... এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকানো বিষয়ও অবগত।'

সূরার সূচনাতেই এরূপ বক্তব্য থাকা হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে, এটা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং তার জন্যে জান মালের ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা সংকোচ ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু সূরার পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রচুর আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য রয়েছে। এ সব উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চারকারী বক্তব্য উপরোক্ত উদাত্ত আহবানের মাঝে মাঝে এসেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তা উক্ত আহবানকে জোরদার করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোমেনদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে।' অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে দুনিয়ার জীবন ও তার সহায় সম্পদকে আখেরাত ও তার বড় বড় ঘটনাবলীর সামনে নিতান্ত তুচ্ছ নগণ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আরেক জায়গায় অদৃষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এ বক্তব্য রেখে মানুষের মনকে সেই অদৃষ্টের দিকে আবর্তিত করা হয়েছে, যা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আপদই আসুক, তা পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ..... আল্লাহ তায়ালা অভাবশূন্য স্বতপ্রশংসিত।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে থাকা ও চলা অবস্থায় মানুষের ওপর ভালো বা মন্দ যাই আসুক, তার মন যেন স্থির অবিচল থাকে। খারাপ অবস্থায় বিমর্ষ এবং ভালো অবস্থায় যেন দাম্ভিক না হয়। মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ যাই আসুক, সে যেন কোনো কারণ, পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনাকে আল্লাহর সাথে অংশীদার না বানিয়ে বসে। কেননা, সব কিছুর ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে, সে কথা বিশ্বাস করতে হবে।

সূরাটি স্বীয় আলোচ্য বিষয় নিয়ে দুই পর্যায়ে আলোচনা করেছে। প্রথমটি আমরা এ ভূমিকার শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে সূরার মাঝে বক্তব্য এসেছে, কিন্তু এই দুটো বিষয়ই পরস্পরে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল।

সূরা আল মোজাদ্দালাহ

আমরা এই গোটা সূরাসহ বলতে গেলে প্রায় এই সমগ্র পারাটার মাঝেই মাদানী সমাজে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পাই। দেখতে পাই সদ্যোজাত মুসলিম দলটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, শুধু এই ছোট পৃথিবীতেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বনিখিলে তার সেই ভূমিকা পালনের জন্যে কিভাবে তাকে গড়ে তোলা হচ্ছে, যে ভূমিকা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা আসলেই এক বিরাট ভূমিকা। এই দলটির হৃদয়ে মানবজীবন সম্পর্কে যে পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা জন্মে তা থেকেই এই ভূমিকা পালন করা শুরু হয়। জীবন সম্পর্কে এই পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা এই দলটি অতপর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, যাতে করে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এ ধারণার ভিত্তিতে একটা পূর্ণাংগ জীবন ও চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই ভূমিকাটা এতো বড় যে, তার জন্যে একটা পূর্ণাংগ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

যে মুসলিম দলটিকে মহান আল্লাহ এই বিরাট ভূমিকা পালনের জন্যে তৈরী করছিলেন, সে দলটির লোকগুলো অন্যান্য মানুষের মতো মানুষই ছিলো। তাদের মধ্যে একদল ছিলো সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসার, যাদের ঈমান পরিপক্বতা অর্জন করেছিলো, নতুন আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে তাদের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিলো, এর জন্যে তাদের অন্তরও একনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিজেদের সত্ত্বা ও মহাবিশ্বের বিশাল সত্ত্বার সাথে প্রকৃত পরিচয় তারা জানতে পেরেছিলো। এভাবে তারা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর পরিকল্পনার একটি অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের মন মগযে এ ব্যাপারে কোনো বক্রতা ছিলো না, তাদের গৃহীত কোনো পদক্ষেপই মহান আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে গৃহীত হতো না এবং তাদের

www.pathagar.com

অন্তরে এমন কোনো চিন্তা বা ইচ্ছাও জন্ম নিতো না, যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের সম্পর্কে যে ধরনের বিবরণ দেয়া হয়েছে তারা আসলে সে রকমই ছিলো,

'তুমি আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের বিরোধী কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে এমন দেখতে পাবে না, এমনকি সে যদি তাদের মা বাবা, ছেলে মেয়ে, ভাই বোন অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হয় তবুও নয়। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান অংকন করে দিয়েছেন .....।' (শেষ আয়াত)

কিন্তু ঈমান আনয়নে অগ্রণী এসব লোক পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর তুলনায় ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, বিশেষত ইসলাম একটা শক্তিতে পরিণত হবার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সময়ে এটা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে এমন লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, যারা ইসলামী শিক্ষাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করেনি এবং ইসলামী পরিবেশে দীর্ঘকাল জীবন যাপনও করেনি। কিছু কিছু মোনাফেক শ্রেণীর লোকও এই সময়ে ইসলামে প্রবেশ করে, যাদের অন্তরে ইসলাম অতোটা শেকড় গাড়েনি, যতোটা শেকড় গেড়েছিলো স্বার্থপ্রীতি, নিরাপত্তাপ্রীতি, সুযোগসন্ধানী মানসিকতা। মুসলিম শিবির ও তৎকালীন শক্তিশালী মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কে দোদুল্যমানতা, স্থীতিহীনতা ও নমনীয়তা সৃষ্টির কুমতলব যতোটা মযবুত ছিলো তাদের ঈমান ততোটা মযবুত ছিলো না।

সমগ্র সৃষ্টিজগতে এই মুসলিম জাতির জন্যে যে ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছিলো, সে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রস্তুত করা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিলো বহুমুখী চেষ্টা সাধনার, সুদীর্ঘ ধৈর্যের এবং ছোট বড়ো প্রত্যেক সমস্যার সঠিক সমাধানের। এ উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিলো মানুষ গড়া ও চরিত্র গড়ার সেই বিরাট আন্দোলন, যা ইসলাম ও রসূল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ আন্দোলন সেসব চরিত্রবান মানুষ গড়ে তুলেছিলো, যারা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যারা আল্লাহর বিধান বুঝবে ও বাস্তবায়িত করতে পারবে। যারা তাকে পৃথিবীর সর্বত্র বাস্তবায়িত করবে, একে শুধু বই পুস্তকের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখবে না, কিংবা তা নিয়ে শুধু গলাবাজি করেই ক্ষান্ত হবে না।

এই সূরাসহ সমগ্র পারা জুড়ে আমরা সেই বহুমুখী চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের কিছু নমুনা দেখতে পাই। দেখতে পাই সেই মহান মানুষগুলোকে তৈরী করা ও বিভিন্ন রকমের ঘটনা, আদত অভ্যাস, রীতি নীতি, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ঝোঁকপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোরআনের পদ্ধতি। আর ইসলামের নানান রকমের শত্রু মোশরেক, ইহুদী ও মোনাফেকদের সাথে ইসলামের যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে আসছে, তারও কিছু অংশ আমরা এখানে দেখতে পাই।

বিশেষত এই সূরায় আমরা সদ্য আবির্ভূত মুসলমান দলটির প্রতি মহান আল্লাহর অসাধারণ কৃপা ও যত্নের একটা প্রতিফলন দেখতে পাই। মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

স্বয়ং তাকে চোখে চোখে রেখে গড়ে তুলেছেন, নিজের বিধানের আলোকে তাকে প্রতিপালন করেছেন, তার মনমগযে এরূপ চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার ছোটো বড়ো গোপন প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে সর্বদা তার সাথে সাথে রয়েছেন, তাকে তার শত্রুদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে চলেছেন, তার স্বভাব চরিত্র, আদত অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যাতে তারা গোটা পৃথিবীতে আল্লাহর পতাকা উত্তোলনের যোগ্য হয়।

এ কারণেই অত্যন্ত চমকপ্রদ ভংগিতে সূরাটার সূচনা হয়েছে। মূলত এ সময়টা ছিলো মানবেতিহাসের একটা বিরল যুগ। এ যুগে মহান আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতভাবে সংযোগ রক্ষা করা এবং একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের একটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করেছিলো..... নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।' (আয়াত-১)

এখানে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ তায়ালা একটা নগণ্য দরিদ্র ও সাধারণ ক্ষুদ্র পরিবারের একটি সমস্যা আল্লাহর সরাসরি সমাধান করছেন। মহিলাটি রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন। অথচ তার কাছে থেকেও হযরত আয়শা (রা.) তা শুনতে পাচ্ছিলেন না! এটা আসলে এমন এক দৃশ্য, যা আল্লাহর উপস্থিতি, নৈকট্য, স্নেহ ও অভিভাবকত্বের অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে পরিপ্লুত করে দেয়।

এর পরেই খুব জোরের সাথে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর আশ্রয় লাভকারী মুসলমানদের চরম শত্রু। তাদের ওপর ইহকালেও থাকবে আল্লাহর আক্রোশ ও অভিশাপ, আর পরকালেও তারা অপমানজনক শাস্তি পাবে। তারা নিজেরা তাদের অপকর্ম ও পাপাচার ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা গুনে গুনে লিখে রেখেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই দেখেন।

তারপর প্রত্যেক গোপন পরামর্শের সময়েও যে আল্লাহ তায়ালা সেখানে উপস্থিত থাকেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে যে, সেখানে তারা ছাড়া কেউ নেই। অথচ তারা যেখানেই থাকে, আল্লাহ তায়ালা সেখানেই তাদের সাথে থাকেন। 'অতপর তিনি কেয়ামতের দিন তাদের জানিয়ে দেবেন তারা কী করেছে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।' বস্তুত এ আয়াতেও এমন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব, সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, তদারকী ও খবরদারী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে।

এই হুশিয়ারী আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। এ দ্বারা তাদের মনে উদ্বেগ ও ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোপন দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গেছে। আল্লাহর

www.pathagar.com

চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারেনি। পাপকার্য, যুলুম অত্যাচার, রসূল (স.)-এর অবাধ্যতার লক্ষ্যে তাদের সমস্ত গোপন তৎপরতা ও পরিকল্পনা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা এসবের জন্যে তাদের পাকড়াও করবেন ও শাস্তি দেবেন। তিনি মুসলমানদের নিষেধ করেছেন, তারা যেন ভালো কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে গোপন সলাপরামর্শ না করে।

এরপর এই মোমেনদের প্রশিক্ষণ দেয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে, রসূল (স.)-এর বৈঠকে, অন্যান্য এলেম ও যেকেরের বৈঠকে তাদের ভদ্রতা, সুশীলতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলা ও প্রশ্ন করার আদবও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য ও সম্মান বজায় রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এরপরও সূরার অবশিষ্টাংশ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে দহরম-মহরম পাতানো ও তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র পাকানো মোনাফেকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মোনাফেকী ও অপতপরতাকে মিথ্যাচার ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। আখেরাতেও তারা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে কিন্তু তা উভয়ক্ষেত্রেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং হবে। সেই সাথে এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বাপেক্ষা অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে লিখে দেবেন। তিনি এও লিখে রাখবেন যে, তিনি ও তাঁর রসূলরাই বিজয়ী হবেন। এ কথা দ্বারা মূলত মোনাফেকদের অপমানিত করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো মুসলমান তাদের মর্যাদাশালী মনে করতো। তাই তারা তাদের সাথে কিছুটা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করতো। অথচ মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহর অভিভাবকত্ব দ্বারা সম্মানিত ও শক্তিমান বোধ করা উচিত। আল্লাহর প্রিয় বান্দা এই মুসলমানদের আল্লাহর প্রহরাধীন থাকতে পেরে নিশ্চিন্ত থাকার গুরুত্ব কতো তা তারা উপলব্ধি করে না। সূরার শেষাংশে আল্লাহর দল হিসেবে মুসলমানদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে। এ ভাবমূর্তি হচ্ছে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসারদের। তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে শেষ আয়াতটিতে–

'তুমি দেখতে পাবে না আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের বিরোধী কোনো লোকের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে.....।'

সূরা আল হাশর

এই সূরাটা নাযিল হয়েছিলো ৪র্থ হিজরীতে বনু নযীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বনু নযীর ছিলো একটা ইহুদী গোত্র। বনু নযীরের ঘটনাটা কেন কিভাবে ঘটলো এবং এরপর মুসলমানরা তাদের মোকাবেলায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এ সূরায় তাঁর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোরআনের বর্ণনাভংগিতেই এ বিষয়গুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতপর ঘটনাবলী ও তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ওপর

www.pathagar.com

কোরআনের সেই নির্দিষ্ট ভংগিতে বিস্তারিত পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে। ঘটনা ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনাগুলো সুন্দর পর্যালোচনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সেই দলটিকে কোরআন এভাবে প্রাণবন্ত প্রশিক্ষণ দিতো।

সূরার মূল আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমরা সেই ঘটনার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরবো, যার প্রসংগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এভাবে আমরা এখানে কোরআনের উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবো। দেখতে পাবো, যে ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এটা নাযিল হয়েছে তার অন্তরালে কী সুদূরপ্রসারী কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। এভাবে ঘটনাবলীর তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর পরিমন্ডলে তার বিস্তৃতি কতো দূর তা নিয়ে কোরআনের আলোচনার বিশিষ্ট ধরন ও রীতি আমরা হৃদয়ংগম করতে পারবো।

বনূ নযীরের ঘটনাটা চতুর্থ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন রসূল (স.) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা.)-সহ দশ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনু নযীরের পল্লীতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাদের অনুরোধ করেন যে, তাঁর মদীনায় আগমনের সূচনাতে তাঁর সাথে বনু নযীরের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো, সে অনুসারে তারা যেন নিহত ব্যক্তিদের দিয়াতে (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) অংশগ্রহণ করে। বনু নযীর রসূল (স.)-এর আগমনকে বাহ্যত স্বাগত জানায় এবং তাদের ওপর যে দায়দায়িত্ব বর্তে তা পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এর পাশাপাশি তারা গোপনে রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তিনি যখন তাদের একজনের বাড়ীর প্রাচীরের পাশে বসে ছিলেন, তখন তারা পরস্পরকে বলে, এই ব্যক্তিকে তোমরা এমন সুবিধাজনক অবস্থায় আর কখনো পাবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ এই প্রাচীর সন্নিহিত বাড়ীটির ছাড়ের ওপর ওঠে গিয়ে ওর ওপর বড়ো এক পাথর ছুঁড়ে মারুক এবং আমাদের তার কবল থেকে রেহাই দিক। আমর বিন জাহশ এই দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং বললো, হাঁ, এ কাজটা আমি করবো। তারপর সে ছাদের ওপর উঠলো। ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তৎক্ষণাত রসূল (স.)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। সংগে সংগে তিনি একটা জরুরী কাজ সেরে আসার ভান করে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হচ্ছে বলে সাথীরাও তাঁর সন্ধানে ইহুদী পল্লী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে তারা জানতে পারলো যে, রসূল (স.) মদীনায় প্রবেশ করেছেন।

বনূ নযীরের বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর রসূল (স.) বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইতিপূর্বে বনু নযীরের নেতা কাব ইবনে আশরাফ রসূল (স.)-কে নিন্দা করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে তার শত্রুদের উস্কানি দিয়ে কবিতা লিখেছিলো। তাছাড়া একথাও লোক মুখে প্রচারিত হয়েছিলো যে, রসূল (স.)-এর সাথে বনু নযীরের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার চুক্তি থাকা সত্তেও বনু নযীরের লোকেরা দলে দলে

www.pathagar.com

গিয়ে কোরায়শ কাফেরদের সাথে যোগাযোগ ও সলাপরামর্শ করছে। রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও গাঁটছড়া বাঁধাই ছিলো এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য। এসব কারণে রসূল (স.) মোহাম্মদ বিন মাসলামাকে অনুমতি দিলেন কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার, অনুমতি পেয়ে মোহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে ফেললেন।

বনু নযীরের মহল্লায় যখন রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, তখন তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা ছাড়া রসূল (স.)-এর আর কোনো উপায়ান্তর থাকলো না। কেননা ইসলামের একটা মূলনীতি হলো, 'কোনো দলের পক্ষ থেকে যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো, তাহলে চুক্তিটা তাদের ওপর একইভাবে ছুঁড়ে মারো। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।' (সূরা আত তাওবা)

রসূল (স.) যথারীতি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বনু নযীরের মহল্লা অবরোধ করলেন। তাদের তিনি তিন দিনের– মতান্তরে দশ দিনের চরম পত্র দিলেন যেন এই সময়ের মধ্যে তারা তাদের মহল্লা ছেড়ে চলে যায়। তিনি তাদেরকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাওয়া এবং ক্ষেতখামার ও বাগানগুলোর দেখাশুনার জন্যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে প্ররোচনা দিলো যেন তারা রসূলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে তাকে প্রতিরোধ করে। সে তাদের আশ্বাস দিলো যে, তোমরা অবিচল অনড় থাকো। আমরা তোমাদের কখনো অসহায় ছেড়ে দেবো না। তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা তোমাদের পক্ষে লড়বো, আর তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন,

'তুমি কি দেখোনি, মোনাফেকরা তাদের আহলে কেতাব কাফের ভাইদের বলে যে, তোমাদের যদি বের করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আর কারো হুকুম মানবো না, আর যদি তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। অথচ আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি বের করে দেয়া হয়, তবে মোনাফেকরা তাদের সাথে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে না। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি যুদ্ধ করতে হয় তবে তাদেরকে মোনাফেকরা সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করে তাহলেও আহলে কেতাব গোষ্ঠী পরাভব মেনে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা আর কোনো সাহায্য পাবে না। তাদের মনে আল্লাহর চেয়েও তোমাদের ভয় অধিক প্রবল। কেননা তারা একটা নির্বোধ জাতি।'

এরপর ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নিলো। ফলে রসূল (স.) তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে আহলে কেতাব গোষ্ঠী বললো, হে মোহাম্মদ, আপনি তো অরাজকতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করতেন এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীর নিন্দা করতেন। এখন এই যে খেজুর বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে ও জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, এটা কেমন ব্যাপার? তাদের এই প্রশ্নের জবাবেই

www.pathagar.com

সূরা হাশরের আয়াত নাযিল হলো, 'তোমরা যদি কোনো গাছ কেটে থাকো অথবা তাকে তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়ে থাকো, তবে সেটা আল্লাহর হুকুমেই করেছো, যাতে তিনি পাপিষ্ঠদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।'

অবরোধ যখন একটানা ছাব্বিশ দিন পর্যন্ত গড়ালো, তখন ইহুদীরা নিশ্চিত হলো যে, মোনাফেকদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরি হবার কোনো আশা নেই। এ সময় আল্লাহ তায়ালাও তাদের মনে আতংকের সৃষ্টি করে দিলেন। তাই তারা রসূল (স.)-এর কাছে প্রার্থনা জানালো যেন তিনি রক্তপাত না করে তাদের বিতাড়িত করেন, যেমন ইতিপূর্বে অপর ইহুদী গোষ্ঠী বনু কায়নুকা'কে করেছেন (এর কারণ ও পটভূমি সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে)। তারা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, তাদের উট যে পরিমাণ বইতে পারবে কেবল সেই পরিমাণ মালপত্রই তারা নেবে। কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেবে না। রসূল (স.) তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারা উটের বহনযোগ্য পরিমাণ মালপত্র নিয়ে চলে গেলো। কেউ কেউ দরজার চৌকাঠসহ গোটা ঘর ভেংগে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে গেলো। কেউ নিজের ঘর এমনভাবে বিধ্বস্ত করে গেলো, যাতে মুসলমানরা তা ব্যবহার করতে না পারে। অবরোধ চলাকালে যেসব প্রাচীর আত্মরক্ষার কাজে লাগানো হয়েছিলো, তার কোনো কোনো প্রাচীর মুসলমানরা পরে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে এ প্রসংগটি আলোচনা করেছেন। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত এই বনু নযীর ইহুদী গোত্রের কেউ সিরিয়ায় কেউ বা খায়বরে চলে যায়। খায়বরে গমনকারীদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলো সালাম বিন আবিল হাকীক, কেনানা ইবনুর রবী বিন আবিল হাকীক এবং হুওয়াই বিন আখতাব। পরবর্তীকালে আহযাব যুদ্ধ ও বনু কোরায়যার ঘটনায় মক্কার মোশকেরদের মুসলমানদের ওপর হামলা করতে উস্কে দেয়া (সূরা আহযাব দ্রষ্টব্য) এবং খায়বরে যুদ্ধ বাধানোতে (সূরা আল-ফাতাহ দ্রষ্টব্য) এসব লোকের ভূমিকা ছিলো। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের সম্পত্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের ঘোড়া বা উট ব্যবহার করে যুদ্ধ করে এগুলো জয় করতে হয়নি। এগুলো রসূল (স.) কেবল মোহাজেরদের মধ্যেই বণ্টন করেন। আনসারদের মধ্যে দু'জন দরিদ্রতম ব্যক্তি সাহল বিন হানিফ ও আবু দুজানা সাম্মাক বিন খারশাকে ছাড়া আর কাউকে এর অংশ দেয়া হয়নি। কারণ মোহাজেররা মক্কায় তাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ ত্যাগ করে চলে এসেছিলো শুধু ঈমান রক্ষার তাগিদে, আর আনসাররা তাদের ঘরবাড়ী ও জমিজমায় মোহাজের ভাগ দিয়ে নযীরবিহীন ত্যাগ ও আন্তরিক ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পর রসূল (স.) মুসলিম সমাজে স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় ত্বরিত পদক্ষেপ নিলেন, যাতে দরিদ্র লোকদের হাতে নিজস্ব সম্পত্তি থাকে এবং যাবতীয় ধন সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। আনসারদের মধ্যে কেবল দু'জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই তিনি এর ভাগ দিয়েছিলেন। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাটবাটোয়ারা নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তুলেছিলো। প্রসিদ্ধ মতানুসারে এই লোকটি ছিলো মোনাফেক। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় বলেন,

www.pathagar.com

'আল্লাহ তায়ালা যে সম্পত্তি তার রসূলকে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা উট ও ঘোড়া ছুটাওনি, তবে আল্লাহ তার রসূলকে যার ওপর বিজয়ী করতে চান করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।' রসূল (স.) আনসারদের বললেন, তোমরা যদি চাও, তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর একাংশ মোহাজেরদের বন্টন করে দিতে পারো, আর এই গনিমতে তোমরা তাদের সাথে অংশীদার হতে পারো। আর যদি চাও তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী পুরোপুরি তোমাদেরই থাক এবং গনিমতের কোনো অংশ তোমাদের মধ্যে বন্টন করা হবে না। আনসাররা বললেন, বরং আমরা আমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর অংশও তাদের দেবো এবং গনিমতেও তাদের অগ্রাধিকার দেবো, তাদের সাথে আমরা শরীক হবো না।

এ হচ্ছে সেই ঘটনা যার প্রেক্ষাপটে এ সূরা নাযিল হয়েছে। সমগ্র সূরাই এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত মুসলমানদের সম্বোধন করে সূরার শেষাংশে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনমূলক মন্তব্য করা এবং এ ঘটনাবলীকে তার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের যে ঐতিহ্যবাহী রীতি রয়েছে, সূরার শেষভাগের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সূরার একেবারে শেষাংশে মহান আল্লাহর এমন কিছু গুণাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার কার্যকর প্রভাব এই সৃষ্টিজগতে সর্বক্ষণ বিদ্যমান। এ গুণাবলীর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করার ওপরই সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি সম্বলিত, বোধগম্য ও বিবেকসম্মত ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ গুণাবলী হচ্ছে সেই আল্লাহর, যিনি এই কোরআন দ্বারা ঈমানদারদের সম্বোধন করেন ও তার দিকে আহবান করেন। সূরাটার সূচনা ও সমাপ্তি দুটোই ঘটেছে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের সর্বময় অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশ তার আলোচিত বিষয়ের সাথে এবং তাকওয়া, একাগ্রতা, আনুগত্য ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর বিশ্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা গবেষণার আহবানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়যুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরা আল মোমতাহেনা

এ সূরাটি কোরআনের সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যেগুলো ঈমানী যিন্দেগী, সামাজিক সংগঠন এবং কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঈমানী জীবনের প্রশিক্ষণদানের সুদীর্ঘ শেকলের মধ্য থেকে এ সূরাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়ি, অথবা বলা যায়, উম্মতে মুসলিমার সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে, এ সূরাটিতে সেই শিক্ষা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে এবং বাস্তব একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গোটা মানবজাতিকে সঠিক পথ পেতে সাহায্য করেছে। এই ভাবে আল্ কোরআন সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছে তার থেকে মানব জাতি কখনও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আবার কখনও এ শিক্ষা থেকে সে দূরে

www.pathagar.com

সরে গেছে, কিন্তু আমরা যারা ইসলামকে একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরেছি, তারা সদা সর্বদা এ আশায় বুক বেঁধে রয়েছি যে, একদিন গোটা পৃথিবীর বুকে অবশ্যই এই জীবন ব্যবস্থা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম হবে।

অবশ্যই এক সময়ে এ জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যার ইংগিত সূরাটির শুরুতে দান করা হয়েছে। এ জন্যে ইসলামের সূচনালগ্নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। এই দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং আল্লাহর জানামতেই এসব ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে।

পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান চালু করার ব্যাপারে যে সব মানুষ চেষ্টা সাধনা ও কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকেছে, তাতে কখনও দুঃখ কষ্ট এসেছে, আবার কখনও মানুষ জীবনের নিত্য নতুন স্বাদ লাভ করেছে। তাই সত্যের এই প্রদীপ্ত আলো যখন উদ্ভাসিত করে দেবে গোটা ধরণীকে, তখন ঈমানের নতুন এই চেতনার কারণে অন্য সব কিছু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যাবে এবং ঈমানদারদের দলভুক্ত থাকার জন্যে চমকপ্রদ যে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ করবে। সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই ঈমানী চিন্তাধারা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন ছিলো সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণই মানুষের মনমগয ও প্রকৃতিকে তৎকালীন বিরাজমান সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি ও সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করেছিলো; বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের সকল পাপপূর্ণ চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানের এই মহীয়ান চিন্তার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটে, তারা জীবনের বাস্তবতা থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারে না এবং বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা তারা এড়িয়েও চলতে চায় না; বরং তারা দিনের পর দিন এবং একবারের পর আর একবার নানা প্রকার দুর্ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের কোনো একটি বিষয় ও একটি সৃষ্টির দিকে বার বার ফিরে যেতে হয়, নানা প্রকার প্রভাবপূর্ণ জিনিসের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালাই তো সকল ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি ভালো করেই জানেন সব জিনিসের প্রভাব এক রকম হয় না এবং সৃষ্টির প্রথম থেকেই একইভাবে সব কিছু থেকে মানুষ প্রভাব গ্রহণ করে না, একইভাবে সব কিছুতে সাড়াও দেয় না এবং এক নযরে সব কিছু তারা দেখতে পায় না। সে একথা জানে এবং স্বীকারও করে যে, অতীতের অনেক রীতিনীতি, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ঝোঁকপ্রবণতা, মানবীয় দুর্বলতা, বাস্তবে সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা, আপনজন ও সংগী-সাথীদের মতের গুরুত্বদান ও তাদের অভ্যাসের প্রভাব– এসব কিছুই মানুষের মধ্যে এমন কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে, একের পর এক সঠিক প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজও বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। এই জন্যেই এ সকল বাধা বিপত্তির মোকাবেলার কথা বার বার স্মরণ করানোর প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়, প্রয়োজন হয় নিবিড় ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক স্থাপন করার। এর ফলেই আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী অপ্রীতিকর ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকে। এই কারণে উপর্যুপরি পরামর্শ দেয়া হয়, আর তারই আলোকে সে সতর্ক হতে থাকে এবং এই পথ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বার বার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। রসূলুল্লাহ (স.) প্রকৃতপক্ষে বরাবরই জাগ্রত থাকতেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে যে স্পষ্ট পথনির্দেশনা (এলহাম) পেতেন তারই আলোকে আগত সমস্ত সমস্যার সমাধান দান করতেন, আর তাঁর প্রিয় সাহাবাদের চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে গড়ে তোলার জন্যে কাজে লাগাতেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় ওহী এবং এলহাম পরস্পর সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এবং একটি অপরটিকে বলিষ্ঠ করেছে। এরই ফলে তাঁর হাতে এই মুসলিম জামায়াত আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর পছন্দনীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছিলো।

আলোচ্য সূরাটি এ দীর্ঘ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ধারার মধ্যে একটি বিশেষ ধারা। সূরাটির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে আনীত অন্যান্য বিষয়ের সাথে রয়েছে; মুসলমানদের একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার ভিত্তিতেই মুসলমানরা পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ এমন এক রশির বাঁধন যা কখনও ছিন্ন হয় না। এ বন্ধনের কারণে সকল প্রকারের গোত্রীয় বা বংশীয় হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। এই মহান ঈমানী সম্পর্কের ফলে বংশীয় ও শ্রেণীগত আভিজাত্যবোধ, বিদ্বেষ এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব দূরীভূত হয়েছিলো এবং তাদের সবার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত হয়ে একটি দলে আবদ্ধ হয়ে থাকাই প্রাধান্য পেয়েছিলো।

ইসলাম যে জগত গড়তে চায় তা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক আল্লাহমুখী জগত, মানুষের প্রতি মমত্ববোধের জগত। আল্লাহমুখীতার অর্থ হচ্ছে, মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির পথে ও তাঁর নির্দেশ পালনার্থে নিয়োজিত হবে। তার চিন্তা চেতনা ও কাজ হবে আল্লাহকেন্দ্রিক। আর মানবকেন্দ্রিক বলতে বুঝায় মুসলমানের সকল কাজ ও ব্যবহার হবে গোটা মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত। সকল বিশ্বাসের মূল লক্ষ্য হবে এই মানব কল্যাণ। বর্ণ, ভাষা, এলাকা, দেশ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণ সাধনই হবে মুসলমানের চেষ্টা ও সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। এই উদ্দেশ্যেই মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ণীত হবে এবং তাদের কাছে ঈমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কই প্রাধান্য পাবে না। এই আল্লাহমুখী মহান জগতই হবে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান লোকদের জন্যে আরামদায়ক বাসস্থান, যেখানে আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরত বর্ষিত হবে।

এই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের বহু পর্যায় ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। তৎকালীন আরবের পরিবেশে যেমন এসব পর্যায় ও কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছিলো, তেমনি আজও বিশ্বের সবখানে অনেক পর্যায় ও কন্টকাকীর্ণ পথ পার হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম জটিল পথ হচ্ছে নিজ বাড়ীর লোকের প্রতি দুর্বলতা,

www.pathagar.com

নিজ গোত্রের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, নিজ জাতির প্রতি দুর্বলতা, নিজ শ্রেণী (নারী বা পুরুষ)-এর প্রতি দুর্বলতা এবং নিজ এলাকা ও এলাকাবাসীদের প্রতি দুর্বলতা এবং কোনো বিশেষ এলাকার জন্যে দুর্বলতা। এমনি করে মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা এবং অন্তরের চাহিদা, লোভ লালসা, সংকীর্ণতা, ধনসম্পদ ও বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ, প্রাধান্য লাভের খাহেশ এবং অনেক সময় কৃচ্ছ্র সাধনের প্রবণতা পোষণ করা– এই ধরনের নানাবিধ অবস্থা ও পর্যায় মানুষকে অতিক্রম করতে হয়।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইসলামী দলের মধ্যে বিরাজমান উপরোক্ত সর্বপ্রকার অবস্থা কার্যত সামাল দিয়েই পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে সামাজিক এসব সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান এসেছে।

যে সকল মোহাজের মুসলমান তাদের ঈমান আকীদা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের দেশ ও সহায় সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের অনেকেরই অন্তর প্রাণ পরিত্যক্ত মাতৃ-ভূমিতে আবদ্ধ বিবি-বাচ্চা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে উদ্বেলিত ছিলো, আর মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অপমান সহ্য করা সত্তেও তারা আশা করতেন যে, তাঁদের ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ভালবাসা স্থাপনের কোনো দুয়ার যদি খুলে যেতো, পরিসমাপ্ত হতো যদি এই ঝগড়া বিবাদ ও নিষ্ঠুরতার, যার কারণে তাদের ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ-বিগ্রহের দাবানল জ্বলে ওঠেছিলো এবং তাদের সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই লোকদেরকে সকল দিক দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাদের এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে, যার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ, এ ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা এবং এর কল্যাণকর দিকগুলো তিনি পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত দুর্বলতাগুলো ভালো করেই জানেন। জানেন জাহেলী যামানায় গড়ে ওঠা তাদের নানা প্রকার সংকীর্ণতা সম্পর্কেও। বিশেষ করে আরবদের মধ্যে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্রভাবে বিরাজ করতো। ঘরে ঘরে ছিলো এসব সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। তাই আল্লাহ পাক ধীরে ধীরে এক এক করে সেই সকল মানসিক ব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ সূরার মধ্যে যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষেই সে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, কিন্তু সরাসরি ওই ঘটনা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলেও উক্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, শুধুমাত্র সে ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা স্থায়ীভাবে একটি শিক্ষা দান করেছেন, যা মানুষের জন্যে চিরদিনের তরে এক দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই, হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী ব্যক্তিদের অন্যতম (মোহাজের) এবং বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের মধ্যেও একজন ছিলেন। মক্কা শরীফে তাঁর সন্তনাদি ও সহায় সম্পদ ছিলো। অথচ তিনি কোরায়শ গোত্র উদ্ভূত ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের মিত্র ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন বিদেশী মানুষ। এ সময় মক্কাবাসীরা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভংগ করায় রসূল (স.) মক্কা অভিযানের মনস্থ করলেন এবং মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিলেন ও বললেন, 'ওদের থেকে খবরটি গোপন রেখো' (এই এ জন্যে, যেন প্রস্তুতি সম্পর্কে কোরায়শরা জানতে না পারে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতির কথা মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদের জানালেন, তাদের মধ্যে হাতেব ইবন আবী বালতায় ছিলেন অন্যতম। অতপর হাতেব মক্কা নগরী থেকে আগত মোযায়না গোত্রোদ্ভূত এক মহিলার হাতে রসূল (স.)-এর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি চিঠি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে করে মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর এহসান প্রদর্শনের একটি প্রমাণ থাকে। এ মহিলাটি নাচ-গান করে তার জীবিকা নির্বাহ করতো এবং এই উদ্দেশ্যেই সে মদীনায় এসেছিলো। রসূল (স) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যেন তাঁর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনার কথা গোপন থাকে। আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যেন মক্কা বিজিত হয়, তাই তিনি রসূল (স.)-কে এ খবর পাচারের ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ফলে রসূল (স.) সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে সংগে সংগে লোক পাঠালেন এবং তার থেকে পত্র উদ্ধারও করা হলো।

বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে (যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও তাঁর কেতাব সহীহ মুসলিম শরীফে হোসায়ন ইবনে আবদুর রহমানের বরাত দিয়ে আলী (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে, আবূ মারসাদ এবং যোবায়ের ইবনুল আওয়ামকে (একটি চিঠি উদ্ধারের জন্যে) পাঠালেন। আমরা সবাই ঘোড়-সওয়ার ছিলাম। আমাদের তিনি বলে দিলেন, 'তোমরা সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে 'রওদাতুল খাক' নামক স্থানে যাবে। সেখানে তোমরা মোশরেক এই মহিলাকে পাবে। তার কাছে মোশরেকদের হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি পাবে।' আলী (রা.) বলেন, আমরা উক্ত মহিলাকে তার উটের ওপর সওয়ার অবস্থায় সেই স্থানে পেলাম, যেখানে পাবো বলে রসূল (স.) বলেছিলেন। আমরা বললাম, চিঠিটি কই? সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। এরপর আমরা উটটিকে বসিয়ে দিয়ে চিঠিটি খোঁজ করলাম, কিন্তু চিঠি পেলাম না। তখন আমরা বললাম, এটা নিশ্চিত, রসূল (স.) মিথ্যা বলেননি, অবশ্যই তোমার চিঠি বের করে দিতে হবে, নচেত আমরা তোমাকে উলংগ করে চিঠি অনুসন্ধান করবো। আমাদের এই দৃঢ়তা দেখে সে নতি স্বীকার করলো এবং

www.pathagar.com

কাপড় দিয়ে বাঁধা তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা চিঠিখানা নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছে দিলাম। এ অবস্থা দেখে ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ব্যক্তি (হাতেব) আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের সাথে গাদ্দারী করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান মেরে দেই।' তখন নবী (স.) সে ব্যক্তি (হাতেব)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করলো?' হাতেব বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী ব্যতীত অন্য কিছু অবশ্যই নই। ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি চেয়েছিলাম উক্ত (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার কিছু এহ্সান থাকুক, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা মক্কায় অবস্থিত আমার পরিবার ও ধন সম্পদ রক্ষা করবেন। আপনার অন্য সাহাবাদের সবারই মক্কাতে আত্মীয়স্বজন আছে, যারা (মক্কা বিজয়কালে) তাদের পরিবার ও ধনসম্পদ রক্ষা করতে পারবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হা, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না।' তখন ওমর (রা.) বললেন (না, ইয়া রসূলাল্লাহ), সে অবশ্যই আল্লাহ, রসূল ও মোমেনদের সাথে খেয়ানত (বিশ্বাস ভংগ) করেছে। আমাকে ছাড়ুন, তাকে আমি কতল করে দেই। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সে কি বদরী সাহাবী নয়?' আরও বললেন, সম্ভবত আল্লাহ বদরী সাহাবীদের (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে) জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'যা খুশী তাই করো, অবশ্যই তোমাদের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব হয়ে গেছে, অথবা (এভাবে বলা হয়েছে), অবশ্যই আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। বদরী সাহাবীদের এ মর্যাদার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে আর একটি কথা বেশী এসেছে, এরপর আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করলেন, 'হে মোমেনরা, আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করো না।' আর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যাদের (ওরা স্ত্রীলোকটির সন্ধানে) পাঠানো হয়েছিলো, তারা ছিলেন আলী, যোবায়র ও মেকদাদ।

এই ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে একটু থামুন এবং দেখুন, এ ঘটনা থেকে আল্লাহ তায়ালা কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, যা এ কেতাব 'ফী যিলালিল কোরআনে' পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা একমাত্র কোরআনে বর্ণিত অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ ধারা, এর মধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী, ব্যাখ্যা এবং রসূলুল্লাহ (স.) থেকে প্রাপ্ত ধরপাকড়ের কাজ এই নিয়ম থেকে গ্রহণ করতে পারি, যেহেতু তিনিই আমাদের সবার একমাত্র নেতা, মহাপরিচালক ও মুরব্বী।

এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে মানুষ প্রথম যে অবস্থা দেখতে পায় তা হচ্ছে 'হাতেব'-এর আচরণ। তিনি ছিলেন একজন মোহাজের মুসলমান এবং সেই গুটিকয়েক ব্যক্তির একজন যাদের নিকট রসূলুল্লাহ (স.) মক্কাভিযানের বিষয় প্রকাশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় মানুষের যে সকল অদ্ভুত মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটে, যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তার মধ্যে যে পূর্ণত্ব ও শক্তির স্ফুরণ দেখা দিতে পারে তা সবই এখানে ফুটে ওঠেছে। এ কথা অবশ্যই সত্য, এমন সব দুর্বলতার মুহূর্তে ক্ষতিকর যে কোনো পদক্ষেপ বা কোনো ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বাঁচাতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই এসব কঠিন অবস্থায় সাহায্য করেন।

এরপর রসূল (স.)-এর মহত্ত্বের সামনে মানুষ থমকে দাঁড়ায়। সে দেখতে পায়, রসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস না করে, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। বলছেন, কোন জিনিস তোমাকে এহেন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করলো! রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়ে তাঁর সাহাবীর হৃদয়াবেগের প্রতি কী মধুর দরদ, কী চমৎকার সহানুভূতি। এ দরদ ও সহানুভূতি দ্বারা তিনি তাঁর সংগীকে, তার অন্তরে লুকায়িত সত্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করছেন। আরও লক্ষণীয়, অন্যদের শক্ত কথা বলা থেকে থামাতে গিয়ে রসূল (স.) বলছেন, 'হাঁ, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।' এই ভুলের কারণে তিনি (হাতেব) অনুতাপের যে আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন তা রসূল (স.) সঠিকভাবে বুঝতে পেরেই তো সেই কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে এই কথাগুলো বললেন, আর এ জন্যে নিজে তো কোনো তিরস্কার করলেনই না, অন্য কাউকেও তিরস্কার করতে দিলেন না। অপরদিকে; হযরত ওমর (আ.)-এর সে কঠিন কথাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ক্রোধের প্রকাশ ঘটেনি; বরং সে রাগ ছিলো তাঁর দৃঢ় ঈমান ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কাজের প্রতি নিষ্ঠার বহিপ্রকাশ। 'অবশ্যই এই আচরণ দ্বারা সে আল্লাহ, রসূল ও মুসলমানদের সাথে বে-ঈমানী করেছে, অতএব আমাকে অনুমতি দিন তাকে আমি কতল করে দেবো।' একথা বলার কারণ, ওমর (রা.)-এর নযরে হাতেবের এই পদস্খলন প্রকটভাবে ধরা পড়াতেই তাঁর অনুভূতি টনটন করে ওঠেছে এবং তাঁর বলিষ্ঠ ঈমানে তীব্রভাবে সাড়া জেগেছে। অপরদিকে রসূল (স.) অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে সকল দিক বিচার বিবেচনা করে অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সঠিক মূল্যায়ন করে দরদ সহানুভূতির সাথে চিন্তা করেছেন এবং কী প্রেরণাদায়ক কথা বলেছেন, যার ফলে প্রকৃত সত্য কথা বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। এই ছিলো সেই মহান ও মুরব্বী নেতার ভূমিকা, যিনি সমস্যার গভীরে তাকিয়ে সকল সত্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর যখন মানুষ 'হাতেব'-এর কথাগুলো সামনে রাখে, তখন বুঝতে পারে, এক দুর্বল মুহূর্তে তার দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রতি তার নিষ্ঠা এবং তার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তার একাগ্রতার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই, আর এই নিষ্ঠাই প্রকাশ পেয়েছে এ কথায় যখন তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু মাত্র চেয়েছিলাম সে (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার এহ্সান দেখাতে, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ হেফাযত করবেন।' তাঁর কথায় এ কথা

www.pathagar.com

অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো যে, সহায় সম্পদ ও পরিবার হেফাযত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই এহ্সানই নিজে কোনো হেফাযতকারী নয়, এর ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করবেন। তাঁর পরবর্তী কথায় এ বিশ্বাসের প্রতিফলন জোরদারভাবে ঘটেছে যখন তিনি বলেছেন, 'আপনার সাহাবীদের যারাই সেখানে আছে তাদের সবারই আত্মীয়স্বজন সেখানে রয়েছে, যাদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ও তাদের সম্পদ রক্ষা করবেন।' একথায়, তাঁর ধ্যান ধারণায় আল্লাহর চেতনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে তিনিই যে পরিবারের একমাত্র রক্ষাকারী, আত্মীয়স্বজন রক্ষাকারী নয়, বরং তারা হচ্ছে ওসীলা, তার অন্তরের এ বিশ্বাস পরিষ্কার বুঝা যায়।

আর সম্ভবত এই কারণেই রসূল (স.)-এর তীব্র অনুভূতি একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, তিনি (হাতেব) কোনো মিথ্যা বা বানাওটি কথা বলেননি, এটিই হচ্ছে রসূল (স.)-এর এই বলার কারণ, 'সে সত্য বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।'

কোনো ঘটনার মধ্যে আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালাই চূড়ান্তভাবে কাজ করে– তাকদীরের এ বিধান কেউ লংঘন করতে পারে না। হাতেব ইবনে আবী বালতায়া তাঁর নিজ সংকটের কারণেই মক্কা আক্রমণের খবর পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো না এ খবর মক্কাবাসীর কাছে পৌছে যাক যার জন্যে তিনিই এ পাচারের সংবাদ মুসলমানদের স্বার্থে রসূল (স.)-কে জানানোর ব্যবস্থা করলেন। এটাই তাকদীর, যা সরাসরি আল্লাহর ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা এ খবর পাচার শুধু বন্ধই করলেন না; বরং এ সম্পর্কে কানাকানি জানাজানিও বন্ধ করে দিলেন। এভাবে এ ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, কাউকে কোনো তথ্য গোপন রাখার দায়িত্ব দিলে সে যদি খেয়ানতও করে, তবু তার প্রতি একমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে না। বিশেষ করে মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্যে এ বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে। নেতৃবৃন্দ যেন তার ভাইদের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এ ঘটনাটি মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (অর্থাৎ, এতো অধিক সংখ্যক লোক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে যে, সবাই একযোগে এতো মানুষের ভুল কথা প্রচার অসম্ভব। এ বিষয়টির ওপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও বোখারী শরীফের একটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। এ রেওয়ায়াতের সত্যতাকে আমরা দূরে নিক্ষেপ করতে পারি না; বরং আমরা তো বলেছি, কোরআনের আয়াতের ভাষা সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে সব থেকে বেশী সহায়ক এবং হাতেবের যে ঘটনাটি সম্পর্কে মোতাওয়াতের বর্ণনাধারা এসেছে তা সে ঘটনার সত্যতা সেভাবে প্রমাণ করে যেভাবে কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে।

এ ঘটনাটি পারিবারিক জীবনের জটিলতা এবং পরিবারের নিকটস্থ লোকদের জন্যে মানুষের দুর্বলতা যে কত বেশী এবং সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কতটা রেয়ায়াত করা যেতে পারে তাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে বিশ্ব মুসলিমের জীবনকে সংকট সমস্যা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

হাদীসটি এসব পরিবারের কর্তাদের এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছে, নতুনভাবে তাদের মূল্যায়ন করেছে, নতুনভাবে তাদের পরিমাপ করেছে। গোটা সৃষ্টির জীবন ও মানবতা সম্পর্কে নতুন এক চিন্তাধারা পেশ করেছে । পেশ করেছে পৃথিবীতে মোমেনরা কি দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে এবং মানব জাতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ।

আর এ যেন আল্লাহরই সাহায্যে তৈরী সৃষ্টি মল্লিকার মধ্যে গ্রথিত সর্বপ্রকার পত্রপল্লবের এক বিপুল সমারোহ, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাদের মৌলিক সত্য সম্পর্কে জানাতে এবং তার সৃষ্টি ও জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাদের দুশমনদের শত্রুতার ধরন ও নানা প্রকার চক্রান্তের প্রকৃতি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, আর স্পষ্টভাবে তাদের বলে দিতে চেয়েছেন, তারা তো তাঁরই মানুষ, তাঁরই দল এবং তাদের দ্বারা তিনি বিশেষ একটি কাজ নিতে চান এবং তাদের দ্বারা জীবনের একটি মহান মূল্যবোধ রচনা করতে চান। এভাবেই বিশ্ব-মানবতার দরবারে মুসলিম জাতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, এক অতুলনীয় জীবনের রূপরেখা পেশ করেছে এবং অতি সুন্দর এক জীবনধারার আলোকেই তারা বিশ্বের দরবারে আপন পরিচিতি তুলে ধরেছে, আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারা সফলকাম হয়েছে। অতএব সকল মুসলমানকে নিজেদের আদর্শ ও নবী (স.)-এর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হতে হবে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্ষতিকর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া চিন্তা চেতনা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে অন্য সকল সম্বন্ধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়েছে, এমনকি সূরার একেবারে শেষের দিকে বর্ণিত শরীয়ত ও সংগঠন সম্পর্কিত আয়াতগুলো মোমেন মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের রসূল (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলো এবং এ কারণে তাদের ও তাদের কাফের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিলো। বিচ্ছেদ ঘটেছিলো মোমেন স্বামী ও তাদের কাফের স্ত্রীদের মাঝেও। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সবটুকু এ একই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির পরিসমাপ্তিতে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর নবীর দুশমন ও আল্লাহর কাছ থেকে আগত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নতুন করে যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আল্লাহর আক্রোশ ডেকে আনতে পারে। তা এ সব ব্যক্তি মোশরেক, ইহুদী, নাসারা যেই হোক না কেন। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা একথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, কোনো মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান আকীদার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

সূরা আস সাফ

আলোচ্য এ সূরাটিতে দুটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা এর বর্ণনাধারার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে, এ মৌলিক বিষয় দুটি বুঝানোর জন্যে বারবার ইশারা-ইংগিতের পন্থাও অবলম্বন করা হয়েছে।

আলোচনার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের মনের মধ্যে একথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া যে, মানুষের জন্যে যে জীবনব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে তার শেষ অবস্থা সামনে রেখে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে এই জীবন বিধানই বার বার এসেছে। এসেছে বহু রসূলের জীবনে এবং তাদের অনুসরণে বহু মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এ জীবন ব্যবস্থা চালু করার অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে শেষ নবীর জীবনে এসে। তাঁকে তিনি সমাপ্তকারী রসূল বানাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে তিনি মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর তাঁর প্রদত্ত এই জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসংগে মূসা (আ.)-এর রেসালাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে যাতে একথা স্থিরভাবে জানিয়ে দেয়া যায় যে, যে জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা তাঁকে মারাত্মক কষ্ট দিয়েছিলো এবং এর ফলে তারা গোমরাহ হয়েছিলো। অতপর তারা আর পৃথিবীর বুকে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এরশাদ হচ্ছে, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (আ.) তার জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার জাতি, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হয়ে এসেছি। এরপর যখন তারা (সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে) বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।

এরপর আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মূসা (আ.)-এর জাতির নেতৃত্বের অবসান হয়ে গেলো। তারপর তারা আর কখনও আল্লাহর অনুগত হতে পারেনি। তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করেছিলো। বিধায় আল্লাহ তায়ালাও তাদের বাঁকা পথে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। এজন্যে আল্লাহ তায়ালাও তাদের জন্যে ভুল পথে চলা সহজ করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।

এরপর ঈসা (আ.)-এর রেসালতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন একথা জানানো যায়, তিনি মূসা (আ.)-এর সাহায্যের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর সামনে যে তাওরাত কেতাব বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এবং সর্বশেষ রসূল (স.)-এর পূর্বাভাস ও সুসংবাদ দান করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী আহলে কেতাব এবং পরবর্তী আহলে কেতাব ব্যক্তিগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

www.pathagar.com

'স্মরণ কারো সে সময়ের কথা, যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বললো, হে বনী ইসরাঈল জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি ..... সুসংবাদদানকারী সেই (অনাগত) রসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমাদ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.)-এর পর আল্লাহর কাছ থেকে তিনি দ্বীন ইসলামের যে আমানত পেয়েছিলেন তাই তিনি পরবর্তী সেই রসূলের কাছে হস্তান্তর করতে এসেছিলেন যার সুসংবাদ তিনি দিচ্ছিলেন। আর আল্লাহর জ্ঞানভান্ডারে একথা মওজুদ ছিলো এবং স্থির করা ছিল যে, তাঁর দ্বীনকে শেষ বারের মতো দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হবে এবং শেষ রসূলের হাতে আল্লাহর যমীনে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না।

এ সূরার মধ্যে আলোচিত প্রথম স্পষ্ট লক্ষ্যের ওপর স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় লক্ষ্য। অতএব মুসলমানদের চেতনার মধ্যে একথা দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করা হচ্ছে এবং তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে আকীদা বিশ্বাস তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠবে তাদের জীবনব্যবস্থা, সেই জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর বুকে চালু করাই তাদের আসল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রয়োজন চূড়ান্ত সংগ্রামের এবং মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী করার। এই চূড়ান্ত প্রচেষ্টাই আল্লাহর কাম্য। তিনি চান মুসলমানদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য না থাকুক। তিনি চান না এই ওয়াদা পালনে তারা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করুক। তিনি চান তারা ঈমান আনার দাবী করে যে ওয়াদায় আবদ্ধ হয়েছে এই জেহাদের মাধ্যমেই তা পূরণ করুক।

তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না যে, মোমেনরা জেহাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তারপর বাস্তব জেহাদ যখন হাযির হবে, তখন তারা পেছন দিকে ফিরে দাঁড়াবে, যেমনটি অতীতে ঘটেছিলো মুসলমানদের একটি দলের পক্ষ থেকে। আর এভাবেই সূরার শুরুতে সৃষ্টির সব কিছু যে আল্লাহর প্রশংসায় রত একথা ঘোষণার পর নাযিল হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কেন বলছো এমন সব কথা যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু সেই কথা বলা যা তোমরা করো না। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যেন তারা এক শীশাঢালা প্রাচীর।'

এরপর সূরাটির মধ্যভাগে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সব থেকে লাভজনক ব্যবসার দিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাকছেন। বলছেন, 'হে ঈমানদাররা, আমি কি তোমাদের বলবো এমন একটি ব্যবসার কথা যা তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? .....।'

তারপর মোমেনদের প্রতি শেষ আহবান রেখে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে। যেন তারা সেইভাবে আল্লাহর সাহায্যকারী দলে পরিণত হয়ে যায়, যেমন ঈসা (আ.)-এর একদল সাহায্যকারী ছিলো, আল্লাহর দিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত। বনী

www.pathagar.com

ইসরাঈল জাতির বিরোধিতা ও চরম শত্রুতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দলটি তাঁকে সাহায্য করত। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে তিনি বলেছিলেন .....ফলে তারা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলো।'

এ সূরার মধ্যে শেষের এ দুটি লাইন অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে আল্লাহর প্রায় সব কথাই এসে গেছে। শুধু শেষ রসূল (স.)-কে অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনার কথাটিই বাকি রয়ে গেছে। এই হচ্ছে সূরাটির কাহিনী ও বক্তব্যের লক্ষ্য এবং হঠকারী কাফেরদের সমালোচনার কথা এই মৌলিক আয়াত দুটির মধ্যে পরোক্ষভাবে অবশ্যই এসে গেছে, তা একটু খেয়াল করলে বুঝা যায়। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুসংবাদ দিতে গিয়ে ঈসা (আ.)-এর উক্তি আল্লাহর বাণীতে কি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। 'তারপর যখন তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে সে এসে গেলো, তখন তারা বলে উঠলো, এটা তো স্পষ্ট জাদু.....এটা পছন্দ করে না।

এখানে একজন মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই তার জন্যে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, যা শেষ রসূলের আমলে সমাপ্ত হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে পরিচিত হয়েছে। গোটা মানবজাতির কাছে এ ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া তাঁর দায়িত্ব। তিনি জানেন, তাঁকে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু করার জন্যে মাল ও জানের কোরবানী নিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে হবে। যেহেতু এটাই আল্লাহর পছন্দ। এভাবে এ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ধারণায় আর কোনো অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই, বা একাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে এমন কোনো ভয় ভীতি নেই যাতে তাঁর স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যাবে, অথবা তিনি দুর্বিষহ দুঃখভারে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করার ব্যাপারে তার মাঝে কোন জড়তা নেই। আল্লাহ পাকের দেয়া জ্ঞান ও তাঁর নির্ধারিত পরিণাম বিলম্বে হলেও যে আসবেই, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

এই স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে মুসলমানদের তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে আহবান জানানো হচ্ছে, তার মননশীলতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা করতে বলা হচ্ছে। সুতরাং এমন কথা একজন মুসলমান বলবে না যা সে করে না, প্রকাশ্যে গোপনে, একাকিত্বে, সর্বসমক্ষে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সে কথা বলবে, কথা বলবে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে। তার কথা ও কাজের মধ্যে থাকবে স্বচ্ছতা, সে তার ভাইদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে হবে আবেগময়, এইভাবে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠবে তা হবে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই মযবুত।

সূরা আল জুমুয়া

মদীনায় অবতীর্ণ এ সূরাটি সূরা 'সফ'-এর পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা 'সফ'-এর মধ্যে যে-বিষয়ের ওপরে আলোচনা এসেছে এ সূরার মধ্যে আলোচনার বিষয়ও প্রায় সেই একই প্রকার, তবে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে সে বিষয়টিকে এ সূরার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এর প্রভাবও নতুন এবং আর একভাবে মানুষের মনে দাগ কাটে।

www.pathagar.com

এ সূরা মদীনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে ঈমানের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত করতে চেয়েছে। রসূল (স.)-এর যমানায় বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানরা ঈমানের সম্পদ হাসিল করায় যে অভংগুর একতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো, তা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতেই সম্ভব হয়েছিলো। নিরক্ষর আরববাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে শেষ রসূলকে, এটা আরবদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই এক বিরাট এহসান, যার জন্যে আরববাসীদের এ আমানতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া দরকার এবং বিশেষভাবে আল্লাহর শোকরগোযারী করা দরকার। একই ভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে যে জনগোষ্ঠী রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং ঈমানের আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে তাদের ওপর কিছু দায়িত্বও বর্তায়। আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী স্বরূপ তাদের আল্লাহ রসূলের বিধানমতো জীবন যাপন করতে হবে এবং অপরের কাছেও এই আমানত পৌঁছে দিতে হবে। এ দায়িত্ব কোনো সময়েই শেষ হয়ে যাবে না; বরং হেদায়াতের যে বীজ রসূল (স.) বপন করে গিয়েছেন তার বৃক্ষকে লালন পালন করতে হবে এবং বাড়াতে হবে। চার হাজার বছর ধরে এই দায়িত্ব বনী ইসরাঈল জাতির হাতে ছিলো, কিন্তু এর হক আদায় না করার কারণে তাদের থেকে এ মহান দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীকে দেয়া হলো। তাওরাত ছিলো মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহরই কেতাব, বনী ইসরাঈল জাতি গাধার মতো এই কেতাবের বোঝা বহন করেছে বটে, কিন্তু এর থেকে কোনো ফায়দা নিতে পারেনি। গাধা তো বোঝা বহন করে খাদ্যস্বরূপ কিছু মজুরি পায়, কিন্তু বনী ইসরাঈলরা সে মজুরিও পায়নি এবং বোঝা বহন করার সময় তাদের কেউ সাহায্যও করেনি।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে এই মূল সত্যটিই আলোচ্য সূরাটি বদ্ধমূল করে দিতে চায়। বিশেষ করে মদীনাবাসী তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারাই ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এভাবে তাদের পরে যারা এসেছেন– তাবেঈ, তাব্‌য়ে তাবেঈ, পর্যায়ক্রমে সবার ওপরেই পর্যায়ক্রমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এসেছে।

এখন আমরা দেখতে পাই ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের এমন কিছু বাস্তব অবস্থা এই সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, যা ওই কঠিন সময়ে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে লোভ লালসা ও পার্থিব ফায়দা হাসিলের আকাংখা, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মনোবৃত্তি এবং সুনাম অর্জন করার বাসনা থেকে মুক্ত করেছে। বিশেষ করে মুক্ত করেছে ধন দৌলতসহ এমন সব আসক্তি থেকে যা মানুষকে প্রদত্ত আমানতের মহান দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয় খেলাফতের দায়িত্ব পালন থেকে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্যে সূরাটি ইশারা করেছে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে।

www.pathagar.com

ঘটনাটি হচ্ছে, এক জুময়ার নামাযে মসজিদে রসূলুল্লাহ (স.) খোতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক বাণিজ্য কাফেলা ব্যবসা-দ্রব্য নিয়ে দেশে ফিরলো এবং শহরে এসে হাযির হলো। তাদের আগমন সংবাদ জানার সাথে সাথে যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর খোতবা শুনছিলো, সেই শ্রোতাদের অনেকে হঠাৎ করে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলো। কাফেলার আগমন সংবাদ ঘোষণাকারী বাদ্যধ্বনি তাদের আবেগমুগ্ধ করে ফেললো। অবশ্য এভাবেই আরববাসীরা (ইসলাম-পূর্ব) জাহেলী যুগে বাণিজ্য ফেরতা কাফেলাকে অভিনন্দন জানাতো। কাফেলার মধ্য থেকে দফ নামক বাদ্যযন্ত্র (তবলা) সহ উট-হাঁকানো গান ও সম্মিলিত কলরব ভেসে আসছিলো! এতদ্ শ্রবণে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রসূলুল্লাহকে দন্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে আসে। এদের মধ্যে বারো জন ব্যক্তি ছিলেন ব্যতিক্রম। এরা ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত সাহাবা, ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যারা সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স.)-কে ঘিরে থাকতেন। সুতরাং তারা স্থান ত্যাগ না করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে আবু বকর ও ওমর (রা.)-ও ছিলেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে এরা একেবারে নগণ্য ছিলেন না, কিন্তু কোরআনুল করীমে আসা সতর্কবাণী থেকে জানা যায়, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক উঠে চলে গিয়েছিলো। এ ঘটনাটি বিশেষভাবে পীড়াদায়ক ছিলো এজন্যে যে, যে প্রথম ইসলামী দলটিকে এতো কষ্ট করে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিলো, তার এমন দশা হলো! ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা বিশেষ ঘটনা এবং গোটা মানব জীবনের ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো কঠিন অবস্থাতে আমাদের সবর করতেই হবে। আসলে যে মুসলিম জামায়াত ইসলামের এই মহামূল্যবান আকীদার প্রচার প্রসারের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন অবিচল দৃঢ়তার। এই সবর দ্বারাই পরবর্তী কালের মুসলমানরা ইসলামকে বাস্তব জগতে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, যেভাবে প্রথম যুগের মুসলমানরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আলোচ্য সূরাটিতে ইহুদীদের সাথে 'মোবাহালা' করার দৃশ্যও দেখা যায়, অর্থাৎ কারা সত্য পথে আছে তার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে উভয় পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করা, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে ভুল পথে আছে তার প্রতি তোমার লা'নত বর্ষণ করো এবং সে ধ্বংস হয়ে যাক। ইহুদীদের সাথে সে প্রতিযোগিতার কথাও এ সূরার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা ছিলো উভয় পক্ষ থেকে মিথ্যাপন্থীদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা, আর ইহুদীরা অন্যান্য যে কোনো জাতির তুলনায় নিজেদের আল্লাহর বন্ধু ও অধিক প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো, আর বলতো যে, অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রসূলের আগমন ঘটবে না– সেই দাবী প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এই মোবাহালা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে আল কোরআনও চূড়ান্ত ভাবে দাবী করেছে যে, ওদের মোবাহালার জন্যে ডাকলে এই

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় ওরা কিছুতেই সাড়া দেবে না, যেহেতু তাদের চেতনার মধ্যে গভীরভাবে একথা রয়েছে যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাপন্থী এবং তাদের দাবী মিথ্যা। এর পর আল কোরআন মৃত্যুর তাৎপর্য জানাতে গিয়ে বলছে, এমন ভয়ানক বিপদ যার থেকে বাঁচার জন্যে ওরা সব সময়েই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়; কিন্তু সে মৃত্যু অবশ্যই ওদের সাথে সাক্ষাত করবে তা ওরা যেখানেই থাকুক না কেন। অবশেষে তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর জাননেওয়ালা যে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর কাছে হাযির করা হবে। আর তখন তিনি তাদের সেই সকল বিষয়ে অবগত করবেন, যা অতীতে তারা করতে থেকেছে। এ কথাগুলো শুধু ইহুদীদের জন্যেই নয় বরং সবার জন্যে, কেননা এ কথাগুলো খাস করে ইহুদীদের নাম নিয়ে বলা হয়নি। কাজেই মোমেনদের ওপরেও কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু ঈমান আকীদার আমানত বহন করার প্রশ্নেই এ কথাগুলো এসেছে, এজন্যে যারাই এ আমানতের হক আদায় না করবে, তাদের ওপরেই কথাগুলো প্রযোজ্য হবে।

এই হচ্ছে সূরার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে সূরা 'সফ'-এ যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, তা এখানে আলোচিত বিষয়ের খুবই কাছাকাছি। তবে প্রত্যেক সূরার বর্ণনাভংগি পৃথক এবং প্রতিটি সূরা ভিন্ন ভিন্নভাবে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। যদিও উদ্দেশ্য তাদের এক অভিন্ন।

সূরা মোনাফেকুন

এই সূরাটির নাম আল মোনাফেকূন। এই নাম দ্বারাই এর আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে মোনাফেকদের আলোচনা এবং তাদের স্বভাব চরিত্র ও চক্রান্তের বিবরণ শুধু যে এই সূরাতেই এসেছে তা নয়; বরং বলতে গেলে মদীনায় নাযিল হওয়া কোনো সূরাতেই মোনাফেকদের প্রসঙ্গ বাদ যায়নি। তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক। কিন্তু এই সূরা মোনাফেকদের এবং তাদের কথিত কিছু কথাবার্তা ও তাদের দ্বারা সংঘটিত কিছু ঘটনার আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া মোনাফেকদের চরিত্র, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, তাদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত আক্রোশ, চক্রান্ত, নীচাশয়তা, কাপুরুষতা এবং চোখ ও মনের অন্ধত্ব সম্পর্কেও এই সূরায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এ সূরায় অন্য কোনো প্রসংগ আলোচিত হয়নি বললেই চলে। কেবল শেষের দিকে মোমেনদের অতি সংক্ষেপে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন মোনাফেকদের সামান্যতম দোষেও দুষ্ট না হয়। এই সাথে কয়েকটি জিনিসকে মোনাফেকদের ন্যূনতম চারিত্রিক দোষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদিত না হওয়া, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করতে থাকা, যতোক্ষণ না মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে– যেদিন কোনো দানশীলতাই কাজে আসবে না।

www.pathagar.com

মোনাফেকী নামক রোগটা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে মদীনায় ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে এবং বলতে গেলে কোনো সময়েই তা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। অবশ্য সময়ে সময়ে তার বৈশিষ্ট্য, নিদর্শনাবলী ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের যে ঐতিহাসিক যুগটা অতিবাহিত হয়েছে, তার বিভিন্ন ঘটনাবলীতে এই রোগটার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা, সময় ও শক্তির এক বিরাট অংশ এই রোগের কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছে। কোরআন ও হাদীসে এ রোগ সম্পর্কে এতোবার আলোচনা করা হয়েছে যে, তা দ্বারা বুঝা যায়, এ রোগটি কতো সাংঘাতিক এবং তৎকালীন ইসলামী আন্দোলনের ওপর এর প্রভাব কতো বেশী ছিলো।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত দারূযা লিখিত 'সীরাতুর রসূল, সুয়ারুম মুকতাবাসাতুম মিনাল কোরআনিল কারীম' (কোরআনে রসূল জীবনের কয়েকটি চিত্র) নামক গ্রন্থে মোনাফেকী সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে সেই অধ্যায় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

'মদীনায় এই ব্যাধিটি ছড়িয়ে পড়ার কারণ সুবিদিত। রসূল (স.) ও প্রথম যুগের মুসলমানরা মক্কায় থাকাকালে এমন শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের ভয়ে বা তাদের কাছ থেকে সুবিধা লাভের আশায় কেউ প্রকাশ্যে তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত হবে, আর গোপনে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে ও ধোকাবাজি করবে, যেমনটি ছিলো মোনাফেকদের সাধারণ স্বভাব। মক্কাবাসীরা ও বিশেষত তাদের নেতারা রসূল (স.)-এর বিরোধিতা প্রকাশ্যেই করতো, মুসলমানদের মধ্যে যাকে যতোটা পারতো কঠোর নির্যাতন করতো এবং কোনো রকম রাখঢাক না করেই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধ করতো। শক্তিসামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি যা কিছু ছিলো মক্কাবাসী কাফেরদেরই ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের প্রাণ ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। কেউবা কাফেরদের নৃশংসতা ও বল প্রয়োগের কারণে, কেউবা প্রলোভন ও সন্ত্রাসের দরুন ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছে, কেউবা পদস্খলিত হয়েছে, কেউবা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে ও মোশরেকদের সাথে কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার ফলে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছে।

কিন্তু মদীনার পরিস্থিতি ছিলো একেবারেই ভিন্ন রকমের। রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করার আগেই আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ও জোরালো সমর্থক লোক পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় নিজের অবস্থান সুসংহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি হিজরত করেননি। এরূপ পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেনি এমন লোকদের পক্ষে এটা মোটেই সহজ ছিলো না যে, তারা রসূল (স.),

www.pathagar.com

মদীনার আদি অধিবাসী মুসলমান (আনসার) ও হিজরত করে আসা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা ও শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করবে, চাই তাদের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাই হোক অথবা ইচ্ছাকৃত হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষই হোক। সম্ভাব্য এই হঠকারিতা ও বিদ্বেষের কারণ এই যে, রসূল (স.)-এর আগমনে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হওয়া যে অবধারিত তা তারা আঁচ করতে পেরেছিলো। প্রকাশ্য শত্রুতা করতে না পারার আরো একটা কারণ এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে মদীনাবাসীর এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, আওস ও খাযরাজের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁকে সাহায্য করা ও সংরক্ষণ করার অংগীকারে আবদ্ধ ছিলো। শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশ ইসলামের প্রতি এত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ছিলো যে, রসূল (স.)-কে তারা শুধু আল্লাহর রসূলই মনে করতো না, বরং নিজেদের সর্বোচ্চ নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শকও মনে করতো এবং তাঁর আনুগত্য অনুসরণ অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো। তাই যারা তখনো শেরকের প্রতি অধিকতর ঝোঁক ও অনুরাগ পোষণ করতো, অহংকার ও হিংসার ন্যায় মানসিক ব্যাধি তাদের মনের ওপর প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করে রাখতো এবং এই ব্যাধি তাদের রসূল (স.), তাঁর আন্দোলন ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করতো, তাদের পক্ষে তাদের উক্ত ঝোঁক ও বিরোধিতার মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। ইসলামের প্রতি আনুগত্য লোক দেখানোভাবে হলেও জাহির না করে তাদের উপায় ছিলো না। ইসলামের মৌলিক এবাদাতসমূহ পালন এবং তাদেরই স্বগোত্রীয় মুসলমানদের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না। আর তাদের ধোকা, শঠতা ও ষড়যন্ত্রগুলো চরম জালিয়াতির মাধ্যমে ভিন্ন মোড়কে পেশ করতে তারা বাধ্য ছিলো। কদাচিত তারা কোনো প্রকাশ্য মোনাফেকী ও ভন্ডামিপূর্ণ আচরণ এবং ধোকা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতো বটে, তবে সেটা করতো শুধুমাত্র কতিপয় সংকটজনক অবস্থাতেই– যা রসূল (স.) ও মুসলমানদের ওপর সময় সময় আপতিত হতো। আর এসব সংকটজনক পরিস্থিতিকে তারা তাদের আচরণের অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের কুফরী বা মোনাফেকীর কথা স্বীকার করতো না। তথাপি তাদের কুফরী, মোনাফেকী ও চক্রান্ত রসূল (স.) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের কাছে গোপন থাকতো না। আর এই সংকটজনক অবস্থা তাদের প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী ভূমিকা ও আচরণ, তাদের কুফরী ও মোনাফেকী আরো অপমানজনক এবং নিন্দনীয়ভাবে প্রকাশ করে দিতো। কোরআনের আয়াতও তাদের নিন্দা ভর্ৎসনা সহকারে বারংবার নাযিল হতো এবং রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিতো।

মোনাফেকদের আচরণ ও চক্রান্তের প্রভাব যে খুবই সুদূরপ্রসারী ছিলো, সে কথা কোরআনের মদীনায় নাযিল হওয়া অংশ থেকে বুঝা যায়। এ অংশটি এমন একটি দুরন্ত সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে, যা রসূল (স.) ও মক্কার নেতাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাত

www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য মক্কার দুই পক্ষের ভূমিকা ও তার ফলাফল মদীনায় দুই পক্ষের ভূমিকা ও ফলাফল থেকে ভিন্নতর ছিলো। কেননা, মদীনায় রসূল (স.)-এর কেন্দ্র ক্রমেই শক্তিশালী, তাঁর ক্ষমতা ক্রমেই সংহত এবং ইসলাম ক্রমেই প্রসার ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। এখানে তিনি ছিলেন ক্ষমতাসীন ও পরাক্রান্ত শাসক, আর মোনাফেকদের না ছিলো কোনো সুসংগঠিত দল, না ছিলো কোনো খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু রসূল (স.)-এর পর্যায়ক্রমিক শক্তি বৃদ্ধি, ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার এবং তার শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রসারের সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাদের দুর্বলতা, কমে যাচ্ছিলো তাদের জনশক্তি ও প্রভাব প্রতিপতি।

মোনাফেকদের ভূমিকা, বিশেষত সেই প্রাথমিক যুগের পটভূমিতে কতো মারাত্মক ও ক্ষতিকর ছিলো, তা বুঝার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, (১) মোনফেকদের যা কিছু শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিলো, তার প্রধান উৎস ছিলো তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তাদের গোত্রসমূহের জনগণের মনে তখনো অত্যন্ত শক্তভাবে বিরাজ করছিলো। (২) তারা তখনো বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পুরোপুরিভাবে চিহ্নিত ও কলংকিত হয়নি। (৩) মদীনার গোত্রসমূহের সাধারণ জনতার মনে ইসলাম তখনো যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বদ্ধমূল হয়নি। (৪) রসূল (স.) চারদিক থেকে ইসলামের ঘোরতর শত্রু মোশরেকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। (৫) বিশেষত মক্কাবাসী তখনো তাঁর কট্টরতম শত্রু ছিলো। আরব দেশের কেন্দ্রভূমিতে তাদের অবস্থান ছিলো। প্রতি মুহূর্তে তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে তৎপর ছিলো। (৬) মদীনায় ও তার আশেপাশে ইহুদীরা শুরু থেকেই তাঁকে অস্বীকার এবং নিজেদের জন্যে অশুভ এবং অকল্যাণকর মনে করে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা প্রকাশ্যভাবেই তাঁর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করে। (৭) এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর ব্যাপারে একাত্মতা, চেষ্টার ঐক্য এবং স্বাভাবিক মৈত্রী গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা চলে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা, সমর্থন ও শক্তি অর্জন করা ছাড়া মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতোটা শক্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারতো না, এতোটা মারাত্মক নির্যাতনকারী বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকের ভূমিকা পালন করতে পারতো না, যতোটা কার্যত করতে পেরেছিলো। আর রসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রতাপ দান করে তাদের ওপর বিজয়ী করা এবং তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের শক্তি কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি, তাদের দিক থেকে ভয়ভীতি মোটেই হ্রাস পায়নি।' (মুহাম্মাদ ইযযত দারূযার উক্ত গ্রন্থের ১৭৬ থেকে ২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

সূরা আত তাগাবুন

এই সূরাটি বিশেষত এর প্রথমাংশ মক্কী সূরার বিষয়বস্তুর সাথে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ, কেবলমাত্র শেষের কয়েকটি বাক্যে মদীনার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা প্রতিফলিত হয়।

'হে মোমেন ব্যক্তিরা' বলে সম্বোধন করার পূর্ব পর্যন্ত সূরার প্রথম ১৩টি আয়াতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বিবরণদান ও ইসলামী আদর্শকে অন্তরে বদ্ধমূল করার

www.pathagar.com

কাজটি অবিকল মোশরেক কাফেরদের লক্ষ্য করে নাযিল করা মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনাভংগি অনুসারেই করা হয়েছে। এতে প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং অতীতের অবিশ্বাসীদের পরিণামও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া যে অকাট্য সত্য, তা প্রমাণিত হয়। এ সব বর্ণনাভংগি প্রমাণ করে যে, এ অংশটির লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসী কাফেররা।

সূরার শেষাংশে সম্বোধন করা হয়েছে মোমেনদেরকে। কেননা, এ অংশের বাকরীতি মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মতোই। এতে আল্লাহর পথে ধন সম্পদ ব্যয় করতে এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে বান্দাদের যে পরীক্ষা করা হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক হতে বলা হয়েছে, মদীনায় যে ধরনের জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠেছিলো, তার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে বারংবার এ জাতীয় সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এতে মুসলমানদের ওপর আপতিত বিপদ আপদ ও দুঃখকষ্টে তাদের প্রবোধ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মাদানী সূরায় বিশেষত জেহাদের আদেশদান ও জেহাদ থেকে উদ্ভূত ত্যাগ তিতিক্ষা প্রসংগে এ সব বিষয় বার বার আলোচিত হয়ে থাকে।

কিছু কিছু রেওয়ায়াতে এ সূরাটিকে মক্কী বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য রেওয়ায়াতে একে মাদানী বলা হয়েছে এবং এই মতটিই অগ্রগণ্য। সূরাটির পারিপার্শ্বিক ও প্রথমাংশের বর্ণনাভংগি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও একে প্রথম প্রথম মক্কী সূরা মনে করতাম। কিন্তু পরে চূড়ান্ত বিবেচনায় একে মাদানী বলেই গ্রহণ করেছি। সূরার প্রথম ভাগে কাফেরদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা মাদানী সূরায় থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। হিজরতের পরেও মক্কার অথবা মদীনার পার্শ্ববর্তী কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখা সম্ভব। তাছাড়া কোরআনের মাদানী অংশে যদি কখনো কখনো ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা করা হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর তা করতে গিয়ে কোরআনের সর্বাধিক প্রচলিত রীতি, অর্থাৎ মক্কী সূরায় অনুসৃত রীতি অনুসরণ করাই যে স্বাভাবিক, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূরা আত তালাক্ব

এটি সূরা তালাক। এ সূরায় আল্লাহ তালাকের বিধিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সূরা বাকারায় তালাকের কিছু বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে সব বিধি বাদ পড়েছে, তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। তালাক পরবর্তী অবস্থা সংক্রান্ত কিছু পারিবারিক বিষয়ও এতে আলোচিত হয়েছে। যে তালাক আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কার্যকরি হয়, সেই তালাকের উপযুক্ত সময় কোন্‌টি, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দাও।'

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিজ বাড়ীতে তথা তাকে তালাকদানকারী স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। এটা তার অধিকারও এবং কর্তব্যও। সে ইদ্দতের ভেতরে সেখান থেকে বের হবে না, আর প্রামাণ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া তাকে সেখান থেকে বের করাও যাবে না।

ইদ্দত পেরিয়ে যাওয়ার পর তার সে বাড়ী থেকে বের হওযার অধিকার থাকবে, যাতে সে নিজের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা, ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামী স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তাকে দেয়া তালাক প্রত্যাহারও করেনি, তাকে স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালও করেনি। এই তালাক প্রত্যাহার ও স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালের উদ্দেশ্য যদি তার ক্ষতি করা, তাকে কষ্ট দেয়া এবং তার পুনর্বিবাহের পথ রোধ করা হয়, তা হলে সেটা অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বলা হয়েছে, 'যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে তখন তাদের হয় স্বাভাবিকভাবে পুনর্বহাল করো, নতুবা ভালোভাবে আলাদা করে দাও।' তবে পুনর্বহাল করাই হোক আর বিচ্ছিন্ন করাই হোক– 'দুজন সাক্ষীর সামনে তা করতে হবে।'

সূরা বাকারায় ঋতুবতী স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই মেয়াদ হচ্ছে তিন ঋতু অথবা তিনটি ঋতুমুক্ত সময়। এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মতভেদ রয়েছে। আর এখানে এই মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে যাদের ঋতুর চির অবসান হয়ে গেছে এবং যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীর জন্যে, এখনো যাদের আদৌ রজস্রাব শুরুই হয়নি। বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা আর ঋতুবতী হবার আশা করে না, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হলে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।'

আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত বর্ণনা করা হয়েছে 'সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।'

অতপর তালাকপ্রাপ্তার বাসস্থান ও সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ভরণ পোষণ সংক্রান্ত বিধি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যে বাসস্থানে তোমরা নিজেরা বসবাস করে আসছো এবং যা তোমাদের কাছে সহজলভ্য, সেই বাসস্থানেই তাদের থাকতে দাও।'

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভূমিষ্ঠ সন্তানের দুধ খাওয়া সংক্রান্ত বিধি– 'তারা যদি তোমাদের জন্যে তোমাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তাদের পারিশ্রমিক দাও .....।'

অতপর ভরণ পোষণ ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে– 'যার যেমন সাধ্য আছে তার তেমন ভরণ পোষণ দেয়া উচিত ...।' এভাবে সূরার আয়াতগুলো তালাক ও তৎসংক্রান্ত প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান দিয়েছে এবং তালাকের পরিণতিতে বিধ্বস্ত পরিবারটির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধি ঘোষণা করেছে।

সূরাটি অধ্যয়ন করে পাঠক বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। কেননা, এতে তালাকজনিত পরিস্থিতি ও তার ফলাফল সংক্রান্ত বহু সংখ্যক বিধি তুলে ধরার

www.pathagar.com

পাশাপাশি সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী, প্রতিটি বিধির সাথে সাথে মন্তব্য, এই বিষয়টির সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের সংযোগ, আল্লাহর আদেশ লংঘনকারীদের ব্যাপারে এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর শাশ্বত নীতি, বারংবার সদাচার, উদারতা, পারস্পরিক সন্তোষ ও সম্মতি, অপরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার, কল্যাণকর কাজের আকাংখা পোষণ করার পুন পুন নির্দেশ প্রদান এবং সৃষ্টি করা ও জীবিকা বিতরণ করা আর অভাব ও প্রাচুর্যের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে।

তালাক সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে এত বিপুল সংখ্যক মহাজাগাতিক তত্ত্বের উল্লেখ দেখে মানুষ মাত্রেই অভিভূত না হয়ে পারে না। এখানে ব্যক্তিগতভাবে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও এটা আসলে সকল মুসলমানের জন্যে সাধারণ নির্দেশ। রসূল (স.)-কে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধির এই বিশদ বিবরণ, এই বিধিসমূহ মেনে চলার জন্যে জোর তাগিদদান, এ বিধির বাস্তবায়নে আল্লাহকে ভয় করা সম্পর্কে এতো দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে যে, এ দ্বারা মনে হয় এটাই পরিপূর্ণ ইসলাম। বস্তুত এ বিষয়টি নিয়েই কোরআন বিস্তারিত আলোচনা করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজটি তদারক করে থাকে। এতে আল্লাহভীরু লোকদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, একজন মোমেনের পক্ষে যতোটা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব, ততোটাই উচ্চ মর্যাদায় তাকে উন্নীত করা হবে। পক্ষান্তরে যারা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত এবং যারা স্ত্রীদের ক্ষতি সাধনে তৎপর, তাদের কঠোরতম শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে। সদাচার, উদারতা ও নম্র আচরণকারীদের জন্যে উত্তম পুরস্কার ও কল্যাণময় প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়ার সময় পাঠকের সামনে উল্লিখিত বক্তব্যগুলো পরিস্ফুট হবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো।' .... 'এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের ওপর যুলুম করে।' ..... 'তুমি জানো না হয়তো পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু সংঘটিত করবেন।' ..... 'দু'জন সৎ সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্য স্থাপন করো।' ..... ' এ হচ্ছে তাদের জন্যে উপদেশ, যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে।' .....'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটা সমাধান তৈরী করে দেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে যথেষ্ট। .....'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে তার কাজ সহজ করে দেন।' ..... 'এ হচ্ছে তোমাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দেন।' .....'আল্লাহ তায়ালা কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থার উদ্ভব করবেন।'

www.pathagar.com

এরপর তার সামনে নিম্নোক্ত হুমকিও আসে– 'অতীতে বহু জনপদের অধিবাসীরা তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রসূলদের আদেশ অমান্য করেছে। ফলে আমি তাদের ..... নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়েছি। ফলত তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছে এবং তাদের শেষ ফল ছিলো দুর্গতি। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এরপরই সর্তবাণী উচ্চারিত হয়েছে উল্লিখিত ভয়াবহ পরিণতি থেকে। রসূল ও তাঁর সাথে কেতাবরূপী আলোকবর্তিকা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বিরাট পুরস্কারের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অতএব হে ঈমানদার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে স্মরণিকা নাযিল করেছেন আর রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে পড়ে শোনান, যাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসতে পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে চমৎকার জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

এরপর পাঠক সর্বশেষ যে উক্তিটি পাঠ করে তা হচ্ছে, মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত গুরুগম্ভীর ঘোষণা, 'আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আর পৃথিবী থেকেও অনুরূপ সাতটি। এ সবের মাঝেই আল্লাহর বিধান নাযিল হয়। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান।'

এ সব কিছুই তালাকের বিধানের উপসংহার স্বরূপ। এভাবে আমরা এই ধাঁচের একটি পূর্ণাংগ সূরা দেখতে পাই, যা পারিবারিক জীবনের এই বিশেষ অবস্থা, তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমাধান এবং জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে ঈমানের তত্ত্বগুলোর সাথে তার সংযোগ সাধনের ওপর কেন্দ্রীভূত। এটা ধ্বংসাত্মক অবস্থা, গঠনমূলক অবস্থা নয়। একটি পরিবারের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়া একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এর একাধিক তাৎপর্য রয়েছে।

এর সর্বপ্রথম তাৎপর্য হলো ইসলামী বিধানে পরিবারের গুরুত্ব সংক্রান্ত।

পারিবারিক বিধান ইসলামের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবার হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল ও মাথা গোঁজার ঠাঁই। এর আওতায়ই মানুষ স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, পরিচ্ছন্নতা, পরস্পরকে আগলে রাখা ও পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখার প্রশিক্ষণ পায়। এই পরিবেশেই মানুষের শৈশবের সূচনা ও যৌবনের উদ্ভব হয়। এখান থেকেই সঞ্চারিত হয় পারস্পরিক একাত্মতার বন্ধন।

এ কারণেই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে পারিবারিক সম্পর্ককে এমন স্বচ্ছভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে যে, তা থেকে সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যেমন সূরা 'আররূমে' আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো, আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দয়া ও মমতার সৃষ্টি করেছেন।' সূরা 'আল বাকারায়' বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ।' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, পরিবার হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ সেতু, স্থিতি ও বসবাসের সংযোগ সেতু, দয়া ও সহানুভূতির সংযোগ সেতু এবং দুর্বলতা আগলে রাখা ও সদাচারের সংযোগ সেতু। এ আয়াত দুটির ভাষা থেকেই স্নেহ-মমতার ভাব ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ক ও সম্বন্ধের পূর্ণাংগ চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা ইসলাম পরিবারের ন্যায় দয়ামায়ার বন্ধনে আবদ্ধ অটুট মানবীয় সংগঠনটির ওপর ফরয করে দিয়েছে। একই সাথে এই মানবীয় সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের সম্প্রসারণ। ইসলাম এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বানায় এবং এর দাবী ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সূরা বাকারার নিম্নোক্ত উক্তিতে এই ভাবধারা সুস্পষ্ট। যথা, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত।' সংখ্যাধিক্য ও উর্বরতার বিষয়টি এ উক্তিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইসলাম এই পরিবারকে সার্বিক প্রযত্ন ও তত্ত্বাবধানে লালন এবং সংরক্ষণ করে, আর ইসলামের সার্বিক প্রকৃতি অনুসারে এ ক্ষেত্রে সে শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং আইনগত সংস্থাসমূহ আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়েও তাকে সংহত করে।

কোরআন ও সুন্নাহতে পরিবারের প্রতিটি অবস্থা সংক্রান্ত আইনগত বিধিসমূহে, সংশ্লিষ্ট নীতিগত নির্দেশাবলীতে, এতদসংক্রান্ত মন্তব্যসমূহে এবং এ বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার মধ্যে যে জিনিসটি পরিলক্ষিত হয় এবং যে জিনিসটি পূর্ণাংগভাবে উপলব্ধি করা যায়, তা হলো, ইসলামী বিধি ব্যবস্থায় পরিবার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এ বিষয়টি এই সূরাতে যেমন বিদ্যমান, তেমনি অনান্য সূরাতেও বিদ্যমান। সূরা নেসায় আল্লাহর ব্যাপারে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ব্যাপারে একই সাথে সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, একই মানুষ থেকে তার জোড়ও সৃষ্টি করেছেন ,এবং তা থেকে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকো, রক্ত সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়দের ব্যাপারে তাঁকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।' অনুরূপভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে ও অন্যান্য সূরায় একই সাথে আল্লাহর এবাদাত ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক স্থির করেছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' সূরা লোকমানেও

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার নির্দেশ একই সাথে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমার শোকর করো এবং তোমার পিতামাতারও।'

পরিবারকে এই সর্বোচ্চ গুরুত্বদান প্রকৃতপক্ষে পরিবারের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে গড়ে তোলার খোদায়ী পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মানব জাতির প্রথম ভিত্তিমূল হবে আদম (আ.) ও তদীয় স্ত্রীর পরিবার এবং সেই পরিবার থেকে বহু সংখ্যক মানুষের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা মাত্র কয়েকজন মানুষ থেকে এক সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু এই সৃষ্টির জীবনে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকবে এটাই ছিলো আল্লাহর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। পরিবারকে তিনি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তার সামগ্রিক জীবনধারা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বভাব প্রকৃতি, সহজাত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীকে বিকশিত করে এবং তার জীবনে পরিবারের গভীরতম প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতপর এই একই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পৃথিবীতে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বিধান ইসলামী বিধানের প্রতি। এই বিধান মানবজাতির প্রথম সৃষ্টির সাথে সমন্বিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছুই সৃষ্টি হয়, তার সাথে মানব সৃষ্টির একই রকম সংযোগ ও সমন্বয় রয়েছে।

আলোচ্য সূরায় এবং কোরআনের সর্বত্র দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্ককে এত গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ পবিত্রতার মর্যাদা দিয়েছে। সে পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহর সাথে সংযোগের মহিমায় ভাস্বর। ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে শুধু যে সর্বোচ্চ পবিত্রতায় মন্ডিত করতে চায় তা নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও চেতনাগত পরিচ্ছন্নতাদানের জন্যে পরিবারকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। পৌত্তলিকরা পরিবার সম্পর্কে ঠিক এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করতো। বিকৃত ধর্মের অনুসারীরাও আল্লাহর সৃষ্ট স্বভাবধর্মের পরিপন্থী মনোভাব পোষণ করতো।

'ইসলাম মানুষের প্রকৃতির দাবীকে প্রতিহত বা প্রত্যাখ্যান করে না এবং তা খারাপ বা অপবিত্রও মনে করে না। সে শুধু একে শৃংখলাবদ্ধ ও পরিশীলিত করে এবং পাশবিক স্তর থেকে উন্নীত করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়, যেখানে তা বহু সংখ্যক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সদাচারের উৎসে পরিণত হয় এবং যৌন সম্পর্ককে এতটা উন্নত মানবিক চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, যে দৈহিক মিলনকে তা মানসিক, আন্তরিক ও আত্মিক মিলনে, এক কথায় দুইটি মানুষের মিলনে রূপান্তরিত করে। এ দুটি মানুষের জীবন, আশা আকাংখা, দুঃখবেদনা ও ভবিষ্যত ভাগ্য হয় সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ভাবী বংশধরের মধ্যেও সেই একই ভাবধারা প্রতিফলিত হয়।' (তাফসীর ফী যিলাল কোরআন, ১৮শ পারার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ইসলাম বিয়েকে চরিত্রের পবিত্রতা, সততা ও উৎকর্ষ নিশ্চিত করার পন্থা ও মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে যখন অর্থাভাব বিয়ে করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন গোটা মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানায় তার সদস্য পুরুষ

www.pathagar.com

ও মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে । সূরা নূরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ ও মেয়েদের এবং বিবাহযোগ্য দাসদাসীদের বিয়ে দাও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছু জানেন ও সব কিছু শোনেন। আর যারা বিয়ে করার আর্থিক সংগতি রাখে না, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে অভাব থেকে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত চরিত্রের হেফাযত করে।' ইসলামী পরিভাষায় বিয়ের আর এক নাম এহসান– যার শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ। মোমেনরা মনে করে যে, বিয়ে ছাড়া জীবন যাপন করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না– চাই তা যত ক্ষুদ্র সময়ের জন্যেই হোক না কেন। রসূল (স.)-এর কন্যা ফাতেমার (রা.) এন্তেকালের অব্যবহিত পর হযরত আলী (রা.) যখন বিয়ে করার জন্যে তাড়াহুড়া করেন, তখন এই বলে তার ব্যাখ্যা দেন, 'আমার আশংকা হয় যে, আমাকে বিপত্নীক অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করতে হবে।' এ থেকে বুঝা যায়, বিয়ে একজন মোমেনের কাছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সিঁড়িরূপে গণ্য একটি এবাদাত বিশেষ।' আর এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্কও তার বিবেকের দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদাতের ন্যায় পবিত্র।

সূরা তালাক ও অনুরূপ অন্যান্য সূরার বক্তব্যের তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, এ দ্বারা ইসলামী বিধানের বাস্তবতা এবং মানুষ ও পার্থিব জীবনের প্রতি তার স্বভাবসুলভ আচরণ প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানবতাকে সহজাত যোগ্যতার উপর ভর করেই অত্যন্ত সম্মানজনক স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে চায়। এ জন্যে বিবেকনির্ভর এই বিষয়টি সম্পর্কে সে শুধু আইন জারি করেই ক্ষান্ত হয় না। শুধু উপদেশ দেয়াকেও যথেষ্ট মনে করে না; বরং মানব সত্ত্বার ও জীবনের বাস্তবতার মোকাবেলায় সে এই দুটিকেই কাজে লাগায়।

দাম্পত্য সম্পর্কের মূল কথা হলো স্থিতি ও স্থায়িত্ব। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে এমন সব ক'টি উপকরণ সরবরাহ করে, আর এ উদ্দেশ্যেই সে বিয়ে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে এবাদাতের মর্যাদা দেয়। যে নর নারী দারিদ্রের কারণে বিয়ে করতে পারে না, তাদের সে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য করে। দাম্পত্য প্রেম প্রণয় যাতে স্থায়ী হয় এবং পথেঘাটে ও বাজারে রূপের প্রদর্শনী করার দিকে মন যাতে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্যে বিপথগামিতা ও উচ্ছৃংখল আচরণ প্রতিরোধকারী বিধিনিষেধ (পর্দার বিধান) আরোপ করে। একই উদ্দেশ্যে সে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি জারি করে। কোনো গৃহে বহিরাগতের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও গৃহের অভ্যন্তরেও পরিবারের সদস্যদের একে অপরের শয়নকক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে গৃহকে নিরাপদ, পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে।

সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে সুশৃংখল বানায় এবং গৃহ ব্যবস্থাপনা দম্পতির যে সদস্য অধিকতর যোগ্য ব্যবস্থাপক তার নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করে, যাতে তা অরাজকতা, উচ্ছৃংখলতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে রক্ষা পায়। আবেগ

www.pathagar.com

উদ্দীপক উপদেশ প্রদান ও আল্লাহভীতির চেতনা সৃষ্টি ছাড়াও আরো যতো রকম নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব, তা প্রদান করে ইসলাম পরিবারকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু মানব জীবনের বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, সকল রকমের নিশ্চয়তা ও উপদেশাবলী সত্তেও কখনো কখনো এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য করে তোলে। এ ধরনের পরিস্থিতি বাস্তবানুগভাবে মোকাবেলা না করে উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হয় এবং তা অস্বীকার করে কোনো লাভ হয় না। কেননা, দাম্পত্য জীবন যাপন তখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা ও ভিত্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম কখনো পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্ককে নিয়ে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, প্রথম সুযোগেই এবং দাম্পত্য কলহের প্রথম ধাক্কাতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সে বরঞ্চ এ সম্পর্ককে মযবুত করে এবং সর্বাত্মক চেষ্টার পর নিরাশ হওয়া ছাড়া তাকে ধ্বংস হতে দেয় না।

ইসলাম পুরুষকে আহবান জানায়, 'স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। তাদের যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে হয়তো এমন কোনো কোনো জিনিস তোমরা অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।' এভাবে ইসলাম চরম অপ্রীতিকর অবস্থায়ও ধৈর্য সহনশীলতার পথে পুরুষদের পরিচালিত করে এবং অপছন্দনীয় নারীর মধ্যেও কল্যাণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। বস্তুত অপছন্দনীয় স্ত্রীদের মধ্যেও যে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ রাখেননি, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর তা যখন কেউ বলতে পারে না, তখন কল্যাণকে হারানো কিভাবে সমীচীন হতে পারে? অপছন্দের মনোভাব পরিবর্তন করা, তার কুফল প্রতিরোধ করা এবং ভালোবাসা ও অনুরাগ পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে এর চেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা আর হতে পারে না। যা হোক, পরিস্থিতির যদি এতোদূর অবনতি ঘটে যে, পছন্দ অপছন্দের স্তর পেরিয়ে বিদ্রোহ ও ঘৃণার পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলেও ইসলাম প্রথম চোটেই তালাকের দিকে ধাবিত হয় না। সে বরঞ্চ তৃতীয় পক্ষের শুভাকাংখীদের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার একটা সুযোগ রাখা অপরিহার্য মনে করে। সূরা নেসায় বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে তোমরা যদি অ-বনিবনার আশংকা করো, তাহলে স্বামী এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন করে সালিস পাঠাও। তারা দুজনে যদি সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও অবগত।' .....আর কোনো স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে উপেক্ষার আশংকা করে, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়ে নিলেও মন্দ হয় না। আপোষই সর্বোত্তম।'

কিন্তু এই মধ্যস্থতার সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটি গুরুতর হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কেননা,

www.pathagar.com

জোর-জবরদস্তিতে ব্যর্থতা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের কাছে অপছন্দনীয় হওয়া সত্তেও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো বিজ্ঞতার পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে যে, তালাক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল বস্তু।

অতপর যদি স্বামী তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়, তাহলেও যখন ইচ্ছা তখন তালাক দেয়া যায় না। ইসলামী রীতি এই যে, তালাক দিতে হবে এমন অবস্থায়, যখন স্ত্রী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছে, কিন্তু পবিত্রতার এই মেয়াদে এখনো স্বামীর সাথে সহবাস সংঘটিত হয়নি। এই মেয়াদটিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় যে, ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে যাবে। এমনকি উভয়ের মন পাল্টেও যেতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় বিবাদীকে আপোষ রফায় উদ্বুদ্ধ করে দিতেও পারেন। ফলে, তালাক হয়তো আর সংঘটিতই হবে না।

আর যদি তালাক সংঘটিত হয়েও যায়, তবে এর পরই আসে ইদ্দতের মেয়াদ। ইদ্দত হচ্ছে ঋতুবতী ও সন্তান ধারণে সক্ষম মহিলার জন্যে তিনটি পবিত্রাবস্থা, আর এখনো রজস্রাব হয়নি এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্যে এবং আর কখনো সন্তান হবে না এমন মহিলার জন্যে তিন মাস। আর গর্ভবতীদের জন্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। এই ইদ্দকালে যদি ভালোবাসার আবেগ পুনরুত্থিত হয়, তবে তালাকের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে।

কিন্তু এতো সব ব্যবস্থা সত্তেও বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে, যার মোকাবেলায় ইসলামকে বাস্তবানুগ কর্মপন্থা অবলম্বন করা জরুরী হয়ে পড়তে পারে এবং সে জন্যে তাকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যেই তালাকের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে, যা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম জীবন সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত বাস্তবানুগ। সেই সাথে সে মানুষকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

এই সূরার সামগ্রিক বক্তব্য– যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ, সতর্কীকরণ, খুঁটিনাটি বিধি ও মন্তব্য ইত্যাদি। এ সবের চতুর্থ তাৎপর্য এই যে, এগুলো মুসলমানদের সমাজে উদ্ভূত সেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, যা ছিলো জাহেলিয়াতের গ্লানিময় উত্তরাধিকার। নারীরা যে দুর্দশা ও বিকৃতির শিকার ছিলো, তার প্রতিকারের জন্যে এতো সব খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিধি দেয়া হয়েছিলো, যার ফলে নারীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার, দাম্পত্য জীবনে কোনো অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপারে আর কোনো পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার অবকাশ থাকেনি। (তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, ৪র্থ ও ২১শ পারা দ্রষ্টব্য)।

এ পরিস্থিতি শুধু আরব উপদ্বীপেই বিরাজ করতো না। তৎকালীন গোটা বিশ্বেরই অবস্থা ছিলো এরূপ। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে তখন নারীর অবস্থা ছিলো ক্রীতদাসীর

www.pathagar.com

মতো বা তার চেয়েও খারাপ। উপরন্তু নরনারীর যৌন সম্পর্ককে একটা নোংরামি হিসাবে দেখা হতো এবং নারীকে দেখা হতো এই নোংরামির প্ররোচনাদানকারী শয়তানরূপে।

বিশ্বব্যাপী এই শোচনীয় মানবেতর অবস্থা থেকে নারীকে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে মুক্ত করে ইসলাম সেই অত্যুচ্চ মানে উন্নীত করেছিলো, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। নারীকে সে এমন সম্মান মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার দান করেছিলো, যা তার কপালে ইতিপূর্বে আর কখনো জোটেনি। এখন নারী শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে কেউ মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে না, কেউ তার দিক থেকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এখন তাকে কেউ তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে চায় না, চাই সে কুমারী কিংবা অকুমারী যা-ই হোক না কেন। এখন গৃহবধূ হলে সে আইনসংগত অধিকারের চেয়েও অনেক বেশী অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন। আর তালাকপ্রাপ্তা হলেও তার অনেক অধিকার, যার বিবরণ এই সূরায়, সূরা বাকারায় এবং অন্যান্য সূরায় রয়েছে।

ইসলাম নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে এতো সব আইন রচনা এজন্যে করেনি যে, আরব দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নারীরা তাদের মানবেতর অবস্থা উপলব্ধি করে বিক্ষুব্ধ ছিলো অথবা নারীদের এই পরিস্থিতি দেখে পুরুষরা অসন্তুষ্ট ছিলো, কিংবা নারী অধিকার সংরক্ষণের জন্যে কোনো আন্তআরব বা আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। কিংবা নারীরা কোনো পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলো, বা নারীদের পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। এটা ছিলো পৃথিবীবাসীর জন্যে আল্লাহর দেয়া অযাচিত বিধান ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ন্যায়বিচার। এটা ছিলো আল্লাহর এই ইচ্ছার প্রতিফলন যে, মানুষের জীবন বিরাজমান মানবেতর অবস্থা থেকে উন্নীত হোক, দাম্পত্য সম্পর্ক জাহেলী যুগের নোংরামি থেকে পবিত্র হোক, একই মানবসত্ত্বা থেকে উদ্ভূত দম্পতি মানবসুলভ মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করুক।

কারণ এ হচ্ছে আল্লাহর মহান ও মহিমান্বিত দ্বীন। এ দ্বীনকে কেবল সে ব্যক্তিই অগ্রাহ্য করতে পারে, যার বিবেক বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধান কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যে দুনিয়ার সত্য আপন কূ-প্রবৃত্তির গোলামী করে।

এই প্রাসংগিক আলোচনা যা ইসলামী সমাজ গঠনের বিষয় থেকে অনেক বেশী দূরে অবস্থান করে না– এখানেই শেষ হচ্ছে। অতপর সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ নিয়ে আমরা একে একে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ আমাদের আলোচিত সংক্ষিপ্তসার থেকে ভিন্ন। এগুলো জীবন্ত, চলন্ত, উদ্দীপনাময় ও প্রেরণাময় বিষয়। এ সব বিধান ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে অধ্যয়ন করা ও কোরআনে অধ্যয়ন করার মূল পার্থক্য এখানেই নিহিত।

সূরা আত তাহরীম

আল্লাহ তায়ালা যখন ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির সর্বশেষ ও বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন একে তিনি পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করলেন, তাকে মানুষের যাবতীয় শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিপূরক বানালেন এবং সেই সাথে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার জন্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ও সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের, যে পর্যায়ের ও যে মানের যোগ্যতা এবং প্রতিভা আবশ্যক, সেই ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা মানুষকে দান করলেন।

শুধু তাই নয়, ইসলামকে তিনি স্বাভাবিকভাবে জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা দান করলেন, তাকে একই সাথে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উচ্চতা দান করলেন। কোনো গঠনমূলক শক্তিকে তিনি নিষ্ক্রিয় করেননি এবং কোনো কার্যকর যোগ্যতাকে তিনি দমন করেননি। তিনি বরঞ্চ সকল শক্তি ও ক্ষমতাকে সক্রিয় করেছেন এবং সকল সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে জাগ্রত করেছেন। সেই সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়া ও ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতার মাঝে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। আর এ কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, যাতে পার্থিব জীবনে অবস্থান করেই আত্মা আখেরাতের সুখ সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে এবং নশ্বর পৃথিবীতে বসেই পারলৌকিক জগতের অবিনশ্বর জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নাযিল করা জীবন ব্যবস্থাকে এরূপ বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করার ফয়সালা করলেন, তখন তিনি নিজের রসূল হিসাবেও এমন একজন মানুষকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন যিনি এই জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও মূর্ত প্রতীক। যাঁর মধ্যে সকল মানবীয় ক্ষমতা ও প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করেছে, যাঁর শারীরিক গঠন সুদৃঢ় ও নিখুঁত, যাঁর চেতনা সদা জাগ্রত, যাঁর অনুর্ভূতি নির্ভুল এবং যিনি সকল অনুভবযোগ্য জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণাংগভাবে অনুভব করেন। একই সাথে যিনি প্রগাঢ় দয়া, সহানুভূতি, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার অধিকারী, যিনি অত্যন্ত জীবন্ত ও সরস মেযাজের অধিকারী, তীব্র সংবেদনশীল, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, উদার ও দৃঢ়চেতা, যিনি আপন প্রবৃত্তির গোলামী করার পরিবর্তে প্রবৃত্তির ওপর প্রভুত্ব করেন, তাকে বশে রাখেন। সর্বোপরি যিনি এমন একজন নবী, যাঁর অন্তরাত্মা মহাজাগতিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, যাঁর হৃদয় মেরাজের শক্তিতে শক্তিমান, আকাশ থেকে যাঁকে সম্বোধন করা হয়, যিনি মহান আল্লাহর জ্যোতি দেখতে পান এবং বাহ্যিক আকৃতিসমূহের আড়াল থেকে যাঁর স্বভাব বিশ্ব চরাচরের অন্যান্য বস্তুর স্বভাবের সাথে একাকার হয়ে যায়, ফলে পাথরও তাঁকে সালাম করে, খেজুরের মৃত ডালও তাঁর কাছে কাঁদে এবং তাঁর পায়ের তলে পড়ে ওহুদ পর্বতও কাঁপে। অতপর তাঁর সত্ত্বায় এই সকল শক্তি ভারসাম্যপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে তার সত্ত্বা ঠিক সেই আদর্শের ন্যায় ভাবসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়, যে আদর্শ তাঁর জন্যে মনোনীত করা হয়েছে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই রসূলের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে তাঁর উম্মত এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটা উন্মুক্ত গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এই উন্মুক্ত গ্রন্থে উক্ত আদর্শের আকৃতি ও তার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তাই রসূলের জীবনে তিনি কোনো গুপ্ত রহস্য লুকায়িত রাখেননি; বরং তার বিভিন্ন দিক

www.pathagar.com

তিনি কোরআনে তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের জীবনে যেসব জিনিস সচরাচর পরস্পর থেকে লুকিয়ে রাখা হয়, তাও প্রকাশ করে দেন। এমনকি মানবীয় দুর্বলতার সেই দিকগুলোও আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেন, যা নিয়ে অন্য মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করার কোনোই প্রয়োজন বোধ করে না। তথাপি আল্লাহর রসূলের জীবনের এসব দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছাটাই যেন পরিলক্ষিত হয় কোরআনের বিভিন্ন সূরায় ।

আসলে রসূলের ব্যক্তিত্বে কোনো গোপনীয় জিনিসই নেই। তাঁর গোটা জীবন, গোটা সত্তা, গোটা ব্যক্তিত্বই তো ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে। সুতরাং তাঁর জীবনের একটা দিক তিনি কেনই বা লুকিয়ে রাখবেন, আর কেনই বা তা লুকিয়ে থাকবে? রসূলের জীবন হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ বাস্তবায়নের নিকটতম দৃশ্যমান ক্ষেত্র। তিনি পৃথিবীতে এসেছেনই এজন্যে যে, নিজের সত্তায় ও জীবনে এই আদর্শ প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেবেন, যেমন তিনি নিজের কথা ও নির্দেশাবলীর মাধ্যমে তা প্রচার করে থাকেন। এটাই ছিলো রসূলের আগমন ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

রসূল (স.)-এর সাহাবীদের আল্লাহ তায়ালা এজন্যে উত্তম পুরস্কার দান করেন যে, তাঁরা রসূলের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ঘটনাবলী শুধু সংরক্ষণই করেননি; বরং অনাগতকালের মানব জাতির কাছেও তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও হস্তান্তর করেছেন। ফলে রসূল (স.)-এর দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় কোনো ঘটনাই লিপিবদ্ধ হওয়া ও হস্তান্তরিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। রসূল (স.)-এর জীবন বা রসূলের জীবনে ইসলামী আদর্শের সকল খুঁটিনাটির বাস্তবায়ন এভাবে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর গৃহীত সিদ্ধান্তেরই একটা অংশ ছিলো। তাই বলা যায়, কোরআনে ও হাদীসে রসূলের জীবনের যতোটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সার্বিকভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক অনন্য ও চিরস্থায়ী সম্পদ। এ সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনের একটি অংশ তাঁর মহান সহধর্মিণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের সাথে স্বয়ং রসূল (স.)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু উত্তেজনাপূর্ণ দিক এবং রসূলের ও মুসলিম জাতির জীবনে এসব উত্তেজনার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকে মুলসলিম জাতিকে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশাবলীতেও তার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাও এই সূরায় আলোচিত হয়েছে।

এই সূরায় যে ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, তার সঠিক সময়কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে অন্তত এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এসব ঘটনা ঘটেছে যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হওয়ার পর।

এই প্রসংগে রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের ঘটনাবলী ও তাঁর ঘরোয়া জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে তা এই সূরায় বর্ণিত উক্ত ঘটনাবলী সংক্রান্ত উক্তিসমূহ উপলব্ধি

www.pathagar.com

করতে সহায়ক হবে। এই সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার ব্যাপারে আমি ইমাম ইবনে হাযমের গ্রন্থ 'জাওয়ামেউস্ সীরাহ' ও ইবনে হেশাম প্রণীত সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তবে উদ্ধৃতির মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যও করেছি।

রসূল (স.)-এর প্রথমা স্ত্রী হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রাঃ)। তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয় রসূলের বয়স যখন ২৫ (মতান্তরে ২৩ বছর)। খাদীজার বয়স তখন ৪০ বছর বা তারও বেশী। তিনি হিজরতের তিন বছর আগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবদ্দশায় রসূল (স.) আর কাউকে বিয়ে করেননি। মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

খাদীজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর রসূল (স.) সওদা বিনতে যামআকে বিয়ে করেন। তিনি তেমন রূপবতীও ছিলেন না, বয়সেও যুবতী ছিলেন না। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ও সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম সাকরাত বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন এবং স্বামীর ইন্তেকালের পর বিধবা অবস্থায় তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয়।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্কা। তাই হিজরতের পরে ছাড়া তাঁর সাথে রসূল (স.) দাম্পত্য জীবন শুরু করেননি। রসূলের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র কুমারী এবং অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা তাঁকেই তিনি বেশী ভালোবাসতেন। বর্ণিত আছে যে, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৯ বছর এবং রসূল (স.)-এর সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন কাটান ৯ বছর ৫ মাস। এরপর রসূল (স.) ইন্তেকাল করেন।

এরপর রসূল (স.) বিয়ে করেন হযরত ওমরের কন্যা হাফসাকে। তিনি কুমারী ছিলেন না। হযরত ওমর প্রথমে তাকে আবু বকর ও পরে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা উভয়ে অসম্মতি জানান। এ সময় রসূল (স.) ওমরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর মেয়ের জন্যে তিনি আবু বকর ও ওসমানের চেয়েও উত্তম বর জুটিয়ে দেবেন। অতপর তিনি নিজেই তাকে বিয়ে করেন।

এরপর তিনি বিয়ে করেন যয়নব বিনতে খোযায়মাকে। তার প্রথম স্বামী হারেস বিন আবদুল মোত্তালেবের পুত্র ওবায়দা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মারা যান। কারো কারো মতে, রসূল (স.)-এর পূর্বে তাঁর স্বামী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাহশ আল আসাদ– যিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সম্ভবত এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

ওহুদ যুদ্ধে আহত ও পরে সে কারণে শাহাদাত বরণকারী আবু সালামার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। তিনি আবু সালামার পরিত্যক্ত সন্তানদেরও নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আপন ফুফাতো বোন পরমা সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহশকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাকে নিজের মুক্ত গোলাম ও পালক পুত্র যায়দ বিন হারেসার

www.pathagar.com

সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় যায়দ তাকে তালাক দেন। ২২তম পারায় সূরা আহযাবে আমি তার ঘটনা বর্ণনা করেছি। এই মহিলা রসূল (স.)-এর নিকটাত্মীয় ও পরমা সুন্দরী ছিলেন বিধায় হযরত আয়েশা তাঁকে নিজের কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন।

অতপর তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মাঝামাঝির দিকে বনুল মোস্তালেক যুদ্ধের পর পরাজিত ইহুদী গোত্র বনুল মোস্তালেকের সরদার হারেসের কন্যা জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশা বলেন, রসূল (স.) যখন বনুল মোস্তালেকের যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করেন, তখন জুয়ায়রিয়া সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস অথবা তার এক চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন। জুয়ায়রিয়া তার মনিবের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজের মুক্তির পক্ষে সম্মতি আদায় করেন। রূপে গুণে অসাধারণ এই মহিলাকে যেই দেখতো, সেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যেতো। তিনি নিজের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ সংগ্রহে সাহায্য চাইতে রসূল (স.)-এর কাছে আসেন। হযরত আয়েশা বলেন, এই মহিলাকে আমার ঘরের দরজার ওপর দাঁড়ানো দেখামাত্রই আমি তাকে অবাঞ্ছিত মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তার মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক রূপ-গুণ আমি দেখছি, রসূল (স.)-ও তা দেখবেন। যা হোক, মহিলা রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি গোত্রপতি হারেস বিন আবী সেরারের কন্যা। আমি কী বিপদে আছি তা আপনার অজানা নয়। আমি তো সাবেত বিন কায়সের ভাগে পড়েছিলাম। কিন্তু তাকে আমি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিতে সম্মত করেছি। এই মুক্তিপণ সংগ্রহে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। রসূল (স.) বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো প্রস্তাবে তুমি কি আগ্রহী? তিনি বললেন, সেটি কী? রসূল (স.) বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ দিয়ে দেবো এবং তোমাকে বিয়ে করবো। জুয়ায়রিয়া বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি রাযি। রসূল (স.) বললেন, মুক্তিপণ আমি দিয়ে দিয়েছি।

এরপর হোদায়রিয়ার সন্ধির পর রসূল (স.) আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। তিনি মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায় ও তাকে ত্যাগ করে। রসূল (স.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে মোহরানা দিয়ে দেন। অতপর তিনি সেখান থেকে মদীনায় চলে আসেন।

খায়বর বিজয়ের পর তিনি বিয়ে করেন বনু নযীরের সরদার হুওয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সুফিয়াকে। তিনি ছিলেন কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের স্ত্রী। এই ব্যক্তিও বিশিষ্ট ইহুদী নেতা ছিলো। এই মহিলার সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে ইসহাক বলেন, সুফিয়া ও অপর এক যুদ্ধবন্দিনীকে রসূল (স.)-এর কাছে আনা হয়। তারা উভয়ে যখন নিহত একদল লাশের কাছে যাচ্ছিলো তখন সফিয়ার সহযাত্রী মহিলাটি মাথায় ধুলো ছিটিয়ে মুখ চাপড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদা শুরু

www.pathagar.com

করলো। তা দেখে রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা এই শয়তান মহিলাটিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আর সফিয়াকে তার পেছনে রাখতে বললেন এবং তার গায়ের ওপর নিজের চাদর রাখলেন। তা দেখে সাহাবীরা বুঝতে পারলেন, রসূল (স.) সফিয়াকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। উক্ত ইহুদী মেয়েটিকে দেখে রসূল (স.) বেলালকে বললেন, হে বেলাল! এই দুই মহিলার সাথে তুমি যখন তাদের গোত্রের নিহত লোকদের লাশের স্তূপ দেখছিলে, তখন কি তোমার ভেতর থেকে দয়ামায়া ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো?

এরপর তিনি বিয়ে করেন মায়মুনা বিনতুল হারেসকে। তিনি খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের খালা। রসূল (স.)-এর পূর্বে তার স্বামী ছিলো আবু রুহম বিন আবদুল উয্যা। এই মহিলাই রসূল (স.)-এর সর্বশেষ স্ত্রী।

এভাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও কারণ ছিলো। যয়নব বিনতে জাহশ ও জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারেস ব্যতীত অন্য স্ত্রীরা বয়সে যুবতীও ছিলেন না কিংবা তেমন আকর্ষণীয় রূপবতীও ছিলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) রসূল (স.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছাড়া যে দু'জন স্ত্রী যুবতী ও রূপবতী ছিলেন (যয়নব ও জুয়ায়রিয়া), তাদের নিজেদের পেছনে অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। অবশ্য তাদের দু'জনের মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক উপাদানটি ছিলো তা আমি অস্বীকার করছি না। এ ধরনের মানবীয় উপাদানগুলো রসূল (স.)-এর জীবনে যে থাকতে পারে সে কথা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ সব উপাদান কোনো দূষণীয় জিনিস নয় যে, রসূল (স.)-এর জীবনে তার উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে রসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে, আর রসূলের দুশমনদের জন্যে তার উপস্থিতির অভিযোগ তোলা আনন্দদায়ক হবে। রসূল (স.)-কে তো মানুষ হিসাবেই মনোনীত করা হয়েছে। তবে উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ হিসাবে। বস্তুত তিনি আসলেই উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যাবতীয় মানবীয় ভাবাবেগ মাত্রাভেদে বিদ্যমান ছিলো।

নিজ গৃহে নিজ স্ত্রীদের সাথে তিনি রসূল ও মানুষ হিসাবেই জীবন যাপন করেছেন। এভাবেই তিনি সৃজিত হয়েছেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠভাবে একথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 'আমার প্রতিপালক মহা পবিত্র। আমি একজন মানুষ ও রসূল ছাড়া তো আর কিছু নই।'

স্ত্রীদের কাছ থেকে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন এবং তাদেরও আনন্দ দিতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) যখন তাঁর স্ত্রীদের কাছে একান্তে মিলিত হতেন, তখন তিনি হতেন সবচেয়ে কোমল, বিনয় ও উদার মানুষ, তিনি থাকতেন সদা হাসিমুখ। তবে তিনি যে তাদের আনন্দ দিতেন এবং আনন্দ পেতেন, সেটা ছিলো নেহাতই তাঁর হৃদয় থেকে উদ্ভূত, তাঁর সুন্দর স্বভাব ও সদাচারজনিত এবং তাঁর উদার সদয় ও মহৎ আচরণই ছিলো তার উৎস। তাঁদের বৈষয়িক জীবনে কিন্তু ভোগবিলাসের চিহ্নমাত্র ছিলো না; বরং তা ছিলো অনেকাংশে নিছক মৌলিক প্রয়োজন

www.pathagar.com

পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি যখন বিজয়ের পর বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং মুসলমানরা 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলে অধিকৃত সহায় সম্পদ) দ্বারা বিপুলভাবে সমৃদ্ধশালী হয়, তখনো এরূপ অবস্থা অব্যাহত ছিলো। ইতিপূর্বে সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলের স্ত্রীরা তাঁর কাছে সংসারের ব্যয়নির্বাহে আরো একটু প্রশস্ততা ও সচ্ছলতার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই আবেদনের ফলে তারা এক অভাবনীয় সংকটে পড়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দুটো জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। একদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও আখেরাতের সুখ, অপরদিকে পার্থিব ভোগের উপকরণ ও রসূলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়া, কিন্তু রসূলের সহধর্মিণীরা আল্লাহ তায়ালা, রসূল ও আখেরাতকেই গ্রহণ করে নেন।

তবে রসূল (স.)-এর পরিবারের সেই নবুয়ত-প্রভাবিত পরিবেশে জীবন যাপনের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, তাঁর অথবা তাঁর স্ত্রীদের মন থেকে যাবতীয় মানবীয় আবেগ-অনুভূতির বিলোপ সাধন করতে হবে। বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো পরিবারের স্ত্রীদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থাকা স্বাভাবিক, তা তাঁদের মধ্যেও ছিলো। ইতিপূর্বে হযরত আয়েশার এ বর্ণনা আমি উদ্ধৃত করেছি যে, জুয়ায়রিয়াকে দেখে তাঁর রূপগুণে রসূলুল্লাহ (স.) মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন এই আশংকায় আয়েশা দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কার্যতও তার আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, আয়েশা সফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তার একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, 'সফিয়ার যা অবস্থা!' 'অর্থাৎ তার বেঁটে আকৃতি সম্পর্কে টিপ্পনী কেটেছিলাম। রসূল (স.) বললেন, তুমি এমন একটা কথা বলেছো, 'যা সমুদ্রের বিশাল পানিরাশিতে মিশিয়ে দিলেও তা দূষিত হয়ে যাবে।' হযরত আয়েশা আরো বর্ণনা করেছেন, সূরা আহযাবের এ আয়াত যখন নাযিল হল, যাতে রসূলের স্ত্রীদের দুটি জিনিসের একটি গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করে নিলেন এবং রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যা গ্রহণ করেছেন তার কথা অন্যান্য স্ত্রীকে না জানান। এই অনুরোধের উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রসূল (স.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে ধিক্কারদাতা হিসাবে পাঠাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন সহজভাবে যাবতীয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে। কোনো স্ত্রী যদি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করেছো, তাহলে আমি তাকে এই খবরটি জানিয়ে দেবো।'

নিজের সম্পর্কে বর্ণিত হযরত আয়েশার এই বর্ণনাগুলো তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যনিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। এগুলো অন্যান্য মহিলাদের জন্যেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং এরূপ আদর্শ পারিবারিক জীবনেও যে মানবিক পরিবেশ অনিবার্যভাবে বিরাজ করে তা ফুটিয়ে তোলে। এ বর্ণনাগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, রসূল (স.)

www.pathagar.com

তাঁর উম্মতকে যেমন ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি তাঁর পরিবারেও তদ্রূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন।

যে ঘটনা উপলক্ষে সূরা তাহরীমের প্রথমাংশ নাযিল হয়েছে, তা রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের জীবনে সংঘটিত বহু সংখ্যক ঘটনার অন্যতম। এ ঘটনা সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, আমি সূরার তাফসীরে যথাস্থানে তা উল্লেখ করবো।

এই ঘটনা উপলক্ষে এবং এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদ্বয়কে যে তাওবার আহবান জানানো হয়েছে, সে উপলক্ষে এ সূরায় সাধারণভাবে তাওবা এবং পরিবার পরিজনকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দোযখ থেকে বাঁচানোর আহবান জানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে দোযখে কাফেররা কিরূপ দুর্দশায় নিপতিত হবে, তারও একটি দৃশ্য এ সূরায় দেখানো হয়েছে। আর সূরার উপসংহার টানা হয়েছে হযরত নূহ ও হযরত লূতের স্ত্রীদ্বয়কে মুসলিম পরিবারের ভেতর কাফেরের দৃষ্টান্ত এবং ফেরাউনের স্ত্রীকে কাফের পরিবারে মোমেনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে। অনুরূপভাবে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের প্রসংগ– যিনি নিজের পবিত্রতা বজায় রেখেছিলেন, আল্লাহর আত্মা থেকে ফুৎকার লাভ করেছিলেন, আল্লাহর বাণী ও তাঁর গ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং যিনি আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

প্রথম পাঁচটি আয়াত যথা 'হে নবী, কেন তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ওপর হারাম করে নাও যা আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে হালাল করেছেন.....' এর নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা থেকে ইমাম বোখারী যে হাদীস বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ,

হযরত আয়শা বলেন, রসূল (স.) যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে মধু পান করতেন এবং তার কাছে রাত্র যাপন করতেন। এ কারণে আমি ও হাফ্সা স্থির করলাম যে, আমাদের দু'জনের কারো কাছে যখনই রসূল (স.) আসবেন, অমনি তাঁকে বলা হবে, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন। আমি তো আপনার কাছ থেকে মাগাফীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি (মাগাফীর সুস্বাদু অথচ দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের খাদ্যদ্রব্য)। পরে রসূল (স.) তাদের একজনের কাছে এলে সেই স্ত্রী তাঁকে উক্তরূপ কথা বললেন। রসূল (স.) জবাব দিলেন, 'কই, না তো! মাগাফীর নয়, আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে মধু খেতাম। তবে আর খাবো না। আমি শপথ করেছি, তুমি আর কাউকে এ কথা জানিও না।' এভাবে রসূল (স.) একটা হালাল জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে নিলেন।

মনে হয় রসূল (স.) যে স্ত্রীকে এ কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সহযোগী অপর সতীনের কাছে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে বিষয়টা জানিয়ে দিলেন। অতপর রসূল (স.) তাঁর সেই স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন এবং তিনি তার সতীনের কাছে যা যা বলেছেন, তা খানিকটা উল্লেখ করলেন। নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার খাতিরে তিনি সব কথার উল্লেখ করলেন না। কেবল দুই সতীনের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরলেন, যাতে সে স্ত্রী বুঝতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ সব

www.pathagar.com

কিছু জেনে ফেলেছেন। রসূল (স.)-এর মুখে তাদের দুই সতীনের গোপন সংলাপের বিষয়বস্তু শুনে স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কে অবহিত করলো?' সম্ভবত তিনি ভেবেছেন অপর সতীনই তাঁকে অবহিত করেছেন। কিন্তু রসূল (স.) তাকে জবাব দিলেন, 'মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবহিত করেছেন।' অর্থাৎ আমি সেই উৎস থেকে এ তথ্য জেনেছি, যে উৎস সব কিছুই জানেন। এ দ্বারা রসূল (স.) এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে স্ত্রীর সাথে রসূল (স.) কথা বলেছেন, শুধু সেই স্ত্রী নয়, বরং রসূল নিজেও তাদের গোপন সলাপরামর্শ ও পরবর্তী সংলাপের কথা পুরোপুরি জানেন।

এই ঘটনা ও এর মাধমে যে গোপন সলাপরামর্শের তথ্য উদঘাটিত হলো, তার ফল দাঁড়ালো এই যে, রসূল (স.) রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে কসম খেয়ে বললেন যে, এক মাসের মধ্যে কোনো স্ত্রীর কাছেও ঘেঁষবেন না। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদের সকলকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর এই পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। রসূল (স.)-এর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের কাছে ফিরে যান। তবে এ সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা বর্ণনা করার পূর্বে আমি এ সংক্রান্ত অপর হাদীসটির উল্লেখ করতে চাই।

হযরত আনাস (রা.) থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর একজন দাসী ছিলো, যার সাথে তিনি মাঝে মাঝে রাত্র যাপন করতেন। হযরত আয়েশা ও হাফসা তার বিরুদ্ধে রসূল (স.)-কে এতো ক্ষেপিয়ে তোলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত দাসীকে নিজের ওপর হারাম করে নেন। এ কারণেই নাযিল হয়, 'হে নবী, তুমি নিজের স্ত্রীদের খুশী করার জন্যে হালালকে হারাম করছো কেন?'

ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রসূল (স.) হাফসার গৃহে স্বীয় পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেন। এতে হাফসা এতো রেগে যান যে, মারিয়াকে অপমান করতে উদ্যত হন। তখন রসূল (স.) হাফসাকে প্রতিশ্রুতি দেন ও শপথ করেন যে, তিনি মারিয়াকে পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এ বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ না করার জন্যে হাফসাকে আদেশ দেন। কিন্তু হাফসা বিষয়টি আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেন। এ বিষয়টি আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীস দুটি বর্ণিত উভয় ঘটনাই সত্য হয়ে থাকতে পারে। তবে সম্ভবত শেষোক্ত ঘটনাটাই আলোচ্য আয়াত কয়টির ভাষার সাথে অধিকতর সংগতিশীল। রসূল (স.)-এর এতো বেশী রেগে যাওয়া যে, তার পরিণামে স্ত্রীদের সকলকে একযোগে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে, এর সাথে এই শেষোক্ত ঘটনাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাযুকতা ও স্পর্শকাতরতার বিচারে এই ঘটনাই এতোটা গুরুতর রূপ ধারণ করার কথা। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত। বাস্তবে এটা সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয় এবং রসূল (স.)-এর পরিবারে বিদ্যমান জীবন মানের আলোকে এই ঘটনা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করা বিচিত্র কিছু নয়। প্রকৃত ব্যাপার কী ছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

এরপর আলোচনায় আসা যাক 'ঈলা' অর্থাৎ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে রসূলের শপথ গ্রহণ প্রসংগে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমাদ যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাতেই এ ঘটনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ হাদীসে ইসলামী সমাজের একটি দিকের চিত্রও ফুটে ওঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর যে দুই স্ত্রী সম্পর্কে সূরা তাহরীমের এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমাদের উভয়ের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়', সেই দুজন স্ত্রী কে কে, এ কথা আমি হযরত ওমরের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেক দিন যাবত ব্যাকুল ছিলাম এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে একবার হযরত ওমর (রা.) হজ্জে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে হজ্জ আদায় করতে গেলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন, রসূল (স.)-এর সেই দু'জন স্ত্রী কে কে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন যে, 'তোমাদের উভয়ের আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়?' হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'কী আশ্চর্য! হে ইবনে আব্বাস, (যুহরীর মতে, হযরত ওমর তাঁর এই প্রশ্ন অপছন্দ করেছিলেন, তবে তার কাছে কোনো তথ্য গোপন করেননি।) তারা হচ্ছে আয়েশা ও হাফসা।' এরপর হযরত ওমর পুরো ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু আমরা যখন মদীনায় গেলাম, তখন সেখানে এমন এক সমাজ দেখলাম, যে সমাজে নারীর কর্তৃত্ব চলতো। আমাদের মহিলারাও তাদের কাছ থেকে স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব চালানো শিখতে লাগলো। আওয়ালীতে উমাইয়া ইবনে যায়দের পল্লীতে আমার বাড়ী ছিলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রেগে গেলাম। সে আমার সাথে তর্ক করতে লাগলো। আমি তার এরূপ তর্ক করায় খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন? রসূল (স)-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে থাকে এবং তাদের কেউ কেউ তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে না। অতপর আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করো এবং তোমাদের কেউ কি তাঁর সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বন্ধ করে থাকে? সে বললো, হাঁ। আমি বললাম, এরূপ যে করে সে ধ্বংস হবেই। তোমাদের কেউ কি ভাবেও না যে, আল্লাহর রসূল যার ওপর রাগান্বিত হন, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাগান্বিত হতে পারেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে? খবরদার, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করবে না, তাঁর কাছে কিছুই চাইবে না, আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তা থেকে তোমার যা মনে চায় চেয়ে নিয়ো। তোমার সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, (হযরত আয়েশার দিকে ইংগিত করে) তবে সে জন্যে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।

www.pathagar.com

আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলো। সেই প্রতিবেশী ও আমি পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেতো, একদিন আমি যেতাম এবং যেদিন যে ওহী নাযিল হতো, পালাক্রমে তার খবর সে আমাকে জানাতো আর আমি তাকে জানাতাম। আমরা বলাবলি করতাম, যে, গাসসান গোত্র আমাদের ওপর হামলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিন আমার উক্ত প্রতিবেশী রাতের বেলা এসে আমার দরজায় করাঘাত করলো এবং ডাকলো। আমি তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে! আমি বললাম কি হয়েছে? গাসসানীরা এসে গেলো নাকি? সে বললো, না, তা নয়। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর ও সাংঘাতিক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি সংগে সংগে বললাম, হাফসার সর্বনাশ হয়ে গেলো। এ ঘটনা ঘটবে, তা আমি জানতাম। পরদিন ফজরের নামাযের অব্যবহিত পর আমি হাফসার কাছে গেলাম। দেখলাম সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (স.) কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বললো, জানি না। তিনি এই তো এই পানকক্ষে আমাদের সংগ বর্জন করে অবস্থান করছেন। সংগে সংগে আমি এক কৃষ্ণকায় তরুণের কাছে এলাম। তাকে বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি চাও (অর্থাৎ রসূলের কাছ থেকে সাক্ষাতের অনুমতি এনে দাও)। তরুণ ভেতরে প্রবেশ করলো। অতপর বেরিয়ে এসে বললো, আপনার কথা রসূলের কাছে বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি তখন মসজিদে নববীর মেম্বরের কাছে গেলাম। দেখলাম, সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের কেউ কেউ কাঁদছে। আমি সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার ভেতরকার আবেগ উত্তেজনা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমি তাই পুনরায় সে তরুণটির কাছে এলাম এবং আবারো বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি এনে দাও। এবারও সে ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি দানের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি আবারও মেম্বরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। অতপর আবেগ উত্তেজনার বশে আবারো সে তরুণের কাছে গেলাম এবং অনুমতি চাইতে অনুরোধ করলাম। এবারও সে আগের মতো জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি অগত্যা ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। আমি রওনা হতেই পেছনে থেকে উক্ত তরুণ ডাক দিলো। সে বললো, আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভেতরে যান। আমি ভেতরে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে সালাম করলাম। দেখলাম তিনি একটি বালুভর্তি বিছানায় শুয়ে আছেন এবং সে জন্যে তাঁর শরীরে দাগ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি মাথা তুলে আমাকে বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর তাদের স্ত্রীদের কর্তৃত্ব বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

এখানকার মহিলাদের দেখাদেখি আমাদের মহিলারাও কর্তৃত্ব ফলানো শিখেছে। একদিন আমার স্ত্রীর ওপর আমি রাগ করেছিলাম। সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। আমি তার তর্ক করায় বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, আমার তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন! আল্লাহর কসম, রসূলের স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথা বন্ধ রাখে। এ কথা শুনে আমি বললাম, যে মহিলা এমন কাজ করে তার সর্বনাশ হবে। তোমরা কি ভাবো না যে, আল্লাহর রসূলের ক্রোধের কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং এতে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে? এ কথার পর রসূলুল্লাহ (স.) মুচকি হাসলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে বলেছি যে, তোমার কোনো সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয় এবং রসূলের কাছে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। রসূলুল্লাহ (স.) আবারও মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আমি কি আশ্বস্ত হতে পারি ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, হাঁ। তখন আমি বসলাম। আমি ঘরের ভেতরে চতুর্দিকে তাকালাম। সেখানে রসূল (স.)-এর গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থান ছাড়া আর কোনো দর্শনীয় বস্তু আমার চোখে পড়লো না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তো পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকেও সচ্ছলতা দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর এবাদাত করে না। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) ওঠে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি কি সন্দেহের মধ্যে আছো? তারা তো এমন জাতি, যাদের দুনিয়ার জীবনেই সকল সুখ শান্তি নগদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যে ক্ষমা চান। .....রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের ওপর এতো বেশী রুষ্ট হয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তিরস্কার করেন (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও যুহরীর সূত্রে একই ভাষায় এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

সীরাত গ্রন্থসমূহে এ ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তাই এখানে বর্ণনা করা হলো।

সূরা আল বাইয়্যেনাহ

অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুসারে এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একে মক্কী বলা হয়েছে। রেওয়ায়াতের দিক দিয়ে এবং বক্তব্য উপস্থাপনার ভংগির দিক দিয়ে সূরাটির মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও বেশী, তথাপি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। সূরায় যাকাত ও আহলে কেতাবের উল্লেখকে এ ক্ষেত্রে প্রতিকূল সাক্ষ্য হিসাবে ধরা যায় না। কেননা,

www.pathagar.com

অকাট্যভাবে মক্কায় অবতীর্ণ এমন সূরাতেও আহলে কেতাবের উল্লেখ আছে। মক্কায় আহলে কেতাবের কিছু লোক বাসও করতো। তাদের কেউবা ঈমান এনেছে, কেউ আনেনি। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যে রসূল (স.)-এর সাথে মক্কাতেই সাক্ষাত করতে এসেছিলো এবং ঈমান এনেছিলো, সেটা তো সুবিদিত। কতিপয় মক্কী সূরায় যাকাতেরও উল্লেখ দেখা যায়।

মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে এমন রেওয়ায়াত তো রয়েছেই। তদুপরি এ সূরায় এমন কিছু ঐতিহাসিক ও ঈমান বিষয়ক সত্য প্রতিবেদনের ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা এর মাদানী হওয়াকেই অগ্রগণ্য বলে সাব্যস্ত করে।

উক্ত সত্যসমূহের মধ্যে পয়লা সত্যটি এই যে, আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা গোমরাহী ও মতদ্বৈধতার শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিলো, তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য রসূল (স.)-কে পাঠানো অপরিহার্য ছিলো। প্রথম তিনটি আয়াত 'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো, তারা কুফরী ছাড়তে রাযী ছিলো না যতক্ষণ তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ না আসে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবেন। যাতে শাশ্বত ও সঠিক বিধানসমূহ লেখা থাকবে-এর এটাই বক্তব্য।

দ্বিতীয় সত্য এই যে, আহলে কেতাব তাদের ধর্মের ব্যাপারে যে দ্বিমত পোষণ করেছে সেটা তাদের অজ্ঞতার জন্যও নয় এবং এই ধর্মে কোনো অস্পষ্টতা থাকার জন্যও নয়। বরঞ্চ তাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরেই তা করেছে। চতুর্থ আয়াতে, 'পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আসার পরই তারা বিভেদগ্রস্ত হয়েছিলো'-একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

তৃতীয় সত্য এই যে, দ্বীন বা ধর্ম মূলগতভাবে এক ও অভিন্ন। তার মূলনীতি ও বিধিগুলো এত সরল ও সহজ বৈশিষ্টের অধিকারী যে, তা কখনো মানুষকে বিভেদ ও কোন্দলের শিক্ষা বা প্ররোচনা দেয় না। সূরার চতুর্থ আয়াতের বক্তব্য এটাই।

চতুর্থ সত্য এই যে, অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরও যারা ইসলামকে অস্বীকার করে, তারা হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান আনে, তারা উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ জন্য উভয় গোষ্ঠীর কর্মফলেও আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে চিরদিন থাকবে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত।'

এ চারটি সত্যসহ ইসলামী আকীদা ও শেষ নবীর ভূমিকাকে অনুধাবন করার ব্যাপারে সূরাটি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখে

www.pathagar.com

সূরা আয যেলযাল

এ সূরাটি অনেকের মতে মদীনায় অবতীর্ণ, আবার অনেকের মতে মক্কায় অবতীর্ণ। আমার মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষের বর্ণনাই অগ্রগণ্য। সূরার আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভংগিও শেষোক্ত মতেরই সমর্থক।

সূরাটি শিথিল ও উদাসীন লোকদের মনে প্রচন্ড আলোড়ন তোলে। এর বক্তব্য বিষয়, দৃশ্যপট ও ছন্দময় শব্দ সব কিছু মিলেই এই আলোড়ন সৃষ্টি করে। সূরাটি একটি বিকট চিৎকার স্বরূপ, যা পৃথিবীকে ও পৃথিবীবাসীকে প্রকম্পিত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ না তাদের সামনে হিসাব-নিকাশ, ওযন ও কর্মফলের পূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরা না হয়, ততক্ষণ তাদের সম্বিত ফিরতে চায় না। শুধু এই সূরার নয়, গোটা আমপারারই বর্ণনাভংগি এ রকম। তবে এ সূরায় এই বর্ণনাভংগিটি অত্যন্ত জোরদারভাবে উপস্থিত।

সূরা আন নাসর

সূরা কাওসারের অনুরূপ এটিও কোরআনুল কারীমের একটি ছোটো সূরা। মাত্র ৩টি আয়াতসম্পন্ন এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে, আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোকদের ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আগাম সুসংবাদ নাযিল করেছেন। মূলত এটি আল্লাহর মদদ, বিজয় ও ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুসংবাদবাহী সূরা। এ সূরায় সাহায্য ও বিজয়প্রাপ্তির লগ্নে রসূলল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর শোকরিয়া প্রকাশ আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রবিত্রতা বর্ণনা ও মাগফেরাত কামনায় মনোনিবেশ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিজয়োল্লাসে আনন্দে মাতোয়ারা না হয়ে মহান আল্লাহর শোকরিয়া, হামদ, তাসবীহ ও মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে বিনয়, নম্রতা, দীনতা, হীনতা প্রকাশের মহান মানবীয় গুণাবলীর প্রতি হুযুরে পাক (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে এ ছোট্ট সূরাটিতে বিজয়লগ্নে ইসলামী জীবন-চেতনার অনুসারী আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যয়শীল জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে হাবীবে পাক (স.) প্রদর্শিত এমন সব উজ্জ্বল গুণাবলী অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব সভ্যতার কোনো স্তরেই বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত ও বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত জনতার মধ্যে আশা করা যেতে পারে না। এ সূরায় এমন সব মহান উজ্জ্বল উন্নত মানবীয় গুনাবলী যথা সম্মান, মর্যাদা, বিনয়, নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়ন্ত্রন, উদারতা, বিজয় উল্লাসে মদমত্ত না হওয়া এবং হামদ তাসবীহ, মাগফেরাত ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার মতো এত উন্নত পর্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টমন্ডিত হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যা একমাত্র ইসলামী জীবনদর্শনের স্বাভাবিক পদ্ধতি, প্রবৃত্তি, মননশীলতা ও দর্শনের সাথেই সামঞ্জস্যশীল। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা

www.pathagar.com

ছাড়া কখনও মানুষ নৈতিক উৎকর্ষের এত শীর্ষ স্থানে আরোহণ করতে পারে না– পারে না মর্যাদা, সম্মান ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে।

এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে আমি এখানে ইমাম আহমদ সংকলিত হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি রেওয়ায়াত করেন যে, আমাদের কাছে মোহাম্মদ ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ থেকে, দাউদ শাবী থেকে, শাবী মাসরুক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। মাসরুক বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে বেশী করে এ দোয়া পাঠ করতেন।

'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী আসতাগফিরুল্লাহে ওয়া আতুবু ইলাইহে' অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র, তাঁর জন্যে সব প্রশংসা, আমি আমার গুনাহর জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই আমি তাওবা করছি– তিনি এ কথাও বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন, এ লক্ষণগুলো দেখলে আমি যেন আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ, মাগফেরাত ও তাওবায় রত হই। অর্থাৎ উপরোল্লেখিত দোয়া বেশী বেশী করে পাঠ করি।

'আর যখন তুমি দেখতে পাবে যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়েছে, তখনি তুমি এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তোমার ফিরে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে দাখিল হওয়ার এ মর্মই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলাম তার পরিপূর্ণ আদর্শ নিয়ে বিজয়ী হওয়ার তাৎপর্যই হলো যে, সর্বশেষ রসূলের এ ধরার বুক থেকে অন্তর্ধানের সময় ও আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে বর্ণিত ফাত্হ্ (বিজয়) বলতে মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। এটি একজনের একটি উক্তি। আরবের যেসব ক্বাবীলাসমূহ, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলো, তারা বলতো, 'যদি সে তার জাতির ওপর বিজয়ী হয় তাহলে বুঝবো অবশ্যই সে নবী। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই গোটা আরব উপদ্বীপ ঈমানের শরবত আকণ্ঠ পান করলো এবং সমগ্র আরবের কবীলাগুলো ইসলামের সমুজ্জল বাতির বাইরে আর কেউ রইলো না এ বাতির প্রদীপ্ত আভায় সমুজ্জল হয়ে গেলো তাদের জীবন। আলহামদু লিল্লাহ্ আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসাও কৃতিত্ব এবং তাঁর এহ্সানে আমরা ধন্য।

আমর্ ইবনে সালামার্ বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী তাঁর কেতাব সহীহ বোখারীতে রেওয়ায়াত করেছেন, মক্কা বিজিত হলে প্রত্যেকটি ক্বাবীলা ও গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। আর ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান কবীলাগুলোও বলতে লাগলো, 'এবারে তার জাতিকে বুঝতে দাও (অর্থাৎ, বুঝুক তার জাতি এবার) যে অবশ্যই তিনি নবী।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি সূরা নাসর-এর সাথে সম্পূর্ণ সাম স্যশীল। এতে এরশাদ হয়েছে– 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে..... শেষ পর্যন্ত।' সুতরাং, সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়েই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইংগিত পাওয়া যায় যা অবশ্যই পরবর্তীতে সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে নবী (স.) তখনই এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন তিনি এই সুসংবাদ ও এই ইংগিত পেয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)–এর আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, যাতে আমরা সহজেই দেখতে পাই দুটি রেওয়ায়াতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। ইমাম বোখারী বলেন, একটি হাদীস মূসা ইবনে ইসমাঈল আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তাঁদের বলেছেন আবূ উয়ানাহ্, তিনি পেয়েছেন আবূ বাশার থেকে। এই আবূ বাশার সাঈদ ইবনে জোবায়ের থেকে পেয়েছেন। আর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওমর (রা.) কিছু সংখ্যক বদ্‌রী বুযুর্গ (মুরুব্বী শ্রেণীর) ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে আমার কাছে আসতেন। এতে কারো কারো মনে একটু বেখাপ্পা (খারাপ) লাগলো। একজন বলেই ফেললেন, আমাদেরও তো এ বয়সী ছেলেরা আছে, এ ছেলেটা কেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে?' তখন ওমর (রা.) বললেন, হাঁ আছে, তবে এ বাচ্চাটা একটু ব্যতিক্রম। তোমাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই বাচ্চাটাকে সেই একই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা জানো এই বাচ্চাটাও তাই জানে। (সুতরাং এটা সাধারণ বাচ্চা নয়)। পরবর্তী আর এক দিন তিনি এ মুরব্বীদেরকে ডাকলেন এবং সেখানে আমাকেও রাখলেন। তখন আমি বুঝলাম, আসলে তিনি তাদেরকে সেদিন কিছু দেখাতে চাচ্ছিলেন। তাই বললেন, আল্লাহ পাকের বাণী 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাত্‌হু' সম্পর্কে আপনারা কী বুঝেন বলুন দেখি। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন আ-মাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করতে এবং তাঁর কাছে এস্তেগফার করতে আদেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আব্বাসের বেটা, তুমিও কি ওদের মতো একই কথা বলতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে বলো তুমি কী বলতে চাও। বললাম, এ সূরাটি রসূল (স.) এর মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করছে। (অর্থাৎ তিনি অবিলম্বে ইন্তেকাল করবেন এ ঘোষনা দিচ্ছে)। সূরাটি দ্বারা তাঁকে এ কথাটি জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন বুঝবে সেটাই তোমার মৃত্যুর সংকেত। অতএব 'তোমার রবের প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা

www.pathagar.com

ঘোষণা করে তাঁর তাসবীহ্ (পবিত্রতার ঘোষণা) জপতে থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী।' তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, 'তুমি যা বলেছো এর থেকে বেশী কিছু জানিনা।' (বোখারী একটি ব্যক্তি-সূত্র থেকে হাদীসটি পেয়েছেন)। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংকেত পেয়ে গেলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়ে গেছে, আর তিনি শীঘ্র তাঁর রবের সাথে মিলিত হবেন। এটাই ছিলো ইবনে আব্বাসের বোধগম্য অর্থ। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের ভবিষ্যদ্বাণী সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

অবশ্য হাফেয বায়হাকী তাঁর সংকলিত বায়হাকীতে সূরা 'নাসরের' শানে নযুল প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণের পর রসুলুল্লাহ্ (স.) তাঁর নয়ন পুতুলী ফাতেমা (রা.)-কে তাঁর কাছে ডেকে এনে বললেন, শোনো মা ফাতেমা, আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) প্রথমে, কাঁদলেন এবং পরক্ষণেই হাসলেন। তার প্রথম কান্না এবং পরক্ষণেই হাসার কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেছেন, আব্বা যখন আমাকে এ সংবাদ দিলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন আমি কেঁদেছি, পরক্ষণেই তিনি বললেন, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো, (সংযত হও)। আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে, তখনই আমি হেসেছি।

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এ সূরার শানে নযুল ও অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্থিরভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে, যখন সূরা নাসর নাযিল হলো তখন বুঝা গেলো যে, মক্কা বিজয় আসন্ন, দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, রসূল (স.) প্রেরণ করেছেন ও দ্বীনরূপী নেয়ামত উপহার দিয়েছেন, তা সফল হয়েছে। আল্লাহর সাহায্যে বিজয় সূচীত হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব যখন বুঝতে পারলেন যে বিজয়ের নিদর্শন সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে তখন তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের সময় নিকটতর হয়ে এসেছে। এ দুটো হাদীসের মূল বক্তব্য ও মর্ম প্রায় কাছাকাছি। তবু বিভিন্ন হাদীস ও আল কোরআনের ভাষ্য অনুসারে সূরা নাসর-এর শানে নুযুল প্রসংগে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস অপর এক ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে এবং উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও এ মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং অপরাপর হাদীসে একই মতের উল্লেখ রয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের পর হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডেকে কানে কানে কি কথা যেন বললেন, ফাতেমা (রা.) কাঁদলেন। আবার রসূলুল্লাহ (স.) ফাতেমার কানে কি কথা বললেন, এবার ফাতেমা (রা.) হাসলেন। রসূলুল্লাহ (স.) ইন্তেকালের পরে হযরত উম্মে সালমা (রা.) ফাতেমা (রা.)কে হাসা ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাস করলে

www.pathagar.com

উত্তরে ফাতেমা (রা.) বললেন, তিনি প্রথম আমার কানে কানে বলেছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ পৃথিবী থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন। তখন আমি কেঁদেছি। এর পরেই তিনি আমার কানে কানে বললেন তুমি বেহেশতের সকল রমণীকুলের নেত্রী (একমাত্র ইমরান দুহিতা মরিয়ম ছাড়া)। (তিরমিযী)।

উল্লেখিত বর্ণনার সাথে কোরআনুল করীমের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে। এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে সংকলিত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণিত হাদীসের সাথেও হুবহু মিল রয়েছে। কারণ যে নিদর্শন দেখার পর রসূলে পাক (স.) হামদ, তাসবীহ্, এস্তেগফার ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শেষ জীবনে যে আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম' দোয়া বেশী করে অযীফা করতেন, সে আলামত বা নিদর্শন আর কিছুই নয়; তা হচ্ছে 'ইযা জাআ..... তাওয়াবা।' যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে তখন তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি ফাতেমা (রা.)-এর কানে কানে একথা বললেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

এ ক্ষুদ্র সূরাটির মোদ্দা কথা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা যে, যে মহান পয়গাম ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে প্রেরণ করেছেন তা সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেছে। তাঁকে দায়িত্ব সম্পাদনের পর বিরহের অনলে জ্বলে-পুড়ে অব্যক্ত ব্যথা বেদনায় জর্জরিত হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তাই এ সময় সে মহান প্রভুর হামদ, তাসবীহ মাগফেরাত ও তাওবার মাধ্যমে অতিবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

- ০ -

www.pathagar.com